উৎসব ও উপহার

জন্মদিনে, বিয়েতে, কিংবা যে-কোন পালা-পার্বণেই প্রিয়জনের হাতে শ্রেষ্ঠ উপহারটি তুলে দিতে আপনার ইচ্ছে করে। এসব দিনে ডানলপিলোর তৈরী কোন জিনিসের চেয়ে ভালো উপহার আর কি হ'তে পারে? আপনার যে বন্ধুটি প্রবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁকে একটি গদি আর বালিশ সম্বলিত ডানলপিলো ট্র্যাভেলিং কিট্ দিন; জন্মদিনে ডানলপিলোর সুন্দর একটি কুশন অথবা তাকিয়া দিতে পারেন। আর বিশেষ কোন উপলক্ষে যখন অভিনব এবং সুরুচিসম্মত কিছু দিতে চান তখন

ডানলপিলো তোশক ও বালিশই সবচেয়ে চমৎকার উপহার।

DPC-90 BEN

• ধনেখালি
• জর্জেট
• ঢাকাই
বিবিধ ধুতি, শাড়ী
ও বিবাহের শয্যাদ্রব্যের
বিপুল সমাবেশ/
ANINDYA
এসেম

এর পরেই রবার্ট সায়েবের ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলাম। এবং সর্বশেষে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছিলাম মিসেস বনারকে।

অথচ প্রথম যখন মিসেস বনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম…আমার ব্যক্তিগত অধ্যায়টি একটু খুলে বলাই ভাল।

বলতে লজ্জা নেই, মিসেস বনারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের মধ্যে একটু স্বার্থের গন্ধ ছিল। তখন বয়স কম। লেখাপড়া শিখে বেকার বসে আছি। কিন্তু আমার একটি মাত্র চিন্তা—বিলেত যেতে হবে। চিন্তা প্রায় নেশায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলেতের কোথায় যাবো, কেন যাবো, কি করে যাবো কিছুই জানি না। শুধু যেতে হবে, এইটুকু জানি। দিন নেই রাত নেই, বন্ধু শরৎ আর আমার কেবল ঐ শুধু এক চিন্তা। গড়ের মাঠে, নদীর ধারে, বাড়ীর ছাদে শুধু আমাদের ঐ এক আলোচনা। আর সে আলোচনা হতো পুরো ইংরিজীতে। বিলেত গেলে তো আর বাংলায় কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

শরৎ আমার থেকে অনেক চালাক চতুর। সে বলেছে, "চল্ না, খালাসী হয়ে চলে যাই। লিপটন সায়েব তো খালাসী হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন।" আমি বলেছি, "সেসব দিন কি আর আছে রে ভাই। ওসব কাজে ঢোকা খুব শক্ত।" সত্যিকথা বলতে কি বাড়ীর বাক্স ভাঙবার কথাও ভেবেছি। শুনে শরৎ বলেছে, "এই তো আইডিয়া এসে গেছে।" আমি দ্বিতীয়বার ভেবে বলেছি, "না রে, বাক্স ভেঙে বড় জোর বোম্বাই পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু বিলেত যাওয়ার অনেক হাঙ্গামা—পাসপোর্ট চাই, ইঞ্জেকশনের সার্টিফিকেট চাই, গ্যারান্টি চাই, আরও কত কি।" এসব শুনে শরৎ কিন্তু ঘাবড়ায়নি। বলেছে, "মাথায় একটা বুদ্ধি আসবেই। Try, try, try again."

তারপর একদিন হঠাৎ শরৎ এসে বললে, "চল্ তোকে আজ মিসেস বনারের কাছে নিয়ে যাবো।"

"কে?"

"বিরাট বড়লোক মেমসায়েব। অথচ কেউ নেই।"

কি করে শরৎ মেমসায়েবের সঙ্গে আলাপ করেছিল জানি না। কিন্তু লাউডন স্ট্রীটের একটা বাড়ীর গেটে ঢুকতেই দরওয়ান ওকে সেলাম করলে। তারপর বেল টিপতে চাপরাশী এসে দরজা খুলে দিলে। বললে, "মেমসায়েব পুজোয় বসেছেন। আপনাদের বসতে বলেছেন।"

সোফায় বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের পুজো রে? মেরী মাতার?"

শরৎ বললে, "ধ্যাৎ। পুজো রে, তোর দিদিমা যেমন করে।"

সোফায় বসে আমি ততক্ষণ দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছি। কি সুন্দর সুন্দর ছবি। আর কত যে রঙের বাহার, বেশির ভাগ বিলেতের ছবি। আর তারই মধ্যে ঈষৎ অস্পষ্ট হয়ে ওঠা, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরীর অয়েল-পেন্টিং। ভারী সরল মুখখানি—অপরূপ লাবণ্যে ভরা। কিন্তু একেবারে সেকেলে—হাত পর্যন্ত জামায় ঢাকা, বুকের কাছে কুঁচি দেওয়া।

"মেরী মাতা বুঝি?"

শরৎ বললে, "ধ্যাৎ। মেরী মাতা কেন হবে? মেমসায়েবের কম বয়সের ছবি। তখনও মেমসায়েবকে ইণ্ডিয়াতে পায়নি।"

"মানে?"

"মানে, ইণ্ডিয়ার ভূতে পায়নি। এখন তো দিনরাত শুধু বলছেন, ইণ্ডিয়াই সব। ইণ্ডিয়াই জগৎকে পথ দেখাবে। ক্লান্ত অবাধ্য পৃথিবীকে মাথা নত করে একদিন এই প্রাচীন সভ্যতার করুণা ভিক্ষা করতে হবে।"

"তা তুই এসবে বিশ্বাস করিস না?"

"আমার ভাই এসবে মাথাব্যথা করবার সময় কই? আমাকে বিলেতে গিয়ে নাট-বল্টু তৈরী করা শিখতে হবে। তবে তো অনেক টাকা মাইনের চাকরি হবে। তখন ওসব ভাববো"—শরৎ বললে।

এমন সময় মেমসায়েব ঘরে ঢুকলেন—"হ্যালো শরৎ।"

একটুও ভণিতা না করে শরৎ বললে, "এর কথাই বলেছিলাম। আপনার কথা শোনবার পর থেকেই আসবার জন্য ছটফট করছে। রোজ বলে, কবে মাদামের কাছে নিয়ে যাবে।"

মাদাম সামান্য হাসলেন। স্নানের পর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরেছেন। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওঁকে! বললেন, "আমার কি কপাল! নিউকাসেলেই কয়লা পাঠাতে হচ্ছে। অমৃতের সন্তানদের মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তোমরা অমৃতের সন্তান।"

ইতিমধ্যে বেয়ারা চা নিয়ে এসে রাখলো। সঙ্গে প্রচুর খাবার—স্যাণ্ডউইচ, প্যাটিস, কেক। সেগুলো আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "কত ভাগ্যবান তোমরা—You are born in the faith of rebrith."

স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরতে পুরতে শরৎ বললে, "আমি এসব আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন···"

. মাদাম বিমর্ষভাবে বললেন, "নো নো, মাই ডিয়ার বয়, তুমি বিশ্বাস করতে। It is in your blood, শুধু হয়তো বিশ্বাসটা তোমার অবচেতন মনে ঘুমিয়ে ছিল।"

ওদের কথাবার্তার আমি নীরব শ্রোতা। একমনে মাদামের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কি সুন্দর গরদের গাউন। দেওয়ালে টাঙানো ওই সুন্দর মুখটির উপরই যেন শিল্পী দুই-এক পোঁচ অভিজ্ঞতার রঙ বুলিয়ে দিয়েছে। ফলে অপাপবিদ্ধ কৈশোরের শ্রীটুকু হয়তো মুছে গিয়েছে, কিন্তু প্রজ্ঞার আলোকে মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখের প্রতিটি রেখায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। কি-ই বা বয়েস। ওঁর মতো মেমসায়েবরা তো হাফপ্যাণ্ট প'রে গড়ের মাঠে টেনিস খেলেন। ঘাড়খোলা টাইট স্কার্ট পরে মোটর-ড্রাইভ করে রেসে যান।

মেমসায়েব বললেন, "গীতা সমগ্র মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। আমি রোজ পড়ি—আর রোজই নতুন মনে হয়।"

শ্রদ্ধায় মেমসায়েবের মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না, পায়ের দিকে নজর পড়লো। পায়ে পাতলা ফিন্‌ফিনে ঘিয়ে-রঙের মোজা—এমন পাতলা—যে মনে হয় কিছুই পরেননি। কি ভারি ভারি পা দুটো।

মেমসায়েব ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইটের টিন থেকে সিগারেট বার করলেন। বললেন, "তোমরা কিছু মনে কোরো না। এই বদ অভ্যেস বিলেত থেকে এনেছি। কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। তবে খুব চেষ্টা করছি।" রুপোর লাইটারে আগুন জ্বালালেন। তারপর কত কথা হলো। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শরতের এতো আগ্রহ আর কখনো দেখিনি। আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মাদাম ঘড়ির দিকে তাকালেন। "আহা, অনেক দেরী করিয়ে দিলাম।"

আমরা বেরোতে যাচ্ছি। আবার আটকালেন। "একটু দাঁড়াও, ড্রাইভারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমাদের গাড়ী করে এগিয়ে দিয়ে আসুক।"

গাড়ীতে বসে শরতের মুখের দিকে তাকিয়েছি। ড্রাইভার রয়েছে, কথা বলতে পারিনি। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে ওকে চেপে ধরেছি। ও বলেছে, "সোজা কথা ভাই। আমাকে বিলেত যেতে হবে। সে যে করেই হোক।"

আমি বলেছি, "যা বলো ভাই, মহীয়সী মহিলা। এঁদের পায়ের ধুলো নিলেও অক্ষয় পুণ্য হবে।"

অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো মিসেস বনারকে। লোভ সামলাতে পারিনি, শরতের সঙ্গে ওঁর বাড়ীতে আবার গিয়েছি। উনি আদর করে বসিয়েছেন। কত কথা বলেছেন। কথা বলতে বলতে একটু থেমে আবার বলেছেন, "এসব কাদের বলছি। এসব তো তোমাদেরই কথা। আমারই বা জানা আছে কতটুকু? তবে জানবার চেষ্টা করছি, মাই ডিয়ার বয়। এই যে বিরাট ভারতবর্ষ—এরই তীর্থে তীর্থে কত যুগের সাধনা সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে।"

আমি বিস্ময়ে ওঁর মুখে দিকের তাকিয়ে থেকেছি। বিদেশিনী হয়েও এত জানেন। ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইটের টিন খুলে সিগারেটে ধরাতে ধরাতে মিসেস বলেছেন, "জীবনকে জানতে হবে, নিজেকে জানতে হবে। দুঃখের নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁকে আলিঙ্গন করতে হবে।"

উনি একমনে বলে চলেছেন। আর গোটা তিনেক স্যাণ্ডউইচ একসঙ্গে মুখে পুরে শরৎ বলেছে, "আশ্চর্য, নবীন ভারতবর্ষ সেই সত্যকে ভুলে যাচ্ছে।"

মিসেস বনার হেসে বলেছেন, "কে বলেছেন ভুলেছে? ভারত কি আজও বুদ্ধের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয় না? কপিলাবস্তুর রাজকুমার একদিন নিজের সুখস্বর্গ ত্যাগ করে

দুঃখে ভরা বিশাল পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন বলেই তো আজও তাঁর পুজো হয়।"

হঠাৎ মেমসায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "বোধগয়া দেখেছো তোমরা?" আমরা যাইনি শুনে মাদাম এয়ার-কণ্ডিশন ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে এনেছেন। আমি বলেছিলাম, "ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলেই হতো।" মাদাম আঁতকে উঠেছেন—"গড্ ফরবিড্! এই ক্লাইমেটে ফার্স্ট ক্লাস—শেষে তোমাদের একটা অসুখ বেধে যাক্।"

ভারতবর্ষের জন্য দুহাতে টাকা খরচ করেছেন মিসেস বনার। পয়সার কোনো মায়া দয়া নেই। শরৎ বলেছে, "হবে না কেন? আছে অনেক, আর খাবে কে? না আছে স্বামী, না আছে ছেলে। এখন কোনো রকমে আমার একটা হিল্লে হলে হয়। একটা hint দিয়ে রেখেছি।" একটু থেমে আমাকে বলেছে, "অতো মুখচোরা হ'লে লাইফে কিছু করতে পারবি না। মেমসাহেব in fact তোকে আমার থেকেও বেশী পছন্দ করেন। মুখ ফুটে তোর অভাবের কথা বল্, টাকার অভাব হবে না।"

লজ্জায়, ঘৃণায় মাথা নামিয়ে নিয়েছি আমি। মানুষের বিশ্বাস, শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতারণা করা। আগে হয়তো পারতাম। কিন্তু মিসেস বনার আমার অন্ধকার জীবনে সত্যের দীপালোক জ্বেলে দিয়েছেন।

শরৎ একদিন এসে বললে, "ইংরেজি ভাল না জানতে পারি। কিন্তু ম্যাথ্ ম্যানেজ হয়ে গেল। আমার কথা শুনে মেমসায়েব প্রথমে বলেছিলেন, 'বিলেত? ওখানে কি শিখবে? ওরাই তোমাদের পায়ের তলায় এসে শিখবে একদিন, সে দিন বেশী দূর নয়।' কিন্তু আমিও কম চালাক নই, স্বামীজীর বুলি মুখস্থ করে গিয়েছিলাম, নবীন ভারত ইউরোপকে তার বাণী শোনাক।"

এর পর মিসেস বনার আর দ্বিধা না করেই বলেছেন, "তোমার যাওয়ার arrange করো। আমি টাকা দেবো। It is my duty and I will."

টুরিস্ট ক্লাসে শরৎ যাবে শুনে মেমসায়েব রেগে উঠেছিলেন। "আমার গোটা চল্লিশ পাউণ্ড বাঁচিয়ে কি লাভ হবে?" তারপর উনিই টমাস কুককে টেলিফোনে ডেকে পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর জাহাজে কেবিন রিজার্ভ করে দিলেন।

শরৎ চলে যাওয়ার পর মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমিও বিলেত যেতে পারতাম। তারপর ক্রমশঃ নিজেকে সামলে নিয়েছি। এবং যথারীতি একদিন বিকেলে মিসেস বনারের বাড়িতে হাজির হয়েছি। তখন কে জানতো ঐ দিনই রবার্ট সায়েবের সঙ্গে আমার আলাপ হবে।

মেমসায়েব সোফায় বসে গীতা পড়ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি গীতা বন্ধ করলেন। বললেন, "কি ব্যাপার? কোনো খোঁজখবর নেই। ভেবে মরি, ছেলেটার হলো কি?"

বললাম, "শরীরটা ভাল ছিল না। তা আপনার কেমন চলছে?" মেমসায়েব বললেন, "ভালই করেছ, আজকে এসে। এতদিন রবার্টের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে হাঁপিয়ে উঠেছি।"

রবার্ট কে আমি জানতাম না। মেমসায়েবের মুখেই শুনলাম, মাসখানেক হলো কলকাতায় এসেছে। বেঙ্গল চেম্বারে ছোকরা অফিসার। এডিনবরা থেকে বি-এ পাস করে সোজা চলে এসেছে ইণ্ডিয়াতে। ভাল চাকরি, ভবিষ্যৎ আরও ভাল—বড়সায়েব হয়ে রিটায়ার করবে।

মেমসায়েব বললেন, "অদ্ভুত ছেলে। অনাঘ্রাত ফুলের মতো নিষ্পাপ। তবে বয়সটা খারাপ। হোম থেকে প্রথম আসবার পর একটা বছর মোস্ট ডেঞ্জারাস। সাবধানে না থাকলেই ঐ টাইপিস্ট মেয়েগুলোর পাল্লায় পড়বে। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওয়েলেসলী স্ট্রীটে গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে; তারপর একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে হোটেলের বারে এসে বসবে।

"ছেলেটা ভাল, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে কতক্ষণ? সেই জন্যেই ভারতের প্রতি ওর শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা করছি। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে, তার সংস্কৃতিকে ওর জানা প্রয়োজন। কিন্তু ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে কেমন একটা প্রেজুডিস নিয়ে এসেছে। কিছুতেই শুনতে চায় না।"

মেমসায়েব বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে বললেন। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করলে, "তিন আদমীর জন্যে তো?" মেম-সায়েব বললেন, "না, দু আদমীর জন্যে।" আমাকে বললেন, "রবার্ট আজ আর আসবে না। কাল যা ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেল!"

কেকের ডিসটা সবেমাত্র উনি আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। রবার্ট সায়েব ঘরে ঢুকলেন।

মেমসায়েব এক মুখ হেসে বললেন, "কতদিন যে বাঁচবে তুমি! এইমাত্র তোমার কথা হচ্ছিল।"

"কথা হওয়ার সঙ্গে অনেকদিন বাঁচবার সম্পর্কটা কি?" সোফায় বসতে বসতে রবার্ট সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা এ বিষয়ে নিশ্চয় কিছু বাণী দিয়ে গিয়েছেন।"

মেমসায়েব রাগে গর্জন করে উঠলেন। "মুনি-ঋষিদের এর মধ্যে টানছো কেন? ভারতবর্ষের সাধারণ লোকেরা যা বিশ্বাস করে আমি শুধু তাই বলেছি।"

রবার্ট সায়েব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখে থমকে গেলেন। আমিও কোট প্যান্ট মোড়া রবার্ট সায়েবের ছ'ফুট তিন ইঞ্চি দেহখানা ভাল করে দেখে নিলাম। ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের মতো দোহারা অথচ সবল চেহারা। হাতের চওড়া কব্জি দেখলেই বোঝা যায় যে, কব্জির মালিক নিতান্ত ননীর পুতুল নন। দামী সার্জের কোটের বোতামে একটা গোলাপ ফুল গোঁজা।

মেমসায়েব বললেন, "ওহো, তোমাদের আলাপ করিয়েই দেওয়া হয়নি।" রবার্টের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে-দিতে মেমসায়েব বললেন, "শংকর কিন্তু তোমার মতো গোঁয়ার নয়। আমার কথা শুনতে ও কি যে ভালোবাসে!"

ব্যাক-ব্রাশ-করা সোনালী চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে রবার্ট সায়েব বললেন, "কেন এই ছেলেটির ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ। ইণ্ডিয়াতে এখন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কারিগর দরকার। নাগা সন্ন্যাসী আর না বাড়লেও কোন ক্ষতি হবে না ইণ্ডিয়ার।"

মেমসায়েব রাগে গজগজ করে উঠলেন, "রবার্ট, এসব আলোচনা তো কালই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাকে আশা-ই করিনি।"

রবার্ট সায়েব হেসে ফেললেন, "আমার কিন্তু কিছু আশা আছে।" পকেট থেকে দু'খানা সিনেমার টিকিট বার করলেন। "বেশি সময় নেই কিন্তু। সিনেমা হলে পৌঁছতেই পনরো মিনিট লাগবে।"

মেমসায়েবের অনুমতি নিয়ে আমি উঠে পড়লাম। আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে মেমসায়েব বললেন, "তুমি তো জান, সিনেমা আমি দেখি না, তবু আজ যাবো, কারণ ওকে আমাদের দলে টানতে হবে। ভারতের দর্শন, ভারতের ধর্ম-আন্দোলন যে সকল ধর্মের শেষ কথা তা বোঝাতেই হবে।"

মিসেস বনারের ওখানেই রবার্ট সায়েবের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। ওঁরা দু'জনে জোর আলোচনা করছিলেন, সেই সময় গিয়ে পড়েছি।

মিসেস বনার বলছিলেন, "ইউরোপের সবচেয়ে বড় ভুল তো ওইখানেই, প্রচলিত চিন্তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলেই রাগ করে। কেউ যদি বোঝাতে যায়, ভাবে আক্রমণ করছে। হিন্দুধর্মের আশ্রয় নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়। ইউরোপকে, রণক্লান্ত ইউরাপকে, বাঁচাবার ঐ একমাত্র পথ।"

রবার্ট আমার উপস্থিতিতে একটু লজ্জা পেলেন—একজন ভারতীয়ের সামনে ভারতের নিন্দা করা। আন্দাজ করে আমি বললাম, "আলোচনার সময় প্রাণ খুলে কথা বলাই ভাল।"

রবার্ট সাহস পেয়ে বললেন, "ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এই অহেতুক শ্রদ্ধা আমার ভাল লাগে না। হাজার হাজার বছর ধরে ঐ সত্যের পুজো করে ভারতের কি অবস্থা হয়েছে দেখছি তো।"

মেমসায়েব রেগে উঠলেন, "এ তোমার গোঁড়ামি।"

রবার্ট হাসলেন। "ইউরোপ গোঁড়া? উইলিয়ম জোন্স, ম্যাক্সমুলর, উইলসন, উডরফ এঁরা কি কলকাতাতে জন্মেছিলেন?"

আমার টিউশনির সময় হয়ে আসছিল, অনুমতি নিয়ে বিদায় নিলাম। ওঁদের আলোচনা তখন পুরোদমে চলেছে।

কয়েকদিন পরে মেমসায়েবের বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, দরওয়ান বললে, "যাবেন না। রবার্ট সায়েবের বসন্ত হয়েছে। যা ছোঁয়াচে রোগ!"

সপ্তাহখানেক পরে আবার গিয়েছি, মেমসায়েব ভিতরে নিয়ে গেলেন। রবার্ট শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। আমাদের পায়ের শব্দে বই বন্ধ করলেন, সারা মুখে কালো কালো দাগ। মুখের সেই নিষ্পাপ সৌন্দর্য কিন্তু নষ্ট হয়নি। বরং ওই কালো দাগগুলো দিয়ে থিয়েটারের মেক্-আপ ম্যান যেন প্রশান্তি এনে দিয়েছে মুখে।

মেমসায়েব রবার্টের চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, "উঃ, যা অভিমানী! সেদিন তো তুমি যাবার পর ও ঝগড়াঝাঁটি করে বেরিয়ে গেল। তারপর

আর দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত আমিই গেলাম পার্ক স্ট্রীটে— মাদাম বেরিলের গেস্ট-হাউসে। গিয়ে দেখি এই অবস্থা। ভাগ্যিস গিয়ে পড়েছিলাম। ওরা তো এম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য টেলিফোন করে দিয়েছিল। উঃ, সেই অচৈতন্য দেহটাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠালে কি যে হতো! নেহাত মুনি-ঋষিদের আশীর্বাদ।"

রবার্ট এবার একটু হাসলেন। গায়ের চাদরটা আরও একটু টেনে নিলেন—"আবার মুনি ঋষি?"

মেমসায়েব বললেন, "অসুখের ক'দিন এইসব কথা তুলিনি ইচ্ছে করেই। তা বলে চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ করছি না।"

বেয়ারা ফলের রস দিয়ে গেল। মেমসায়েব রবার্টের মুখটি ধরে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিলেন। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন।

রবার্ট সায়েব পা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "টুরিস্টদের দেখবার মতো অনেক কিছু আছে ইণ্ডিয়াতে। মন্দির, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বারাণসী, অজন্তা, ইলোরা, সমস্ত দক্ষিণ ভারত।"

"শুধু মন্দির? সে তো ডাবের খোলা। ভিতরের সত্য যদি আস্বাদন না করলে, তাহলে কিছুই হলো না।"

অসুখের মধ্যে পাছে উত্তেজনা বাড়ে এই ভয়ে আমি আর মিসেস বনার বেরিয়ে এসেছি। উনি বলেছেন, "হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ওর যেন জাতক্রোধ। কিন্তু আমিও ছাড়বো না। রবার্ট আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ভারতের পায়ে মাথা নত করে ছাড়বো। অসুখের মধ্যেই কায়দা করে ওকে কিছুটা সংস্কৃত আর বাংলা শিখিয়েছি।"

এরপর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রবার্টকে নিয়ে মিসেস বনার নৈনিতাল চলে গিয়েছেন। হাওড়া স্টেসনে পাঞ্জাব মেলের এয়ার-কণ্ডিশন কোচে ওঁদের দুজনকে তুলে দিয়ে এসেছি।

ট্রেনের কামরার বাইরে এসে মেমসায়েব আমাকে বলেছেন, "নৈনিতাল যাবার কোনো ইচ্ছে ছিলনা আমার। কিন্তু রবার্টের শরীরটা ভাল না থাকলে ধর্মে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না।"

নৈনিতাল থেকে ফিরে এসে মেমসায়েব আমাকে দেখা করতে চিঠি লিখেছেন। গিয়ে দেখি রবার্ট সায়েবও বসে আছেন। মেমসায়েব আমাকে কতকগুলো বই উপহার দিলেন। অদ্বৈত আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমার জন্য কিনে এনেছেন। আমরা দু'জনে আলোচনা করতে লাগলাম—রবার্ট সায়েব তাতে আগ্রহ দেখালেন না। একমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টাইম কাগজ পড়তে লাগলেন। আমাদের আলোচনা চলতে লাগল। অবশ্য মেমসায়েবই প্রধান বক্তা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রবার্ট সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে তুমি যাবে না সুইমিং ক্লাবে?" মেমসায়েব হাসলেন, "তুমি তো জান রবার্ট, সে মন আমার নেই। ক্লাবে গিয়ে সাঁতার কাটা, ওতে আনন্দ খুঁজে পাই না। তা ছাড়া আমাকে পুজোতে বসতে হবে।"

রবার্ট সায়েব সেদিন আমাকে মোটরে লিফ্‌ট্ দিতে চাইলেন। "আমি সুইমিং ক্লাবে যাবার পথে তোমাকে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দেবো।" শুনে মেমসায়েব বললেন, "তা হলে খুব ভাল হয়।"

রবার্ট সায়েব নিজেই ড্রাইভ করেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। মেমসায়েব বললেন, "শংকর, আবার এসো।" রবার্টকে বললেন, "রাগ করলে চলবে না কিন্তু।"

গেট পেরিয়ে যেতেই রবার্ট সায়েব আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। "কত দিন আসছেন এখানে?"

"তা বছরখানেক হলো।"

"কেন আসেন?"

"মেমসায়েবের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে ভাল লাগে।"

রবার্ট সায়েব এবার আমার হাতটা চেপে ধরলেন, "Please don't take it otherwise. ঐ সরল ভদ্র-মহিলার মধ্যে এইসব ধর্মের কুসংস্কার ঢুকিয়ে কি লাভ হচ্ছে?"

রাগে অপমানে সেদিন আমি চৌরঙ্গী রোডের ওপর গাড়ী থেকে নেমে পড়েছিলাম। এবং সেই শেষ। আর কোনও দিন যাইনি লাউডন স্ট্রীটে। যেখানে আমি প্রত্যাশিত নয়, সেখানে যাওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

মেমসায়েবের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সংসারের নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেয়েছি এবং এক অপরিচিত বিশাল জগতের মধ্যে ডুব দিয়েছি।

অনেকদিন পরে হাইকোর্টের কাজেই একদিন 'বেঙ্গল চেম্বারে' গিয়েছিলাম। হঠাৎ রবার্ট সায়েবের কথা মনে পড়ে গেল। ওঁদের আরবিট্রেশন ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "রবার্ট সায়েবের এখানে কি পোস্ট?"

বড়বাবু আমার দিকে তাকালেন, "আপনি কি রবার্ট সায়েবকে চিনতেন?"

"আজ্ঞে, একসময় পরিচয় ছিল।"

"তিনি তো সংসার ত্যাগ করেছেন।"

চমকে উঠেছিলাম। রবার্ট সায়েব, সংসার ত্যাগ করেছেন! সেই দুর্দান্ত কেতাদুরস্ত, অবিশ্বাসী রবার্ট সায়েব চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সংসারের মায়া কাটিয়ে ঈশ্বর-সন্ধানী হয়েছেন।

বড়বাবু বললেন, "কার মন যে কোথায় মজে! না হলে রবার্ট সায়েবের মতো সায়েব। ঐ চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছোকরা কিনা হিন্দু হয়ে গেলেন। কি করে যে সম্ভব হয় তিনিই জানেন।"

চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিসেস বনার ও রবার্ট সায়েবের ছবিটা। রবার্ট সায়েব হিন্দুধর্মের কথা বুঝবেন না, মেমসায়েবও ছাড়বেন না। রবার্ট বলছেন—"অন্য কেউ হলে এসব কথা কান দিয়ে শুনতামও না। নেহাত তুমি বলছো তাই।"

শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাড়ী ফিরে এসেই মেমসায়েবকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছি—আপনার জন্যই এই অসম্ভব সম্ভব হলো। রবার্ট সায়েবের মতো মানুষকে হিন্দু-ধর্মের পূজারী করে ছাড়লেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়। আধুনিক ভারতের নৈতিক পুনরভ্যুত্থানের ইতিহাসে সিস্টার নিবেদিতা, মাদার এবং মিস্ ম্যাক্‌লাউড-এর সঙ্গে আপনার নামও সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

মেমসায়েবের কাছ থেকে কোনও উত্তর পাইনি। প্রত্যাশাও করিনি। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভারত সংস্কৃতি সোসাইটির বার্ষিক সংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। প্রণাম জানিয়েছি সেই মহীয়সী বিদেশিনীর চরণে। আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে লিখেছি—আমার লেখা শেষ চিঠির উত্তর তিনি দেননি। কিন্তু কোনো খেদ নেই তার জন্য।

খেদের কথাটা সেদিন অত ভেবেচিন্তে লিখিনি। তখন কি জানতাম ওঁর সঙ্গে দেখা না হলেই আমার ভাল হতো। শুধু শুধু দুঃখ পেতে হতো না। আর আপনাদের কাছেও আমাকে আজ কোনো অন্যায় অনুরোধ করতে হতো না। যাক, গল্পের ঝোঁকে, দয়া করে আমার অনুরোধটা কিন্তু ভুলবেন না। কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন।

জানি মানুষের এই সংসারে সবই সম্ভব। জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, কান্না-হাসির মধ্য দিয়েই সংসারের রথচক্র বার বার আবর্তিত হয়। তবু যেদিন দিল্লীমেলে

মিসেস বনারের সঙ্গে দেখা হলো, চোখের জল সামলাতে পারিনি।

আমার হাইকোর্টের পালা চুকিয়ে তখন আবার পথে বেরিয়ে পড়েছি। থার্ডক্লাসের একখানা টিকিট কাটিয়ে দিল্লীমেলে উঠে বসেছি। দিল্লীমেল যখন বর্ধমান স্টেশনে থামলো, তখন গাড়ী থেকে নেমে একটু প্ল্যাটফরমের উপর এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল খাবারওয়ালার উপর। চারচাকা গাড়ীতে পুরি ভেজে বিক্রি করছে। আর এক মেমসায়েব সামনে দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙা হাতে করে পুরি খাচ্ছেন। খাবারওয়ালা বললে, মিঠাই মেমসাব? শালপাতা থেকে তরকারীটা মুছে খেতে খেতে মেমসায়েব বললেন, না। আমি চমকে উঠেছি। গলার স্বরটা চেনা-চেনা যেন। মিসেস বনার না?

এদিকে গাড়ীর হুইসল পড়ে গিয়েছে। ছুটে গিয়ে নিজের কামরায় উঠতে হলো। আসানসোলে যখন গাড়ী

এলো তখন রাত অনেক। গাড়ীতে ভীড়ও বেড়েছে। মেমসায়েবের খবর নেওয়া হলো না। অথচ ঐ পুরি কেনার দৃশ্যটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। পরের দিন ভোরবেলায় মোগলসরাই স্টেশনে গাড়ী থেকে নেমে মেমসায়েবকে খুঁজে বার করলাম। থার্ডক্লাস কামরায় বেঞ্চির এক কোণে উদাস ভাবে বসে রয়েছেন। চুলগুলোর যত্ন যে কতদিন হয়নি কে জানে। চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে। এই ক'বছরেই বয়স যেন পনরো বছর এগিয়ে গিয়েছে। জামা-কাপড়ের দিকেও নজর পড়লো। গরদের সেই স্কার্ট আর নেই—অতি সস্তা দরের তাঁতের কাপড়, তাও ফাট ধরেছে।

ভীড় ঠেলে গাড়ীর মধ্যে ঢোকা সম্ভব নয়। তাই জানলা দিয়েই বললাম, "গুড্ মর্নিং, মাদাম।"

মেমসায়েব আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, "চিনতে পারছেন না? আমি শংকর। রবার্ট সায়েবের সংসার-ত্যাগের খবর পেয়ে আপনাকে শেষ চিঠি লিখেছিলাম।"

মেমসায়েব এবার চিনতে পারলেন। কিন্তু মোটেই খুশী হলেন না। মুখটা ব্যাজার করে বললেন, "লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ তোমার! তোমার বন্ধু ও তোমার জন্যে তো অনেক কিছুই করেছিলাম একদিন। চিঠি দিয়ে অপমান করবার কি অধিকার ছিল তোমার?"

গাড়ীর লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার রাগও বেড়ে উঠছিল। বললাম, "আপনার কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। অনেক কথাই তো বলছেন। কিন্তু লজ্জার মতো কি করেছি?"

মেমসায়েব রাগে লাফিয়ে উঠলেন। "লজ্জা, লজ্জা তোমাদের আছে, যে পাবে? মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করতে পারো তোমরা।"

অনেক কষ্টে সেদিন নিজেকে সংযত করেছিলাম। অনেক উপকার পেয়েছে ভারতবর্ষ ওঁর কাছে। কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে মনকে ঠাণ্ডা করেছি। তবু যাবার সময় বললাম, "অনেক মানুষ দেখেছি, অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু আপনার জুড়ি দেখিনি।" কথা শেষ করেই নিজের কামরায় উঠতে যাচ্ছি, দেখি মেমসায়েব ডাকছেন, লোকজন আমার দিকে মিটমিট করে হাসছে। কি কুক্ষণেই যে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো!

ফিরে গিয়ে বললাম, "কি চান?" মেমসায়েবের রাগে কে যেন ইতিমধ্যে জল ঢেলে দিয়েছে। বললেন, "রাগ করলে? I am sorry. মাথাটা ঠিক থাকে না। তার উপর থার্ডক্লাসের এই কষ্ট।"

কিছু উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। উনি বললেন, "তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছো; কৃষ্ণপ্রাণকে দেখেছো কি?"

"কৃষ্ণপ্রাণ?" আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ট্রেনের হুইসল বেজে উঠলো।

এলাহাবাদ স্টেশনে সুটকেস সমেত নামলাম। আমার টিকিট ঐ পর্যন্ত। হঠাৎ দেখি মিসেস বনারও তাঁর ছোট্ট ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ছেন। বললেন, "ভেবেছিলাম কানপুরটা আগে খুঁজে দেখবো। তা তুমি যখন রয়েছো চলো। এলাহাবাদটাই সেরে ফেলি। কিছুই বলা যায় না, হয়তো ও এখন ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করছে।"

ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা যখন সঙ্গমের কাছে এসে রিক্শা থেকে নামলাম তখন প্রায় বিকেল। ভাগ্যিস কোনো বাঁধাধরা প্রোগ্রাম ছিল না, আমার। নিজের মনেই দেশ দেখবার জন্যে হাওড়া থেকে টিকিট কিনে বসেছিলাম।

মেমসায়েব আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, "আমার উপর খুব রাগ করেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মাথার ঠিক থাকে না।"

নদীর ধারে একটা গাছের তলায় এসে বসলাম দু'জনে। বললাম, "অক্ষয়বটকে পুজো দেবেন না?"

মেমসায়েব হাসলেন, "পুজো···ওসব মিথ্যে। আমি কেন পুজো দেবো? আমার তো সব গিয়েছে।"

আমি চমকে উঠলাম। রবার্ট সায়েব—সংসার-ত্যাগী রবার্ট সায়েব—এ কথা শুনলে কি ভাবতেন। নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যেতেন। বললাম, "আপনার অবশ্য আর পুজোর প্রয়োজন হবে না। ক্লাইভ স্ট্রীটের একটা সাধারণ ইংরেজও যাঁর স্পর্শে সোনা হয়ে গিয়েছেন, পূজা-উপচারে তাঁর কি প্রয়োজন?"

সামনে দিয়ে কয়েকজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন। মেমসায়েব হঠাৎ ছুটে গিয়ে তাঁদের মুখগুলো দেখতে লাগলেন। সন্ন্যাসীরা অবাক। মেমসায়েব বললেন, "আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনারা কেউ কি কৃষ্ণপ্রাণকে দেখেছেন? আগে নাম ছিল রবার্ট। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুল। গায়ে লম্বা গেরুয়া-রঙের আলখাল্লা, হাতে একতারা, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।"

সন্ন্যাসীদের একজন বললেন, "না মাইজী, কোনো সায়েব-মহারাজকে তো দেখিনি এখানে।"

ক্লান্ত মেমসায়েব আবার আমার পাশে এসে বসলেন। কেন খুঁজছেন তিনি রবার্ট সায়েবকে? জিজ্ঞাসা করলাম, "রবার্ট সায়েব কোন্ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছেন? যাঁর জন্যে আপনি এতো করেছেন, তিনি আপনাকে ইচ্ছে করলেই চিঠি লিখতে পারেন। সন্ন্যাসীদের তো চিঠি লেখা বারণ নেই।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মেমসায়েব। এমন তীব্র সে চাহনি যে মনে হলো আমাকে সম্মোহিত করে ফেলবেন। তারপর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার কোলে মাথা রেখেই কাঁদতে লাগলেন। কোনোদিন তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে উনিই আমাকে ও রবার্ট সায়েবকে বলেছিলেন, দিব্যজ্ঞানী কখনও চোখের জল ফেলেন না। সুখদুঃখ কোনো কিছুতেই অভিভূত হন না।"

অশ্রুর বারিবর্ষণে নিজেকে শীতল করে মিসেস বনার যখন উঠে বসলেন তখন সন্ধ্যার ক্লান্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ত্রিবেণী তীর্থের পবিত্র সলিলে কে যেন লাল রঙ ঢেলে দিয়েছে। সেই প্রায়ান্ধকারে এলাহাবাদ ফোর্টের কাছে বসে মিসেস বনারের মুখে সেদিন রবার্ট সায়েবের পুরো গল্প শুনেছিলাম।

"তুমি তো জান ও ভগবানে বিশ্বাস করতো না।"

"খুব জানি। আমাকেও একদিন কথা শুনিয়েছিলেন, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম"—আমি বললাম।

মেমসায়েব হাসলেন—"আমি খবর পেয়েছিলাম। রবার্ট নিজেই বলেছিল। রবার্ট বলেছিল, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সময় নষ্ট করছো কেন? ঐ সময়টা পৃথিবীকে দেখলে অনেক লাভ হতো।"

মেমসায়েব তখন ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "হিন্দুর ভগবানে বিশ্বাস না করো, খ্রীষ্টের ভগবানে বিশ্বাস করো। না হলে সৎপথে থাকবে কি করে? ডালহৌসির এই ছন্নছাড়া মেয়েগুলোর সঙ্গে কোথায় ভেসে যাবে।"

রবার্ট সায়েব হেসেছেন। "মেয়েদের হাত থেকে উঠ্তি বয়সের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যেই কি মুনি-ঋষিরা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন?"

মেমসায়েব বলেছিলেন, "মোটেই নয়। কিন্তু জীবনের কাব্যকে ছন্দে বাঁধবার জন্য একটা ভাবের অবলম্বন চাই তো।" রবার্ট সায়েব বলেছেন, "এসব বাজে আলোচনায় সময় নষ্ট কিছুতেই করতাম না। নেহাত তুমি বলছো তাই।"

রবার্টের একমাস ছুটি পাওনা হয়েছিল। ওঁকে নিয়ে ভারত-দর্শনে বেরোবার প্রস্তাব করলেন মেমসায়েব। প্রথমে রাজী হননি। তখন ক্যামেরার ছবির লোভ দেখিয়েছেন মেমসায়েব।

রবার্ট বলেছেন, "That's interesting. বিশ্বাস করি আর না করি, মন্দির, নদী, পাহাড়, সাধু-সন্ন্যাসীর ছবিগুলো ইণ্টারেস্টিং। ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজে খাতির করে ছাপবে।"

কেবল ছবির আকর্ষণ নয়। মেমসায়েব বললেন, "আর কেউ ওকে বার করাতে পারতো না। কেবল আমার জন্যেই রাজী হয়েছিল।"

দু'জনে সমস্ত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছেন। অরুণাচলে রমণ মহর্ষি, আরও দক্ষিণে সাই বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। মেমসায়েব প্রণাম করেছেন। রবার্ট ছবি তুলেছেন।

তারপর রামেশ্বর-সেতুবন্ধ। কন্যাকুমারিকার যে শিলা-খণ্ডের উপর বসে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারত-চিন্তা করেছিলেন, তাও দেখেছেন। রবার্ট সায়েব বলেছেন,

"প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব।" মেমসায়েব জিজ্ঞাসা করেছেন, "শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর কিছু?" রবার্ট বলেছেন, "কই না তো।"

তারপর উত্তর ভারত। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, হরিদ্বার। রবার্ট সায়েব নাক চেপে ধরে ক্যামেরার বোতাম টিপেছেন। মুখ বেঁকিয়ে বলেছেন, "এই ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাবে? How silly!"

ফেরবার পথে এলাহাবাদ। রবার্ট সায়েব বলেছেন, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার কলকাতায় ফিরলেই হয়। ছুটিটা একেবারে নষ্ট হলো। হাজার হাজার বছরের পুরনো ইট-কাঠ-পাথরগুলো দেখে সময় নষ্ট না করে কাশ্মীর গেলে চোখের তৃপ্তি হতো।"

মেমসায়েব বলে চলেছেন, আমি শুনছি।

"সঙ্গমে যাবার জন্য আমরা নৌকো করলাম। সকালের রৌদ্র গঙ্গার জলে এসে পড়েছে। রবার্ট ছবি তুললো কয়েকটা। তীরের দিকে ফিরে আসবার সময় দেখলাম একটি যুবতী বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে, চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে প্রণাম জানাচ্ছে। রবার্ট ক্যামেরা তুলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম, মেয়েদের স্নানের ছবি তুলতে গিয়ে একটা গোলমাল বেধে যাক। প্রণাম শেষ করে, চোখ খুলে আমাদের দেখেই মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

নৌকো থেকে নেমে নদীর ধারে একটু নির্জন স্থানে এসে বসলাম আমরা। পা দুটো ছড়িয়ে রবার্ট ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম পরাতে লাগল। এমন সময় কানে গেল—"ঠাকুর!"

রবার্ট চমকে উঠে ক্যামেরাটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো। ভিজে কাপড় পরে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্নান সেরে সবেমাত্র গঙ্গা থেকে উঠে এসেছে। একেবারে কাঁচা বয়স—একুশ-বাইশের বেশি নয়। ন'হাত গেরুয়া কাপড়ে ঐ দীর্ঘ, চঞ্চল দুরন্ত দেহখানি ঢেকে রাখা কি সম্ভব! ভিজে কাপড় হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে। পা দুটো দুধের মতো সাদা। দুটো-চারটে কালো রোম জলে ভিজে দেহের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। মেয়েটি ভিজে কাপড়ে যৌবনগর্বে উদ্ধত নিজের দেহটিকে কোনোক্রমে জড়িয়ে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে রবার্টের দিকে তাকিয়ে রইল। ভারি সরল মুখখানি।"

বিরক্ত হয়ে রবার্ট আমায় বললে, "একটু নিরালায় বসে তোমার সঙ্গে গল্প করবো ভাবলাম, সেখানেও বাধা। অদ্ভুত দেশ। Privacy বলে কোনো বস্তু নেই।"

"এতোদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর?" মেয়েটি ভিজে কাপড়ে দূর থেকে রবার্টকে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে তুমি? কি চাও?"

মেয়েটি বিরক্ত হলো। মুখ বেঁকিয়ে বললে, "থামো তুমি। আমার ঠাকুর জিজ্ঞাসা করুক। তাকে সব বলবো।" রবার্টের মুখের দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হলো তার দুটি ক্ষুধিত চোখ দিয়ে সে যেন রবার্টকে গিলছে।

ভিতরে কিছুই পরেনি মেয়েটি, কেবল কাপড়টি ভরসা। সেই অবস্থায় সে রবার্টের গা ঘেঁষে এসে বসলো। "ঠাকুর! আমার কেষ্টঠাকুর—এতোদিন কোথায় ছিলে?"

রবার্ট হকচকিয়ে উঠে, খানিকটা আমার দিকে সরে এল। ভাঙা ভাঙা বাংলায় রবার্ট বললে, "কে তুমি?"

"আর ছলনা কোরোনা, ঠাকুর। আমি যে তোমার মীরা। বীরভূমের ভাঙা কুঁড়েঘরে স্বপ্ন দিয়ে সেই যে তুমি লুকিয়ে পড়লে। তারপর আমার ঘুম নেই। অন্ন রোচে না। রাত যেন শেষ হতে চায় না। কত তীর্থে খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। কত মন্দিরে তোমার জন্য মাথা খুঁড়েছি। এতোদিনে সময় হলো ঠাকুর? তাও আবার সায়েব সেজে ছলনা করছো।"

রাগে, অপমানে ও লজ্জায় রবার্টের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলো—"কি চায়? ভিক্ষা?"

আমি বললাম—"এরা বোষ্টমী। সংসার ত্যাগ করে ভগবান কৃষ্ণের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর উদ্দেশে ভজন গায়, তাঁর পূজা করে, তাঁর জন্যেই নিজের দেহ ধারণ করে।"

মনিব্যাগ থেকে একটা আধুলি বের করে রবার্ট মাটিতে ফেলে দিল। বোষ্টমী বললে, "একি ঠাকুর, অর্ধেকে কি হবে? আমি ও নেবো না।"

আমি ভাবলাম পুরো টাকাটাই চাইছে। রবার্টকে বলতে গেলাম তাই। বোষ্টমী রাগে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। "কি সব ভুল বোঝাচ্ছো আমার ঠাকুরকে?" তারপর রবার্টের পা জড়িয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। "আমার স্বপ্নের সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। সেই চোখ, সেই নাক, সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণ।"

রবার্ট পা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করতে, বোষ্টমী আরো ঝুঁকে পড়লো। "চরণে আশ্রয় দাও, ঠাকুর।"

বিরক্ত হয়ে রবার্ট বললে, "এই ভারতবর্ষকে তুমি মাথায় তুলে রেখেছো। যতোসব পাগলের আড়ত।"

রবার্ট উঠতে যাচ্ছিল, বোষ্টমী করজোড়ে বললে, "ঠাকুর, আর কিছু না দাও, তোমার পায়ের ধুলো দাও একটু। দাসী মাথায় করে রাখবে।" হুকুমের অপেক্ষা না করে বোষ্টমী রবার্টের জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

রবার্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "এদেশের মেয়েরাও সংসার ত্যাগ করে ?"

আমি বললাম, "করে। মীরার গল্প তোমাকে বলিনি ? রাজবধূ মীরার কৃষ্ণ-অভিসারের গল্প।"

"তা বলে এই কাঁচা বয়সে একা একা ঘুরে বেড়াবে ? অন্য লোকদের জ্বালাতন করবে ? এদের আত্মীয়-স্বজনরা কিছু বলে না ?"—রবার্ট জিজ্ঞাসা করলে।

"কৃষ্ণ যাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সংসার তাকে বেঁধে রাখবে কি করে ?"

"কেউ এদের ডেকে পাঠাবেনা, মেণ্টাল হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়া।" রবার্ট বিরক্ত হয়ে নিজের জুতোটা সরিয়ে নিলে।

বোষ্টমী পরম যত্নে রবার্টের জুতো খুলছিল। চমকে উঠে রবার্টের দিকে বড় বড় চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল, ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, "তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে কেউ যদি শান্তি পায়, তাতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।"

বোষ্টমী কিন্তু রেগে উঠলো ; আমাকে বললে, "আমার ঠাকুর আমায় শাস্তি দিচ্ছেন, তাতে তোমার কি ?"

রবার্ট রেগে বললে, "তোমার পাল্লায় পড়ে আমার মোজা পর্যন্ত খুলতে হলো।" বোষ্টমী অনুমতির অপেক্ষা না করে আবার রবার্টের মোজা খুলতে লাগল।

রবার্ট সেই ফাঁকে ক্যামেরায় বোতাম টিপলো। মুখ তুলে বোষ্টমী জিজ্ঞেস করলে, "কি করলে ঠাকুর ?" রবার্ট হেসে বললে, "তোমার ছবি নিলাম।" নিজের আঁচল দিয়ে রবার্টের পা মুছোতে মুছোতে বোষ্টমী বললে, "ছায়া নিয়ে কি করবে ঠাকুর ?"

মাটিতে যে আধুলিটা পড়েছিল সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে বোষ্টমী রবার্টের বুকপকেটে নিজেই রেখে দিল।

বোষ্টমীর মুখের দিকে তাকিয়ে রবার্ট কি যেন ভাবলো ; আমার কানে কানে বললে, "চমৎকার একটা ফিচার হবে। লাইফ কিংবা ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ লুফে নেবে—একটি কৃষ্ণ-প্রেমিকার জীবন।" বোষ্টমীকে বাংলায় বললাম, "সায়েব তোমার কয়েকটা ছবি নেবেন।"

বোষ্টমী রেগে বললে, "আমার ঠাকুর আমার ছবি তুলুক, আমাকে মারুক, আমাকে জলে ফেলে দিক, তাতে তোমার কি ?"

আমি হেসে ফেললাম। রবার্টও। একটু ভেবে বললে, "তুমি থাকলে অসুবিধে হবে।" ক্যামেরাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, "তুমি যাও, আমি একটু পরে হোটেলে যাচ্ছি।"

রবার্ট উঠে দাঁড়ালো। আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

"তারপর ?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মেমসায়েবের চোখে জল। "সেই আমার শেষ দেখা, রবার্ট আর ফেরেনি।"

"সারারাত রবার্টের অপেক্ষা করে বিছানায় ছটফট করেছি। সকালেও রবার্টের দেখা নেই। ভয় পেয়ে যখন পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছি, তখন বিরাট প্যাকেট হাতে এক ঘাটের পাণ্ডা দেখা করতে এলো। বললে, একজন সায়েব আট আনা পয়সা দিয়েছেন তাকে, আর এই প্যাকেটটা হোটেলে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছেন।"

প্যাকেট খুলে মেমসায়েব চমকে উঠেছিলেন—রবার্টের কোট প্যাণ্ট, জামা জুতো, ক্যামেরা সব রয়েছে। সঙ্গে একটুকরো কাগজ।

নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে কাগজের টুকরোটা বের

করে আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা—"চললাম। সত্যিই অদ্ভুত ভারতবর্ষ। ইতি কৃষ্ণপ্রাণ (রবার্ট)"

কাগজটা মেমসায়েবের হাতে ফেরত দিলাম। উনি সযত্নে সেটা ব্যাগে পুরলেন।

"সেই থেকেই খুঁজছি তাকে। কোনো তীর্থ, কোনো মেলা, কোনো আশ্রম বাদ দিইনি। কত লোককে পয়সা দিয়েছি। কৃষ্ণপ্রাণকে দেখলেই যেন আমাকে টেলিগ্রাম করে দেয়। হরিদ্বার থেকে টেলিগ্রাম পেলাম একবার। কলকাতা থেকে ছুটে গিয়েছি। কিন্তু কোথায় রবার্ট ?

"অনেকে বলল, দেখেছি। দেখেছি বটে এক সায়েব-বৈরাগীকে। পরিধানে গৈরিক, হাতে একতারা, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুল। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। সঙ্গে এক বোষ্টমী, কি সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী। আহা যেন সাক্ষাৎ মীরাবাঈ।

"কত যে খুঁজেছি রবার্টকে! হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা যেখানে খবর পেয়েছি, সেখানেই ছুটে গিয়েছি।"

প্রয়াগতীর্থে বসে মেমসায়েবের কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণপ্রাণের ছবি আমার মানসনেত্রে ভেসে উঠল। হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরা এক অবিশ্বাসী ইংরেজ তরুণ, সংসারের সমস্ত মোহ ত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রাণ রূপে ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করছেন। যে মুহূর্তে আমি তাঁর গল্প শুনছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই হয়তো কোনো জনমানবহীন অরণ্যপথে, অস্তমিত সূর্যের পটভূমিকায় মীরার ভজন শুনছেন—চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। আর আমরা, পৃথিবীর মানুষরা, কামিনীকাঞ্চনের মোহে শূয়োরের মতো সংসারের পাঁকে গড়াগড়ি দিচ্ছি।

মেমসায়েবের মুখের দিকে তাকালাম। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, "রবার্টের জন্যে আমার সব গিয়েছে। বাড়ী ছেড়ে দিয়েছি, গাড়ী বিক্রি করেছি।"

মেমসায়েবের এই আকৃতি আমার ভাল লাগেনি। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, "যে রবার্ট-সায়েব সত্যের স্বাদ পেয়ে, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে কৃষ্ণপ্রাণ হয়েছেন, তাকে নাই বা পেলাম আমাদের মধ্যে। খাঁচার পাখী যখন খাঁচা খুলে উড়ে গিয়েছে, তখন তাকে ফিরিয়ে এনে কি লাভ হবে ?"

মেমসায়েব আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন, "আমার সর্বস্ব গেছে যাক। কিন্তু তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। অন্ততঃ একটিবারের জন্য তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

"কেন ?"

মেমসায়েব একটু থতমত খেলেন। "রবার্টকে একটা প্রশ্ন করবো।"

"কি প্রশ্ন ?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। নিজের মনেই বললেন, "আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে। না হলে কোনোদিন রবার্টকে ক্ষমা করতে পারবো না।" ইতস্তত করতে লাগলেন মেমসায়েব।

"যদি কোনো অসুবিধা থাকে বলবেন না। যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে জিজ্ঞাসা করবেন"—আমি বললাম।

মেমসায়েব নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বললেন, "আমার কি ? যদি কোনো অসুবিধে থাকে সে তার। তার সম্বন্ধেই হয়তো তোমার সব শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তবু বলবো। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা কি ?"

মেমসায়েবের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। চারিদিকে তাকিয়ে কানে কানে বললেন, "তুমি শুধু জানলে। আর কেউ জানে না। প্রয়াগতীর্থে বসে, রবার্ট যখন আমাকে হোটেলে চলে যেতে বলেছিল, ঠিক তার আগের মুহূর্তে ভিজে কাপড় পরা বোষ্টমীর দিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।"

চমকে উঠে কান সরিয়ে নিয়ে আমি মিসেস বনারের মুখের দিকে তাকালাম। ওঁর ঠোঁট কাঁপছে তখনও। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করো। হয়তো হয়তো আমার ভুল। কিন্তু তবু ওকে জিজ্ঞাসা করবো, শুধু একবার জিজ্ঞাসা করবো, সে দৃষ্টিতে কি ছিল ?"

আজও মেমসায়েব সংসার-বিরাগী, মোহমুক্ত কৃষ্ণপ্রাণকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজেও অনেক খোঁজ করেছি। কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি। আপনাদের সঙ্গে যদি কৃষ্ণপ্রাণের কোনোক্রমে দেখা হয়ে যায়, দয়া করে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন। আর একান্তই যদি তাঁকে ধরে রাখা না যায়, বলবেন—"মিসেস বনার তাঁকে একটি, মাত্র একটি প্রশ্ন করবার জন্য খুঁজছেন।"

কলকাতা : নানান চোখে

রূপদর্শী
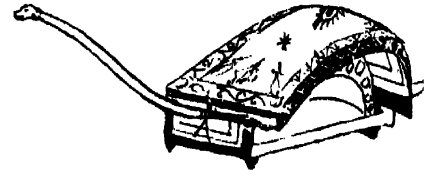
কলকাতার পত্তন : ১৬৯০

[ইতিবৃত্তকারের চোখে]

তখন কলকাতা বলে কিছু ছিল না। না ছিল ছোট্ট একটা গ্রাম। উত্তরে সুতোনুটি আর দক্ষিণে গোবিন্দপুর। পরে ইংরেজরা এই তিন গ্রাম কিনে নেয়। তার উপর যে শহর গড়ে ওঠে, তারই নাম কলকাতা।

কিন্তু তখন, সেই গোড়াপত্তনের দিনে তিনখানা গ্রাম মিলিয়ে একখানা মাত্র কোঠাবাড়ী ছিল। সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের কাছারী। আর ছিল মাঠ-কোঠা। আর জল জঙ্গল। হোগলার বন। সাপ বাঘ কুমীর। নানা মারাত্মক ব্যাধির আস্তানা।

তবু একদিন কয়েকজন পলাতক ইংরেজ এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায়। কারণ, না করে উপায় ছিল না। রাজরোষের হাত থেকে রেহাই পাবার মতো স্থান, এর মতো আর কোথায় মিলবে?

১৬৮৬ সালেই, বাংলার মাটিতে ব্যবসার শিকড় ভাল-ভাবে বসাতে না বসাতেই ইংরেজ বণিকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল হুগলীর মোগল ফৌজদারের অত্যাচারে। ফৌজ-দারের টাকার খাঁকতি মেটাতে মেটাতে ইংরেজদের কাঁচা ব্যবসা ডকে উঠবার উপক্রম হয়েছে তখন। মোগল শাসকরা বুঝতে পেরেছিল, অদ্ভুত ঢং-এর কুর্তা-পাতলুন-টুপি পরা এইসব ফিরিঙ্গী বণিকেরা কামধেনু। মোচড় দিলেই ফয়দা মেলে। টাকা পাওয়া যায় বিস্তর।

অথচ এমন অত্যাচার হবার কথা নয়। সুলতান সুজার ফরমান আছে ইংরেজদের কাছে, সালিয়ানা তিন হাজার টাকা মালগুজারি দিয়ে অবাধ বাণিজ্য চালাতে পারবে তারা। নিশান দিয়েছেন সুলতান সুজা।

কিন্তু সুজা কে? তিনি তো বাদশা নন, তাঁর এক প্রতিনিধি মাত্র। তিনি যতদিন বাংলা মুলুক শাসন করেছেন, ততদিন তাঁর নিশান মোতাবেক কাজ চলেছে। অন্য প্রতিনিধিরা সে নিশান মানবেন কেন? নতুন সুবাদার শায়েস্তা খাঁ-ও তা মানলেন না। আর তা ছাড়া সে নিশান দেওয়া হয়েছিল ১৬৫২ সালে। তারপর তোমাদের ব্যবসা বেড়েছে, মুনাফা বেড়েছে। আর মাল-গুজারি বাড়বে না? এ কেমন কথা?

কথা যাই হোক, ইংরেজরা গোঁ ছাড়বেন না। সুজা যা বলে দিয়েছেন, সেই তিন হাজার টাকা-ই বছরে দেব, তার একপয়সা বেশি নয়।

এই নিয়ে মন কষাকষি। তারপরে বিবাদ। জব চারনক হুগলীতে তখন ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট। এর আগে তিনি কাশিমবাজার কুঠিতে ছিলেন, তারও আগে পাটনায়। কাশিমবাজারের দালাল গোমস্তারা পাওনা টাকার জন্য কোম্পানীর নামে নালিশ ঠুকে দেওয়ায় জব চারনক এবং অন্যান্য কুঠিয়াল সাহেবদের নামে ডিক্রি হয়। ৪৩ হাজার টাকার ডিক্রি। বলা বাহুল্য, চারনক সাহেব একটি আধলাও উপুড়হস্ত করলেন না। তার বদলে ঢাকায় আপীল করলেন। আপীল ডিসমিস হ'ল। তবু সাহেব টাকা দিলেন না। তখন পরোয়ানা এল ঢাকায় যাবার। ঢাকায় না গিয়ে চারনক সাহেব গোপনে হুগলীতে পালিয়ে এলেন।

দেখতে দেখতে হুগলীতে ইংরেজদের দল ভারী হ'তে লাগল। সে খবর পৌঁছে গেল শায়েস্তা খাঁর কানে। ইংরেজদের শায়েস্তা করবার জন্য ১২ হাজার ফৌজ তিনি হুগলীতে পাঠালেন। হুগলীর ফৌজদারও খাপ্পা হয়ে হুকুম জারী করে দিলেন: ইংরেজদের কাছে কেউ কোনও কিছু বেচাকেনা করতে পারবে না। একদিন সকালে, সেটা অক্টোবর মাস, তিনজন ইংরেজ ছোকরা হুগলীর বাজারে খাবার কিনতে গিয়ে দেখে কেউ বেচেনা। ব্যাপার কি? না, বয়কট। ফৌজদারের হুকুম। শুধু তাই নয়, হঠাৎ কোতয়ালের লোক এসে বলে, চল থানায়। কয়েদ করে নিয়ে গেল তাদের।

খবরটা কানে পৌঁছুতে যা দেরী, বন্দুক সঙিন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোরার দল। দনাদন গুলী গোলা ছুঁড়ে ফৌজদার আবদুল গনি সাহেবের চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছেড়ে দিলে। গনি সাহেব হুগলী ছেড়েই চম্পট দিলেন। চারদিকে বাড়ী-ঘর জ্বলতে লাগল।

এর পর, নবাবী ফৌজের হাত থেকে বাঁচবার জন্য,

দু মাসের মধ্যেই তল্পীতল্পা গুটিয়ে জব চারনক জাহাজ ভাসালেন গঙ্গায়। লক্ষ্য বালেশ্বর।

পথে পড়ল সুতোনুটি গ্রাম। নামলেন। সেদিন ছিল খ্রীষ্টমাসের পরব। দলবল নিয়ে চারনক সাহেব সেইখানেই উৎসবটা পালন করলেন। এইটেই কলকাতার প্রথম খ্রীষ্টমাস।

এই ঘটনার প্রায় দু বছর বাদে ১৬৯০ সনের ২৪শে আগস্ট আবার চারনক সাহেবের জাহাজ ভিড়ল সুতোনুটির ঘাটে। নানা জায়গা ঘুরে আবার সাহেব পা দিলেন সেই গ্রামের মাটিতে। এবার শুধু পা-ই রাখলেন না, বিলাতী ফ্ল্যাগ-ও পুঁতে দিলেন সেই মাটিতে। সেই বিজয়ী পতাকা এদেশ থেকে আবার তুলে ফেলতে ২৫৭ বছর সময় লাগবে, এ কথা সেদিন, ভাদ্রের সেই অসহ্য গুমোট দিনটিতে, কে বুঝতে পেরেছিল ?

সুতোনুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর—এই তিনখানা গ্রাম ইংরেজরা জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মাত্র ১,৩০০ টাকায়। অবিশ্যি নবাবের কাছ থেকে গ্রাম কেনার অনুমতি নিতে সাহেবদের সেলামী দিতে হয়েছিল ১৬ হাজার টাকা। এই তিন গ্রাম মিলেই ইংরেজদের এদেশের প্রথম জমিদারী কলকাতা।

আজকের কলকাতা : ১৯৫৮
[আমেরিকান সাংবাদিকের চোখে]

রুডিয়ার্ড কিপলিং কলকাতা সম্পর্কে লিখেছিলেন: যেভাবে ব্যাঙের ছাতা গজায় সেইরকম বিশৃঙ্খলভাবে এই শহর ছড়িয়ে পড়েছে। পলিমাটির উপরে এই প্রাসাদ উঠেছে, এই উঠেছে বস্তি। দারিদ্র্য আর আভিজাত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবার উপরে, এই ঘিঞ্জি আর মহামারীর শহরে লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পেতে আছে মৃত্যু। কলকাতা কিপলিং-এর চোখে এই মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল ৭০ বছর আগে। এই বছরও কলকাতায় ২ হাজার লোক মারা গেছে শুধু কলেরায়। বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাস্থ্য-সংস্থা কলকাতাকে বলেছে: পৃথিবীর সব থেকে অস্বাস্থ্যকর জায়গা। একদিকে হুগলী নদীর ঘোলা জলের বেষ্টনী আর একদিকে নোনা নোনা জলা আর ভেড়ি আর এরই মধ্যে গাদাগাদি করে বাস করে এই শহরের ৪০ লক্ষ লোক। ময়দান সহ শহরের পার্ক ক'টা, লেকটা আর রাস্তাগুলো বাদ দিলে প্রতি বর্গমাইলে এখানে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক বাস করে। হাজার হাজার লোক সপরিবারে রাস্তায় পড়ে থাকে। সেইখানেই, গাড়ী-বারান্দাগুলোর নিচে শোয়, বসে, রাঁধে বাড়ে, খায় আর সেইখানেই পায়খানা পেচ্ছাব করে।

কলকাতার দৈন্যদশা, আর অগণিত ভিক্ষুকের পাল চোখকে যেমন পীড়া দেয়, তেমনি আঁতকে উঠতে হয়, অনশনরত মায়েদের ক্ষুধিত শিশুদের মুখে চুবসানো স্তন গুঁজে দিতে দেখে। আবর্জনা, ব্যঞ্জন, পেঁয়াজের সম্বরা, ভেজাল সর্ষের তেল আর মানুষের ঘামের পাঁচমিশেলী ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে নাকে জ্বালা ধরায়। হকারদের চীৎকার, ঠ্যালা আর গো-গাড়ীর চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানি, দেড়েল শিখ ড্রাইভারদের মান্ধাতা আমলের ট্যাক্সির হর্নের অবিশ্রান্ত প্যাঁকপ্যাঁকানিতে কানে তালা লাগে। মনে হয়, করালবদনী কালী যেন শতহস্ত বিস্তার করে তাড়া করে বেড়াচ্ছেন।

মৃত্যু আর ধ্বংস যেন এই শহরের নিয়তি। অপুষ্টি, কলেরা, বসন্ত, মড়ক নিয়মিত হানা মারে। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব ১৪৬ জন ইংরাজকে অন্ধকূপে বন্দী করে রাখেন, পরদিন সকালে তার মধ্যে মাত্র ২৩ জনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় এইখানেই। ১৯৪৬ সালে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হবার ঠিক আগে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৬,০০০ হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়। এখনও সশস্ত্র জনতা যে-কোন মুহূর্তে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। যে কোন অজুহাতে। তা সে একপয়সা ট্রামভাড়া বাড়াবার জন্যই হোক, বা মোটর-দুর্ঘটনার জন্যই হোক, অথবা গুজবকে কেন্দ্র করেই হোক। পুলিশ লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস দিয়ে জনতাকে ঠ্যাঙায়। জনতা ছোঁড়ে ইট-পাটকেল আর ছোঁড়ে কলকাতার নিজস্ব আবিষ্কার নাইট্রিক অ্যাসিড ভর্তি বিজলী বাতির বাল্ব্।

কলকাতার লোকে বেশীর ভাগই বাঙালী। দাঙ্গা যখন করে না তখন গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতার এই হৈ-হৈ ভাব ওদের খুবই ভাল লাগে। বকবক করতে পারলে নাওয়া-খাওয়াও ভুলে যায়। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বাঙালীরা ভিড় বাড়ায় (ছাত্রসংখ্যা ৪০ হাজার), ওদিকে কলকারখানার কাজ চলে যায় বিহারীদের হাতে। অন্যান্য মেহনতী কাজ করে উড়িয়ারা। মাড়োয়ারীদের কুক্ষিতে যায় ব্যাঙ্ক আর ব্যাবসা। উপরের স্তরের কিছু বাঙালী বড় বড় সরকারী চাকরী করে। বাদবাকী যারা, তারা হয় কেরানী নয় বেকার।

কলকাতা থেকে বৃটিশরাজ এখন সরেছে আর কলকাতার বদ্‌বু বেড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার চাপে দম আটকে উঠেছে শহরের। এর উপর রোজ ৩০০ করে শিশু জন্ম নিচ্ছে। হাজারে হাজারে বেকার কাজের সন্ধানে মফস্বল থেকে এসে জুটছে প্রত্যহ। ৫ জন পুরুষ পিছু মেয়ের সংখ্যা ৩ জন। ৪ থেকে ৫ হাজার লোক মরীয়া হয়ে বাস করছে কর্মব্যস্ত শিয়ালদা স্টেশনে। নোংরা নরক মুসাফিরখানায় কিম্বা প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চের নিচে, টিকিটঘরের আনাচে কানাচে তারা ঘুমোয়। পেটের জ্বালা যাদের কখনো কমেনা, সেইসব সদা-ক্ষুধার্তের দল হাজারে হাজারে রাত কাটায় ফুটপাথের কঠিন বিছানায়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, পুলের তলায়। এদের মধ্যে অনেকেই সকালের সূর্য দেখতে পাবে না। কখনো না।

কলকাতা : 'হাতের চেয়ে মোয়া বড়'

[অভিজ্ঞ পৌর-প্রতিনিধির চোখে]

কলকাতার উপর যে চাপ পড়েছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। কলকাতার জমি, তার ড্রেন, তার পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, রাস্তার সহনশক্তি, তার নাগরিক সুখ-সুবিধা দেবার কোন জিনিসই প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। মানুষ বাড়ছে। হু-হু করে, বন্যার বেগে বাড়ছে। দেশ-বিভাগের পরের কথাই ধরুন, পার্টিশানের দরুন যে আন্দাজ লোকসংখ্যা বাড়ল, তার তুলনায় শহর আর কতটুকু বেড়েছে? দু আনা পরিমাণ, কি তার কিছু বেশি। কিন্তু উচিত ছিল শহরের আয়তন অন্তত তিনগুণ বাড়া।

কলকাতার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, শহর-পরিচালকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আঁতকে ওঠার কথা। এই শহরের পত্তনের দিন থেকেই কলকাতা এলোমেলোভাবে গড়ে উঠেছে। নাগরিকরা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করেই যথেচ্ছভাবে বাড়ী-ঘর তুলেছেন। গোড়ার দিকে বলবারও কেউ ছিল না, এ বিষয়ে ভাববার লোকও ছিল না। পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের বোঝা, একদিন দু'দিনের নয়, ২৬৮ বছরের বোঝা চেপেছে আমাদের এ যুগের হতভাগাদের ঘাড়ে।

কলকাতার দুর্ভাগ্য এই যে, তার অধিবাসীদের মধ্যে, জাতির জনক জন্মেছেন, বিশ্বকবি জন্মেছেন, ধর্ম-প্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, ভাস্কর, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিল্পপতি, দেশনেতাও প্রচুর জন্মেছেন। কিন্তু ঐ মেকারের এমন কোন নগর-স্থপতি জন্মাননি যাঁর সময়োচিত নির্দেশ বা পরিকল্পনা কলকাতাকে পুরাতন নগরীর খোলস ছাড়িয়ে নতুন এক আধুধিক নগরীর পোশাক পরাতে পারত। ফলে বরাবর যা হয়েছে, আগে শহরের ঘর-বাড়ী বেড়েছে পরিকল্পনাহীনভাবে, তারপরে নাগরিক সুবিধাগুলো জোড়াতালি দিয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু তাপ্পি দিয়ে কি অনন্তকাল চলে?

কলকাতা ভারতে নবজাগরণের সূচনা করেছে। দীক্ষা দিয়েছে ভারতকে, নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশব্যাপী আন্দোলন, উন্মাদনা, উদ্দীপনা—সব কিছুই ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা থেকে। কিন্তু হায়, কলকাতার ভিতের নিচে যে-সব হাইড্রেন্ট তাতে মাটি জমছে, ধীরে ধীরে ময়লাবাহী পাইপগুলোয় ছিদ্র হচ্ছে, পানীয় জল সরবরাহের পাইপগুলো কমজোর হয়ে আসছে, সময় থাকতে সেদিকে তেমনভাবে কারও নজরে পড়েনি। ইমপ্রুভ্‌মেন্ট ট্রাস্ট গঠিত হবার পর কলকাতার কিছু চওড়া রাস্তা কোন কোন অঞ্চলে বেরিয়েছে। কিন্তু তার সাধ্যও বা কতটুকু। বস্তি-অপসারণও তার সামর্থ্যের মধ্যে নয়। অথচ কলকাতার তিনভাগের একভাগই বস্তি এলাকা। বস্তি

না সরালে কলকাতা থেকে কলেরা বসন্ত সরানো যাবে না, এ সোজা কথা। কিন্তু বস্তির অপসারণ বা উন্নয়ন ঘটালেই যে কলকাতা অমরাবৎ হয়ে উঠবে, সে কথাও ভুল।

কলকাতার প্রধান সমস্যা জনসংখ্যার চাপ। কলকাতার নাগরিক সুযোগ সুবিধা দেবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা যা, তার থেকে নাগরিকদের সংখ্যা বেশি। ঢের ঢের বেশি। হাতের চেয়ে মোয়া বড়। এই সমস্যার সমাধান না হ'লে অর্থাৎ জনসংখ্যার চাপ কমাতে না পারলে, কোন হাতুড়ে চিকিৎসাতেই ফল হবে না। কলকাতা 'রাতের বিকট দুঃস্বপ্ন' হয়েই থাকবে।

কলকাতা : ক্রুদ্ধ শহর

[শিক্ষিত বাঙালী বেকারের চোখে]

কলকাতার আকাশে আক্রোশ, বাতাসে হতাশা। বারোলক্ষ বেকারের বারো আনাই কলকাতায় ঘোরে। যাবে

কোথায় তারা? কোথায় যাব? এমন নয় যে, সারা দেশে চাকরির দরজা খোলা রয়েছে আর আমরা সেখানে না গিয়ে কলকাতায় বসে জটলা করছি। শিলং কি গৌহাটি, কটক অথবা পাটনা কলকাতার মতো উদার নয়। শিলং-গৌহাটি অসমীয়াদের, কটক উড়িয়াদের, পাটনা বিহারীদের। তেমনি কলকাতা কি বাঙালীদের? না, কলকাতা সবার। সবার বলেই এই শহরে বসেই সবাই নিজের কোলে ঝোল টানে।

আমাদের কোলও নেই, ঝোলও নেই। তাই বেকার-দের ব্যোমে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছি। হাসি পায়—অসহায়ের সব-খোয়ানো হাসি—যখন বোদ্ধা ব্যক্তিদের বলতে শুনি, কলকাতায় পান-বিড়ির দোকান থেকে মাসে তিনশ টাকা আয় হয়, মুড়ি-চিঁড়ের দোকান থেকে কোঠাবাড়ী বানাবার মতো টাকা পাওয়া যায়, জুতো পালিশ করলে কি মোট বইলে কি ঠ্যালাগাড়ী ঠেললে বাঙালীদের ভাতের কষ্ট থাকে না। বাঙালী তা করে না, কেরানী হতে চায়, তাই সে বেকার, তাই তার দুর্দশা। তাঁরা বলেন, বাঙালী যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে তাঁদের দুর্দশা ঘুচবে না। এ কথার মানে কি? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে ইস্কুল-কলেজে না গিয়ে, জুতোর বাক্স হাতে নিয়ে ফুটপাথে বসে কি পানের দোকান দেয়, নয়তো ঠ্যালাগাড়ী ঠেলে, সেই ভাবে তাদের তৈরী করতে হবে?

লেখাপড়া শিখলে মানসিক অবস্থা সংস্কৃত হয়। এ তো জানা কথা। বালিয়া জেলার ঐ যে ভুজার দোকানদারটি সে পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে,—তিন হাত বাই দু'হাত যে খাপরার ঘরে সে দোকান দেয়, সেই ঘরেই সে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শোয়, অধিকাংশ দিন ছাতু খায়, রাস্তার কলে তার বউ চান করে, অন্ধকার থাকতে রাস্তায় বসে প্রাতঃকৃত্য সারে—এই আদিম প্রবৃত্তি কি আমরা ছেড়ে আসিনি? এত সংক্ষেপে থাকতে পারে বলেই ওরা ভুজার দোকান দিয়ে টিঁকে আছে। বিদ্যা আমাদের উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধান দিয়েছে। অসভ্যতার স্তর থেকে আমরা উঠে এসেছি সভ্যতর পরিবেশে। আমাদের সভ্য কোন কর্মসংস্থানের সন্ধান দিতে পারছেন না বলে আমাদের আবার ঠেলে নামাতে চাইছেন সেই আদিম জীবনযাত্রায়?

কর্ম যদি দিতে না পারেন, দয়া করে উপদেশ দিতে আসবেন না। বলবেন, আমাদের অধোগতি হয়েছে। হয়ত তাই। এককালে বাঙালী 'ভারত' 'ভারত' করেছে, বিশ্বকে আপন বলে জড়িয়ে ধরেছে। সেই বাঙালী এখন 'বাঙালী' 'বাঙালী' করছে। এ যে এক বিরাট মানসিক অধঃপতন, তাতে আর সন্দেহ কি? সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার চিন্তায় যে বাঙালী আত্মহারা হয়েছিল, সে আজ ভাবতে শুরু করেছে বাংলা থেকে অবাঙালীদের তাড়াও। এ সংকীর্ণতা, লজ্জাকর সংকীর্ণতা—স্বীকার করছি। তবু, যেহেতু সুস্থতর কোন বিকল্প পন্থা দেখতে পাচ্ছি না, সেই হেতু এই পথ গ্রহণ করেছি।

যে বিদ্যা কেরানীগিরি ছাড়া আর কোন পার্থিব সিদ্ধি দেয় না, সে বিদ্যাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ অন্য বিদ্যা গ্রহণ করবার সুযোগ ছিল না। শিক্ষা-জগতের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা যে স্রোতে নিয়ে গেছেন সেই পথে গিয়েছি, অদূরদর্শী অভিভাবক যে পথে চালিত করেছেন, সেই পথ ধরে চলেছি। সে স্রোতে ভাসার পরিণতি যে পরিত্রাণহীন ঘূর্ণিপাকে পড়া, সে পথে এগুবার পরিণতি যে কাণাগলিতে ঘোরা, তা তো আগে বুঝতে পারিনি। আর এতে আমাদের অপরাধ কি? নেতারা যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তাতে শংকিত হচ্ছি। তাঁরা যেন সব দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত হতে চাইছেন।

এখন দেখছি, অতীত আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, বর্তমান পায়ের নিচ থেকে জমি সরিয়ে নিচ্ছে, ভবিষ্যতের কোন চেহারাই চোখে ভাসছে না। অনিশ্চিতি, আতঙ্ক আর ব্যর্থতার আঘাতে আমাদের মানসিক স্থৈর্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, আমরা ভারসাম্য হারাচ্ছি। হিংস্র হয়ে উঠছি। নিজের উপর, পরিবারের উপর, পরিবেশের উপর আক্রোশ জমে উঠছে।

কলকাতায় আমাদের ভিড় বাড়ছে তাই আক্রোশও জমে উঠছে।

কলকাতা : শাসন-ভাঙার শহর

[পুলিশের এক কর্তার চোখে]

চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমায়েসদের কথা বলছি নে। ওদের শায়েস্তা করতে পুলিশের বিলম্ব হয় না। সাধারণ নাগরিকরা যখন আইন ভাঙতে থাকেন, পুলিশকে তখনই সব থেকে বেশি ঝামেলা পোয়াতে হয়। আর কলকাতায় সাধারণ নাগরিকেরা যত ঝামেলা বাধান, এমন আর পৃথিবীর কোন শহরে হয় না।

কলকাতার মতো শৃঙ্খলাহীন শহর আর আছে কিনা সন্দেহ। শৃঙ্খলা ভাঙার ব্যাপারে ধনী গরীব সব সমান, প্রেসিডেন্ট মার্কা ঢাউস মোটরগাড়ীর মালিকে আর ঠ্যালাওয়ালায় প্রায় তফাত নেই বললেই চলে।

এত শিক্ষিত লোকের বাস কলকাতায় অথচ ট্রাফিক রুল সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্য অশিক্ষিত পল্লীবাসীরই সমান। আর একটা জিনিস, ধৈর্য বস্তুটা কলকাতার লোক যেন এখন হারিয়েই ফেলেছে। কোথাও হয়ত রাস্তা 'জাম' হয়েছে, একটু ধৈর্য ধরলে পাঁচ মিনিটেই পুলিশ রাস্তা খোলসা করে দিতে পারে। কিন্তু কে ধৈর্য ধরবে? ওরই মধ্যে 'নিজে আগে তো বেরিয়ে যাই' করতে গিয়ে সমস্ত রাস্তাটি আটকে দিলেন এমনভাবে যে কুড়ি মিনিটের আগে রাস্তা সাফ-ই করা গেল না। পথ চলার ব্যাপারেও তাই। এ বিষয়ে সার্ভে করা হয়নি বটে, তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ শহরবাসীই, বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় শাসনের বাঁধা গণ্ডীর বাইরে যেতেই ভালবাসে।

বৃটিশ আমলে আইন-অমান্য একটা আদর্শ বলে মনে করা হত। স্বাধীন হবার পরও সে মনোভাব দূর হয়নি। বরং একটার পর একটা বামপন্থী আন্দোলনের প্রশ্রয় পেয়ে সেটি পুনর্জীবন পেয়েছে। তবে এই ধরনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মনোবৃত্তির সঙ্গে অপরাধবোধ বা প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়িত নেই। অপরাধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের আবির্ভাব ঘটেছে কলকাতার ৪৬ সালের দাঙ্গার মধ্যে। এরা বেশির ভাগই ভদ্র পরিবারের স্বল্প-শিক্ষিত ছেলে। দাঙ্গার সময়ে এরা সামাজিক প্রশ্রয় পেয়ে সবরকম অপরাধে হাত পাকিয়েছে। এখনও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন জোগাড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই মালগাড়ী ভেঙে জিনিস লুঠ করে, আন্দোলনের সময় ট্রাম বাস পোড়ায়, পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডামি করে। এদের মুরুব্বির জোর বেশি বলেই এদের বিরুদ্ধে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এরা সংখ্যায় ধীরে ধীরে বাড়ছে। সমাজের লোক সচেতন হয়ে যদি এদের উৎখাত করার জন্য এগিয়ে না আসেন তবে ভবিষ্যতে এদের হাতে সমাজ অসহায়ভাবে তার ভাগ্য সমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

কলকাতা : একপুরুষ আগের ছবি

[বৃদ্ধা এক পুত্রবধূর চোখে]

প্রথম প্রথম কলকাতায় আসতুম—আমরা তখন খুব ছোট, ছোট হলেও কিছু কিছু ছবি এখনও বেশ মনে আছে—চিড়িয়াখানা দেখতে। ওতোরপাড়া থেকে নৌকোয় চাপতুম আর নামতুম আহিরীটোলার ঘাটে। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ী চেপে গঙ্গার ধার দিয়ে ধার দিয়ে যেতুম চিড়িয়াখানা। দূর থেকে দেখতুম ঘোড়ায় টানা ট্রাম-গাড়ী যাচ্ছে। চড়িনি কখনো। তখন মেয়েদের মধ্যে পর্দার খুব কড়াক্কড়ি ছিল। বাড়ীর বৌয়ের মুখ দেখবে লোকে, সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। অথচ পালা-পার্বণ লেগেই আছে। হিন্দুর বাড়ী। গঙ্গাস্নানটি চাই। তাই ঢাকা পালকি আসতো। সেই ঢাকা পালকিসুদ্ধ বেয়ারারা বউদের গঙ্গায় চুবিয়ে আনতো। তখন খুব পালকির চল ছিল। আর ঘোড়ার গাড়ী। কত রকম সব নাম। জুড়ি, চৌঘুড়ি, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ফিটন। ঠিকে-গাড়ীও ছিল বিস্তর। মোটর কেউ চোখেও দেখেনি।

তখনকার দিনে চাদরের চল ছিল খুব। চাদর ছাড়া বাইরে বেরুবার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। তখনো বাবু সাজার যুগ যায়নি। বাবু সাজা মানে কি? কালো পাড় কোঁচানো ধুতি। গায়ে কামিজ। কামিজের কলার, কফ আর বুকের কাছের বোতাম লাগাবার প্লেট একেবারে কাঠের মতো শক্তো হয়ে থাকত। তখনও পাঞ্জাবির চল হয়নি। হাতে বুকে সোনার বোতাম আর বুক-পকেটে চেন-ঘড়ি। পায়ে চকচকে জুতো, যার যা পছন্দ। তখন তো সামাজিকতার হিড়িক। বিয়ে, পৈতে, জলসা, পুজো-পার্বণ। নেমন্তন্ন লেগেই আছে। নিজের না থাকলেও চেয়েচিন্তে আনতে হবে, তবুও বাবু সাজা চাই। নইলে সমাজে বদনাম। অনেক বাবুর আবার বাইরে কোঁচার পত্তন, কিন্তু পকেট ঢুঁ-ঢুঁ। দূরের নেমন্তন্নে যাবেন, গাড়ী করার পয়সা নেই। ঝাঁকা-মুটের মাথায় চেপেই চললেন। এখন শুনলে তো সবাই হাসবে।

স্বদেশী আন্দোলন এসে লোকের বাবুগিরি একেবারে

ঘুচিয়ে দিলে। মোটা ধুতি, মোটা জামা পরা শুরু হ'ল। বাবুর পোশাক উঠেই গেল।

তা যাই বল, তখন খুব ফুর্তি ছিল লোকের মনে। আমোদ করে ভিখিরী হতেও যেন বাধত না। বিয়ে-চুড়োয় রোশনাই হ'ত কত রকম। একরকম ছিল তাকে বলত 'বাঁধা রোশনাই'। ছেলের বাড়ী থেকে মেয়ের বাড়ী পর্যন্ত পথের দুধারে খুঁটি পুঁতে পুঁতে তার গায়ে আলো বসিয়ে দেওয়া হ'ত। এই হ'ল বাঁধা রোশনাই। আর একরকম ছিল তার নাম 'গাস বাতি'। আর একরকম ছিল তার নাম 'ফুঁকো শিশি'। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছেলে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স এলে ফুঁকো শিশির আলোর মালা তৈরী করা হয়েছিল। ঐ সময় আরেকটা কাণ্ড হয়। ভবানীপুরের বকুলবাগানের মুখুজ্জেদের বাড়ীতে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে বরণ করা হয়। তাই নিয়ে সে সময় সমাজে কি হৈ-হৈ। কবি হেমচন্দ্র মুখুজ্জেদের নামে এমন ছড়া বাঁধলেন, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

এইরকম ছড়া নানান ব্যাপারে বাঁধা হ'ত। এলোকেশী বলে একটা বউকে তার স্বামী খুন করেছিল। অমনি এলোকেশীর নামে ছড়া, এলোকেশী শাড়ি, এলোকেশী গানের ডিবে বেরিয়ে। মাতঙ্গিনীকে নিয়েও সে আমলে খুব তোলপাড় হয়েছিল। সে তার স্বামীকে খুন করেছিল। তার নামেও ছড়া, গান, শাড়ি সব বেরিয়েছিল।

এইরকম সব হুজুগ ছিল তখন। তখন বাই নাচ, খ্যামটা নাচ, যাত্রা-গান হ'ত খুব। একবার দুই বাইজীর নাচ দেখলাম, গান শুনলাম। তাদের নাম গহরজান মালকাজান। আর ছিল তখনকার দিনে থিয়েটার। থিয়েটার আমরা খুব দেখতাম। গিরিশ ঘোষ, তারাসুন্দরী, বিনোদিনী—আঃ, কি তাদের অভিনয়! এখনো চোখে ভাসে। কানে এসে লাগে।

দেখতে দেখতে কতদিন পার হ'ল। আমাদের বাড়ীতে কেরোসিনের সুন্দর সুন্দর সব আলো ছিল। গ্যাস আসতে তারা গেল। বিজলী আসতে গ্যাসও গেল। দুটো যুদ্ধ গেল জীবনের উপর দিয়ে, দু-দুটো ভূমিকম্প, দাঙ্গা। কলকাতা কত বড় হয়ে গেল। এখন তো রাস্তায় বেরুতেই ভয় করে। কূলকিনারা পাইনে। ঘোড়ার গাড়ী প্রায় চোখেই পড়ে না, এখন মোটর। কত রকম মোটর। তিন টাকা মণ বালাম চাল খেয়েছি, এখন মোটা চালের দামই তিরিশ টাকা। একমাত্র পটল দেখেছি আগের চাইতে সস্তা হয়েছে। তখনকার দিনেও নতুন পটলের দাম ছিল ২।২৷৷০ টাকা সের। এখন নতুন পটল ১৷৷০ টাকা সেরেই পাওয়া যায়। আর সস্তা হয়েছে টাকা। তখন জিনিস ছিল সস্তা, টাকা ছিল আক্রা, এখন হয়েছে উল্টো। টাকাই সস্তা হয়ে গিয়েছে।

ভাল হয়েছে না খারাপ, তা বলতে পারব না। তবে যা দেখছি, কলকাতার প্রাণের রস যেন শুকিয়ে আসছে। তখনকার দিনে আমোদে-ফুর্তিতে আলোয় সাজে পোশাকে কলকাতা যেমন ঝলমল ঝলমল করত সেই জেল্লাটা যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

কলকাতা ঃ লেখকের চোখে

গত ১৬ বছরে কলকাতার উপর দিয়ে যে ঝড়-ঝাপ্‌টা বয়ে গেছে, অটুট জীবনীশক্তি ছিল বলেই সে-সব ধাক্কা সামলে এখনও টিঁকে আছে কলকাতা। মন্বন্তরের পর দাঙ্গার আঘাত, দাঙ্গার পর দেশ-বিভাগের বলি উদ্বাস্তুর অপরিসীম চাপ মুখ বুঁজে সহ্য করেছে কলকাতা। এই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া শতাব্দীর সাধনাতেই সম্ভব।

মনে পড়ে, প্রথম দিন কলকাতার মাটিতে পা দিতেই পিছলে পড়েছিলাম। তখন এক ভদ্রলোক আমাকে গাঁইয়া ভেবে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ কলকাতায় চলতে গেলে পা ঠিক রাখতে হয়। একটার পর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় পা আমাদের কিঞ্চিৎ বেঠিক হয়ে পড়েছে। তাই কলকাতা সম্পর্কে আমাদের এত দুশ্চিন্তা। পা ঠিক করবার সাধনা সর্বস্তরে শুরু হবে কবে, সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছি।

নফর সংকীর্তন

বিমল
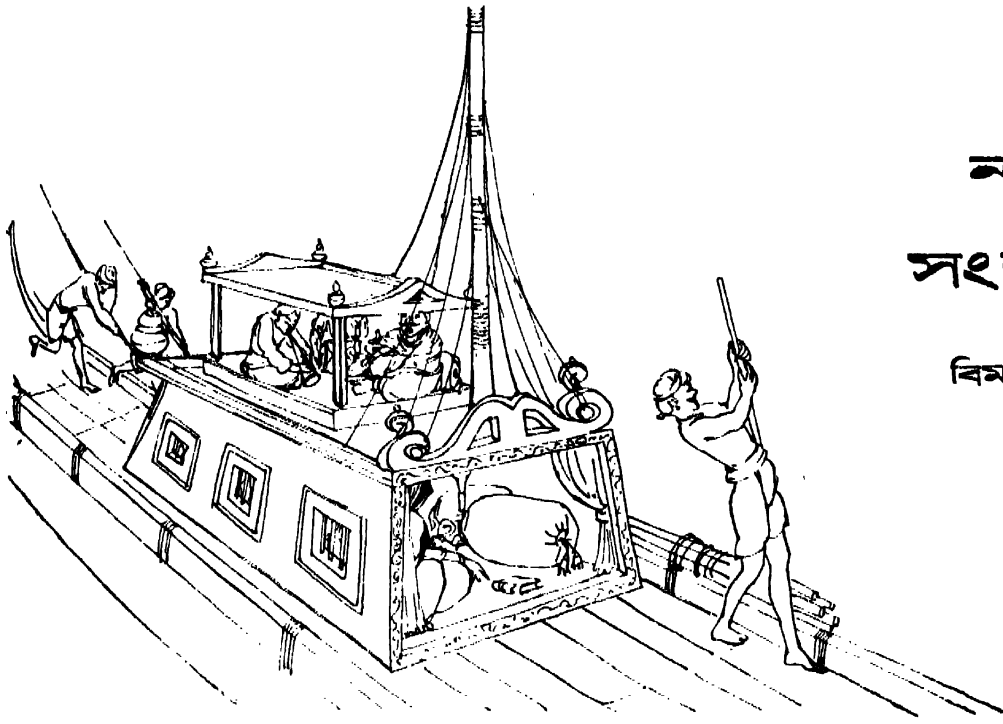
পাড়ার ছেলে আমরা। আমাদের পাড়ার সব লোকই আমাদের মতন মধ্যবিত্ত। আগে এখানে এমন ছিল না শুনেছি। শুনেছি, তখন আশেপাশের এ-সব নাকি মাঠ ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে চারদিকে। আগে শুধু ওই একখানা বাড়িই ছিল এদিকে। চারদিকে অনেকখানি জমি নিয়ে বেশ খেলিয়ে ছড়িয়ে বাস করবার জন্যে কোন্ এক সংসার সেন নাকি এইখানে প্রথম বাড়ি করেন। তাঁরই বংশধর এরা। আগে মাত্র ওই একটা বাড়িতেই দুর্গাপুজো হতো। পুজোর সময় আমরা ঠাকুর দেখতে যেতাম এই বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। বড়লোকের যে বাড়ি তা এখনও চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সামনে মস্তবড় গেট। তখন বাড়ির গেটে দরোয়ান পাহারা দিত। বিকেলবেলা সেনবাবুদের কোঁচানো ধুতি, বাহারে পাঞ্জাবি প'রে মাথার চুলে তেড়ি বাগিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতে দেখেছি। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগতো। প্রথম যখন আমরা এলাম তখনও জানতাম ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাত। ওদের সমাজ আমাদের থেকে আলাদা। দরোয়ান ঝি চাকর সরকার মুহুরি কোনও কিছুই অভাব নেই বাড়িতে। কিছু কিছু দেখতে পেতাম দুর্গাপুজোর সময়। পঙ্খের কাজ-করা দেয়াল। বাড়িতে সামনে বাগান মতন ছিল। হাঁস ছিল, ময়ূর ছিল, কাকাতুয়া পাখী ছিল। মানে, বড়লোকের বাড়িতে যা থাকতে হয় সবই ছিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে সে-বাড়ির চেহারা যেন ম্লান হয়ে যেতে লাগলো। যত দিন যেতে লাগলো, দেখতাম বাড়িটা যেন আরো পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে রং পড়ে না। ঘোড়া মরে গেলে আর ঘোড়া কেনা হয় না। চাকর-বাকরদের কাপড় জামা ক্রমেই ময়লা হতে লাগলো। অথচ আশেপাশের অন্য বাড়িগুলো তখন ক্রমেই মাথা তুলে উঠছে। সে-সব রং-বেরং-এর বাড়ি, তাদের জানালায় পর্দা ঝোলে, ভেতরে রেডিও বাজে, নতুন মটরগাড়ি আসে গ্যারেজে।

ঠিক এইরকম সময়ে একটা কাণ্ড ঘটলো।

আগের দিনও দেখেছি সেন-বাড়ির বড়বাবু সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ভাঙা গেট্‌টা বন্ধ করে দিলে ওদের দরোয়ান ভূষণ সিং। তারপর রাত হয়েছে, সেন-বাড়ির ঘরে ঘরে আলোও জ্বলেছে, আবার মাঝ-রাত্তিরের পর সমস্ত বাড়িটা নিঝুমও হয়ে গেছে। যেমন অন্যদিন অন্ধকারে সমস্ত বাড়িটা হাঁ-হাঁ করে, সেদিনও তেমনি নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সবাই অবাক হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে পুলিশ!

তিন-চারটে লাল-পাগড়ি-পরা পুলিশ, আর একজন দারোগাও আছে। পুলিশ দেখে সবাই জড়ো হলো বাড়ির সামনে।

—কী হয়েছে মশাই?

—হ্যাঁ মশাই, কী হয়েছে এখেনে?

একজন বললে—হ্যাঁ মশাই, নফ্‌রা বলে একটা লোক থাকেনা এই বাড়িতে?

একজন বললে—নফ্‌রা না মশাই, নফর তার নাম,—

—ওই হলো! ওই একই কথা, যার নাম চাল-ভাজা তারই নাম মুড়ি। সেই বেটাই বোধহয় চুরি-টুরি কিছু করেছে—

—চুরি-টুরি নয়, ডাকাতি হবে, ডাকাতি না হলে এত পুলিশ আসে?

একজন বললে—না মশাই, শুনছি গলায় দড়ি দিয়েছে—

হঠাৎ দেখা গেল গুলমোহর আলি গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকেই আসছে। সবাই সরে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যেই বড়বাবু আছে, জগত্তারণবাবু আছে।

আর গাড়ির মাথায়?

গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলির পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নফর, দিব্যি কোঁচানো ধুতি পরেছে, বাহারে পাঞ্জাবি পড়েছে, তেড়ি বাগিয়েছে—

আর…

কিন্তু পুলিশ-দারোগার ব্যাপারটা পরে বলছি। আগে নফরের সংকীর্তন শুনুন।

এ-সংকীর্তনেরও একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে।

সেনেদের বাড়ির সুবর্ণ সেন একদিন ভোর এগারোটার সময় নিজের বিছানার ওপর আড়ামোড়া ভেঙে চোখ মেললেন। চোখ মেলতেই খাস-বরদার পাঁচু এক হাতে বোতল আর এক হাতে সিগারেটের কৌটোটা এগিয়ে ধরতে গেল।

সুবর্ণবাবু হাই তুলতে তুলতে বললেন—হ্যাঁরে, নফর কোথায় থাকে রে? নফরকে আর দেখতেই পাই না,—সে কি মরে গেছে?

পাঁচু বললে—আজ্ঞে আমি এখুনি ডাকছি তাকে—

খাস-বরদার পাঁচু কাঁধের তোয়ালেটা গুছিয়ে নিয়ে দৌড়ুল। নফরের ডাক পড়েছে। চারটিখানি কথা নয়। বাইরে দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়িটা সোজা নিচের বার-মহলে নেমে গেছে। খাস-বরদার ওই সিঁড়ি দিয়ে নামবে। ওটা অপবিত্র সিঁড়ি। নিষিদ্ধ জিনিসপত্র ওই সিঁড়ি দিয়ে আসবে যাবে। ভেতরের সরকারী সিঁড়ি গঙ্গাজল দিয়ে ধোঁয়া-মোছা হয়। সে-সিঁড়ি দিয়ে মা-মণির পুজোর নৈবিদ্যি ওঠে, পুরুতমশাই ওঠেন বৌ-মণির ঠাকুর-পুজোয়। আরো অনেক জিনিস যায়। নারায়ণ-শিলা যায়, ঠাকুরের প্রসাদ যায়। কিন্তু সুবর্ণ-বাবুর ফাউল-কারি, বোতলের ওষুধ, তার জন্যে বাইরের সিঁড়ি। এ-নিয়ম বোধহয় সেই সংসারবাবুর আমল থেকেই চলে আসছে। এতদিন পরে আর কেউ প্রশ্নও করে না, মাথাও ঘামায় না ও-সব নিয়ে।

পাঁচুর সঙ্গে ঠিক বার-বাড়ির মুখেই হরি জমাদারের দেখা।

—এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছো গো খাস-বরদার?

পাঁচুর তখন কথা বলবার সময় নেই। কাঁধের তোয়ালেটা সামলাতে সামলাতে বললে—এখন কথা বলবার সময় নেই গো, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—

নফরের ডাক পড়েছে! হরি জমাদার ঝাঁটা নিয়ে বার-বাড়ির উঠোনের দিকে যাচ্ছিল। বললে—নফরের ডাক পড়েছে!

হরি-জমাদারের বউ-বেটা থাকে বাড়ির পেছন দিকের বাগানের কোণটায়। আস্তাবল-বাড়ি পেরিয়ে নোংরা আঁস্তাকুড় আর পচা ডোবাটার পাশে। হরি জমাদার ঘরে গিয়ে ফরসা ফতুয়াটা পরে নিলে।

বউ বললে—ফতুয়া গায়ে দিচ্ছ যে? কোথায় যাচ্ছ?

হরি জমাদারের কথা বলবার সময় নেই। শুধু বললে—নফরের ডাক পড়েছে, আমি চলি—

ফুলমণি বাসন মাজছিল কলতলায়। এক কাঁড়ি এঁটো বাসন। বার-বাড়ির বাসন মাজে ফুলমণি। ফাউল-কাটলেট আর মুরগীর ডিমের ছোঁয়া বাসন সব। ফুলমণি সেই বাসন নিয়ে বার-বাড়িতে রেখে দেবে। ও-বাসন ভেতরে ঢুকবে না। ফুলমণি ভেতরের বাড়ির সিন্ধুকে ছোঁবে না। সিন্ধু মা-মণির খাস-অন্দরের বাসন মাজে।

সিন্ধু বলে—ছুঁসনে, ছুঁসনে, সরে যা—এই ছাখ্, ছুঁয়ে দিবি নাকি লা?

ফুলমণি বলে—আমি কাচা কাপড় পরেচি গো, বাসনের পাট সারা করে কাচা কাপড় পরেচি, এই ছাখো—

—রাখ্ তোর কাচা-কাপড়, তোর জাত-জন্ম কিছু আছে নাকি লা?

এ-বাড়ির, এই সংসার সেনের আদি বাড়ির ভেতরে-বাইরে অনেক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জীব আছে ; তাদের জীবন-ইতিহাস কেউ জানেনা। বাইরের বাসনই শুধু নয়, বাইরের মানুষও ভেতরে যেতে পারে না। বার-বাড়ির দরজা থেকেই ফুলমণি ডাকে—ওলো, ও সিন্ধু, এক খাম্‌চা তেল দে তো হাতের তেলোয়—

সদর দরজার ওপারে যাবার তার অধিকারও নেই, এক্তিয়ারও নেই। এ-পারের ভিজে কাপড়ের জল ও-পারে ছিটোতে পাবে না। এ-দিকের মাছের কাঁটা ও-বাড়ির উঠোনে যদি কাকে নিয়ে ফেলে দেয় তো ও-বাড়ির উঠোন অশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ভারি ভারি জল আসে কলসীতে। কলসী-কলসী জল ঢালা হয় উঠোনে। মা-মণি ওপরের বারান্দা থেকে তদারক করেন। বলেন—ও সিন্ধু, পৈঁঠেটা শুক্‌নো রইলো যে, ওখেনটায় জল ঢেলে দে—

আজ কিন্তু ফুলমণি সিন্ধুকে দেখতে পেয়েই বললে—হ্যাঁ লা সিন্ধু, বড়বাবু নাকি নফরকে ডেকেছে ?

—কে বললে ? কোত্থেকে শুনলি ?

সিন্ধুর মুখের চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে।

ফুলমণি বললে—জমাদারের মুখে শুনলুম—

সিন্ধু বললে—জমাদারকে কে বললে ?

কে বললে কেউ জানে না। কথাটা কোথা থেকে উঠলো, কে প্রথম শুনেছে, কেউ-ই জানে না। কিন্তু হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। মহলে-মহলে এক কান থেকে আর এক কানে ছড়ালো।

—হ্যাঁ গা, বড়বাবু নাকি আজ নফরকে ডেকেছে ?

—কই, বড়বাবু তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি !

আস্তাবল-বাড়িতে গুলমোহর আলি চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল। তার খাতির ছিল বড়বাবুর বাবার আমলে। বাহারও ছিল। কালো আর বাদামী দুটো ঘোড়া ছিল তখন। বাড়ি থেকে গাড়ি বেরোবার সময় পাড়ার লোক হাঁ করে চেয়ে দেখতো ঘোড়া-দুটোকে। আর গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলি জরির জামা প'রে গাড়ি হাঁকাতো।

কেউ কেউ সেলাম করতো গুলমোহর আলিকে—সেলাম আলি সাহেব—সেলাম—

গুলমোহর আলির তখন দিনকাল ভালো। কর্তাবাবুকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে গুলমোহর আলিকে ধরলেই কাজ হতো। একবার একটা ভালো ময়না পাখী বেচতে আসে একজন বেদে। ওই গুলমোহর আলি তিনশো টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তাকে। ময়নাটা কথা বলে না, বোল্ বলে না। গায়ের পালকগুলোও ভালো করে গজায়নি তখন।

কর্তাবাবু তখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

বেদেটা এসে বললে—হুজুর, ময়না-পাখী লেবেন ?

কর্তাবাবুর খাস-বরদার তখন পীরজাদা। পীরজাদা হাঁকিয়ে দিচ্ছিল বাজে লোক দেখে।

বেদেটা বললে—আজ্ঞে নীলগিরি পাহাড়ের ময়না, খুব সস্তায় ছেড়ে দেব—

কর্তাবাবুর কী খেয়াল হলো। অন্যবার অন্যলোক হলে হাঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু মেজাজ বোধহয় ভালো ছিল। চেয়ে দেখলেন ময়নাটার দিকে একবার।

বললেন—কত দাম ? পাঁচ টাকা ?

দুর্লভবাবু তখন কর্তাবাবুর পেছনে ছিলেন। তিনিও কর্তাবাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে যেতেন। তিনি বললেন—পাঁচ টাকা ? বলেন কি হুজুর, পাঁচ পয়সা দাম নয় ওর—ওর চোদ্দপুরুষ ময়না নয়—কালো শালিকপাখী নির্ঘাৎ—

কর্তাবাবু চটে গেলেন। বললেন—শালা ঠকাচ্ছিলি আমাকে ? বেরো—

বেদেটা বললে—না হুজুর, আসল জাত-ময়নার বাচ্চা, শালিখ লয়—

দুর্লভবাবু বললেন—ও আসল শালিখ, ওর চোদ্দপুরুষ শালিখ, ময়না চেনাচ্ছে আমাকে ? আলবাৎ শালিখ—শালিখ না হলে কান কেটে ফেলবো হুজুর—

কর্তাবাবুর বাগানবাড়ি যাওয়া হয়ে গেল। কর্তাবাবু বললেন—ডাকো মুহুরিবাবুকে, মুহুরিবাবুর বাড়ি চাক্‌দায়, ও শালিখ চেনে—

মুহুরিবাবু খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছিল। কানে কলম নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে হাজির।

কর্তাবাবু বললেন—তোমার তো চাক্‌দায় বাড়ি মুহুরিবাবু, তুমি পাখী চেনো ?

—আজ্ঞে চিনতাম আগে।

—দ্যাখো তো, এটা ময়না পাখী কিনা ?

মুহুরিবাবু চশমাটা কপালের ওপর তুলে ফেললে। কাছে মুখ এনে দেখতে লাগলো। হিসেব-পত্তোরের খাতা দেখা তার কাজ। আদায়-পত্র দেখে পাকা খাতায় তোলা তার কাজ। তারপর সেই খাতা থেকে জমা-বকেয়া আলাদা-আলাদা তুলে আলাদা হিসেব রাখতে হয়। এই কাজই চব্বিশ বছর একাদিক্রমে করছে। সেই লোককে হঠাৎ পাখী চিনতে হবে কর্তাবাবুর হুকুমে।

অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আজ্ঞে চাকৃদাতে এরকম পাখী দেখিনি, তবে শালিখই মনে হচ্ছে—

বেদেটা বললে—তা হলে মল্লিকবাবুদের বাড়িতেই দিই গে গিয়ে হুজুর—বাবুরা দেড়শো টাকা বলেছিল, দিইনি—

দুর্লভবাবু বললে—কোন্ মল্লিকবাবু? কোথাকার মল্লিকবাবু?

বেদেটা বললে—আজ্ঞে, গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু।

গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু! কথাটা কর্তাবাবুর কানে গিয়ে খট্ করে বিঁধলো। গোয়ালটুলির মল্লিকরা কি আমার চেয়েও পাখী ভালো চেনে নাকি?

বললেন—গোয়ালটুলির কোন্ মল্লিক হে দুর্লভ? কার কথা বলছে?

দুর্লভ বললে—হুজুর, আর কথা কার বলছে, আমাদের ন্থুলো মল্লিকের কথা বলছে, ন্থুলো মল্লিকের যে আজকাল পাখা গজিয়েছে—

গুলমোহর আলি এতক্ষণ গাড়ির মাথায় চুপ করে বসে ছিল। এবার নেমে এল নিচেয়। বললে—হুজুর, এ আসলি ময়না আছে হুজুর—

দুর্লভবাবু এবার যেন সরে এল সামনে। বললে—দেখি রে, ভালো করে দেখি তোর পাখীটা?

বেদেটা পাখী নিয়ে দুর্লভবাবুর চোখের সামনে তুলে ধরলে। দুর্লভবাবু বললে—ও-ধারটা একবার দেখা তো—

এ-ধার ও-ধার সব ধারই দেখানো হলো। দুর্লভবাবু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললে—না হুজুর, এ ময়নাই মনে হচ্ছে—

কর্তাবাবু বললেন—ভালো করে দেখে বলো দুর্লভ, ন্থুলো মল্লিকের কাছে হেরে যাবো নাকি শেষকালে?

মুহুরিবাবু তখনও দেখছিল মন দিয়ে; বললে—আমারই ভুল হয়েছিল কর্তাবাবু, এ আসল ময়না—

—ঠিক বলছো তো।

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ হুজুর, আর কোনও সন্দেহ নেই, এ নির্ঘাৎ ময়না, এ আর দেখতে হবে না।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ন্থুলো মল্লিক কত দর দিয়েছিল?

বেদেটা বললে—হুজুর, দেড়শো বলেছিল, আমি দিইনি—

ঠিক আছে, আমি তিনশো দেব, কিন্তু ন্থুলো মল্লিককে গিয়ে বলে আসতে হবে, আমি তিনশো টাকায় ময়না কিনেছি—

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ, ওম্‌নি ছাড়া হবে না, ন্থুলো মল্লিককে শুনিয়ে দিতে হবে হুজুর, বড্ড পাখা গজিয়েছে আজকাল—

শেষ পর্যন্ত তো সেই পাখী কেনা হলো। পাখীর খাঁচা কেনা হলো। সেই তিনশো টাকার পাখী দেখতে এলো এ-বাড়িতে আরো দশটা পাড়ার লোক। পাখী দেখে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল একদিন। পাখীটা যে শালিখ তা জানতে কারো বাকি রইল না। একদিন পাখীকে চান করাতে গিয়ে পায়ের রং ধুয়ে মুছে একাকার। চোখের কোণের হলদে দাগ, গায়ের কালো রং সব রং-করা। সব ফাঁকি ধরা পড়লো।

কর্তাবাবুদের এরকম গল্প আরো আছে। এ-বংশের গল্প, এই সংসার সেনের বংশধরদের গল্প এক কথায় বললে সব বলা হয় না। ওয়ারেন হেষ্টিংস কি তারও আগে যে-বংশের পত্তন তার উত্থানের যেমন একটা ইতিহাস আছে তেমনি আছে পতনের ইতিহাসও। গুলমোহর আলির এখন কাজ কমে গেছে। এখন বড়বাবু কর্তাবাবুর মতো রোজ বেরোয়ও না, রোজ বেরোবার মতো মেজাজও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। সকাল থেকে ঘুমিয়ে বসে খেয়ে সময় কেটে যায় গুলমোহর আলির। হঠাৎ মাসের মধ্যে হয়ত একদিন

বলা-নেই কওয়া-নেই গাড়ি বেরোবার হুকুম হয়। বড়বাবুর খাস-বরদার পাঁচু এসে খবর দিয়ে যায়—বড়বাবু বেরোবে আজ গুলমোহর—

তা সেই বাদামী ঘোড়াটা মরে গেল শেষ পর্যন্ত। কর্তাবাবুর বড় পেয়ারের ঘোড়া ছিল সেটা। শেষকালে তার এলাইজও হলো না, তরিবৎও হলো না। আস্তাবল-বাড়িতে দানা খেতে খেতে কাৎ হয়ে পড়লো। সেই থেকে গুলমোহরও যেন ভেঙে পড়েছে।

হঠাৎ সহিস আবদুল এসে বললে—চাচা, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—

নফরকে ডেকেছে! গুলমোহর শুয়েই ছিল, এবার উঠে বসলো। বললে—ডেকেছে নফরকে! ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ চাচা, খাস-বরদার বললে যে!

গুলমোহর এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। নফরকে বড়বাবু ডেকেছে। এখন ঘোড়া তৈরি করতে হবে। জরির জামা বের করতে হবে। ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করতে হবে। ঘোড়ার ল্যাজে আতর মাখাতে হবে, সাজ চড়াতে হবে। বেলঘরিয়া কি এখানে?

খাস-বরদার সিঁড়ির নিচে নামতেই মুহুরিবাবুর সঙ্গে দেখা। মুহুরিবাবু অনেক দিনের লোক। মুহুরিবাবু চাকৃদ' থেকে এসে কাজের চেষ্টায় একদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছিল। রাস্তার কলের জল খেয়েই কেটেছিল ক'টা দিন। তখন কর্তাবাবুই চেতলায় প্রথম ধানের কল করলেন। তাঁর দেখাদেখি গোয়ালটুলির নুলো মল্লিকের বাবা মাতাল মল্লিকও ধানের কল করতে গেল। কর্তাবাবুর ধানের কল থেকে দিনরাত চাল বেরোয়। সেই চাল চালান যায় এদেশে ওদেশে। জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, মালয় আর চীনে। সব ভাত-খেগো দেশ।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—গড়পড়তা মণ পিছু চার আনা রেখে সব ছেড়ে দাও—

ঐ চেতলার গঙ্গা থেকে হাজারমুনি নৌকো বোঝাই হয়ে সব চালান যেত চাল। ঘাটের ধারে বেগুনি-ফুলুরির দোকান বসে গেল সার-সার। কলের সামনে মওড়াদানীরা এসে সকালবেলা সেদ্ধ ধান সিমেন্টের উঠোনে শুকোতে দেয়। বিরাট উঠোন। এ মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দেখা যায় না। তারপর সন্ধ্যেবেলা আবার ধানগুলো জড়ো করে করে ঢাকা দিতে হয়। নইলে পায়রায় খেয়ে যাবে, হিম লাগবে। তারপরে সেই শুকনো ধান কলে চড়াতে হয়। ঘড় ঘড় করে কল চলে। সেই কলের শব্দে গদি-বাড়িটা কাঁপতো সারাক্ষণ। কর্তাবাবু আসতেন। ঘণ্টাখানেক দেখতেন, তারপর চলে যেতেন। কিন্তু সেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজকর্ম কিছু দেখতে আর বাকি থাকতো না।

তা সেই কল মুহুরিবাবু হতেও দেখেছে আবার উঠতেও দেখেছে।

কর্তাবাবু সারাজীবন বাগানবাড়ি করে শেষজীবনটা বছর দেড়েক কাশীবাস করেছিলেন। ফিরে এসে আর বেশিদিন বাঁচেননি।

কালিদাসবাবু এখন খাজাঞ্চি। কল-বাড়ির খবর তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। জানে মুহুরিবাবু। বলে—শেষ পর্যন্ত সেই শালিখ পাখীটার কী হলো শুনুন খাজাঞ্চিবাবু।

—আরে রাখো তোমার শালিখ-পাখীর গল্প! এদিকে মরছি আমি হিসেবের জ্বালায়। তুমি তো খালি জমার হিসেব করেই খালাস, বকেয়া তো আমাকেই মিটোতে হবে—

তারপর খাতাটা সরিয়ে রেখে বলেন—হরিচরণ এক গ্লাস চা দে বাবা—

বাড়ির বাইরে রাস্তা। রাস্তাটা এখন গলির মতন। আগে এইটেই ছিল প্রধান রাস্তা। তখন লোকজন গাড়ি-ঘোড়া এই রাস্তা দিয়েই যেত। বড়বাবুর বিয়ের সময়ও এই রাস্তাটাই ছিল একমাত্র পথ। তা রাস্তা ছোট হলে কি হবে। একটা চায়ের দোকান আছে, একটা জামা-কাপড় ধোলাইএর দোকান আছে। টপ্ করে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটে চা আনা যায়। কালিদাসবাবু চা মুখে দিয়ে বলেন—এ কী চা করেছে রে হরিচরণ, চা খাচ্ছি না ছাই খাচ্ছি—

মুহুরিবাবু বলে—কর্তাবাবুর আমলে চা আমাদের কিনে খেতে হতো না খাজাঞ্চিবাবু—

কালিদাসবাবু থামিয়ে দেন। বলেন—তুমি থামো দিকিনি মুহুরিবাবু, কবে সোনা সস্তা ছিল তার গল্প থাক্, এখন বকেয়া-বাকী খতেনটা দাও তো—

তারপর বলেন—গেলমাসে বড়বাবুর কত টাকা হাওলাত, দেখ তো হিসেবটা?

মুহুরিবাবু হাওলাতের হিসেবটা দিয়ে সবে একটু কলে গিয়েছিল। ফেরবার পথেই খাস-বরদার পাঁচুর সঙ্গে দেখা। আর তারপরেই একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

—এদিকে সর্বনাশ হয়েছে খাজাঞ্চিবাবু!

—কী হলো? হাওলাত খাতা থেকে মুখ তুলে কালিদাসবাবু তাকালেন।

—বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন!

আবার নফরকে স্মরণ করেছেন। কালিদাসবাবু যেন খবরটা পেয়ে মুষড়ে পড়লেন। মাসের আজকে চব্বিশ তারিখ, পাওনা-গণ্ডা কিছু এখনও মেলেনি, এরই মধ্যে নফরকে স্মরণ করে বসলেন!

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে শেষদিকে বার-বাড়ির দরোয়ানদের থাকবার ঘর। কিছু কিছু পুরোনো বাতিল খাতা-পত্র তাকের মাথায় জমা করা আছে। সাত-আট-দশ পুরুষের জমা-বকেয়ার খাতা, কত জমিদারি, কত ধান-কল আর নানা কারবারের হিসেব-নিকেশের খাতা-পত্র এখানে ওখানে সিন্দুকের মাথায় পড়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে ধুলো জমছে তার ওপর। দরোয়ানেরা সকালে ওঠে ঘুম থেকে, দুপুরবেলা ঘুমোয় আবার রাত্রে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। তারা জানতেও পারেনা কতপুরুষ ধরে যে হিসেব-নিকেশ তাদের মাথার ওপর ধুলো জমে জমে এখন পচে খসে যাচ্ছে, সে হিসেব-নিকেশ অনেক কষ্টের আর অনেক যত্নের ধন ছিল একদিন। অনেক পুরুষের পাপের আর পরিশ্রান্তির সব ফসল সেগুলো। সে-ফসল একদিনে সঞ্চিত হয়নি। দিনে রাতে নিরলস বিলাস, বিভ্রম আর বিতৃষ্ণার সব সঞ্চয়। কেউ বুঝতে পারেনা কেউ চিনতে পারেনা তা! কেউ জানতেও পারেনা সে-সব।

শুধু একজন জানে।

মা-মণি বলেন—বৌমা?

বৌমা এ-বাড়ির বড়বাবুর বৌ, তাঁর যেন সব দেখা শোনা বোঝা হয়ে গেছে। রাত যখন গভীর হয়, বড়রাস্তার ট্রামের বাসের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তখনও ঘুম আসেনা তাঁর। বলেন—সৌরভী, দেখে আয়তো জগত্তারণবাবু কি চলে গেছেন না আছেন?

জগত্তারণবাবু কর্তাবাবুর আমলের লোক। অ্যাটর্নীর অফিসে চাকরি করেন দিনের বেলা। কিন্তু বড়বাবু তাঁকে স্মরণ করেন প্রায়ই। গাড়ি পাঠিয়ে দেন। জগত্তারণবাবু জামা-কাপড় বদলে পাঞ্জাবিতে আতর মেখে এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেন। আগে রোজই আসতেন। রোজ। গুলমোহর আলির একটা বাঁধা কাজই ছিল ওটা, সোজা গাড়ি যেত কম্বলিটোলায়। সেখানে যতক্ষণ না জগত্তারণ-বাবু জামা-কাপড়-সাজ-পোশাক প'রে তৈরি হতেন ততক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপরে নিজের খেয়ালমতো টগ্‌বগ্‌ করতে করতে আসতেন।

এখন বড়বাবুর কাছেও আসেন।

এসেই বলেন—আজকে আর একজন কাৎ—বুঝলে হে বড়বাবু, আর এক মক্কেল কাৎ হলো।

বড়বাবু তাকিয়ায় হেলান দিলেন।

বললেন—আবার কোন্ মক্কেল কাৎ হলো মাস্টার?

রোজ হাইকোর্ট অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করেন। টাট্‌কা খবরটা তিনি পান। মক্কেল কাৎ হওয়ার খবরে ভারি খুশী হন জগত্তারণবাবু। যে দিন কোনও মক্কেল কাৎ হয় না সেদিন ভারি বিমর্ষ থাকেন। কিন্তু আবার কোনও মক্কেলের কাৎ হওয়ার খবর পেলেই শুনিয়ে যান। মোষের শিং-এর পাখীর ঠোঁট মার্কা হ্যাণ্ডেলওয়ালা পাকানো একটা ছড়ি হাতে। এসেই বলেন—মা-জননী কেমন আছেন বড়বাবু?

বড়বাবু বলেন—ভালো!

—যাক্, ভালো থাকলেই ভালো বড়বাবু, ওঁরা সব পুণ্যাত্মা লোক বড়বাবু, ওঁরা বেঁচে থাকলেও পৃথিবীটা তবু কিছু হালকা থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে।—কিন্তু আজকের খবর শুনেছেন?

বড়বাবু বলেন—কী খবর?

—শোনেননি? আরে আজকে হাইকোর্ট পাড়ায় যে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, সেই মাতাল মল্লিকের নাতি, নুলো মল্লিকের ছেলে কার্তিক মল্লিক কাৎ—

—কেন?

জগত্তারণবাবু বলেন—হুণ্ডি কেটেছিল কাবলিয়ালার কাছে, এখন সুদে-আসলে সব ডিক্রি হয়ে গেল, আর মাথা তুলতে হবে না বাবাজীকে এবার—

একটা-না-একটা কাপ্তেন রোজ ঘায়েল হয় কলকাতায়, আর জগত্তারণবাবু তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দেন বড়বাবুর কাছে এসে। আগে রোজ আসতেন, এখন বড়বাবুর রক্তের তেজ কমে এসেছে, একটা-না-একটা অসুখে কাবু হয়ে থাকেন। এসেও তেমন জমে না। একলা আর কতক্ষণ জমিয়ে রাখেন।

যাবার সময় বলেন—কই বড়বাবু, অনেকদিন তো কিছু হয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি?

বড়বাবু তাকিয়া থেকে উঠে বলেন—না, কই, এতদিন তো মনে ছিল না মাস্টার, মনে করিয়ে দিতে হয় তো—

—হ্যাঁ, তাহলে কালকেই হয়ে যাক্—খুব দাঁওয়ে কিছু হুইস্কি পাওয়া যাচ্ছিল, ফস্‌কে গেল—

বাড়ি ফেরার আগে জগত্তারণবাবু বার-বাড়ির সামনে একবার এসে দাঁড়ান। উঠোনে বাল্‌বাতিটা তখনও জ্বলছে টিমটিম করে। দরোয়ানদের সদরে ভূষণ সিং ছাতু খাচ্ছিল। জগত্তারণবাবু সামনে গিয়ে বললেন—এই যে ভূষণ, একবার যে বাবা ভেতরে খবর পাঠাতে হবে, মা-জননীর পায়ের ধুলো নেব—

ভূষণ সিং সোজা মা-জননীর কাছে যেতে পারবে না, সে খবর দেবে পয়মন্তকে। পয়মন্ত বার-বাড়ির চাকর, সে খবর পাঠাবে ভেতর বাড়ির সিন্ধুকে। সিন্ধু মা-জননীকে বলবে—মাস্টারবাবু একবার পায়ের ধুলো নিতে এসেছেন মা-মণি।

তারপর জগত্তারণবাবু পয়মন্তর সঙ্গে গিয়ে অন্দরের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াবেন। ওপর থেকে সিন্ধু ঘোমটা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেই জগত্তারণবাবু ওপর দিকে চেয়ে বলবেন—মা-জননী, আপনার ছেলে এসেছে, ক'দিন আসতে পারিনি, অপরাধ নেবেন না আমার—

সিন্ধু মা-মণির বকলমায় বলবে—খোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন মাস্টারবাবু—

—আজ্ঞে আমাকে আর বলতে হবে না মা-জননী, আমি তো তাই বোঝাতেই রোজ আসি, বলি তো যে ও-সব ছাইভস্ম খাওয়া কি ভালো? বুঝেছে, আগের থেকে অনেক বুঝেছে মা-জননী, দেখেন না আমি বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কত ঠাণ্ডা করেছি—

সিন্ধু বলবে—আজকে কেমন আছে খোকা?

—আজকে তো মেজাজ ভালোই দেখলাম মা-জননী, গীতাখানা পড়ালাম আজ, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ্ চিন্তা-টিন্তা যাতে না আসে আর কি! তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের নেশা তো, সইয়ে সইয়ে ছাড়াবো, তা আমি যখন আছি আপনি তখন কিছু ভাববেন না—এখন আমার হাতযশ আর আপনার আশীর্বাদ—

সিন্ধু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবে—আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন মা-জননী, আপনার একটু পায়ের ধুলো পেলে আমি আর কাউকে ভয় করি না—একটু পায়ের ধুলো দিন মা-জননী, বাড়ি চলে যাই।

সিন্ধু একটা ছোট রূপোর বাটিতে খানিকটা পায়ের ধুলো নিয়ে এসে সামনে ধরে আর জগত্তারণবাবু সব ধুলোটুকু মাথায় ঠেকিয়ে বাটিটা একবার জিভে ঠেকান। তারপর সেই সেখানে দাঁড়িয়েই সিঁড়ির সিমেন্টের ওপর কপাল ঠেকিয়ে বাড়ি চলে যান।

এ-ঘটনা বহুদিনের, বহু বছরের। বহু বছর ধরেই জগত্তারণবাবুর এমন মা-জননীর পায়ের ধুলো-প্রাপ্তি ঘটে আসছে। পায়ের ধুলোর জোরেই জগত্তারণবাবুর নিজস্ব বাড়ি হয়েছে কম্বলিটোলায়, নিজস্ব মোটরগাড়ি হয়েছে। সেই গাড়ি করেই নিজের অফিসে যান। কিন্তু বড়বাবুর কাছে আসতে হলেই বড়বাবুর গাড়ি নিয়ে যায় গুলমোহর।

আগের দিন রাত্রেও এসেছিলেন জগত্তারণবাবু। যথারীতি মক্কেল কাৎ হওয়ার গল্পও করেছেন বড়বাবুর ঘরে বসে, তারপর যথারীতি মা-জননীর পায়ের ধুলো নিয়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণামও করে গেছেন। তখনও কেউ টের পায়নি যে পরদিন ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়বে। নফর নিজেও কল্পনা করতে পারেনি।

খাস-বরদার পাঁচু বার-বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একেবারে সামনা-সামনি ধাক্কা লাগছিল ভূষণ সিং-এর সঙ্গে। ভূষণ সিং বহুদিনের লোক। কর্তাবাবুর আমলে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত। সে বন্দুক এখন নেই, তাই সে তেজও নেই। মানুষটাও বুড়ো হয়ে গেছে। একতাল আটা নিয়ে যাচ্ছিল মাখতে। আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে আটাও নষ্ট হতো, থালাও ভাঙতো। খাস-বরদার মুর্গী ছোঁয়, মছ্‌লি ছোঁয়—

—অন্ধা হ্যায়, না কেয়া হ্যায়?

আর দু'একটা চড়া কথা বললেই হাতাহাতি বেধে যেত সেখানে। এমন বেধেছে অনেকবার। ভূষণ সিং-এর সে-তেজ নেই বটে, কিন্তু রাগটা আছে। রাগ করলে আর জ্ঞান থাকে না তার।

—থাম্ তুই, ভারি রাগ দেখাচ্ছে আমাকে!

কর্তাবাবু পর্যন্ত সে-আমলে ভূষণ সিংকে সামলে নিয়ে চলতেন। বলতেন—ওকে চটিয়ো না তোমরা হে, ও খাস মৈথিলী ব্রাহ্মণ, ওদের রাগটা একটু বেশি হয়। আর সদর গেট্-এ রাগী লোক থাকা ভালো—

—তুই রাগ করে তো আমার কচু করবি—ব'লে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে দেখায় পাঁচু। হয়ত আটাসুদ্ধ পেতলের থালাটা পাঁচুর মুখে ছুঁড়েই মারতো ভূষণ সিং। ছুঁড়ে মারলে আর রক্ষে থাকতো না পাঁচুর। ওখানেই অজ্ঞান হয়ে একট রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেত। আর নফরকে ডাকতে যাওয়া হতো না!

—অন্ধা হ্যায় না কেয়া হ্যায়?

—থাম্ তুই, এখন কথা বলবার সময় নেই আমার, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—নইলে দেখে নিতুম—

নফরকে ডেকেছে! অমন যে রাগী মৈথিলী ব্রাহ্মণ ভূষণ সিং, সেও যেন খবরটা শুনে কেমন থমকে দাঁড়াল।

রান্নাবাড়িতে সকাল থেকেই গোলমাল থাকে। গোলমাল সব সময়েই থাকে সেখানে। রান্নার কালি-ঝুল আর ধোঁয়ার মধ্যে যে-মানুষগুলোর জীবন এতদিন

কেটেছে, তারা জানতে পারে না কখন কোন্ দিকে সূর্য উঠলো, কখন ডুবলো। বড়বাবুর খাবারের রকমারি চাই। খাজাঞ্চিমশাই বাজারের সরকারও বটে। বাজার-খরচটা তাঁর হাত দিয়ে হবে। কালিদাসবাবু বাজারে গেলেই বাজারের মেছুনি থেকে শুরু করে আলু-পটলওয়ালারা ডেকে ওঠে—এই যে বাবু, এদিকে আসুন—আজকে ধলেশ্বরীর লালচক্ষু রুই—

আলুওলা বলে—নৈনিতাল আলু ছিল বড়বাবু, আধমণ নিয়ে যান্—

সেই বাজার কিছু যাবে নিজের বাড়ি, কিছু আসবে এ-বাড়িতে। তারপর ভাঁড়ারের ঝি'রা সেই আনাজ তরকারি কুটতে বসবে। মা-মণির জন্যে বড়-বড় আলু কুটতে হবে। বৌ-মণির আলু-ছেঁচকি। আর বড়বাবুর কুচো-কুচো আলুভাজা। ডাল হোক না-হোক, ঝোল হোক না-হোক, ডালনা হোক না-হোক—আলুভাজা চাই-ই বড়বাবুর।

খেতে বসে বড়বাবু বলেন—আর চারটি আলুভাজা দিতে বল্ তো পেঁচো—

খাস-বরদার পাঁচু ছুটে যায় রান্নাবাড়িতে। রান্নাবাড়ি কি এখানে! বার-বাড়ির উঠোনে মস্ত একটা নিমগাছ। সেই নিমগাছ ঘুরে খিড়কী দিয়ে অন্দরের রান্নাঘরের দরজা। দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে পাঁচু দূর থেকে হাঁকায়।

বলে—ও শিশুর-মা, আলুভাজা চাইছে বড়বাবু, আলুভাজা দাও—

মঙ্গলা তখন উনুনে চচ্চড়ি চড়িয়েছে। নটে শাক, কুমড়ো আর আলুর খোসা দিয়ে মা-জননীর শখের তরকারি হচ্ছিল। ভাজা বড়ির গুঁড়োও দিতে হবে শেষে। সর্ষে বাটিয়ে রেখেছে শিশুর-মাকে দিয়ে। সকালবেলা ফরমাশ হয়েছে, সিন্ধু এসে রান্নাবাড়িতে ফরমাশ দিয়ে গেছে। এখন বেলা হতে চললো, চচ্চড়ি এখনও নামলো না।

মঙ্গলা বলে—হ্যাঁ শিশুর-মা, খাজাঞ্চিখানার লোক এখনও খেতে এলো না?

প্রথমে খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করে। তারপর বার-বাড়ির মানুষ-জন যারা দু'একদিনের জন্য আসে বাড়িতে তারা খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু আসে বেলা বারোটার সময়। তাঁকে খেতে দিতে হবে। দফে দফে রান্না যেমন, তেমনি দফে দফে খাওয়া। মা-মণি, বৌ-মণি যা খাবে তা সিন্ধু এসে থালা সাজিয়ে নিয়ে যাবে দোতলায়। তারপর সকলের শেষে খাবে বড়বাবু।
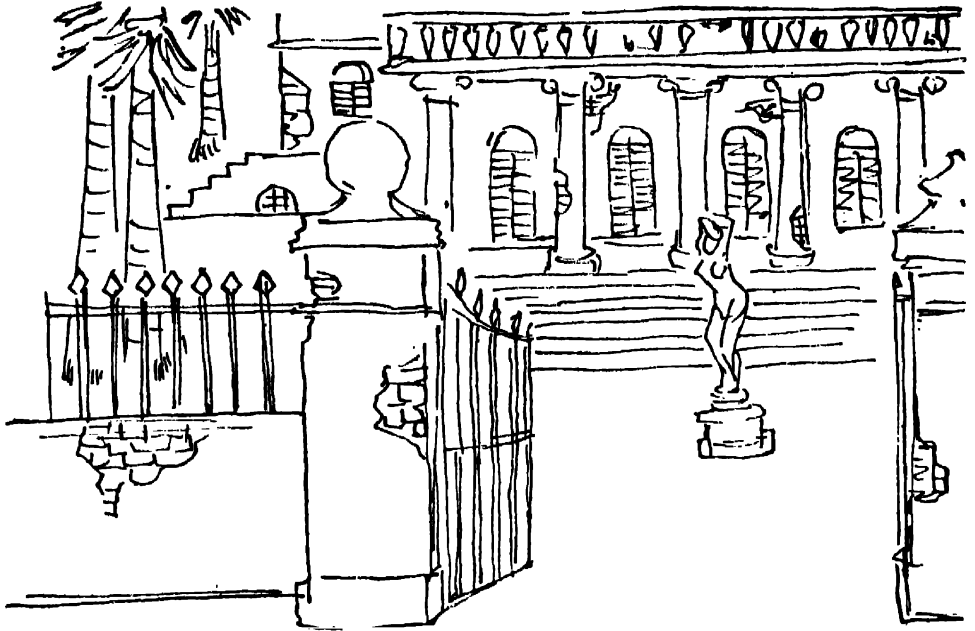
—হ্যাঁরে, বড়বাবু কি চান করতে নেমেছে?

খবর আসে বড়বাবু তেল মাখতে নেমেছে। দাড়ি কামানো, তেল মাখা, গা টেপা তাইতেই বেলা পড়ে যাবার ব্যাপার। মঙ্গলাকে ততক্ষণ বসে থাকতে হয়। বড়বাবু না খেলে মঙ্গলাও খেতে পারে না। ক্ষিদে অবশ্য পায় কি পায় না তা বোঝবার ফুরসুত থাকে না। শিশুর-মা জোগান দেয় আর মঙ্গলা রাঁধে।

—হ্যাঁরে, নফর আজ কই খেলে না তো!

শিশুর-মা বলে—পারিনে বাপু ডেকে ডেকে ভূত খাওয়াতে, যার গরজ হবে সে এসে খেয়ে যাক্ না!

—আহা ছাখ্ না, ছেলেটা না খেয়ে থাকবে গা!

এক এক দিন খেতেই আসে না, লোক পাঠিয়ে ডাকলে

তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের কাজ আছে। ওই খাজাঞ্চিবাবু থেকে শুরু করে চাকৃদ'র মুহুরিবাবু, ভূষণ সিং, ফুলমণি, সিন্ধু, মা-মণি, বৌ-মণি, হরি-জমাদার, সকলে সকাল থেকে চরকির মতো ঘোরে। কাজটা যে কে কী করে তার হিসেব দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু ব্যস্ত সবাই। সকাল থেকেই কেন, ভোর রাত থাকতে উনুনে আগুন পড়ে রান্নাবাড়িতে। তখনও কেউ ওঠেনি। মঙ্গলার তখন চান হয়ে গেছে উঠোনের কলতলায়। বিধবা মানুষ, জপ বলো আহ্নিক বলো সব সেই সময়ের মধ্যে করতে হয়। তার চেয়ে সে-সময়টাতে আলুভাজা, চচ্চড়ির কথা ভাবলে বেশি লাভ। সারা বাড়ির লোক খাচ্ছে, কিন্তু রাঁধছে যে কে তার হিসেব কেউ রাখে না।

শিশুর-মা বাট্‌না বাটতে বাটতে বলে—দিদি, অম্বুবাচী কবে গো?

কে জানে কার অম্বুবাচী। কবে অম্বুবাচী, কবে সূর্য-গ্রহণ, কবে পূর্ণিমা, কবেই বা একাদশী কোনও খবর রাখবার সময় থাকেনা রান্নাঘরের মধ্যে। চারটে উনুন। হাঁ-হাঁ
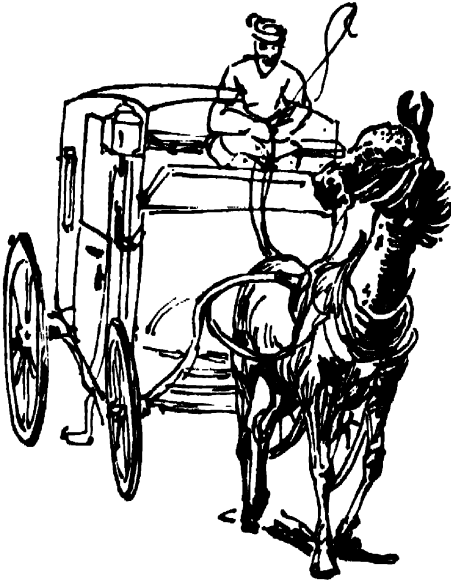
করে জ্বলছে রাবণ-রাজার চিতার মতো। চিতা যেন আর নিভতে চায় না। কবে সংসার সেনের আমলে এই চিতা জ্বলতে শুরু হয়েছে, তার যেন আর ক্ষান্তি নেই। একটা উনুনে ভাত চাপিয়ে আর একটা উনুনে ডাল চাপাতে হয়। ততক্ষণে আর একটা উনুন হু-হু করে জ্বলছে। সেটাতেও ভাত চাপাতে হয়। এক মণ চালের ভাত চড়ে রোজ। এক হাঁড়ি ভাত নামলো তো আর এক হাঁড়ি চড়িয়ে দাও। দশরকম চাল। চালের কম-বেশ আছে। বাইরের লোক খাবে মোটা লাল চাল। বৌ-মণি মা-মণি খাবে সরু আতপ চাল। বড়বাবু খাবে বাসমতী সেদ্ধ চাল। ডালও একরকম নয়। কেউ মুগ, কেউ মুসুর, কেউ বিউলি, কেউ খেসারি। রকমারি লোকের রকমারি খাওয়া।

খেতে বসে মুহুরিবাবু বলে—বড়ির ঘণ্ট আর-একটু শিশুর-মা!

মঙ্গলা বলে—বড়ির ঘণ্টটা এই রেখে দিলাম বাটি ঢাকা দিয়ে, নিস্‌নে যেন, নফর খাবে—

—মুহুরিবাবু চাইছে যে!

—তা চাইছে বলে কি আর কেউ খাবে না! আমার দুধ পুড়ে গেল, আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারিনে বাপু—

রোজ সকাল থেকে নানান লোকের চাহিদা মেটাতে-মেটাতেই হিমসিম খেয়ে যায় মঙ্গলা আর শিশুর-মা। এর মধ্যে ওপর থেকে ফরমাশ আসে—ডালে আজ নুন কম হয়েছে শিশুর-মা—

কেউ বলে—কালিয়াতে আজ এত লঙ্কা দিলে কেন গা?

সব খবর পৌঁছোয় না রান্নাবাড়িতে। ফ্যান গালতে-গালতে হাতটা পুড়ে যায় কতবার। শিশুর-মা বলে—ওমা, হাতে তোমার ফোস্কা কেন দিদি?

মঙ্গলা টেরও পায়নি। বলে—ওমা, তাই তো—

—একটু চুন আর নারকোল তেল দিয়ে দেব?

চুন নারকোল-তেল দেবার সময় নেই সেন-বাড়ির রান্নাবাড়িতে। ভোরবেলা উঠে উনুনে রান্না চাপাবার পর সেই যে একটার পর একটা কাজের চাপ আসে, তারপর থেকে রাত বারোটা অবধি নিশ্বাস নেবার ফুরসুত থাকে না মঙ্গলার।

শিশুর-মা দু'একটা খবর এসে দিয়ে যায় বটে, বলে—শুনেছ দিদি, ভেতর-বাড়ির সিন্ধুর কাণ্ড?

মঙ্গলা তখন ডালে ফোড়ন দিচ্ছে। বলে—কথা রাখ্ বাছা, তোর বাটনা হলো? আমার এদিকে কয়লা পুড়ে গেল—

শিশুর-মা বলে—ঝি-গিরি করছি বলে তো জীবন বিকিয়ে দিইনি দিদি, ঘেন্না ধরে গেল মাগীর কাণ্ড দেখে—

তবু মঙ্গলা কোনও কথা কানে নেয় না।

বলে—মা-মণির অসুখ হয়েছিল, কেমন আছেরে জানিস্?

শিশুর-মা বলে—আজ তো বড় কবিরাজ এসেছিল, গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল দেউড়িতে—

মঙ্গলা বলে—একবার সময়ও পাইনা যে দেখা করে আসি—

—কদ্দিন কাজ হোল তোমার দিদি?

কাজ কি আজকের! কত বছর হবে? যেবার কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিল তীর্থ করতে, সেইবারই প্রথম এ-বাড়িতে ঢোকে মঙ্গলা। ওই নিমগাছটা তখন ছোট ছিল। হাত দিয়ে ডাল ছোঁয়া যেত। কতদিন ওরই ডাল ভেঙে দাঁতন করেছে বাড়ির ঝিউড়িরা। ওইখানে তখন মাটি ছিল। মাটির কোণে দুটো লাউগাছ ছিল। সেই লাউডগা উঠেছিল রান্নাবাড়ির ছাদে। লাউ হয়েছিল প্রথম-প্রথম। কিন্তু হনুমান এসে সব মুড়িয়ে খেয়ে গেল একদিন। শিশুর-মা তখনও আসেনি। আর নফর তখন ছোট। ফরসা ফুটফুটে চেহারা।

লোকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, তোর মা কে? বাবা কে?

মুহুরিবাবু তখন খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছে। বলতো—অ্যাই ছোঁড়া, নাচ্‌তো দেখি, নাচ—

কালিদাসবাবু সরকারি কাজ থেকে মুখ তুলে বলতেন—আবার ওকে ক্ষেপাচ্ছ কেন বলো দিকিন্—

কিন্তু নফর তখন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। নাচ মানে তেমনি নাচ। ধেই ধেই করে নাচ।

—এইবার গান গা তো?

কালিদাসবাবু বলতেন—আবার কাজের সময় গান করতে বলছো কেন বলো তো!

নফর ততক্ষণে নাচ থামিয়ে গান ধরে দিয়েছে—

আমি বৃন্দা-
বনে বনে বনে
বাঁশী বাজাবো—
আমি বৃন্দা—

—থামা বাপু, তোর গান থামা—তোর বাপ কে রে? কাদের ছেলে তুই?

—সরকার মশাই, ওর ডিগবাজি খাওয়া দেখবেন? অ্যাই, ডিগবাজি খা তো?

নফরকে বলতে হয়না বেশি। হুকুম তামিল করতে পারলেই খুশী। শেষকালে সামনে এসে হাত পাতে। বলে—একটা পয়সা দাওনা সরকারবাবু—

কালিদাসবাবু এক ধমক দেন। বলেন—দূর, দূর হ, পয়সা কেন রে, পয়সা কী হবে?

—ল্যাবেনচুষ খাবো।

—দূর হ, বেরো এখান থেকে, পরনে কানি নেই, ল্যাবেনচুষ খাবেন! যা, বেরো এখান থেকে!

বের করে তাড়িয়ে দিত বটে সরকার-গমস্তারা। তখন ছোট। কেউ বলুক না কিছু, দিক না তাড়িয়ে, কিছু আসে যায় না তাতে নফরের। আবার গিয়ে দাঁড়াত দরোয়ানদের ঘরে। ভূষণ সিং তখন ডন-বঠকী দিচ্ছে আর হুম্ হুম্ শব্দ করছে। সেখানে গিয়েও দাঁড়াতো খানিকক্ষণ। তারপর বলতো—আমিও পারি ও-রকম, দেখবে? দেখবে তোমরা?

ন্যাংটো হয়ে সেই অবস্থাতেই লেগে যেত ডন্-বৈঠক করতে। হতোনা ঠিক। তবু করতো। ফুলমণি দেখতে পেয়ে বলতো—হ্যাঁরে, তোর কাপড় কী হলো? ন্যাংটা হয়ে ঘুরছিস্ কেন?

কাপড় কি কোমরে থাকতো তখন নফরের! ধরে বেঁধে কেউ একটা ছেঁড়া কানি পরিয়ে দিলে তো তাই নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। কর্তাবাবু যখন বেরোতেন, সঙ্গে জগত্তারণবাবু, দুলালহরিবাবুও যেতেন। নফর সামনে গিয়ে হাজির। কর্তাবাবু দেখলে বলতেন—হ্যাঁরে, এটাকে একটা কাপড় পরিয়ে দেয় না কেন কেউ?

জগত্তারণবাবু একবার দেখে বললেন—ছেলেটা কাদের কর্তাবাবু?

দুলালহরিবাবু বলতেন—ক'দিন থেকে দেখছি, কোত্থেকে এল?

—এই, তোর নাম কী রে?

—একটা পয়সা দাওনা।

—এইটুকু ছেলে আবার পয়সা চায় যে! পয়সা কী করবি?

—ল্যাবেনচুষ খাবো, ওই মোড়ের দোকান থেকে।

তখন কর্তাবাবুর রমারম অবস্থা। সংসার সেনের বংশের কুলতিলক। চেতলায় ধানের কল করেছেন। পোস্তায় সোরার কারবার, বেলেঘাটায় তেল-কল। সব কারবারই ভালো চলছে। হুড় হুড় করে টাকাও আসছে। টাকার যেন বৃষ্টি হয়। লাখ-লাখ টাকা জমা হয় খাজাঞ্চিখানায়, খাতা লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করে মুহুরিবাবুর। বকেয়ার খাতায় তেমন কালির আঁচড় পড়ে না, জমার খাতায় চারটা-পাঁচটা অঙ্কর ধাক্কা সামলানো দায় হয়ে ওঠে। রাত আটটা ন'টা বেজে যায় সরকার-মুহুরির সেই ঠেলা সামলাতে। কর্তাবাবুর মোসায়েবের দলও বাড়ে।

বাবুরা বলেন—আজকে নৌকাবিলাস হোক কর্তাবাবু, অনেকদিন নৌকাবিলাস হয়নি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—অনেকদিন ভালো গান শুনিনি কর্তাবাবু, মোহরবাঈ কলকাতায় এসেছে শুনছি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—মুলো মল্লিক একজোড়া সাদা ওয়েলার কিনেছে দেখলুম, বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু—

তা তা-ই হয়।

নৌকাবিলাস হয়, মোহরবাঈজীর গান হয়, সাদা ওয়েলার একজোড়া, তা-ও হয়। কোনও শখ অপূর্ণ থাকে না কর্তাবাবুর বাবুদের। কোথাও ভালো পাট্‌নাই গাই-গরু এসেছে শুনলে, তাই-ই কেনা হয়।

কর্তাবাবুর শোবার ঘরে মা-মণি একদিন এলেন।

বললেন—গুরুদেব এসেছেন, জানো!

—কই জানি না তো! কেউ বলেনি তো আমাকে!

মা-মণি বলেন—গুরুদেব বলছিলেন চূড়ামণি-যোগে তীর্থভ্রমণে নাকি সব পাপ ক্ষয় হয়, যাবে!

—পাপ!

পাপ যে কোথায় তা তো জানা ছিল না কর্তাবাবুর। পাপ তো কিছু করেন না। কারোর কোনও ক্ষতি তো করেন না তিনি। কারো চোখের জল ফেলেন না। যে আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে খেতে দেন। কেউ হলপ করে বলতে পারবে না সংসার সেনের বাড়িতে এসে অপমান পেয়ে ফিরে গেছে। দান-ধ্যানও আছে কর্তাবাবুর। পুরী থেকে পাণ্ডারা এলে দক্ষিণে নিয়ে হাসিমুখেই আবার চলে যায়। নিত্য দেবসেবা আছে বাড়িতে—সেখানেও ভোগ হয়, প্রসাদ বিলোনো হয়। পুজোর সময় যে-সে কাপড় পায়। পাত পেতে খেয়ে যায় সবাই। সরকারের খাতায় তার হিসেব আছে দস্তুরমতো। তারপর ওখানে দুর্ভিক্ষ, এখানে অজন্মা, সব চাঁদা দেন কর্তাবাবু। কাউকে ফেরান না তিনি। তবে আর পাপ কিসের?

মা-মণি বললেন—বলছো কি তুমি, পাপ নেই? বেঁচে থাকাই তো পাপ, কত পাপ-ই যে করছি—

তা ঠিক হলো তীর্থবাসই করতে হবে। তীর্থবাস! গুরুদেব বোঝালেন—ব্রাহ্মণকে দান করলে এক জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু সস্ত্রীক তীর্থবাস করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় হয়। আর সত্যিই তো, বেঁচে থেকেই তো আমরা অসংখ্য পাপ করছি। মনের অগোচরে কত হত্যা করছি, কত মিথ্যাচার করছি, কত অসদাচরণ

গুরুদেব সোয়া পাঁচশো টাকার প্রণামী আর কাপড়, বাসন, খড়ম ইত্যাদি নানা জিনিসপত্র নিয়ে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কাশীধামে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। এদিকে তোড়জোড় হতে লাগলো।

জগত্তারণবাবু তখন অ্যাটর্নীশিপ পড়ছেন। বললেন—অব্যেস খারাপ হয়ে গেছে কর্তাবাবু, সময় কাটতে চাইবে না—

কর্তাবাবু বললেন—তোমরাও চলো না—

দুলালহরিবাবু বললেন—আমরা চললে এদিকে সামলাবে কে?

বাগানবাড়িতে কর্তাবাবুর মেয়েমানুষের তখন খুব খাতির। পুতুলমালার মা আছে, পুতুলমালার ঝি আছে, পুতুলমালার চাকর, দরোয়ান সব আছে। কিন্তু তবু ভয় যায় না। মুলো মল্লিক নতুন বড়লোক। কোত্থেকে কী করে বসে, পুতুলমালার মাকে খুশী করে হয়ত হাত করে নেবে, তখন এ-কূল ও-কূল উভয়কূল যাবে। তার চেয়ে জগত্তারণবাবু থাক্। দুলালহরিবাবু থাক্। দু'বেলা দু'জন পালা করে পাহারা দেবে।

কর্তাবাবু বললেন—জগত্তারণ তুমি যেয়ো সন্ধ্যাবেলা, আর দুলালহরির তো কোনও কাজ নেই, ও যাবে'খন সকালবেলার দিকটা,—কড়া নজর রাখবে যেন বাইরের মাছিটি না মাড়ায় ওখানে—

কিন্তু সেই-যে কর্তাবাবু কাশী গেলেন, সেই যাওয়াতেই কপাল ভাঙলো মঙ্গলার।

মঙ্গলা তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। এ-বাড়ির কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। কে সঙ্গে যাবে, কে যাবে না। কী-কী যাবে, কখন যাবে, অনেক ঝঞ্ঝাট। দু'মাস ধরে তার বিলি-বন্দোবস্ত হলো। এ-সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ভূষণ সিং-এর বয়েস কম ছিল। কালিদাসবাবুর যৌবন ছিল, মুহুরিবাবুর তখনও চুল পাকেনি। জগত্তারণবাবু তখনও অ্যাটর্নীশিপ পাস করেননি। আর এখন তো দুলালহরিবাবুই নেই। একদিন হঠাৎ কর্তাবাবুর বাগানবাড়ির পুকুরে পাওয়া গেল দুলালহরিবাবুর দেহখানা। ফুলে-ফেঁপে তখন ঢোল হয়ে গেছে। থানা-পুলিশ যা-হবার হলো। কর্তাবাবুর কাছে চিঠি গেল কাশীধামে। কিন্তু সে-চিঠির উত্তর আর এল না। মা-মণির তখন খুব অসুখ।

বাড়িতে খবর এসে গেছে কর্তাবাবু অস্থির হয়েছেন

কলকাতায় আসবার জন্যে, কিন্তু মা-মণির জন্যে আসবার উপায় নেই। সঙ্গে সরকার গেছে, খাস-বরদার পীরজাদা দরোয়ান গেছে, কুঞ্জবালা গেছে। আর গেছে মঙ্গলা।

মঙ্গলাকে কে যেন এনে দিয়েছিল এ-বাড়িতে। কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন তীর্থ করতে। তাই একটা লোক চাই রান্না-বান্না করতে। বামুনের মেয়ে হবে, খাটবে-খুটবে বেশি, মুখে কথাটি বলবে না।

মা-মণি আপাদমস্তক দেখলেন। বললেন—তুই কাজ করতে পারবি?

—কাজ না করলে খাবো কি মা, বিধবা মানুষকে কে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে।

—বলি রান্না-বান্নার কাজ করেছিস কখনও?

—করবার তো দরকার হয়নি মা, এখন থেকে করবো।

কত আর বয়েস তখন। তেরো কি চোদ্দ। ওই বয়েসেই কপাল পুড়েছে। রূপ নয় তো, আগুন বললেই যেন ভালো হয়।

মা-মণি বললেন—তোর দ্বারা হবে না বাপু আমার কাজ, এত রূপ, সব ছারখার করে দিবি, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে বিদেয় হও বাপু, অন্য জায়গায় ছাখো—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—মুখখানা আমার পুড়িয়ে তুমি কালো করে দাও মা, তা-ও আমি সইতে পারবো, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মা—

—তাই যদি এত জ্বালা তো গঙ্গায় ডুবতে পারো না বাছা? গঙ্গায় তো জলের অভাব নেই!

—তাই-ই যদি পারবো তো তোমার পায়ে ধরছি কেন মা।

তখনকার ঝি ছিল কুঞ্জবালা। কুঞ্জ মারা গেছে পরে। সে বলেছিল—কর্তাবাবুর সামনে বেরোসনি হারামজাদী, সামনে যদি বেরোস্ তো তোর শিরদাঁড়া আস্ত ভেঙে দেবো—

তা তাই-ই ঠিক হলো। কাজ করবে মুখ বুঁজে। দিনরাত কাজ করতে ব্যাজার হবে না, এমন লোকই দরকার। কুঞ্জবালা বললে—থাক্ মা, কর্তাবাবুর সামনে ওকে আড়াল করে রাখবো আমি—

কুঞ্জবালার সঙ্গে একদিন মঙ্গলা ফরসা থান কাপড় পরে ঘোমটা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আগে যাবে ঝি-ঝিউড়িরা। চাকর-বাকররা। সরকার-গমস্তারা। তারা বাসা ঠিক করে সব বন্দোবস্ত করে রাখবে আগে-ভাগে। তারপর কর্তা-গিন্নী যাবেন। তাঁদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

শিশুর-মা এক-একদিন কথা তোলে। বলে—তুমি তো কাশী গিয়েছিলে, না দিদি?

চারটে উনুনে হাঁ-হাঁ করে কয়লা পোড়ে। সব কথার জবাব দেবার সময় থাকে না মঙ্গলার। সব কথা কানে নিতে নেই। কানে নিতে গেলে ডালে নুন দিতে ভুলে যাবে, ভাতের ফ্যান গালতে হাত পুড়ে যাবে।

প্রথম খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করবে বটে, কিন্তু জোগান দেবে তো মঙ্গলা। তারপর ধান-কলের লোক এসেছে দু'জন, তারা আজ এখানে খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু এসে বেলা বারোটায় ভাত চায়। মা-মণি, বৌ-মণির খাবার দিতে হবে পাঠিয়ে দুপুরবেলায়। দেরি হলে সিন্ধুর মুখ-ঝামটা দেখে কে! তারপর সবশেষে বেলা পুইয়ে গেলে খাবে কর্তাবাবু। তারপর যখন সকলের খেয়ে-দেয়ে কাজকর্ম সেরে চা-খাবার সময় হবে তখন ভাত নিয়ে বসবে মঙ্গলা।

—তুমি তো জীবনের কাজ শেষ করে দিয়েছ দিদি, কাশীবাস করেছ, বাবা বিশ্বনাথ দর্শন হয়ে গেছে, আমাদের পাপ আর কে খণ্ডাবে বলো!

—রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করতে তো?

মঙ্গলা এ-কথার উত্তর দেয় না। বলে—হ্যাঁ রে, নফর খেতে এলো না আজ?

শিশুর-মা বলে—ওমা, নফর খাবে কি গো, নফর যে বড়বাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে গেছে, সেখানে কালিয়া-কোপ্তা খাচ্ছে, জগত্তারণবাবু গেছে, নফর তোমার এই কুমড়োর ঘণ্ট খেতে আসছে!

মঙ্গলা লুকিয়ে রেখেছিল একথালা ভাত। দু'টুকরো পোনা মাছ। একটু কুমড়োর ঘণ্ট। গরম ভাত খাওয়া কপালে নেই। তবু বাসি কড়কড়ে ভাতটা উনুনের পাশে রেখে দিলে তবু একটু গরম থাকে। নফরকে যেদিন ডেকে ডেকে এনে বসায়, রোয়াকের ওপর উঁচু হয়ে বসে ভাতগুলো গোগ্রাসে খায়।

বলে—শিশুর-মা, ডালটা কে রেঁধেছে গো?

শিশুর-মা বলে—আর কে রাঁধবে, বামুনদিদি—

নফর বলে—কী ডালই রেঁধেছে মাইরি, একেবারে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে—

শিশুর-মা বলে—যা দিয়েছি ওই দিয়ে খেতে হয় খাও, নয়তো উঠে যাও বাপু—

—কী বললে? নফর রুখিয়ে ওঠে একবার।

শিশুর-মা আবার বলে—খেতে হয় খাও, নয়তো চলে যাও, রান্নাবাড়িতে এসে চোখ রাঙাবে নাকি?

নফর আরো রেগে ওঠে। বলে—ডেকে নিয়ে এসো তোমার বামুনদিকে, মাইনে-ফাইনে যখন বন্ধ করে দেব বড়বাবুকে ব'লে তখন পায়ে ধরতে আসবে এই শর্মার—

শিশুর-মা কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে তেড়ে আসে। বলে—বামুনদি, খ্যাংরাটা নিয়ে এসো তো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ ভেঙে দিই—

—কী-ই-ই, এত বড় কথা!

এঁটো হাতেই নফর দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে—ভাত দিচ্ছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? মাছ কোথায় শুনি? ইয়ারকি পেয়েছ তোমরা? এসো, এগিয়ে এসো, ঘুষি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব আজ, চেনো না আমাকে—

—তবে রে মিনসের মরণ দশা হয়েছে— ব'লে শিশুর-মা খ্যাংরা-ঝ্যাঁটাটা নিজেই নিয়ে এসেছে। নফরও তার চুলের মুঠি ধরে এক টান দিয়েছে।

শিশুর-মা তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে—ওগো, মিন্‌সে আমাকে মেরে ফেললে গো—

সে চীৎকারে রান্নাবাড়িতে লোক জড়ো হয়ে গেছে। খাজাঞ্চিখানা থেকে দৌড়ে এসেছে মুহুরিবাবু, বার-বাড়ি থেকে দৌড়ে এসছে ফুলমণি, আস্তাবল-বাড়ি থেকে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির গুলমোহর আলি। সিন্ধু দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হলো রে শিশুর-মা?

নফর তখনও চীৎকার করছে—আমি মাগীকে খুন করে ফেলব আজ, খুন করেঙ্গা—জরুর খুন করেঙ্গা—

মুহুরিবাবু ভয় পেয়ে গেল। হরি-জমাদার দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। বললে—যা তো হরি, ভূষণ সিং-কে ডেকে নিয়ে আয় তো—

সবাই যখন উত্তেজনায় চীৎকারে অস্থির, তখনও রান্না-বাড়ির ভেতরে মঙ্গলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কোনও দিকে খেয়াল নেই তার।

নফর চীৎকার করছে—আও হামারা সাথ লড়েগা, কোন্ লড়েগা হামারা সাথ, আও, আও,—তোমরা বামুন-দিকো বোলাও—বোলাও বামুন-দিকো, মাছ চুরি করেগা, আবার ইয়ারকি—

ততক্ষণে ভূষণ সিং এসে গেছে। এসেই নফরের ঘাড়ে এক লাঠি।

—এই উল্লু! নিকালো—

আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক মন্ত্রের মতো যেন কাজ হয়ে গেল। এক আঘাতেই নফর যেন কেঁচোর মতো হয়ে গেছে। একেবারে কেঁচোটি! আমতা-আমতা করছে তখন। বললে—এই দ্যাখো ভূষণ সিং, ভাত্‌মে মাছ দেতা নেই বামুনদি, বড়বাবুকো বোল্ দেও—উস্‌কা নক্‌রী খতম্ কর্ দেও—

—আরে তুম্ তো ইধার আও পহেলে—

নফরের ঘাড় ধরে ভূষণ সিং বার-বাড়ির উঠোনে ছেড়ে দিলে। নফর অসহায়ের মতো চাইলে সকলের দিকে। বললে—আমারই দোষ দেখলে তুমি, আর আমাকে যে মাছ দেয় না খেতে—

ব'লে সকলের মুখের দিকে সহানুভূতির জন্যে আবার চেয়ে দেখলে।

কিন্তু সবাই হাসছে তখন কাণ্ড দেখে। মুহুরিবাবু বললে —মাছ কেন দেবে শুনি? কোন্ কম্মে তুমি আছো হে?

নফর বললে—কাজের কথা ছেড়ে দিন, তা বলে দুটো খেতে দেবে না, আমি কেউ নই?

গুলমোহর আলিও হাসতে লাগলো। বললে—নফর পাগলা হো গিয়া—

মুহুরিবাবু বললে—তুমি কে হে শুনি? কোন্ নবাবের দেওয়ান!

—ক্ষিদের সময় ঠাট্টা করবেন না, ঠাট্টা ভালো লাগছে না এখন—

—তা ভালো লাগবে কেন, বসে বসে খেতে ভালো লাগবে কেবল, কেমন?

নফর বলে—আমি বসে বসে খাই!

—বসে বসে খাও না তো, কী করো শুনি! সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোও!

নফর বলে—তা কাজ দিন না আমাকে, কাজ না থাকলে কী করবো? ঘুমোব না তো আপনাদের দাড়িতে হাত বুলোব?

ব'লে যেন মহা রসিকতা করেছে এমনি ভাবে সকলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

ভূষণ সিং তেড়ে আসে আবার। বলে—ফিন্ দিল্লাগি?

—মেরো না ভূষণ সিং, শালা সারাদিন খাওয়া হোল না, পেট চোঁ-চোঁ করছে—ইয়ারকি আর ভাল্লাগে না—

কিন্তু তারপরে যখন চুপটি করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকে, তখন কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। তেলাপোকা আর ছারপোকাতে ভর্তি ঘরখানা। ঘুম ভেঙেই দেখে পাশে যেন একটা ভাতের থালা। এক থালা ভাত যেন কে রেখে গেছে তার পাশে। বলেওনি কেউ, ডাকেওনি। টপাস্ করে উঠে পড়েছে নফর। মাছও দিয়েছে একটা।

বাইরের দিকে চেয়ে চেঁচালে—এই, কে রে ওখানে?

কে যেন যাচ্ছিল উঠোন দিয়ে। তেমন খেয়াল করলে না। খেয়াল অবশ্য কেউ-ই করে না নফরকে।

—কে যায় রে, কে ওদিকে যায়?

ভাতটা কে দিয়ে গেল তার খোঁজ নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু দূর হোক গে! টপ্ টপ্ করে ভাতগুলো খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়তো নফর। তারপর ঘুম আসতো, কিন্তু পেটে ক্ষিদে থাকলে ভালো ঘুম আসে না যেন। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যখন মনে হতো কোথাও গেলে হয়, তখনই আবার মনে হতো কোথায়ই বা যাবে। কোথাও গিয়েই বা কি হবে। ধোপার কাছে একটা গেঞ্জি দিয়েছিল, সেটা আনতে গেলে পয়সা দিতে হবে। তার চেয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো।

আগে ক্ষিদে পেলে, রাগ হলে ওম্নি হৈ-চৈ করতো। এখন আর সে-সব করে না। আদ্ধেক দিন খায় না। ঘুমিয়েই কেটে যায় বেশ। বার-বাড়ির উঠোনের এক কোণে নিমগাছটার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা ঘর। গুরুদেব এলে ওইখানেই থাকেন। তা তাই-ই বা ক'দিন। বছরে একবার আসেন হয়ত। যে-ক'দিন থাকেন সে ক'দিন ঘর ধোয়া-মোছা হয়। ধূপ-ধুনো দেওয়া হয় ঘরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সব। কিন্তু তিনি চলে গেলেই আবার তেলাপোকা আর উই-পোকার রাজত্ব। এ-ঘরের দিকে কেউ আর মাড়ায় না তখন। অন্ধকারে ধোঁয়ায় কালিঝুলের মধ্যে ওইখানেই পাড় থাকে নফর। কেউ খোঁজ নেয় না, কেউ খবর নেয় না। শিশুর-মা মাঝে মাঝে আসে। বলে—এই নফর, খাবি নে? খেতে যাস্নি যে আজ?

—না, খাবো না, যা।

শিশুর-মা বলে—না খাবি তো বয়ে গেল ভারি, খাবি নে তো, পেটে খিল দিয়ে পড়ে থাক্, মর্গে যা—আমার কী?

—আমি মরবো, তোর কী রে? আমি মরবো এখানে, তোর কী শুনি?

রান্নাবাড়িতে গিয়ে শিশুর-মা বলে—এলো না বাবু, এলোনা তোমার নফর!

বামুনদি বলে—হ্যাঁ রে, তা বলে ছেলেটা না খেয়ে থাকবে? আর একবার ডাক না গিয়ে!

—আমি বাপু ডাকতে পারবো নি, তোমার খুশী হয় নিজে ডাকো গিয়ে—

এক-একদিন খবরটা মা-মণির কাছেও যায়। বলে—হ্যাঁরে সিন্ধু, রান্নাবাড়িতে এত গোলমাল কিসের রে?

সিন্ধু বলে—ওই নফর, নফর আবার হৈ-চৈ বাধিয়েছে—

পুজোর সময় সকলের কাপড়-জামা হয়। কাপড়-জামা শুধু কর্তা-গিন্নীদেরই নয়, সকলেরই হয়। বাড়ির কুকুর-বেড়ালটারও হয়। ও জগত্তারণবাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুরও হয়। শুধু তাই নয় জগত্তারণবাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুর ছেলে-মেয়েদেরও হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে। জামা-জুতো-কাপড়, মোজা-গেঞ্জি সব। এ রেওয়াজ চলে আসছে সংসার সেনের আমল থেকে।

কিন্তু হঠাৎ নফরের যেন খেয়াল হয়েছে।

স্বাথে ন'বৎ বসে গেছে দেউড়িতে। হরি-জমাদার লাল গেঞ্জি পরেছে। ভূষণ সিং কাপড় হলুদ দিয়ে ছুপিয়েছে। কী হলো? পুজো এসে গেছে নাকি?

খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে বললে—খাজাঞ্চিবাবু, পুজো এসে গেল, আমার কাপড়-জামা কই ?

কালিদাসবাবু খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—তোর কাপড়। কোথায় ছিলি তুই ?

—ও-সব শুনছিনে, আমার কাপড় দিন, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, জুতো মোজা—সব দিতে হবে।

—ওরে বাব্বা, এ যে চোখ রাঙায় আবার, দেব না, না দিলে কী করবি তুই শুনি ?

—দেবেন না মানে? আলবাৎ দিতে হবে, নইলে বড়বাবুকে বলে চাকরি খতম করে দেব সক্কলের।

ব'লে লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগলো নফর।

মুহুরিবাবু দেখে শুনে এগিয়ে এল। বললে—কী বলছিস নফর তুই? বলছিস কী?

—আজ্ঞে, যা বলছি ঠিক বলছি, সক্কলের পুজোর কাপড় হয়, আমার হয় না কেন শুনতে চাই।

কালিদাসবাবু বললেন—হবে না তোর কাপড়, কী করবি তুই করগে—

—কেন হবে না শুনি? আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই?

কোথায় যে এত জোর পায় নফর কে জানে। কিসের যে এত জোর তাও জানেনা কেউ। এ-বাড়ির কেউ নয় সে, কোনও সূত্রে এ-বাড়ির সঙ্গে সে কোনওভাবে যুক্ত নয়। চাকর-ঝিদের মতো তার মাইনেও নেই, আবার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও কেউ নয় সে। এ-বাড়ির কেউ জানে না, কী সূত্রে সে আছে এখানে, কিসের টানে, কাদের জোরে। তবু তার সব জিনিসে ভাগ চাই আর-সকলের সঙ্গে। ভাত খাবার সময় আর-সকলের মতো মাছ চাই, পুজোর সময় কাপড়-জামাও চাই আর-সকলের মতো।

মুহুরিবাবু বললে—কোথায় ছিলি তুই? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

—খাতায় যখন নাম আছে আমার তখন চুরি করেছ তোমরা, নির্ঘাৎ চুরি করেছ।

—তবে রে, চোর বলা?

ব'লে মুহুরিবাবু ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যেতেই নফরও মুহুরিবাবুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—শালারা চোর সব, আমার কাপড়-জামা চুরি করে আবার আমারই ওপর তম্বি, বড়বাবুকে বলে সকলের চাকরি খেয়ে দেব না? আমাকে দেবেনা শালারা···

ঠিক সময়ে কালিদাসবাবু দেখতে পেয়েছেন তাই, নইলে মুহুরিবাবুকে খেয়ে ফেলতো বোধ হয় নফর।

কালিদাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন—ভূষণ সিং—ভূষণ সিং—

ভূষণ সিং দৌড়ে এসেই নফরকে ধরে ফেলেছে।

নফর বললে—ছাড়ো আমাকে দরোয়ান, ছাড়ো মাইরি, ছাড়ো বলছি, আমি যাচ্ছি বড়বাবুর কাছে! দেখাচ্ছি মজা—

ভূষণ সিং ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে নফরকে, নফর কিন্তু তাতেও দমলো না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে দৌড়লো। সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে গিয়ে উঠলো একেবারে বড়বাবুর বার-বাড়ির ঘরে। বেশির ভাগ দিন ওখানেই থাকেন বড়বাবু। জগত্তারণবাবু বেশী রাতে গেলে বড়বাবু আর ভেতরে যেতে পারেন না। জগত্তারণবাবু যখন বড়বাবুর মাস্টারি করতেন, তখন থেকেই বড়বাবু ওই ঘরেই থাকেন।

নফর গিয়ে ডাকলো—বড়বাবু, বড়বাবু—আমি নফর—

এমন সময় অবশ্য ঘুম ভাঙে না। বড়বাবুর ঘুম ভাঙতে বড্ড দেরি হয়। খাস-বরদার পাঁচু বেলা দশটা থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার দিকে চেয়ে। ঘুম ভাঙলেই সিগারেটের টিনটা কিম্বা বোতলটা এগিয়ে দিতে হবে। কখনও-কখনও বড়বাবুর তেষ্টা পায়। খাস-বরদার তা-ও সব রেডি করে রাখে। আগের দিন অনেকক্ষণ জগত্তারণ-বাবু গল্প করে গেছেন। বহুদিন আগে কর্তাবাবুর আমলে সেই যে জগত্তারণবাবু একদিন মাস্টার হয়ে এলেন, তারপর লেখাপড়া বেশিদূর হলো না, জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হলেন, কর্তাবাবুও একদিন মারা গেলেন, বড়বাবুর বিয়ে হলো।

কর্তাবাবু গাড়িতে যেতে যেতে মাঝে-মধ্যে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন—খোকার কেমন লেখাপড়া হচ্ছে জগত্তারণবাবু?

জগত্তারণবাবু বলতেন—আজ্ঞে, বড়বাবুর ব্রেনটা ভালো, আমার চেয়েও ভালো ব্রেন, কিন্তু একটা দোষ, খাটতে চাইবে না মোটে—

কর্তাবাবু বলতেন—ও আমার স্বভাব পেয়েছে—

কাশীধামে যাবার আগে জগত্তারণবাবুর কোনও কাজ ছিল না। কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। কিন্তু ভিক্ষে করে সংসার চলে না। তারপর কাশী থেকে এসে যেবার দত্তক নিলেন, তার কয়েকবছর পরেই ছেলের লেখাপড়ার ভারটা দিলেন জগত্তারণবাবুর ওপর। পোষ্যপুত্র, বেশী বকা-ঝকা চলে না। সেই থেকেই জগত্তারণবাবু এসে পড়াবার সময় গল্প ফাঁদতেন।

—জানো বড়বাবু, আজকে এক মক্কেল কাৎ হলো।

ছোটবেলা থেকে বড়বাবুকে মক্কেল কাৎ হবার গল্প শুনিয়ে এসেছেন জগত্তারণবাবু। বড়বাবুর ধারণা হয়েছে মক্কেলরা কাৎ হবার জন্যেই জন্মায়। মুলো মল্লিকের ছেলে

কার্তিক মল্লিকের থেকে শুরু করে কোনও মক্কেল আর কাৎ হতে বাকি রইল না কলকাতায়।

বড়বাবু বলেন—আমাদের ন্যাঁকা শীলের খবর কি গো মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বলেন—সে-ও এইবার কাৎ হবে বড়বাবু, আর দুটো দিন সবুর করো না, তারও পাখা উঠেছে, খবর পেইছি আমি—

—আর সেই ন্যাড়া মিত্তির, সেই যে খুব কাপ্তেনি করলে ক'দিন!

জগত্তারণবাবু বলেন—আরে, সে কবে কাৎ হয়েছে, উড়তে-না-উড়তে কাৎ হয়েছে, তোমাকে তো বলেছি সে-খবর! মনে নেই তোমার?

তারপর যাবার আগে চুপি চুপি বলেন—টেঁপির শরীরটা বড় খারাপ, খবর পাওনি তুমি?

বড়বাবু বলে—শরীর খারাপ? টেঁপির? কই, শুনিনি তো?

—বোধহয় লজ্জায় বলেনি!

—কেন, লজ্জা কিসের?

জগত্তারণবাবু বলেন—লজ্জা হবে না? কী বলো তুমি বড়বাবু, মেয়েমানুষের লজ্জা হয় বৈকি! তোমারই খাচ্ছে, তোমারই পরছে, তোমার খেয়ে-পরেই মানুষ, কথায় কথায় জ্বালাতন করতে লজ্জা হবে না! হাজার হোক মেয়েমানুষ তো?

বড়বাবু বললেন—তাহলে কী করতে হবে মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বললেন—একবার যেতে হবে তোমায় বড়বাবু, শরীর খারাপ হোক আর যা-ই হোক, যাওয়া তোমার একবার উচিত—

বড়বাবু বললেন—স্টেটের অবস্থা তো তেমন ভালো নয় এখন—

—একবার শুধু যাবে আর আসবে; স্টেটের ভালো-মন্দের সঙ্গে তার কী? তুমি তো থাকছো না সেখানে—! আর অনেকদিন তো ও-সব হয়-টয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি?

বড়বাবু বললেন—তা হলে নফরকে ডাকতে হবে—

—হ্যাঁ, নফরকে দিয়ে আমার আপিসে খবর দিয়ো, আমি তৈরি হয়ে থাকবোখন।

এরকম মাঝে মাঝে ঠিক নিয়ম করে টেঁপির শরীর খারাপ হয়। স্টেটের অবস্থা খারাপ বলে বড়বাবু একবার আপত্তিও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের দিন জগত্তারণ-বাবুর কথায় ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়ে। কিন্তু যাবার সময় জগত্তারণবাবু ভেতর-বাড়িতে গিয়ে মা-জননীর পায়ের ধুলোও নেন।

বলেন—কই, মা-জননী কোথায়, পায়ের ধুলো একটু নিতাম যে—

সেই ওপরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা-মণি। বাইরে ঘোমটা দিয়ে সিন্ধুই বকলমায় কথা বলবে। খোকার কথা হবে।

সিন্ধু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই এককালে ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবেন—গীতাখানা তো আজও পড়ালাম, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ চিন্তা-টিন্তা যাতে না-আসে আর কি! তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের অভ্যেস তো।—আপনি কেমন আছেন মা-জননী?

সিন্ধু বলবে—আমার আর থাকা—

জগত্তারণবাবু বলবেন—আপনারা পুণ্যাত্মা লোক, আপনারা সুস্থ থাকলে পৃথিবীটা তবু একটু সুস্থ থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে—

তারপর সেই রুপোর বাটি থেকে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে চেটে মাথায় ঠেকাবেন। এমনি প্রায়ই। এমনি বহুদিন থেকেই চলছে। খাস-বরদার পাঁচু এসব জানে। ঘুম ভাঙবার সময় তাই পাঁচু সিগারেটের টিন, দেশলাই, যাবতীয় জিনিস নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন বড়বাবু উঠবে তার আশায়।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই পাঁচু গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ির দরজা খোলে—কে রে?

—বড়বাবু কোথায়? আমি নফর।

পাঁচু বলে—নফর তা এখন কী? বড়বাবু তো তোকে ডাকেনি!

নফর বললে—বড়বাবু ডাকেনি তো কী হয়েছে, আমার কাজ আছে বড়বাবুর কাছে।

—কী কাজ?

নফর বললে—ছাখ্‌তো পাঁচু, এই ছাখ্‌, আমাকে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেরোচ্ছে দেখছিস্? পুজোর কাপড় সব্বাই পেলে, বাড়ির ঝি-চাকর দাসী-বাঁদী কেউ বাদ গেল না, ওই বেটা হারামজাদা মুহুরিবাবু আমার কাপড়টা মেরে…

—কে রে? কে ওখানে?

গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল ভেতর থেকে। পাঁচু লাফিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কে চেঁচাচ্ছে রে ষাঁড়ের মতো? সক্কালবেলা দিলে ঘুমটা ভাঙিয়ে!

—আজ্ঞে, ও নফর।

—জুতো মেরে বের করে দে ওকে, বেটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে—

কালিদাসবাবু বলেন—কোথায় গেল রে নফরটা?

মুহুরিবাবু বলে—বড়বাবুর কাছে গেছলো, দিয়েছে বেটাকে টিট্ করে তাড়িয়ে, এখন জব্দ—

সত্যিই জব্দ হয়ে যায় নফর। আবার এসে আস্তে আস্তে ঢোকে নিজের ঘরটাতে। পাশেই গুরুদেবের খালি তক্তপোশটা। তার তলায় নফরের বিছানাটা গোটানো থাকে। আবার সেইটে খুলে শুয়ে পড়ে। দূর হোক্ গে। না দিক কাপড়, না দিক জামা, না দিক মাছ—ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়। এ-বাড়ির যেখানে যা-কিছু হোক, তাতে কিছু এসে যায় না নফরের, নফর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই এই এতগুলো বছর যদি কাটিয়ে দিয়ে থাকে তো আরও ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারবে—

আজ কিন্তু খাস-বরদার পাঁচুই দৌড়ে এসেছে। রোজকার মতো ঘুমিয়েই ছিল নফর।

—নফরবাবু, নফরবাবু!

নফর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। বললে—কি রে পাঁচু? বড়বাবু ডেকেছে নাকি?

—ডেকেছে।

—কী বললে?

—বড়বাবু ঘুম থেকে উঠতেই সিগারেটের টিনটা এগিয়ে নিয়ে সামনে ধরেছি, বড়বাবু আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললেন—হ্যাঁ রে, নফর কোথায়, নফরকে যে আর দেখতে পাইনে, নফর কি মরে গেছে নাকি!

এর বেশি আর বলতে হয় না। এর বেশি আর বলার দরকার হয় না।

কথাটা শুনে নফরের এক গাল হাসি বেরোল।

বললে—জয় মা কালী— ব'লে বিছানাটা গুটিয়ে রেখে নফর এক দৌড়ে খাজাঞ্চিখানায় গেল। কালিদাসবাবু তখন খাতা দেখছেন। মুহুরিবাবু হিসেবের খাতার মধ্যে ডুবে আছেন।

নফর সোজা গিয়ে বললে—এই যে খাজাঞ্চিবাবু, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন তো, পাঁচটা টাকা—

কালিদাসবাবু ক্ষেপে গেলেন—আবার এসেছিস? সেদিন বড়বাবুর কাছে জুতো খেয়েও তোর জ্ঞান হলো না রে?

মুহুরিবাবু বললে—বেরো এখান থেকে,—বেরো বলছি হারামজাদা!

নফর বললে—বাজে কথা বোলো না বেশি, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, বড়বাবু ডেকেছে—সময় নেই আমার—

বড়বাবুর নাম শোনার পরই কালিদাসবাবুর মুখের চেহারাটা যেন বদলে গেল।

বললেন—বড়বাবু ডেকেছেন?

তারপর একটু ভেবে বললেন—মাসের শেষে এই অসময়ে তোমায় ডাকলে?

নফর বলে—দিন দিন, টাকা দিন মশাই, সময় নেই আমার, বড়বাবু আবার ক্ষেপে যাবে—

শুধু কালিদাসবাবুই নয়। সমস্ত বাড়িখানার চেহারাই যেন তারপর একেবারে বদলে যাবে। সারা বাড়িতে খবর রটে যাবে যে বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন। তারপর সেই টাকা নিয়ে নফর ধোপার বাড়ি যাবে। সেখান থেকে কাচা জামা-কাপড় এনে চুল ছাঁটবে। দাড়ি কামাবে। তখন আর চেনা যাবে না নফরকে। তখন আর নফর নয়, নফরবাবু। ভেতর-বাড়িতে মা-মণি পেস্তা-বাদাম বাটতে বলবে। পেস্তা-বাদাম বাটা হবে সকাল থেকে। মাছের
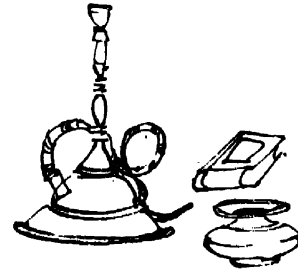
মুড়ো আসবে। বাজার থেকে সেদিন নতুন করে বাজার আসবে। বৌ-মণি সেদিন নতুন করে স্নান করবে আবার। সাজবে গুজবে। বড়বাবুর দাড়ি কামাতে এসে অধর নাপিত সেদিন মোটা বকশিশ পাবে।

সিন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে—আজকে আবার পেস্তা-বাদাম বাটছে কেন মা-মণি ?

মা-মণি বলবেন—আজ যে খোকা নফরকে ডেকেছে—

রান্নাবাড়িতে সেদিন হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে। হুলুস্থূল এমনিতেই সেখানে বেধে থাকে সব সময়। ভাত চড়াতে চড়াতে ডাল পুড়ে যায়, ডাল সাঁতলাতে গিয়ে ভাত গলে যায়। কিন্তু সেদিন আর ফুরসুৎ থাকবে না বামুনদির।

বলে—বাটনা কী হলো শিশুর-মা ?

শিশুর-মা'র সেদিন সদর-অন্দর করতে-করতে পা দুটো টনটন করে ওঠে। তারপর বড়বাবুর ফরমাশ আর হুকুমের ঠ্যালায় সারা বাড়ি চরকির মতো ঘুরতে থাকে। নফরের কী দাপট তখন! ভূষণ সিং যে ভূষণ সিং সে-ও যেন কেমন সমীহ করে কথা বলবে নফরের সঙ্গে। নফরকে আর চেনাও যায় না তখন। চুল ছেঁটে ফরসা জামা-কাপড় পরে নফর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ভাত চাইবে। সেদিন আর মাছ নিয়ে ঝগড়া বাধবে না শিশুর-মা'র সঙ্গে।

শিশুর-মা'র যে অত তেজ, সেই শিশুর-মা-ই বার বার জিজ্ঞেস করবে—আর দুটো ভাত দেব নাকি নফরবাবু!

—না না।

বলতে গেলে নফর সেদিন কিছুই খাবে না। ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে রাত্তিরের ক্ষিদেটা নষ্ট করবে না নফর।

নফর বলবে—এত মাছ দিলে কেন আজ আবার? আজ তো ও-বেলা মাংস খাবো।

এ-বাড়ির ইতিহাসে এরকম ঘটনা নতুনও নয়, আবার নিত্য-নৈমিত্তিকও নয়। মাসের আর ক'টা দিন নফরের খোঁজ রাখবার প্রয়োজন মনে করে না কেউ, কিন্তু সেদিন নফরই সব। নফরই বড়বাবুর ডান হাত সেদিন। কথায় কথায় নানা কারণে বড়বাবু নফরকে ডাকবেন। খাস-বরদার পাঁচুকে সামনে পেয়েই ধমকাবেন।

বলবেন—নফর কোথায়? নফরকে ডাকতে বলেছিলুন না তোকে ?

—হুজুর, ডেকেছিলুম তো, আপনি তো মাস্টারবাবুর কাছে পাঠালেন।

—পাঠালুম তো সারাদিনের মতো পাঠালুম? এলো কিনা দেখবি তো ?

আবার দৌড়তে হয় বার-বাড়িতে। নফর এল কিনা খোঁজ নিতে হয়। নফরের ঘরখানায় কেউ তখন নেই। বিছানাটা গুরুদেবের তক্তপোশের তলায় গুটোনো পড়ে আছে। কেউ নেই সেখানে। গুলমোহর আলি সেদিন আবার পোশাক পরে তৈরি হয়ে নেবে। আবদুল আবার অনেকদিন পরে গাড়ি জোড়ে। ঘোড়াটা আবার গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে পা ঠোকে। গুলমোহর আলি তখনও গাড়ির মাথায় ছিপটি নিয়ে বসে আছে। বড়বাবু এসে উঠলেই হাঁকিয়ে দেবে।

কিন্তু তখনও নফরের দেখা নেই।

খাস-বরদার পাঁচু একবার খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে উঁকি মারে।

—কী রে? কাকে খুঁজছিস ?

—নফরকে দেখেছেন হুজুর ?

মুহুরিবাবু বলে—নফর তো পাঁচটা টাকা নিয়ে দৌড়ল ধোপার বাড়ি। তারপর তো দেখলাম বাবু সেজে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে গেল—

তারপর দরোয়ানদের ঘরে।

—ভূষণ সিং, নফর-বাবুকো দেখা ?

রান্নাবাড়িতে গিয়েও খোঁজ নেয় পাঁচু।

—হ্যাঁ গো শশীর মা, নফর খেয়েছে আজ? বামুনদিকে জিজ্ঞেস করো তো ?

নফর আজকে কাজে ফাঁকি দেবে না। আজকেই তার আসল কাজ। অ্যাটর্নীবাবুকে কম্বলিটোলা থেকে একেবারে নিয়ে এসেছে। জগত্তারণবাবু এসে গেলেন ঠিক সময়েই।

মা-মণির ঘরের সামনে গিয়ে বড়বাবু ডাকলেন—মা!

বড়বাবুর আঙুলে অনেকগুলো আঙটি ঝকঝক করে উঠলো। কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা লুটোচ্ছিল। খাস-বরদার এসে তুলে ধরলে উঁচু করে। বড়বাবু হাতের ছড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মা-মণির ঘরের সামনে।

সিন্ধুকে ডেকে খাস-বরদার বললে—ওরে মা-মণিকে ডেকে দে তো একবার—

মা-মণি বেরিয়ে আসতেই বড়বাবু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

—মা, আসি তা হলে ?

মা-মণি বললেন—আবার যাচ্ছো খোকা? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, এখনও শরীরটা সারেনি যে তোমার—

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো মা—

মা-মণি সিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে, পেস্তার শরবতটা দিয়েছিলি খোকাকে ?

বড়বাবু বললেন—খেয়েছি মা, সব খেয়েছি—

—শরবতে মিষ্টি হয়েছিল ?

এর পর বৌ-মণি। ঘোমটা দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে

ছিল দরজার আড়ালে। বড়বাবু ঘরে আসতেই বৌ-মণি বললে—এই শরীর খারাপ নিয়ে নাই-বা গেলে।

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো—

—এবার যেন আর তিন-চারদিন থেকোনা, তোমার শরীরের অবস্থা তো ভালো নয়!

এর পর মা-মণি জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠাবেন।

জগত্তারণবাবু সিঁড়ির নিচেয় এসে দাঁড়ালেই ওপর থেকে মা-মণির বকল্‌মায় সিন্ধু বলবে—দেখুন, আপনি রইলেন সঙ্গে, দেখবেন খোকা যেন অত্যাচার না করে বেশি—

জগত্তারণবাবু যথারীতি বলবেন—সে কি কথা, আমি থাকতে বড়বাবুর কিছু অত্যাচার হবে না, নেহাত বড়বাবু আবদার ধরেছে তাই—নইলে…

তারপর খাজাঞ্চিবাবুর কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বড়বাবু গাড়িতে উঠবেন। তার পর উঠবেন জগত্তারণবাবু, তারপর উঠবে নফর। গাড়ি ছেড়ে দেবে গুলমোহর আলি। আর ভূষণ সিং ঘড়ঘড় শব্দ করে গেট খুলে দেবে।

এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার করে বড়বাবুর শরীর খারাপ হয়। প্রত্যেক মাসে একবার করে ভোরবেলা নফরের ডাক পড়ে। এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার খাজাঞ্চিখানা থেকে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। তারপর তিন রাত্রি কাটবার পর আবার যখন ফিরে আসেন বড়বাবু—তখন পকেটের টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। দেনাও হয়ে গেছে প্রচুর।

বড়বাবু বাড়ি এসেই সাষ্টাঙ্গে মা-মণির সামনে পড়ে যান।

বলেন—মা, তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মা—

মা-মণি বলেন—ওঠো ওঠো বাবা, এ ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে—

—না, উঠবো না, তুমি আগে বলো অধম সন্তানকে ক্ষমা করেছ—

মা-মণি এক ধমক দেন খাস-বরদার পাঁচুকে। বলেন—হাঁ করে দেখছিস কী, ধরে তোল্, ধরে তুলে নিয়ে যা ঘরে—

প্রত্যেকবারই জগত্তারণবাবু আসেন। বলেন—মা, আসতে কি চায় বড়বাবু, কী যে আটা, অনেক বলে-কয়ে তবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি—

আবার নফরের সেই দশা। আবার নফর গিয়ে ঢোকে তার কোঠরে। সেই তক্তপোশটার তলা থেকে আবার গুটোনো বিছানাটা টেনে নিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। আবার কোথায় তলিয়ে যায় নফর। কেউ খবর রাখে না তার।

কিন্তু এবার এক কাণ্ড ঘটলো।

বিকেল নাগাদ বড়বাবুর গাড়ি বেরিয়ে গেল। তারপরই সব ভোঁ-ভাঁ! কারো আর কোনও কাজে মন দেবার কথা নয়। সব এলিয়ে পড়ে। অন্দরে বাইরে যেন একটা আল্‌সে-আল্‌সে ভাব। হরি-জমাদার থেকে শুরু করে ফুলমণি, সিন্ধু, খাজাঞ্চিবাবু, মুহুরিবাবু, শিশুর-মা সবাই যেন একটু ঢিলে দেয়। আর কী, বড়বাবু তো বাড়ি নেই! নফরকে নিয়ে যখন বেরিয়েছেন বড়বাবু তখন তিন-চারদিনের ধাক্কা তো বটেই।

কিন্তু এবার এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কাণ্ডটা ঘটলো বড় হঠাৎ।

রাত্রিবেলা বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ গুরুপুত্র এসে হাজির। কাশীর গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে মা-মণির গুরুপুত্তুর। ভূষণ গেটের পাশেই শুয়ে ছিল।

বললে—কৌন হ্যায়?

—আমি, আমি রে, দরজা খোল্!

গলা শুনেই ভূষণ সিং ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে।

—হুজুর, বড়বাবু নেই, বড়বাবু বাহার গিয়া।

দরজা খুলে গেল। ভূষণ সিং খবর দিলে ভেতরে। পয়মন্ত খেয়ে-দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছিল। সে গিয়ে খবর দিলে সিন্ধুমণিকে। সিন্ধুই ডেকে দিলে মা-মণিকে। মা-মণি তখনও শোননি। বললেন—রান্নাবাড়িতে খবর দে, ঠাকুরমশাই এসেছেন—

ঠাকুরমশাই এমনিতে খবর না দিয়ে আসেন না। মা-মণি উঠে থানটা বদলে নিলেন। সিন্দুক থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করলেন। প্রণাম করে দক্ষিণা দিতে হবে। সিঁড়িতে আলো নিভে গিয়েছিল। আবার চারদিকে আলো জ্বলে উঠলো। মা-মণি সিন্ধুকে বললেন—ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আয় ওপরে।

জলচৌকি পাতা ছিল। তার ওপর রেশমের আসন। আসনের ওপর পদ্মাসন করে বসলেন গুরুপুত্র। মা-মণি প্রণাম করলেন গলবস্ত্র হয়ে। তারপর পায়ের কাছে দক্ষিণাটা রাখলেন। গুরুপুত্র বললেন—বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি আমি—তাই অত দূর থেকে ছুটে এলাম আপনার কাছে—

—কী নিবেদন বলুন!

ঠাকুরমশাই বললেন—আমার বাবা দেহত্যাগ করেছেন সম্প্রতি—

মা-মণি স্তম্ভিত হলেন। বললেন—কবে? আমি তো খবর পাইনি?

—বড় শীঘ্র ঘটে গেল, তাই আর সংবাদ দিতে পারিনি আপনাকে। কিন্তু আমি নিজেই যখন আসবো তখন পত্রে সংবাদ দেবার দরকার মনে করিনি—

মা-মণি বললেন—এই বিপদের সময় আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন?

—সেই বলতেই এসেছি। আপনার মনে আছে, কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিলেন আপনাকে নিয়ে, আপনার দারুণ অসুখ হয়েছিল সেখানে—প্রায় একবছর শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন আপনি?

সে অনেকদিন আগের কথা। ওই মঙ্গলাও গিয়েছিল সঙ্গে। তখন সিন্ধুমণি ছিল না। কুঞ্জবালা গিয়েছিল সঙ্গে। দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর বাড়ি কেনা হয়েছিল। সাজানো হয়েছিল বাড়ি। সারাদিন গঙ্গার হাওয়া সেবন। আর সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ-দর্শন। কিন্তু হঠাৎ মা-মণি অসুখে পড়লেন। অসুখ মানে সে এক ভীষণ অসুখ। কর্তাবাবু মুশকিলে পড়লেন। বিদেশে কোথায় ডাক্তার, কোথায় কবিরাজ কিছুই জানা নেই। গুরুদেব কাশীবাসী। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতায় টেলিগ্রাম চলে গেল। খাজাঞ্চিবাবু টাকা নিয়ে নিজে চলে গেলেন।

সে একদিন গেছে বটে।

গুরুপুত্র বললেন—বাবার কাছে শুনেছি, আপনার তখন জ্ঞান ছিল না—

—আমি যে বেঁচে উঠেছিলাম, সে তো কেবল গুরুদেবেরই আশীর্বাদে—

গুরুপুত্র বললেন—মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে আমার বাবা সমস্ত ঘটনা আমায় বলে গেছেন, আপনি যে জীবন ফিরে পেয়েছেন সে বাবার আশীর্বাদে নয় মা, রাহু আপনার মারক গ্রহ, নেহাত বৃহস্পতির প্রভাবে সেদিন আপনার প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু কেতু-মঙ্গলের প্রভাবে আপনার চরম ক্ষতি চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে—। সেই কারণেই বাবা সেই সময়ে আপনাদের বিশ্বনাথের চরণে নিয়ে যেতে অত পীড়াপীড়ি করেছিলেন—

—সে তো আমি জানি।

—না, সব আপনি জানেন না, কর্তাবাবু সব আপনাকে জানান্‌নি, জানিয়েছিলেন বাবাকে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। কর্তাবাবু বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পরে আপনাকে জানাতে, আজ বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে—

ঠাকুরমশাই সিন্ধুমণির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—আগে আপনার দাসীকে চলে যেতে বলুন এখান থেকে—

রাত তখন এগারোটাও হতে পারে, বারোটাও হতে পারে। অন্যদিন এ-সময়ে সব চুপচাপ হয়ে যায়।

সিন্ধুমণি কথাটা শুনেই আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মা-মণি না ঘুমোলে সিন্ধুও ঘুমোতে যেতে পারে না। সিঁড়ির পাশে খাঁচার টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্‌টে উঠলো। বেচারীর চোখে আলো লেগে ঘুম আসছে না। ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথা হতে লাগলো। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। বড়বাবুও নেই। থাকলে একটু রাত হয়। তা সে খাস-বরদারের কাজ। ভেতর-বাড়িতে তা নিয়ে কেউ জেগে থাকে না।

শিশুর-মা দাওয়ার ওপরেই ঘুমোচ্ছিল। অঘোরে। রাত বোধহয় তখন অনেক হয়েছে। রান্নাবাড়ির চারটে উনুনই নিভে গিয়েছিল। একটায় তখন আগুন দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে।

—ও শিশুর-মা, শিশুর-মা!

সারাদিন খেটেখুটে মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছে শিশুর-মা। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। মেঝেতে আঁচলটা পেতে সেই যে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো কাৎ হয়ে গেছে।
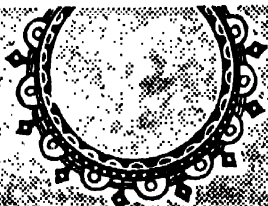
উনুন-টুনুন সবই তো নিভে গিয়েছিল। গুরুপুত্রের আসার খবর পেয়ে আবার উনুনে কয়লা দিতে হয়েছে। শিশুর-মা আঁচ দিয়ে ডাকতে গিয়েছিল দু-দু'বার। ঠাকুরমশাই-এর জন্যে চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতে হবে, তারপর তিনি নিজে নাবিয়ে নেবেন। শিশুর-মা ফিরে এসে বললে—একটু দেরি হবে বামুনদি—

—ওরে, আর একবার যা না শিশুর-মা!

আবার গেছে। আবার সেই একই উত্তর। সিঁড়ির বাইরে বসে বসে সিন্ধু ঢুলছে। ভেতরে মা-মণির সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর গুরুপুত্র।

একটা বেড়াল বুঝি এঁটো-কাঁটার লোভে টিপি-টিপি পায়ে রান্নাবাড়ির ভেতরে ঢুকছিল, মঙ্গলা তাড়িয়ে দিলে।

—বেরো, বেরো, দূর হ—

সিন্ধুমণি হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এল।

—বামুনদি, মা-মণি ডাকছেন তোমায়।

আমাকে! মঙ্গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমাকে? কেন রে?

মঙ্গলাও অবাক হয়ে গেল। তার তো জীবনে কখনও ভেতর-বাড়িতে ডাক পড়েনি।

সেই-যে কতদিন আগে একদিন এ-বাড়িতে কাশীধামে যাবার সময় মা-মণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল অন্দর-মহলে, সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ। তারপরে কাশী থেকে এসে আর কখনও কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হয়নি। এই রান্নাঘরের মধ্যেই তার সূর্যোদয় হয়েছে, সূর্যাস্তও হয়েছে। বর্ষা গ্রীষ্ম শীত বসন্ত, ষড়ঋতুর সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে তার ঠিক নেই। কারোরই ঠিক নেই, সবাই এসে ঠিক সময়ে ভাত পায়, ডাল পায়, ঝোল পায়—তারপর যথাসময়ে চলেও যায়। এর বেশি কোনদিন তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। উত্তরও কেউ পায়নি।

আজকে এতদিন পরে তার উত্তর দেবার ডাক পড়লো বুঝি!

রান্নাবাড়ির বাইরে যেতে গিয়ে মঙ্গলার পা যেন বার বার বেধে যেতে লাগলো। অভ্যেস নেই এদিকে আসা। রাত্রে পথটা যেন আরো উঁচু-নিচু।

—আমাকে কেন ডাকছে রে সিন্ধু, জানিস্ কিছু তুই?

ভাগ্যের পথ বোধহয় এমনি কুটিল! মঙ্গলার ভাগ্য কবে কোন্ বিধাতাপুরুষ গড়েছিল কে জানে। কাশীধামে যাবার সময়ও ঠিক বুকটা এমনি দুরদুর করে কেঁপে উঠেছিল। সেদিনও রাত্রের একটা রেলে চড়ে যেতে হয়েছিল তাদের। আগের গাড়িতে মোট-লটবহরের সঙ্গে গিয়েছিল সরকার-মশাই আর মেয়েদের গাড়িতে কুঞ্জবালা আর মঙ্গলা। কুঞ্জবালা পান কিনে খেয়েছিল ইস্টিশান থেকে। মঙ্গলাকেও একটা দিতে চেয়েছিল।

—পান খাস না তুই মঙ্গলা?

মঙ্গলা বলেছিল—সোয়ামী যাবার পর আর পান খাইনে দিদি।

তার ওপর ইস্টিশানের পান। কত লোকের ছোঁয়া-ন্যাপা। কে কোন্ জাতের লোক কে জানে! সেই ট্রেন কাশী পৌঁছোতেই পাণ্ডার লোক এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কর্তাবাবুর নতুন-কেনা বাড়িতে। কেমন ভয়-ভয় করতো মঙ্গলার। এ কোন্ দেশ, কত বড় গঙ্গা। কোথায় ছিল এক অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কেমন রেলগাড়ি চড়ে কত দূরে বাবা বিশ্বনাথের চরণে এসে এক দণ্ডে পৌঁছে গেল।

কুঞ্জবালা সেয়ানা ছিল খুব।

বলতো—লম্বা করে ঘোমটা দে মঙ্গলা, বেটা-ছেলে আসছে—

লম্বা ঘোমটাই ছিল মঙ্গলার। সেটা আরো লম্বা করে দিত। কর্তাবাবু আর মা-মণি যাবার পর সেই যে রান্নাঘরে ঢুকলো সে, আর বার হতে পারেনি সেখান থেকে। দিন-রাত রান্না করা আর দরকার-না-থাকলে রান্নাঘরের সামনে বসে থাকা। কুঞ্জবালাই ছিল সব। কুঞ্জবালাই রান্নাঘরে এসে খাবার নিয়ে যেত, পরিবেশন করতো। কর্তাবাবুর যে কেমন চেহারা তা পর্যন্ত কোনওদিন দেখেনি মঙ্গলা। কানেই শুনতো কিছু কিছু। কর্তাবাবু যেতেন বেড়াতে, সঙ্গে যেতেন মা-মণি। কুঞ্জবালাও এক-একদিন সঙ্গে যেত।

কিন্তু একদিন হঠাৎ অসুখে পড়লো মা-মণি।

তারপর ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ—কিছু আর বাকি রইল না। কলকাতার বাড়ি থেকে লোকজন গেল সব। দূর থেকে শুধু ওষুধের গন্ধ আর লোকজনের আসা-যাওয়ার শব্দ কানে আসতো। শেষকালে অসুখ বুঝি বিকারে দাঁড়ালো। তখন আজ-যায় কাল-যায় অবস্থা।

সেই সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো।

ঠাকুরমশাই বললেন—কাণ্ডটা সেই সময়েই ঘটলো—

মা-মণি তখন দিনের পর দিন অজ্ঞান অচৈতন্য। ডাক্তার কবিরাজ আসছে—

কুঞ্জবালা একদিন এসে বললে—মা-মণি আর বাঁচবে না রে, কবিরাজ মশাই বলে গেছে—

মা-মণি মারা গেলে কী হবে! চাকরিটা চলে যাবে! রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে কেবল সেই কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন। গঙ্গাও দেখা হতো না, বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও হতো না। কেবল রান্না আর রান্না। কোথা দিয়ে দিন কাটতো রাত কাটতো বোঝা যেত না। রাত্রি-ভোর গরম জল করতে হতো কোনও কোনও দিন, গরম জলের সেঁক দিতে হতো মা-মণিকে। কুঞ্জবালা বলতো বুকে পিঠে ব্যথায় নাকি ছটফট করতো মা-মণি।

একদিন বোধহয় দুপুরবেলাই হবে।

—কে ওখানে?

ভারি গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে ঘোমটাটা আরো টেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলা। দেখতে কিছুই পায়নি। কে কথাটা বললে, কার গলা তা-ও বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ওঁরা চলে গেলেই আড়ালে চলে যাবে।

আর একজন বুঝি কাকে জিজ্ঞেস করলে—আমি তো চিনিনে, ও কে গো?

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সমস্ত শরীরটা। তারপর মনে হয়েছিল যেন ভারি দু'মণ একটা পাথর বুক থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে হাজির। বললে —হ্যাঁ লা, কী করেছিস, সর্বনাশ বাধিয়ে বসেছিস?

—কেন?

—কর্তাবাবুর সামনে পড়ে গিয়েছিলিস্ একেবারে?

কর্তাবাবু! কর্তাবাবুর গলা তবে ওই রকম। গলাটাই শুধু শুনেছে, আর কিছু চোখেও পড়েনি, কানেও যায়নি।

মনে হলো এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে লাজ-লজ্জা সব যেন ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এমন সর্বনাশেও মানুষ পড়ে! কর্তাবাবুর দুপুরবেলা ওদিকে যাওয়ার কথা তো নয়। সাধারণত খেয়ে-দেয়ে তিনি দুপুরবেলা ঘুমোতেন একটু। সেই ঘুমের সময়টায় সমস্ত বাড়ি ঝিমঝিম করতো। গঙ্গার হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্টা দিতো জানলা-দরজায়। তখন কুঞ্জবালাও কাছে থাকতো না, কেউ-ই কাছে থাকতো না। সমস্ত একতলাটা খাঁ-খাঁ করতো। একটা হিন্দুস্থানী সকালে বিকেলে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যেত। তারপর সব অন্ধকার, সব ঝাপসা। একতলার সমস্ত আবহাওয়াটা একটা গুমোট গরমে যেন জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকতো চারপাশে। ভিজে কাপড় টাঙানো থাকতো গলিটাতে। সেই ভিজে কাপড় এতটুকু নড়তো না। এতটুকু হেলতো-দুলতো না। একটা টিকটিকি সারাদিন সারারাত মাথার ওপর দেয়াল থেকে দেয়ালে চরে বেড়াতো, নড়ে বেড়াতো—আর মাঝে মাঝে চুপ করে চেয়ে থাকতো নিচের দিকে কিছু। মঙ্গলার দিকে। সব কাজ শেষ করে মঙ্গলারও যেমন কোনও কাজ থাকতো না, টিকটিকিটারও বুঝি কাজ থাকতো না কিছু। দু'জনে দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বিকেল হতো, কলে জল আসতো, রান্না চাপাতো উনুনে। কর্তাবাবু ওপরে থাকতেন। তাঁর জুতোর আওয়াজ, কাশির আওয়াজ পাওয়া যেত, তামাকের ধোঁয়ার গন্ধও নাকে এসে লাগতো। কিন্তু আর চোখে কখনও পড়েননি তিনি।

বিকেলবেলা বেলফুলওলা আসতো। এসে হাঁকতো দরজার বাইরে—বেল-ফুলওয়ালা—

হাঁক শুনে পীরজাদাই গিয়ে কর্তাবাবুর জন্যে ফুলের বরাদ্দ নিয়ে আসতো। ফুলের বরাদ্দও যেমন ছিল, রাবড়ির বরাদ্দও তেমনি ছিল। আর ছিল সিদ্ধির বরাদ্দ। সিদ্ধি-বরফওয়ালা রোজ আসতো রাত দশটার সময়। সে-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকতো—বরোফ্—

আর তারপর ছিল গান। গানের কথা বোঝা যেত না। হিন্দুস্থানী মাগীরা কী যে গান গাইত, কোথায় বসে যে গাইত, তা-ও জানতো না মঙ্গলা। সুর করে দল বেঁধে গান তাদের। সেই সকালবেলাই তাদের গান শুরু হতো। কুঞ্জবালা বলতো—আটা পিষতে পিষতে ওরা গান গায়—

আর ছিল গঙ্গার দিকে যাত্রীর ভিড়। সকালে বিকেলে পেছনের গলি দিয়ে কত লোক যে যেত! ভোর-বেলাই আরম্ভ হতো। তখন রাত বেশ। রাত থাকতে-থাকতে গান গেয়ে-গেয়ে চলতো সব—অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যেত ভেতর থেকে। আর মাঝে মাঝে হাঁকতো—জয় বাবা বিশ্বনাথ—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

একদিন কুঞ্জবালাকে জিজ্ঞেস করেছিল—এতদিন কাশীতে এলুম, একদিন বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারবো না দিদি?

কুঞ্জবালা বলেছিল—কাশী তো পালিয়ে যাচ্ছে না তোর—যাবো একদিন তোকে নিয়ে—

প্রথম প্রথম কর্তাবাবু বেশ কাটাচ্ছিলেন। রোজ রোজ নৌকোয় বেড়াতেন।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কাশীতে এলাম, কাশীর সানাই শুনলাম না—

সানাই-এর ব্যবস্থা হয়েছিল ছু-একবার। তা সানাই কী রকম বেজেছিল তা টের পায়নি মঙ্গলা। শুধু খাবার-টাবার তৈরি করে দিতে হয়েছিল মঙ্গলাকে।

কুঞ্জবালা বলেছিল—নৌকোর ওপর সানাই বাজবে, সে আর কী শুনবি তুই?

কোথা থেকে সেদিন কত কে এল গেল তা জানা যায়নি। কর্তাবাবু আর মা-মণি। মা-মণিও গিয়েছিল। কুঞ্জবালা সারাদিন ধরে পান সেজে সেজে ডিবে ভর্তি করেছিল। সাত সের ময়দার লুচি ভেজেছিল একলা মঙ্গলা। লুচি আর আলুভাজা। সঙ্গে রাবড়ি আছে, মালাই আছে। আরো কী কী সব মিষ্টি খাবার দোকান থেকে ফরমাশ দিয়ে এনেছিল। সবাই যখন ফিরে এসেছিল তখন রাত অনেক। একলা বাড়িতে থাকতে ভয় করেছিল খুব।

শিশুর-মা তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—তা একবছর ছিলে কাশীতে বামুনদি, আর বাবা বিশ্বনাথের চরণ-দর্শন হলো না— ?

ওদিকে লাউঘণ্ট রান্না হচ্ছে একটা উনুনে, এদিকে একটাতে ডাল আর একটাতে বড়বাবুর মাছের ঝাল।

—বড়বাবু আর ছুটো আলুভাজা চাইছে বামুনদি—

—চাল-কলের ম্যানেজারবাবু আজ খাবেনা শিশুর-মা, পেটের অসুখ হয়েছে।

—কী গো, ভাত হয়েছে? সকাল-সকাল খাবে আজকে বৌ-মণি!

একটা তাল সামলাতে সামলাতে আরো দশটা তাল এসে ঘাড়ে চেপে বসে। একটা উনুন সামলাতে গিয়ে আর একটা উনুনের রান্না পুড়ে যায়।

শিশুর-মা'র এক-একটা ফরমাশ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক রকম!

—কালকে বড্ড ঝাল হয়েছিল ডালে, আজকে লঙ্কা দিয়োনা বামুনদি।

ভেতর-বাড়ি থেকে আবার হঠাৎ তখুনি ফরমাশ হয়—ডালে কাল ঝাল হয়নি কেন গো, বামুনদি কি লঙ্কা দিতে ভুলে গেছে?

—ভাতে এত কাঁকর কেন থাকে গো?

—কে তরকারি কুটেছে শুনি আজ, আলুর খোসা ছাড়ায়নি!

আজ কুড়ি বছর আগের সে-সব দিনের কথা ভাবতে যেন কেমন লাগে! সেই নৌকোয় চড়ে বেড়াতে গেল বাবুরা। কর্তাবাবু গেলেন, মা-মণি গেলেন। সানাই-ওয়ালারা

গেল। মা-মণি গাড়িতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। মস্তবড় দোতলা-ঘর-ওয়ালা নৌকো। কুঞ্জবালা সঙ্গে ছিল। কুঞ্জবালার সঙ্গে পানের ডিবে ছিল। মা-মণি পান খেতে লাগলেন। নৌকো ছাড়া হলো। সেই মাঝগঙ্গায় নৌকো ভাসতে-ভাসতে চললো। সানাই শুরু হয়েছে নৌকোর মাথায়। কর্তাবাবু নৌকোর মাথায় বসে তামাক খেতে খেতে সানাই শুনছেন। নৌকোও ভেসে চলেছে। স্রোতের মুখে নৌকো ভেসে চলেছে। একটার পর একটা রাগ বাজানো হচ্ছে। বেহাগটা একবার শুনলেন, পুরিয়া ছু'বার, কিন্তু দরবারী কানাড়াটা বার বার—

কর্তাবাবু বললেন—বাজাও বাজাও—ফিন্ বাজাও—

হুজুরের ভালো লেগেছে। সঙ্গে লুচি আছে, রাবড়ি আছে, মিষ্টি খাবার আছে। সবাই খেলে, গেয়ে-দেয়ে আবার বাজনা চলতে লাগলো। মা-মণি অত বাজনা-টাজনা সুর-ফুর বোঝেন না।

বললেন—বেশ বাজাচ্ছে না রে কুঞ্জবালা—

কুঞ্জবালা বললে—খুব ভালো লাগছে মা-মণি আমার—

মা-মণি বললেন—তিনশো টাকা নগদ নিয়েছে, ভালো বাজাবে না? কর্তাবাবু যাচাই করে নিয়েছে যে—

রাত বোধ হয় তখন ন'টা। বেশ ছিল। কর্তাবাবুও বেশ খোস-মেজাজে বাজনা শুনছিলেন—হঠাৎ মেঘ করে এলো দক্ষিণ দিকে। দেখতে দেখতে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো

আকাশে। দু'ফোঁটা জল পড়লো কর্তাবাবুর গায়ে। তখন হুঁশ হলো। চমকে উঠলেন তিনি। উঠে পড়লেন। সানাইও থামলো। ছাতি-টাতি কিছু নেই। বললেন—ঘাটে ভিড়োও নৌকো—

নৌকো ঘাটের দিকে ভিড়তে লাগলো। কিন্তু তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

অসময়ের বৃষ্টি, কিন্তু তা বলে একটুতে থামলো না। একেবারে তুমুল জোরে নামলো। নৌকো তখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ছাত ফুটো ছিল নৌকোর। ফুটো দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মা-মণি ভয় পেয়ে গেলেন। নৌকো না উল্টে যায়। শেষ পর্যন্ত নৌকো অবশ্য উল্টোয়নি। কিন্তু সে-বৃষ্টি আর থামলো না সে রাতে। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে অবস্থায় কর্তাবাবু আর মা-মণি যখন বাড়ি এলেন তখন অনেক রাত।

সদর দরজায় কড়াকড় কড়া নড়ে উঠলো।

কর্তাবাবু বললেন—ভেতরে কে আছে রে?

সরকারবাবু বললে—মঙ্গলা—

—মঙ্গলা কে?

—হুজুর, আমাদের রান্নার কাজের লোক।

দরজাটা খুলে দিয়েই মঙ্গলা আড়ালে সরে গিয়েছিল। কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে হারিকেন নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কিন্তু মা-মণির শরীরে তখনই কাঁপন ধরেছে। সেই অত রাত্রে আবার জল গরম হয়, তেল গরম হয়। পায়ে গরম তেল সেঁক দিয়ে মা-মণি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পরদিন জ্বর এলো। প্রবল জ্বর। জ্বরের ঝোঁকে মা-মণি প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

গুরুদেব সকালবেলাই এলেন। বললেন—ডাক্তার আছে এখানে, কিন্তু কবিরাজ ডাকাই ভালো, আমি ভালো কবিরাজ পাঠিয়ে দেব—

কুড়ি বছর আগের ঘটনা। তখনও ওই দত্তক গ্রহণ হয়নি। মা-মণির সব মনে আছে। মনে আছে তিনি মাসের পর মাস শুয়ে থাকতেন সেই বিদেশে। সান্নিপাতিক ব্যাধি। নড়াচড়া নিষেধ। খালি কলকাতা থেকে লোক যায় আর আসে। কর্তাবাবু কাশী ছেড়ে নড়তে পারেন না।

গুরুপুত্র বললেন—আপনি তখন সেই রোগশয্যায়, সেই অবস্থাতেই ওই ঘটনাটা ঘটলো—

—কোন্ ঘটনা?

গুরুপুত্র বললেন—বলছি,—এ-সব কথা বাবা মৃত্যুর আগে সব আমাকে বলে গেছেন—

নেহাত দৈব। দৈব-দুর্ঘটনা বলা যায়। প্রথম প্রথম কর্তাবাবু মা-মণির বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। শেষে রোগ পুরোনো হলো। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় কাটতো। ক্রমে ক্রমে কর্তাবাবু আবার নিজের বসবার ঘরে এসে বসতে শুরু করলেন। ওপর থেকে সামনের গঙ্গা দেখা যায়। সেই গঙ্গার ওপর নৌকোগুলো ভেসে যায় দক্ষিণ দিকে। মাঝে মাঝে গুণ টানতে টানতে যায় রামনগরের কোল ঘেঁষে। তারপর কলকাতার চিঠি দু'একটা পড়তে লাগলেন। এতদিন হাত দেননি কোনও কাজে। এবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি এল। একদিন বললেন—পীরজাদা, আজকে একটু সিদ্ধি বাটতে বল ওদের—

বহুদিন ও-সব চলেনি। কলকাতা ছাড়ার পর বরাবর মা-মণিই সামলে-সামলে নিয়ে চলেছেন। এখন যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো।

একদিন বললেন—সিদ্ধিটা বড় পাতলা করে ফেলে কেন—রাবড়ি কম দিয়ে একটু মসলা বেশি দিতে পারে না—

বেশি মসলাই দেওয়া হলো। মা-মণি তখনও অচৈতন্য।

বাবা বিশ্বনাথের মাথায় তখন গুণে গুণে বিল্বপত্র চড়ানো হচ্ছে। প্রথমে কম-কম। পাণ্ডাঠাকুর রোজ এসে প্রণামী নিয়ে যায়। তারপর একশো আটে উঠলো। তারপরে দু'শো ষোল। হোম চললো চব্বিশ প্রহর ধরে। বারোজন পাণ্ডাঠাকুর হোমের তদারক করতে লাগলো। ব্রাহ্মণ-ভোজন হলো তিনশো আটচল্লিশ জনের।

কর্তাবাবু বললেন—এবার সিদ্ধিতে নির্ঘাৎ ভেজাল মেশাচ্ছে কেউ, সে 'তার' নেই কেন রে?

রান্নায় ভুল ধরেন। বলেন—কালিয়াতে গরম-মসলা দেয়নি কেন রে? কে রেঁধেছে?

কুঞ্জবালা খাওয়ার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটু কম দিয়েছে হয়তো।

কর্তাবাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—এ রান্না খাওয়া যায় না—

হাত ধুতে ধুতে বললেন—রান্না করে কে আজকাল?

—মঙ্গলা।

কর্তাবাবুর বরাবরের অভ্যেস খাওয়ার পরে একটু শুয়ে ঘুমোনো। পান চিবুতে চিবুতে তামাক খেতে খেতে একটু

ঘুমোতেন। তখন পাখা ঘুরবে মাথার ওপর। কাশীর বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক হয়নি। পাখা হাতে নিয়ে কর্তাবাবুর খাস-বরদার পীরজাদা পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতো। তারপর ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে তামাক চাই। তখন কবিরাজ মশাই এলে ভেতরে আসতেন।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন ?

কবিরাজ বললেন—সান্নিপাতিক ব্যাধি, একটু সময় নেবে, সমস্ত বুকটায় কফ বাসা বেঁধেছে—

একদিন দুপুরবেলা ঘুম থেকে কর্তাবাবু উঠলেন। বললেন—আগে শরবতটা দে—

তামাকও তৈরি ছিল, শরবতও তৈরি ছিল। খাস-বরদার শরবত দিলে।

শরবত খেয়ে বললেন—তুই এখন যা—

খাস-বরদার চলে গেল। খাস-বরদার এমন ছুটি কোনদিন পায় না। কিছু কাজ না থাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কর্তাবাবু নিচে নামলেন। খাস-বরদারও পেছন পেছন এলো। আড়ালে আড়ালে পেছনে আসতে লাগলো। মাঝ-দুপুর, বাইরে খাঁ খাঁ করছে রোদ। সারা কাশী শহরটা বুঝি ঝিমোচ্ছে। গঙ্গার জলে রোদ লেগে পিছলে যাচ্ছে বার বার। কিন্তু ভেতরটা ঠাণ্ডা। মোটা মোটা দেয়াল। স্যাঁতসেঁতে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ভ্যাপসা ভাব।

মা-মণিকে বেদানার রস খাইয়ে পাশে কুঞ্জবালাও একটু ঝিমিয়ে পড়েছে তখন।

কলঘরের ভেতরে ঢুকে মাথাটায় বেশ ভালো করে জল দিলেন। ঠাণ্ডা হলো মাথাটা। কেন যে এরকম হলো কে জানে। ঠাণ্ডা জল চাইলে পীরজাদা এনে দিত হাতের কাছে। সিদ্ধিটায় বোধহয় বেশি মশলা দেওয়া হয়েছিল। উঠে কলতলা থেকে বেরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন রান্নাঘরের সামনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলটা বিছিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। শুয়ে আছে তো শুয়েই থাক্। অন্যদিন হলে এমন ঘটনা দেখেও দেখতেন না। পুতুলমালার কথা মনে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো পায়ের গোছটা। দু'পায়ের ফরসা সুপুষ্ট গোছ। নেশাটা বোধহয় একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিল।

অভ্যাসমতো বলে ফেললেন—কে ?

পীরজাদা সামনে এগিয়ে এল। বললে—হুজুর, ধরবো আপনাকে ?

কর্তাবাবু ধমকে উঠলেন। বললেন—ও কে ?

থতমত খেয়ে পীরজাদা বললে—হুজুর, মঙ্গলা।

সেই চেঁচামেচিতেই ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে মঙ্গলার। তাড়াতাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে গিয়ে এখানকার কাপড় ওখানে সরে গেল, ওখানকার কাপড় এখানে সরে এল। সে এক লজ্জাকর ব্যাপার! কাপড় ঠিক করে উঠে রান্না ঘরের ভেতর ঢুকে দুইহাতে বুকটা চেপে ধরলো। বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা। তারপর অনেক জল অনেক জল গড়িয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সময়ের দাগ কালের নিয়মে মুছে গেছে, আবার অনেক দাগ নতুন করেও লেগেছে সময়ের বুকে। সব মনে নেই, সব মনে ছিলও না। প্রায় একটা বছর যেন ঘুর্ণি-ঝড়ের মতো সমস্ত ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। গিয়েছিলেন এক মাসের জন্যে, কিন্তু হয়ে গেল এক বছর। এক বছর পরে ফিরে এলো সবাই। এসে দত্তক নেওয়া হলো। সেই দত্তক পুত্রের বিয়েও দেওয়া হলো। কিন্তু মঙ্গলা সেই যে এসেছিল কাশী থেকে আর যায়নি। কুঞ্জবালা একদিন মারা গেল। কুঞ্জবালার বুড়ি-মা-ই রাঁধতো। মেয়ে মারা যাবার পর বুড়ি আর থাকলো না। মঙ্গলা রান্নাঘরে ঢুকলো সেই থেকে।

যে দেখলে সে-ই বললে—এ কী গো, কী চেহারা হয়েছে তোর মঙ্গলা ?

জগত্তারণবাবু বললেন—কেমন কাটালেন কর্তাবাবু!

দুলালহরিবাবু বললেন—আপনি চলে গিয়েছিলেন, একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছিলুম আমরা কর্তাবাবু—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—দুলো মল্লিক আর গণ্ডগোল বাঁধায়নি তো ?

জগত্তারণবাবু আর দুলালহরিবাবু দুজনে পালা করে পাহারা দিয়েছিল পুতুলমালার বাড়িতে। পুরুষ মাছিটি পর্যন্ত ঢুকতে পেত না।

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—খাওয়া-দাওয়ার তেমন অসুবিধে হয়নি তো সেখানে ?

দুলালহরিবাবু জিজ্ঞেস করলে—রান্নার তো নতুন লোক নিয়ে গিয়েছিলেন—

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ—

খাস-বরদারকে জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কর্তাবাবু কী করতো রে সেখানে ? কী করে কাটাতো তোর কর্তাবাবু ?

পীরজাদা বললে—আজ্ঞে, সিদ্ধির শরবত খেতেন খুব—পেস্তা বাদাম দিয়ে তৈরি করে দিতুম—

—খুব খেতেন, না ? রোজ ক' গেলাস ?

—কোনও কোনও দিন তিন-চার গেলাসও হতো ?

—তাহলে তুইও বেটা তো খুব খেয়েছিস !

পীরজাদা জিভ কাটলো—না হুজুর, কী যে বলেন আপনারা !

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলে—শুধুই সিদ্ধি ? আর ইয়ে টিয়ে—

খাস-বরদার বুঝতে পারলে ইঙ্গিতটা। তবু বললে—ইয়ে-টিয়ে মানে ?

দুলালহরিবাবু বললে—তুই বেটা জাঁহাবাজ আছিস ! কর্তাবাবু সেই মানুষ কিনা, একটা বছর একেবারে নিরম্বু কাটিয়েছে বলতে চাস্ ? গিন্নী তো অসুখে পড়ে—

খাস-বরদারও তেমনি ছিল কর্তাবাবুর। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বার করা যেত না। ঘুষের পয়সা নিত। কিন্তু ভেতরের কথা কিছু বলতো না। একটু একটু বলতো শুধু।

একদিন মহা বিপদ। মা-মণির সেদিন শ্বাস ওঠবার অবস্থা। বাড়িময় অস্থিরতা। কর্তাবাবুর দিবানিদ্রা হলো না। তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বার দুই শরবত খেলেন। তাতেও তেষ্টা গেল না। বললেন—আরো এক গেলাস বানা—

ডাক্তার চৌধুরী দেখছিলেন তখন। কবিরাজী ছেড়ে অ্যালোপ্যাথি হচ্ছে তখন। বাড়ি তখন হাসপাতাল হয়ে গেছে। ওষুধে ডাক্তারে দিনরাত সরগরম। হঠাৎ অসুখটার বাড়াবাড়িতে ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে গেলেন। সামান্য বৃষ্টিতে ভিজে এই এত কাণ্ড হবে ভাবতে পারা যায়নি। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। ডাক্তার চৌধুরী বললেন—এখন ভালো বুঝছিনা, রোগী দুর্বল হয়ে পড়েছেন, রক্ত দিতে হবে—

—কার রক্ত ?

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—বেশ সুস্থ কোনও লোকের রক্ত চাই—

আর কে আছে ? কার রক্ত হলে চলবে ? সেই অল্প সময়ের মধ্যে কাকেই বা আর জোগাড় করা যায়, স্বজাতি শুধু হলেই চলবে না। কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু আমার গুরুদেবের অনুমতি নিতে হবে এ-সম্বন্ধে—

গুরুদেব এলেন। বললেন—আমার যজমানদের মধ্যে কারো সন্ধান করতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—আমার স্ত্রী ধর্মশীলা, ডাক্তারবাবু, যার-তার রক্তে তাঁর রক্ত অপবিত্র হতে পারে,—

গুরুদেব বললেন—আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে আসছি—

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কিন্তু যা কিছু সব আজ রাত্রেই করে ফেলতে হবে, রোগীর অবস্থা বিশেষ খারাপ—

গুরুদেব বাইরে বেরিয়েছেন। ঘরের বাইরে। অন্ধকারে তেলের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছিল মাথার ওপর। সেই আলোতে পথ দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চেহারাটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। ময়লা একটা শাড়ি পরে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন—কে তুমি ?

কুঞ্জবালা কাছেই গরম জল নিয়ে ওপরে যাচ্ছিল। সে বললে—ও মঙ্গলা—

গুরুদেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেই সিঁড়ির দিকেই উঠে গেলেন আবার।

তারপর কর্তাবাবুকে গিয়ে কানে কানে বললেন—এক-জনকে পেয়েছি, ডাক্তারবাবুকে একবার দেখাতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—কে ?

ডাক্তার চৌধুরী সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি গেলেন। শুধু রক্ত দেওয়া নয়। সেই রাত্রে অনেক ক্রিয়াকর্ম অনেক অনুষ্ঠান ঘটে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মা-মণি তখন বিছানায় অজ্ঞান অচৈতন্য। অনেক আর্তনাদ, অনেক আশঙ্কা, অনেক অশান্তির সমাধি ঘটে গেল সেই রাত্রেই সেই কাশীর পুরোনো বাড়িটার চার দেয়ালের মধ্যে। কেউ জানতে পারলো না মা-মণির জীবনদানের জন্যে কার রক্তের কী সংমিশ্রণ ঘটে গেল।

মা-মণি বললেন—তার পর ?

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এখন নিথর নিস্তব্ধতা। খোকাও নেই, সে গেছে বাইরে। জগত্তারণবাবু সঙ্গে গেছে, নফরও সঙ্গে আছে। সে থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে আলো জ্বলে। খাস-বরদার পাঁচুও জেগে থাকে। এ-মহলে ও-মহলের কোনও শব্দ কানে আসার কথা নয়। তবু মা-মণির ঘুম আসে রাত্রে। রাত্রে শিয়রের জানালাটা খুলে দিলে খোকার ঘরটায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। তারপর জগত্তারণবাবু এক সময়ে চলে যায়, খাস-বরদার পাঁচু দরজা বন্ধ করে দেয়, আর তারপরে একসময়ে আলোও নিভে যায় খোকার ঘরের।

সকালবেলা বৌ-মণির ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন—বৌমা ?

বৌ-মণি এসে দাঁড়ায়। বলে—আমায় ডাকছিলেন মা !

—কাল খোকা ঘরে এসেছিল ?

এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বৌ-মণির লজ্জা হয়। বলে—উনি তো আসেন নি—

মা-মণি বলেন—কিন্তু ঘরের আলো তো সকাল-সকাল নিভে গিয়েছিল ?

খাস-বরদার পাঁচুকে ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন—কাল খোকা ঘুমোতে আসেনি কেন ভেতরে ?

পাঁচু বলে—আমি বলেছিলুম বড়বাবুকে ভেতরে আসতে।

মা-মণি বলেন—তা তুই কেন ভেতরে নিয়ে এলি না ডেকে ?

পাঁচু বললে—বড়বাবু শুয়ে পড়লেন ফরাসের ওপর, তাই মশারি খাটিয়ে দিলুম আমি ওখানেই—

মা-মণি বললেন—আজ ভেতরে ডেকে আনবি, বুঝলি ? না হলে তুই আছিস্ কী করতে ?

তারপর বৌ-মণিকে বলেন—বৌমা, তুমি একটু শক্ত হতে পারো না ?

বৌ-মণি মাথা নিচু করে থাকেন। শাশুড়ীর সামনে কোনও কথা বলতে পারেন না মাথা তুলে।

বৌ-মণির সমস্ত রূপ সমস্ত গুণ যেন এ-বাড়িতে এসে দিন দিন জৌলুষহীন হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন রূপসী বউ, বাইরের নেশা দু'দিনেই কেটে যাবে। হোক বংশের নেশা। তবু তো খোকার সঙ্গে এ-বংশের রক্তের সম্পর্ক নেই। কোন্ গ্রামের কোন্ এক অখ্যাত বংশের ছেলে। মা-মণি কাশী থেকে ফিরেই খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশ ভালো সৎ বংশ হলেই চলবে। এ-বংশের রক্তের দোষ যার শরীরের ত্রিসীমানায় নেই। কর্তাবাবু তখন আবার জগত্তারণবাবুর সঙ্গে বাগানবাড়ি যেতে শুরু করেছেন।

একদিন রাত্রেই সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন মা-মণি।

বললেন—তোমাকে দেখতে হবে একবার—

কর্তাবাবু বললেন—আমি আর দেখে কী করবো ?

মা-মণি বললেন—সৎ বংশ, বাপ-মা সৎ-চরিত্র—কোনও খুঁৎ নেই—

কর্তাবাবু বললেন—আর কিছুদিন সবুর করো না, এত তাড়াহুড়ো কেন ? আমি তো মরছি না এখুনি ?

মা-মণি বললেন—আমি তো মরতে পারি ?

কর্তাবাবু বললেন—মরার কথা উঠছে কেন এখন ?

—বাঁচা-মরার কথা কে বলতে পারে ? আমি তো মরতে বসেছিলুম সেদিন !

কর্তাবাবু বললেন—বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় যখন বেঁচেছ তখন আর কেন ও-কথা তুলছো ?

মা-মণি বললেন—তবু তোমায় দেখতেই হবে, আমি মনস্থির করে ফেলেছি—

কর্তাবাবু বললেন—কোথায় সে ?

মা-মণি বললেন—এখানেই রেখেছি, তোমাকে দেখাবো বলে—

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন—আর কিছুদিন থাক্ না, আমিই না-হয় দেখেশুনে একটা যা-হোক কিছু স্থির করবো !

সকালবেলা মা-মণি ছেলেটিকে আনালেন। ছোট ফুটফুটে ছেলে। বাপ নেই। অবস্থা খারাপ। বিধবা মায়ের তিনটি সন্তান। মা-মণি তাঁদের আনিয়েছেন

নিজের পৈতৃক গ্রাম থেকে। দূরের একটা সম্পর্কও আছে। তিনটি সন্তান নিয়েই এসেছে মা। পুরোহিত-মশাই দেখেছেন। জন্ম-পত্রিকা করে পরীক্ষাও করেছেন তিনি। কোনও আপত্তি নেই কারো। কিন্তু কর্তাবাবু যেন কেমন মন-মরা। সেদিন আর বাগানবাড়ি গেলেন না। জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু সবাই এসে নিচের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

পয়মন্তকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন জগত্তারণবাবু—হ্যাঁরে, কর্তাবাবুর কী হলো, শরীর খারাপ?

পয়মন্ত বললে—কর্তাবাবু মা-মণির ঘরে।

—মা-মণির ঘরে এতক্ষণ কেন রে বাবা? কিসের এত পরামর্শ?

ভেতরের ঝি-দাসী মহলেও যেন অনেক ফিস্‌ফাস্ চলতে লাগলো। সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ওই জগত্তারণবাবুও জানতে পারেননি কিছু। ওই দুলালহরিবাবুও জানতে পারেননি কিছু। অবশ্য দুলালহরিবাবু আর বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন পুতুলমালার বাড়ির সামনের পুকুরে তাঁর মৃতদেহও ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প। আসলে কেউ কিছু জানতে পারেনি। কারা ছেলেপুলে নিয়ে ক'দিন ধরে বাড়িতে রয়েছে। তাদের জন্যে আপ্যায়ন-আয়োজনও প্রচুর। সবাই সজাগ। তাদের জন্যে মিষ্টি আসছে। ছোট ছেলেটির জন্যে জামা আসছে, কাপড় আসছে।

কিন্তু বেলা যখন দেড় প্রহর, হঠাৎ কাশী থেকে লোক এল। ভূষণ সিং দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ময়লা কাপড়, সারা দিন রাত ট্রেনে চড়ে এসেছে। সঙ্গে একটা ছোট ছেলেও—

জগত্তারণবাবু বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। দুলালহরি-বাবুও বসেছিলেন হা-পিত্যেশ করে। ভেতর থেকে কোনও খবর আসছে না। কর্তাবাবুর তখন সময় নেই নিচে নামবার। মা-মণির সঙ্গে তখন কথাবার্তা হচ্ছে ঘরের ভেতর। সকাল থেকে খাওয়া নেই দাওয়া নেই। দু'জনেই ব্যস্ত।

রান্নাবাড়িতে শিশুর-মা খাবার নিয়ে বসে আছে।

—হ্যাঁগা বামুনদি, আজ কর্তাবাবু যে এখনও খাবার চায়নি?

মঙ্গলা নিজের মনেই রাঁধছিল।

শিশুর-মা আবার বললে—কর্তাবাবুতে আর মা-মণিতে কী যে কথা হচ্ছে ঘরের ভেতর, আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি কারো—

জগত্তারণবাবু বললেন—ভাগিয়ে দাও, ভাগিয়ে দাও ওকে ভূষণ—

দুলালহরিবাবুও বললেন—কোত্থেকে এসেছে ও?

জগত্তারণবাবু বললেন—কোত্থেকে এসেছে মরতে কে জানে—শুনেছে এখানে মধু আছে তাই এসেছে—

ভূষণ সিং বলেছে—না না, এখানে কিছু হবে না—ভাগো হিঁয়াসে—

নফরের সে-সব কথা মনে নেই। তখন সে ছোট। দেড়-বছর দু-বছরের ছোট্ট ছেলেটা। এখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে গঙ্গার ধারে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার ঘরে বসে ছিল অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে গেল। তখনও কোথায় যাবে ঠিক নেই, লোকটা ল্যাবেন্‌চুষ কিনে দিয়েছিল এক পয়সার। চেটে চেটে জিভ লাল করে ফেলেছে। তারপর ক্ষিদের জ্বালায় কখন ঘুমিয়েও পড়েছে।

কর্তাবাবু একবার দু'বার লোক পাঠিয়েছেন বাইরে। পয়মন্তকে বললেন—দেখে আয়তো, কাশী থেকে কেউ এসেছে কিনা—সঙ্গে একটা ছোট্ট ছেলে আছে দেখিস্—

পয়মন্ত ফিরে এসে বলেছিল—কই, কেউ তো আসেনি আজ্ঞে—

আরো দু'একবার পাঠিয়েছিলেন দেখতে। বেলা দুটো পর্যন্ত দেখা হলো, কেউ এল না।

তারপরে অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। কুল-পুরোহিত অনুষ্ঠান-ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। হোম হলো যজ্ঞ হলো। সামান্য করে শুধু আরম্ভটা হয়ে গেল। মা-মণি আর কর্তাবাবু গরদের জোড় পরে দত্তক সন্তান গ্রহণ করলেন। ছোট্ট ফুটফুটে চেহারার ছেলে। মাথা নেড়া করা হয়েছে। মা-মণি তাকে নিজের কোলে তুলে নিজের হাতে খাওয়ালেন অনুষ্ঠানের শেষে।

সবশেষে কর্তাবাবু কাজকর্ম সেরে বাইরে এসেছেন।

জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু এতক্ষণ অপেক্ষা কর-ছিলেন।

বললেন—ভালোই হলো কর্তাবাবু, সন্তান না হলে কি গৃহ মানায়! ভালোই করেছেন—

সন্তানের নতুন নাম রাখা হলো সুবর্ণনারায়ণ। কুল-পদবী সেন। সুবর্ণনারায়ণ সেন।

জগত্তারণবাবু বললেন—এবার একদিন পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয়ে যাক্ কর্তাবাবু, সেন-বংশের বংশধর হলো, ইতরজন কেন বাদ পড়ে যায়—

ঠিক হলো পরে একদিন অনুষ্ঠান হবে। সেদিন আত্মীয়-স্বজন অভ্যাগত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

সেইদিন সবাই নতুন সন্তানের মুখ দেখবে, আশীর্বাদ করবে।

কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে কর্তাবাবু বাইরে আসতেই কে যেন এগিয়ে এল সামনে। ভেবেছিলেন ভিখিরীদের কেউ হবে। কিন্তু লোকটা তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

কর্তাবাবু চেয়ে দেখলেন। বললেন—কে?

—আমি কাশী থেকে এসেছি, হুজুর।

কর্তাবাবু কথাটা শুনেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—এনেছ?

লোকটা বললে—এই দেখুন হুজুর—এই যে—নফর—
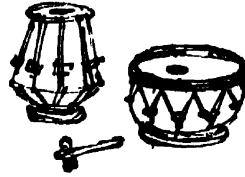
হাতে ধরে ছেলেটাকে সামনে এনে দাঁড় করালো।

—কী নাম রেখেছ এর?

—আজ্ঞে নফর বলে ডাকি আমরা।

নফর!

কর্তাবাবু বললেন—তা এত দেরি হলো কেন আসতে?

—আজ্ঞে এসেছিলাম সকালবেলা, তখন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই একটু ঘুরে এলাম।

নফর তখন কর্তাবাবুর কোটের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। কর্তাবাবু ছেলেটার গাল টিপে দিলেন। বললেন—চালাক হয়েছে খুব—না?

—আজ্ঞে, খুব চালাক, ওর জ্বালায় সবাই অস্থির, বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে ওর দেখবেন—

কর্তাবাবু বললেন—আচ্ছা তুমি যাও—

বলে খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে সরকারবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলেন। নিয়ে লোকটাকে দিলেন। বললেন—এই সব শোধ হয়ে গেল—

সরকারবাবু বললেন—কার নামে টাকাটা জমা করবো হুজুর?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে যে-ঠিকানায় মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠানো হতো, সেই দুর্গা-মন্দিরের নামে খরচা লিখে দিয়ো—

সরকার-মশাই টাকা পাঠিয়ে আসছেন বরাবর মন্দিরের ঠিকানায়। কর্তাবাবুর খরচে দুর্গা-মন্দিরের সংস্কার হচ্ছে। সেই খরচাতেই আরো পাঁচশো টাকা যোগ হয়ে গেল।

কর্তাবাবু বললেন—আসছে মাস থেকে আর পাঠাতে হবে না টাকা, এই শেষ কিস্তি শোধ হয়ে গেল সব।

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। তখন নতুন সন্তান এসেছে বাড়িতে, তার তদারকেই ব্যস্ত সবাই। মা-মণি বলতেন—দেখিস, খোকার ঠাণ্ডা লাগে না যেন?

হঠাৎ হয়তো কেঁদে উঠেছে খোকা। মা-মণি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁরে সিন্ধু, খোকা কাঁদছে কেন?

সিন্ধুমণি এসে বলে—নফরটা মেরেছে ওকে—

—নফর? নফর কে?

সিন্ধুমণি বলে—আজ্ঞে, ওই-যে একটা ছোঁড়া জুটেছে কোত্থেকে, বার-বাড়িতে থাকে, আর খেলা করে খোকাবাবুর সঙ্গে?

—তা তোরা আছিস কী করতে? দেখতে পারিস না, যে-সে এসে মারামারি করে!

আর ঠিক সেই থেকেই কর্তাবাবুর শরীরটা ভেঙে গেল যেন। এখানে ওখানে যেতেন। গাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগানবাড়িতেও যেতেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেতেন না। সিদ্ধিটা শুরু হয়েছিল কাশী থেকে, সেটা এখানেও এসে চলেছে। ক্রমে আরো বেড়েছে।

মা-মণি বলতেন—খোকার জন্যে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করছো না, মুখ্যু হয়ে থাকবে নাকি!

কর্তাবাবু বলতেন—এই বয়েস থেকেই লেখাপড়া?

—এখন থেকে না করলে যে কিছুই শিখবে না, একটা ভালো মাস্টার রাখো না—

মাস্টার! বললেন—জগত্তারণবাবু পড়াতে পারে, বি-এ পাস—

তারপর একটু থেমে বললেন—তাহলে ওরা দু'জনেই একসঙ্গে পড়ুক—

—দু'জন আবার কোথায় পেলে? দু'জন কে?

—খোকা আর নফর।

মা-মণি বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে নফর পড়বে, কোথাকার কে ঠিক নেই, তার লেখাপড়া নিয়ে যত মাথা-ব্যথা—ও কে?

কর্তাবাবু সে-কথা এড়িয়ে যেতেন। বলতেন—ঘাড়ে এসে পড়েছে, যদি মানুষ হতে পারে তো হোক না—

সেই ছোটবেলা থেকেই বড় বায়না করতো নফর। হৈ-চৈ বাধিয়ে চীৎকার করে একেবারে বাড়ি মাৎ করে ফেলতো। বলতো—ওর জুতো হয়েছে, আমার কই?

খাজাঞ্চিবাবু বলতেন—ওর যা হবে তোরও তাই হবে নাকি! তুই কে রে!

নফর রেগে যেত। বলতো—আমি কেউ না?

কর্তাবাবুর কানে যেত সে গোলমাল।

বলতেন—তা ওকেই বা জুতো কিনে দেয়না কেন?

উঠতে পারতেন না শেষের দিকে। কিন্তু কানে আসতো। খাজাঞ্চিবাবুকে ডাকতেন কাছে। বলতেন—ও যা চায়, ওকে দিয়ো তুমি, জানলে—

—আজ্ঞে হুজুর, খোকাবাবুর সঙ্গে সমানে সমানে সব চাইবে।

আজ গাড়ি, কাল খেলনা, পরশু জামা-কাপড়। মা-মণির হুকুমে নতুন নতুন জিনিস আসে বাজার থেকে। খোকাবাবুর জন্যে কোনও জিনিস আর আসতে বাকি থাকে না। নফর দেখতে পেলে কেড়ে নেয়। সিন্ধু বলে—এই ছোঁড়া, বেরো এখান থেকে—বেরো—দূর হ—

নফরও তেমনি। বলে—বেরোব কেন?

—বেরোবি না তো, থাকবি এখানে? এখন খোকাবাবু খাবে!

—আমার খুশী আমি থাকবো। তোর কী! আমিও খাবো, আমার বুঝি ক্ষিদে পায়না?

সিন্ধুমণি গালে হাত দেয়।

—ওমা, শোনো ছোঁড়ার কথা! তোর ক্ষিদে পায় তো তুই রান্নাবাড়িতে যা না—

নফর বলতো—তাহলে খোকন এখেনে খাবে কেন?

—ও হলো বাড়ির ছেলে, তুই কে রে ছোঁড়া?

নফর রেগে গেল। বললে—তুই ছোঁড়া বলছিস কেন রে মাগী আমাকে?

বলে এক চিমটি কেটে পালিয়ে যেত নফর।

কিন্তু কর্তাবাবু মারা যাবার পরই যেন জেদ বেড়ে গেল নফরের। কথায় কথায় রেগে যায়। কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে। ও ইস্কুলে যায়, নফরও ইস্কুলে যাবে। বড়বাবুকে জগত্তারণবাবু পড়ায়, নফরও পড়বে। খোকাবাবু তখন ছোট। সেই বয়েসেই একদিন ঝগড়া বাধলো। তুমুল ঝগড়া। লাট্টু নিয়ে। নফর খোকাবাবুর লাট্টু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। খোকাবাবু গিয়ে লাট্টু চাইতেই নফর এক ঘুষি মেরেছে।

কান্নায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছে খোকাবাবু।

—কী হলো রে, কী হলো?

বাড়িসুদ্ধ লোক দৌড়ে এসেছে নফরের ঘরে। রক্ত বেরোচ্ছে তখন খোকাবাবুর নাক দিয়ে।

—কে মেরেছে রে? কে মেরেছে ওকে?

নফর বললে—আমি।

—তুই! এত বড় আস্পর্ধা তোর—খোকাবাবুকে মারিস?

ব'লে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে কেউ নফরের গালে। তারপর আদর করে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছে খোকাবাবুকে। কিন্তু নফর তবু কাঁদেনি চড় খেয়ে। গুম হয়ে বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা গিয়েছে রান্নাবাড়িতে। চোট্‌পাট করেছে। বলেছে—ভাত দাও আমাকে শিশুর-মা—আমার ক্ষিদে পেয়েছে—

তার সমস্ত আঘাত যেন সে ভাত খেয়ে ভুলে যেতে চাইত।

শিশুর-মা-ও হেঁকে দিত—বেরো এখেন থেকে, সকালবেলা ভাত কিসের রে? পরে আসিস্—

তারপর কবে একদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে বড়বাবুর। কবে নতুন বউ এসেছে। বয়েস বেড়েছে, শরীরও বড়বাবুর ভারি হয়েছে। জগত্তারণবাবু রোজ এসেছে বড়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে—নিঃশব্দে নির্বিবাদে সব কখন ঘটে গেছে কারোর তা মনে নেই। নফরেরও মনে নেই। একতলার অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে কখন ফুটো দিয়ে তার সব অধিকারের অনিবার্যতাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে তা নিয়েও আর নফর মাথা ঘামায় না। এখন ওই বড়বাবু একটু ডাকলেই তৃপ্তি, কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে গিয়ে আবার পুরোনো দিনের কিছুটা অংশ ফিরে পায়—

কেউ আর জিজ্ঞেস করে না—ও কে গো?

এখন আর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করে না।

বলেনা—মাছ দাওনি কেন? আমি এ-বাড়ির কেউ নই?

নফর এখন ভাত খেয়ে চুপি চুপি আবার নিজের ঘরের ঘুপ্‌চির ভেতর এসে শুয়ে পড়ে। কোথায় বড়বাবুর কী জামা-কাপড় হলো, কী গেলে, কিছুই খেয়াল রাখে না। টিকটিকিটা শুধু মাথার ওপর লাল চোখ দিয়ে তার দিকে মাঝে মাঝে হাঁ করে চেয়ে থাকে, আর নিচে নফর ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। আর ঘুম না-পেলেও ঘুমোয়, পেলেও ঘুমোয়—

এ-সব ইতিহাস পুরোনো। বর্তমান সেন-বংশের বাঁধা ইতিহাসের পাতা খুঁজলে এমন অনেক অধ্যায় পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে শুরু করে এই বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অনেক গ্লানি, অনেক কলঙ্ক অদৃশ্য ফলকে লেখা হয়ে আছে। সে আর কেউ জানতে পারবে না। জানা উচিতও নয়, কাম্যও নয়।

শ্যাওলা-ধরা বাড়িটার সামনে থেকে তেমন কিছু বোঝা যাবে না। যখন এ-পাড়ায় আর কোনও বাড়ি ছিল না, এ-সব তখনকার কাহিনী। এখন এ-পাড়ায় সামনে পেছনে

অনেক বাড়ি হয়ে গেছে। আশেপাশে আগে মাঠ ছিল, বন-জঙ্গল ছিল। তখন এ-বাড়ির আভিজাত্য ছিল। দশজন সমীহ করতো, ভয় করতো, ভক্তিও করতো হয়ত।

এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি সকাল-সন্ধ্যেয় রেডিও বাজে। মটর আসে, বেরিয়ে যায়। ভাড়াটেও এসেছে কত। ঘুড়ি উড়তে উড়তে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়লে ছেলেরা নির্ভয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরোয়ান বিশেষ কিছু আর বলে না এখন। সবাই জানে বড়লোকের বাড়ি এটা, কিন্তু জানে না এর ভেতরে কতগুলো লোক থাকে, কী তারা করে, কী করে তারা জীবন কাটায়, কী জন্যে তারা বেঁচে আছে—

কিন্তু আজ পাড়ার লোক সব ভেঙে পড়লো এ-বাড়ির সামনে—

এতদিন এ-বাড়ির দিকে কেউ বিশেষ নজর দিত না। বিরাট বাড়ি। সামনের দিকের জানালা দরজা সব সময় প্রায় বন্ধই থাকতো। বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার ওপর নিম-গাছটা ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে অনেক ঝড় অনেক বাদল এতকাল ধরে সয়ে এসেছে নির্বিবাদে। দেয়ালের শ্যাওলাতে অনেক লতাপাতা জ'ন্মে ঝোপ জঙ্গল হয়ে গেছে। লোকে জানতো ভেতরে যারা বাস করে তারা বনেদী ঘরের লোক—কেউ তাদের কখনও দেখতে পাবে না। চন্দ্র-সূর্যও তাদের দেখতে চেষ্টা করলে হার মানবে।

কিন্তু আজ আর কিছু অজানা থাকবে না। আজ বোধ হয় সব জানাজানি হয়ে যাবে। সামনের চায়ের দোকানের ছোঁড়ারাও দৌড়ে এসেছে, ধোপাপাড়া থেকেও দু'একজন দৌড়ে এল। একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে—রিক্সাওয়ালাটাও থমকে দাঁড়ালো।

বললে—কেয়া হুয়া বাবু ?

আর, বাড়ির ভেতরের যারা তাদের মধ্যেও যেন আজ সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। বড়বাবুর ঘর খালি। খাস-বরদার পাঁচু বড়বাবুর সঙ্গে গাড়ির মাথায় চড়ে চলে গেছে। সেদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফুলমণি রাত থাকতে উঠে বার-বাড়ির বাসন মেজেছে। পয়মন্ত সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়েছে—। সিন্ধুমণি বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। কলতলায় বাসনের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়মড় করে উঠে মা-মণির ঘরে দিকে গিয়ে দেখলে—মা-মণি তখনও ওঠেনি। অন্যদিন সিন্ধুমণি ভেতর-বাড়িতে সকলের আগে ওঠে—কুঞ্জবালা বড় দেরি করে উঠতো। বড় ঘুম-কাতুরে মানুষ ছিল সে। মা-মণির কাছে শুনেছে।

কাশীতে যেবার কুঞ্জবালা গিয়েছিল, দিনরাত ঘুমোত। একদিন কর্তাবাবুর পায়ে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে কুঞ্জবালা মা-মণির ঘরের মেঝেতে শুতো। যখন অসুখ হলো মা-মণির, দিনরাত সেবা করতে হতো, তখন দিনেও জাগতে হতো রাত্রেও জাগতে হতো। একদিন কুঞ্জবালা বলেছিল—কলকাতায় গিয়ে পেট ভরে ঘুমোব—

তা কুঞ্জবালার সেই ঘুমের জন্যই বোধহয় ওই সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল।

সিন্ধুবালা জিজ্ঞেস করেছিল—কিসের সর্বনাশ দিদি ?

—সে তোর শুনে কাজ নেই লা।

—কেন, শুনলে কী হবে দিদি ?

তখন অনেক রাত। কর্তাবাবু সিদ্ধি চড়িয়েছেন দুপুর-বেলা। সেই শরবতের নেশাতেই ঝিম্ হয়ে ছিলেন সমস্ত দুপুর, সমস্ত বিকেল। খাস-বরদারও ততক্ষণ একটু জিরোচ্ছিল। বিকেলের দিকে মা-মণি একটু ভালোই ছিলেন, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ মা-মণি কেমন করতে লাগলেন। মুখ-চোখের ভাব দেখে ভালো মনে হলো না। কুঞ্জবালা গিয়ে খাস-বরদাকে ডাকলে—শুনছিস্—অ্যাই—

কর্তাবাবুর খাস-বরদার উঠলো অনেক ডাকাডাকিতে।

কুঞ্জবালা বললে—কর্তাবাবুকে ডাক, মা-মণি কেমন করছে—

খাস-বরদার বললে—কর্তাবাবু যে ঘুমোচ্ছে, ডাকবো কী করে ?

কুঞ্জবালার রাগ হয়ে গিয়েছিল।

—তুই ডাক না মুখপোড়া ! বল্, মা-মণি কেমন করছে—

এদিকে মা-মণি কেমন করছে, চোখের মণি যেন উল্টে যাবার জোগাড়, আর পাশের ঘরে কর্তাবাবুরও পাত্তা নেই। ঘরে বিছানা ঠিক পাতা আছে, কিন্তু বিছানায় মানুষ নেই। খাস-বরদার এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। নেশার ঘোরে কোথাও কর্তাবাবু চলে গেল নাকি ! গঙ্গার দিক বরাবর দরজাটা বন্ধ ছিল—সেটা বন্ধই রয়েছে—। বারান্দার এ-কোণ ও-কোণ দেখা হলো। কোথাও নেই—কোথায় গেলেন কর্তাবাবু ?

সে-সব দিনের কথা যারা জানতো, যারা হাজির ছিল তারাই জানে।

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কিন্তু দেরি করলে চলবে না, যা করবার শিগ্‌গির করতে হবে—

ডাক্তার চৌধুরী ভালো করে মঙ্গলাকে দেখলেন।

মন্ত্রপড়া ছাগলের মতো থরথর করে কাঁপছিল তখন মঙ্গলা। সারা গায়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পাশেই

খাটের ওপর মা-মণির দেহ নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার চৌধুরী খানিকটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। কী তিনি দেখলেন তিনিই জানেন।

গুরুদেব কর্তাবাবুকে আড়ালে ডাকলেন—

বললেন—এক বংশের রক্তের সঙ্গে আর এক বংশের রক্তের মিশ্রণে শাস্ত্রীয় বাধা-বিরোধ আছে, তা আগে দূর করতে হবে—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী করে দূর হবে?

গুরুদেব বললেন—উপায় আছে—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

—কী উপায়? আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই—

সে-রাত্রে যে কী হলো! ভাগ্যের সেই অমোঘ নির্দেশের মধ্যে ভাগ্য-দেবতার বোধহয় কোনও গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন কর্তাবাবুও বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি তাঁর সেই কৃতকর্মের ফলাফল একদিন এত ভারি হয়ে আর এতদিন পরে তা এতবড় বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে।

সমস্ত রাতটা মা-মণির কেমন করে কেটেছে ভগবানই জানেন।

গুরুপুত্র বেশীক্ষণ রইলেন না।

ট্রেন আসার কথা ছিল সন্ধ্যেবেলা। সেই ট্রেন এলো রাত দশটায়। তারপর ভোরবেলাই আবার রওনা দিতে হবে। বললেন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না, আমাকে ভোরবেলাই রওনা দিতে হবে—আগামী সোমবার অর্ধোদয়-যোগে আমাকে কাশীধামে উপস্থিত থাকতেই হবে—বাবার ক্রিয়াকর্ম সব বাকি রয়েছে—

মা-মণি পায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন।

বললেন—তার পর?

তারপর সেই রাত্রেই কর্তাবাবু নতুন ধুতি পরে তৈরি হয়ে নিলেন। মঙ্গলাও বেনারসী শাড়ি পরলে, ঘোমটা দিলে। বাড়ি থেকে দূরে আর-একটা বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। রাত তখন অনেক।

পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

কর্তাবাবু উচ্চারণ করলেন—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভির-
স্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্মে চর্মে এক হয়ে যাক্।

গোত্রান্তর আগেই হয়েছে। তারপর বিবাহ। বিধবা-বিবাহ। কাশীধাম দেবতার ধাম। শাস্ত্রীয় বিধান মেনে মা-জননীর পুনর্জীবনলাভের জন্যে বিবাহ। এ চলে। এতে অন্যায় নেই, এতে দেবতার নিষেধ নেই, সম্মতিই আছে বরং। গুরুদেবের সমর্থনও আছে।

কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু কেউ যেন এ খবর জানতে না পারে—

একরাত্রের ব্যাপার। লোকচোখের অগোচরেই সব সমাধা হয়ে গেল। কেউ-ই জানতে পারলো না। মঙ্গলা যথারীতি ফিরে এল অনুষ্ঠানের শেষে। আবার বেনারসী শাড়ি ছেড়ে ফেললে। আবার মঙ্গল-চন্দন মুছে ফেললে।

ডাক্তার চৌধুরী ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন শরীরে। ঘোমটার আড়ালে মঙ্গলা একটু কেঁপে উঠেছিল বুঝি ভয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেইখানেই।

—তার পর?

শুধু কি একদিন! শুধু কি দু'দিন! কতবার রক্ত নেওয়া হলো। তখনও মা-জননীর আরোগ্য হয়নি। কর্তাবাবু কিছু রাত্রে কোথায় বেরিয়ে যান, যখন অনেক রাত। গভীর রাত্রে কর্তাবাবুর জন্যে পাল্কী আসে। আবার ভোরের দিকে ফিরে আসেন। তখন ডাক্তার আসে। মা-মণির অসুখের খবর নেন। তারপর দুপুর-বেলা তাঁর গভীর নিদ্রা। বেলা চারটের সময় সে-ঘুম ভাঙে —তখন তাঁর জন্যে শরবত তামাক সব তৈরি রাখে খাস-বরদার—

কিন্তু দিনের বেলা কাজ করতে বেশ ঢুলুনি আসতো মঙ্গলার।

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে রে তোর, বসে বসে ঢুলছিস্ কেন!

মঙ্গলা সেদিন পা জড়িয়ে ধরলো। বললে—আমার সব্বনাশ হয়েছে, আমি আর বাঁচবো না—

—কেন, কী হলো?

পরের দিন থেকে মঙ্গলাকে কোথায় নিয়ে গেলেন কর্তাবাবু। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ রাঁধতে হবে, সেখানেই মঙ্গলা থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে রাঁধাবার জন্যে অন্য লোক এল। কাশীর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। রান্না ভালো, কিন্তু ঝাল-মশলার বেশি হাত।

তা তাই নিয়েই চালাতে হলো। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ রাঁধতে গেল মঙ্গলা। কুঞ্জবালা তা-ই জানে। তা-ই

জানলো সবাই। তখনও মা-মণির অসুখ ভালো হয়নি। আস্তে আস্তে গায়ে একটু বল পেলেন। তখন প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে।

জিজ্ঞেস করলেন—কুঞ্জ ?

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি মা-মণির মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী মা-মণি ?

—কর্তাবাবু কোথায় ?

কুঞ্জবালা বললে—ডাকবো ? কর্তাবাবু তামাক খাচ্ছেন—

—একটু জল দে—

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো মা ?

মা-মণি মাথা নাড়লেন। ভালো না।

একদিন মা-মণি বললেন—আর ওষুধ খেতে পারি না—

ওষুধ খেয়ে খেয়ে তখন অরুচি ধরে গেছে তাঁর। চেহারা শীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম লোক চিনতে পারতেন না। কর্তাবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেও কী-সব প্রলাপ বকতেন। মাথায় ঘোমটা দেবার প্রয়োজন মনে করতেন। যে মা-মণি প্রত্যেকদিন কর্তাবাবুর পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করতেন না, সেই তাঁরই কত মতিভ্রম হতে লাগলো। মুখের কাছে ওষুধ নিয়ে গেলে দাঁত বন্ধ করে থাকতেন, গায়ে জোর থাকলে ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সমস্ত বাড়িতে তখন লোকজন ভরে গেছে। কলকাতা থেকে আরও চাকর-ঝি এসে গেছে। বরফ আসছে, কলকাতা থেকে ট্রেনে করে ডাব আসছে। কাশীধামে সব ওষুধ পাওয়া যায় না। কলকাতা থেকে আনতে হয়। ডাক্তার চৌধুরী আসতেন, তাঁর সঙ্গে আসতেন ডাক্তার সান্ন্যাল। কর্তাবাবুর হুকুম ছিল রোজ এসে তাঁরা দেখে যাবেন।

শেষে একদিন ভাত খাবার অনুমতি দিলেন ডাক্তারবাবু।

বললেন—বেশ পাতলা ঝোল—সিঙ্গি-মাছের ঝোল, আর সরু পুরোনো সেদ্ধ-চালের ভাত—

প্রথম দিন ভাত মুখে দিয়ে কিন্তু রুচি হলো না।

বললেন—মঙ্গলা এ কী রেঁধেছে ?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নয় মা, একটা হিন্দুস্থানী বামুন রেঁধেছে—

—কেন ? মঙ্গলা কোথায় গেল ?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নেই তো মা !

—কোথায় গেল সে !

কুঞ্জবালা বললে—দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধে সে আজকাল—

—কেন ? সেখানে কেন গেল ?

—কর্তাবাবু বলেছেন।

মা-মণি বললেন—কর্তাবাবু কোথায় ? ডাকতো—

কর্তাবাবু আসতেই মা-মণি মাথায় ঘোমটা তোলবার চেষ্টা করলেন।

বললেন—মঙ্গলাকে দুর্গাবাড়ির ভোগ রাঁধতে পাঠিয়েছ তুমি ?

কর্তাবাবু বললেন—কেন, তোমাকে কে বললে ? রান্না কি ভালো হয় না ?

—আজকে খেতে পারলাম না।

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন।

মা-মণি বললেন—তুমি ওকে নিয়ে এসো, ওকে আমি নিজে বলে বলে রান্না শিখিয়েছি—ও-ই এখেনে রাঁধবে।

কর্তাবাবু বললেন—আজকে কেমন আছো ?

মা-মণি বললেন—ও কথা থাক্—বরং তুমি কেমন আছো বলো !

কর্তাবাবু বললেন—তোমার শরীর খারাপ, আমি কি করে ভালো থাকবো ?

মা-মণি বললেন—কাশীতে আমিই তোমাকে আনলুম, আমার জন্যেই তোমার এই কষ্ট—

কর্তাবাবু বললেন—কষ্ট যে সার্থক হয়েছে এইটেই সান্ত্বনা—

মা-মণির চোখ যেন ছলছল করে উঠলো।

বললেন—একটা দিন কি একটা মাস হয় তা-ও না-হয় সহ্য হয়, এ একবছর ধরে শুয়ে শুয়ে আর পারি না—

—এতদিন সহ্য করেছ আর কিছুদিন সহ্য করো !

মা-মণি বললেন—মরে গেলেই ভালো হতো—

কর্তাবাবু বললেন—ও-কথা কেন বলছো ?

—তোমার পায়ে মাথা রেখে মরবো, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যেতে পারবো, কাশীধামে মরবো, এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

কর্তাবাবুর কথা বাড়ির সকলেরই মনে আছে। বাগান-বাড়ি যেতেন বটে, জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু তারাও যেত, ফুর্তি হতো, মাইফেলও হতো, তবু যেন কর্তাবাবু কোথায় যেন ছিলেন সত্যিকারের সংসারী মানুষ। বাগানবাড়ি গিয়েও কখনও বাড়ির কথা ভুলে যাননি। সংসার করেছেন, ধর্ম করেছেন, আবার মদও খেয়েছেন,

বাগানবাড়িও রেখেছেন, এজন্যে মা-মণির কোনও ভয় ছিল না কোনওদিন, সন্দেহও ছিল না।

মা-মণি বলতেন—এমন স্বামী ক'জন পেয়েছে আমার মতো? অনেক তপস্যা করলে এমন মানুষ মেলে, বৌমা—

প্রতিদিন সকালবেলায় যখন কর্তাবাবু বাড়ি থাকতেন, কর্তাবাবুর পাদোদক না পান করে জলস্পর্শ করেননি তিনি।

বৌ-মণিকে বলতেন—তোমার শ্বশুরকে তুমি বেশিদিন দেখতে পাওনি বৌমা,—দেখলে বুঝতে পারতে কী মানুষ ছিলেন তিনি—দেবতুল্য মানুষ, অমন হয় না।

বৌ-মণি কিছু বলতেন না। চুপ করে শুনতেন শুধু শাশুড়ীর কথা।

মা-মণি বলতেন—এতদিন এসেছ, এখনো খোকাকে তুমি বশ করতে পারলে না, আর আমি?

একটু থেমে বলতেন—আমাকে না-জানিয়ে তিনি কিছু করতেন না—বাগানবাড়ি যাবার আগেও আমাকে বলে যেতেন, এমনি মানুষ ছিলেন তিনি—মদ খেতেন তিনি, ছোটবেলার অভ্যেস, কিন্তু আমি বললে তা-ও বোধহয় ছাড়তে পারতেন—

কর্তাবাবু ভোরবেলা ঘুম থেকে দেরি করে উঠতেন। শেষের দিকে তিনি আর রাত্রে অন্দরে আসতেন না। নাচঘরেই রাত্রের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম বিয়ে হবার প্রথমদিকে, একসঙ্গে এক বিছানাতেই শুতেন দু'জনে। সকালে উঠে মা-মণি রোজ কর্তাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতেন। তারপর বাইরে যেতেন।

একদিন দেখে ফেলেছিলেন। বললেন—পায়ের ধুলো নিচ্ছ যে হঠাৎ? কী হলো?

মা-মণি বলেছিলেন—আমি তো রোজই নিই—

—কেন নাও? আর নিয়ো না।

মা-মণি বলেছিলেন—তুমি আপত্তি কোরো না, হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আমি তা বলে দেবতা নই!

মা-মণি বলেছিলেন—ও কথা বোলো না, আমার কাছে তুমি দেবতাই—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কিন্তু আমার যে অনেক বদ রোগ আছে, রাত্রে মাঝে মাঝে বাইরে কাটাই, মদ খাই, তা জানো তো!

মা মণি বলতেন—তা যা ইচ্ছে তোমার করো, তুমি আমার—

বড় গর্ব করেই সেদিন মা-মণি কথাগুলো বলেছিলেন। ভেবেছিলেন, সংসারের যেখানে আর যা কিছু ফাঁক থাকুক, ফাঁকি থাকুক, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কোথাও কোনও গ্রন্থি থাকবে না—

তাই সেদিন যখন কর্তাবাবু বললেন মঙ্গলা দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধতে গেছে, তিনি বিশ্বাসই করেছিলেন।

কিন্তু মঙ্গলা তখন আর এক আঘাতে জর্জর হয়ে রয়েছে। আর এক নিভৃত ঘরে শয্যাগ্রস্ত। সে-কথা কেউ জানে না।

কর্তাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন—এ বিয়েও যেমন সাময়িক, এ সন্তানও তেমনি সাময়িক প্রয়োজনে—

কর্তাবাবুই টাকা দিয়েছেন, সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক রেখেছেন, বাড়ি ভাড়া করবার খরচ দিয়েছেন। সুতরাং আবার সব মুছে ফেলতে হয়েছে। শরীরের ক্লান্তি, পেটের সন্তান, সিঁথির সিঁদুর, সব। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে খুশী চলে যাও, তোমার সন্তান থাক্ তোমার কাছে, কারো কাছে কোনো পরিচয় প্রকাশ হতে পারবে না। পারলে, শাস্তি হবে সে-কথাটা আর খুলে প্রকাশ করা হয়নি।

কিন্তু সেদিন কর্তাবাবুর প্রস্তাবে মঙ্গলা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেনি। শুধু মাথা নিচু করে থেকেছে।

মঙ্গলা আবার যেদিন এল বাড়িতে, কুঞ্জবালা চেহারা দেখে অবাক।

বললে—ওমা, কী চেহারা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধে রেঁধে তোর চেহারার কী দশা হয়েছে রে মঙ্গলা—

মা-মণির ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলোও নিয়ে এল।

মা-মণি বললেন—আমার বাড়ির ভোগ কে রাঁধে তার ঠিক নেই, তুই কিনা গেছিস্ দুর্গাবাড়িতে—

তারপর আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন মা-মণি। পথ্য গ্রহণ করলেন, উঠে চলে-ফিরে বেড়াতে পারলেন। শেষকালে একদিন কাশীর পাট উঠলো।

কর্তাবাবু শেষের দিকে কেমন একটু কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

কী যেন বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে পারতেন

না। কাশীবাসের পর থেকেই কেমন যেন অন্যরকম। বাগানবাড়িতে যাবার আগ্রহ তেমন ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আসতো, জগত্তারণবাবু আসতো, অনেকক্ষণ খবর দেবার পর তবে নিচে নামতেন।

গাড়িতে ওঠবার মুখে এক-একদিন দেখতেন ছেঁড়া নোংরা জামা পরে নফর এসেছে কাছে। বলেছে—একটা পয়সা দাওনা কর্তাবাবু—

জগত্তারণবাবু তাড়িয়ে দিত। বলতো—যা যা, বেরো এখান থেকে, পয়সা কী করবি রে ?

—ল্যাবেন্‌চুষ খাবো।

কর্তাবাবুর মুখখানা যেন কালো হয়ে আসতো !

ডাকতেন—পয়মন্ত—

পয়মন্ত কাছে এলেই বলতেন—এই একে খেতে দেয়না কেন বল্‌তো—একে কেউ খেতে দেয়না কেন ?

—আজ্ঞে খায় তো ও।

—তাহলে ল্যাবেন্‌চুষ খাবে বলছে কেন! আবার খেতে দিতে বল একে—রান্নাবাড়িতে বলে দিবি একে যেন পেট ভরে খেতে দেয়—আর গ্যাখ্‌ খাজাঞ্চিবাবুকে একবার ডাক্‌তো—

নফর ততক্ষণে কর্তাবাবুর পাঞ্জাবিতে ময়লা হাত লাগিয়ে কালো করে দিয়েছে।

খাজাঞ্চিবাবু খাতা ফেলে দৌড়তে দৌড়তে এলেন।

কর্তাবাবু বললেন—এ ছেঁড়া-জামা পরে থাকে কেন ? দেখতে পাও না ?

কালিদাসবাবু বললেন—আজ্ঞে, বড় ইতর ছোঁড়াটা, নতুন জামা দিতে-না-দিতে···

—তুমি থামো !

হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন কর্তাবাবু।

বলতেন—খোকাবাবুর যখন জামা-কাপড় হবে, তখন এরও হবে, দেখবে যেন ন্যাংটা হয়ে আমার সামনে না আসে—
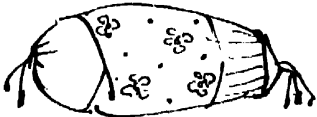
কর্তাবাবু চলে গেলে সবাই বলাবলি করতো—ছোঁড়াটা কে ?

মুহুরিবাবু বলতো—ছোঁড়াটা খুব বশ করেছে তো কর্তাবাবুকে—

কর্তাবাবু খেয়ে-দেয়ে নাচঘরে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন দুপুরবেলা, খাস-বরদারও বোধহয় সেই সময়টা রান্না-বাড়িতে খেতে গেছে, হঠাৎ কোথা থেকে এক-পা ধুলো নিয়ে একেবারে কর্তাবাবুর ঘাড়ে চড়ে বসেছে—

—আরে, ছাড়্‌ ছাড়্‌—

নফরের তখন অন্য মূর্তি। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বলে—দেবনা—

কর্তাবাবু বিব্রত হয়ে উঠেছেন।

—ওরে, কে আছিস, গ্যাখ্‌, ধর্‌ একে—

—তাহলে একটা পয়সা দাও—

—পয়সা কি করবি তুই ?

—ক্ষিদে পেয়েছে।

—তোকে কেউ খেতে দেয়না বুঝি ?

নফর পিঠে উঠে অত্যাচার শুরু করেছে তখন। মাথায় হাত দিয়ে চুল টানছে। এমন করে কর্তাবাবুর কাছে ঘেঁষতে কারো সাহস নেই। খোকাবাবু পর্যন্ত দূরে দূরে থাকে। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, শরীর কেমন আছে সব খবরই নেন তিনি, কিন্তু সে-ও এমনি করে কর্তাবাবুর পিঠে উঠতে সাহস করে না—

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে, ভাত খেয়েছিস ?

নফর বুকের খুব কাছাকাছি শুয়ে বুকের চুলগুলো টানছে তখন।

বললে—হ্যাঁ—

—পেট ভরেছে ?

—না।

কর্তাবাবু হেসে ওঠেন। মিথ্যেকথা বলছে বুঝতে পারেন। মিথ্যেকথা বললেই আদর পাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছে।

জগত্তারণবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—খোকার কেমন পড়াশুনো হচ্ছে জগত্তারণবাবু ?

—আজ্ঞে ব্রেন্‌ আছে খোকাবাবুর, যা বলি টপাটপ বুঝে ফেলে।

—আর ও ?

—কে ?

যেন বুঝতে পারে না জগত্তারণবাবু। বললেন—কার কথা বলছেন ?

—ওই আমাদের নফর ?

জগত্তারণবাবু মুখ বেঁকায়।

—আজ্ঞে, ও ছোঁড়ার কিছু্ছু হবে না, মোটে মাথা নেই, কেবল খেলার দিকে ঝোঁক, ওর লেখাপড়া শিখে কিছু্ছু হবে না, ওটা গণ্ডমুখ্যু হয়ে কাটাবে দেখবেন।

—গণ্ডমূর্খ হবে ?

কর্তাবাবুর মুখটা যেন বিমর্ষ হয়ে এল। যেন বড় কষ্ট পেলেন কথাটা শুনে। মুখ কালো করে বললেন—পড়ে না মোটে ?

জগত্তারণবাবু বললে—পড়বে কি আজ্ঞে, মাথাতেই ওর ঢোকে না কিছু, মাথায় গোবর পোরা আর কি !

কর্তাবাবু বললেন—একটু ভালো করে চেষ্টা করে ছাখো না—হয়ত হতেও পারে, সকলের কি আর সমান মাথা হয় ?

জগত্তারণবাবু বললে—বৃথা চেষ্টা আপনার, তবে আপনি যখন বলছেন, দেখবো চেষ্টা করে—

খোকাবাবু আর নফর দু'জনকেই ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। খোকাবাবু গাড়ি করে ইস্কুলে যেত। গুলমোহর আলি গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতো। মা-মণি নিজে তদারক করে খোকাবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। চাকর-বাকররা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো সে-সময়টা। একটু যদি দেরি হয় তো মা-মণির বকুনির অন্ত থাকে না।

—দেখছিস খোকন এখন ইস্কুলে যাবে, তোরা কোথায় থাকিস সব ?

খোকাবাবু ইস্কুলে গিয়ে যেন সমস্ত বাড়ির লোকের মাথা কিনে নেবে।

নফর দেখতে পেয়েছে। দৌড়ে সে-ও গাড়িতে উঠতে যায়। একেবারে পা-দানিতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—আমিও গাড়ি করে ইস্কুলে যাব—

—ওরে থাম থাম !

গুলমোহর আলি আর একটু হ'লে গাড়ি চালিয়ে দিত। নেহাত থামিয়ে ফেলেছে ঠিক সময়ে। আবদুল পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

—উতরো, উতরো তুম্।

নফর বললে—না, নামবো না—আমিও গাড়ি চড়বো।

গুলমোহর আলি শাসাতে লাগলো—বাবুকো বোলাও, জলদি—

কিছুতেই কিছু হলো না। জোর করে নফরকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চলে গেল গেট্ দিয়ে। নফর রাগ করে ইস্কুলেই গেল না। সমস্তক্ষণ মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একসময় কখন ঘুমিয়েও পড়লো।

এ-সব ছোটবেলাকার ঘটনা। তারপর কর্তাবাবু মারা গেছেন। মারা যাবার আগে ক'মাস আর নিচেও নামতে পারেননি। নফর ওপরে উঠতে গেছে। পয়মন্ত খেঁকিয়ে উঠেছে—যা যা, বেরো এখেন থেকে—

কর্তাবাবুর তখন অসুখ বেশ। ঘরে কেউ নেই। পয়মন্তকে ডেকে বললেন—নিচে কে কাঁদছে রে ?

—কই আজ্ঞে, কেউ তো কাঁদছে না—

—আমি যে শুনতে পেলুম। দেখে আয় দিকিনি ?

পয়মন্ত বাইরে গেল। বাইরে থেকে উঁকি মেরে নিচেয় দেখলে। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তিন মহল বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত লোক বাসা বেঁধেছে। কত মানুষ পুরুষানুক্রমে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় এ-বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে যুগ যুগ ধরে। কেউ ঠকেছে, কেউ ঠকিয়ে গেছে। কেউ মরেছে, কেউ মেরেছে। তবু এ-বাড়ির ইট, কাঠ, গাছপালা, শ্যাওলার মতো এ-বাড়ির সঙ্গে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেছে—তাদের সকলের কোলাহল, সকলের চীৎকার, সকলের কান্না আর হাসির শব্দ যদি ধরে রাখা যেত তো এর ইতিহাস শুনে আজকের লোক চম্‌কে উঠতো, শিউরে উঠতো। কিন্তু কোথায় সব তলিয়ে গেছে, কোথায় হারিয়ে গেছে। সে আর দেখা যাবে না, সে আর বুঝি শোনা যাবে না।

পয়মন্ত বলে—না হুজুর, কেউ তো কাঁদছে না—

—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো ?

রান্নাবাড়ির দিকেও কান পেতে শুনেছে। কিন্তু সব চুপচাপ সেখানে। শিশুর-মা সেখানে শুধু তরকারি কোটে, বাটনা বাটে আর একটা-দুটো কথা বলে মঙ্গলার সঙ্গে। মঙ্গলা তার উত্তরই দেয় না।

—হ্যাঁ দিদি, তোমার তো ভাগ্যি ভালো, তবু বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করেছ। আমাদের যে কী কপাল !

মঙ্গলা চুপ করে রান্না করে যায় চারটে উনুনে একসঙ্গে। ভাত ডাল ঝোল ফোটে টগ্‌বগ্ করে। জল গরম হলে কেমন একটা সোঁ-সোঁ শব্দ হয়। হাঁড়ির ভেতর মাংস রান্না হলে কেমন একটা গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আর মাঝে মাঝে বাইরের রোয়াকে শিশুর-মার শিল-নোড়া ঘষার শব্দ। একটানা। কাশীর গঙ্গার জলের সোঁ-সোঁ শব্দের মতো এ সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

—ও বামুনদি, ওই ছাখো সেই ছোঁড়াটা খেতে এসেছে, আবার জ্বালাবে আজ !

নফর চীৎকার করে খেতে বসবার আগেই,—আজ যদি মাছ না দাও তো কর্তাবাবুর কাছে লাগাবো গিয়ে—

—দেবনা তোকে মাছ, কী করতে পারিস দেখি আমি!

শিশুর-মা কোমরে কাপড় জড়িয়ে মারমুখো হয়ে আসে।

নফর বলে—মারবে নাকি তুমি?

—হ্যাঁ মারবো,—ছোঁড়ার মুখে আগুন, শুনলে বামুনদি ছোঁড়ার কথা, আবার মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে আসে—

নফর বলে—আমি তোমার গায়ে হাত দিতে আসিনি, তুমি থামো—

ব'লে ডাকে—বামুনদি—

মঙ্গলার বুকের ভেতরটা ধকধক করে ওঠে।

—কানে কথা যায় না বুঝি কারো?

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এগিয়ে আসে নফর।

তারপর মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে—তোমার চোখে কী হলো গো বামুনদি? জল পড়ছে কেন গা?

মঙ্গলা ততক্ষণে জলটা মুছে নিয়েছে।

নফর বলে—কাঁচা তেলে ফোড়ন দিয়েছিলে তুমি? দেখি দেখি, চোখটা দেখি—

শিশুর-মা'র আর সহ্য হলো না। বললে—বেরো, ছোঁয়া-লেপা কাপড় নিয়ে রান্নাবাড়ি থেকে বেরো বলছি—নইলে ডাকবো ভূষণ দরোয়ানকে সেদিনের মতো, বেরো বলছি—

হাতে একটা লোহার বেড়ি নিয়ে তেড়ে এসেছে।

কি জানি ভূষণের নাম শুনেই বোধহয় ভয় পেলে নফর। রান্নাবাড়ি থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল। তারপর বললে—দুত্তোর তোর ভাতের নিকুচি করেছে, ভাত দিবিনে তো বয়ে গেল, দেখি ভাত না খেয়ে থাকতে পারি কিনা—

শুর-মা'ও পেছপাও হয়। বলে—তাই দ্যাখ্ তুই—আমিও দেখি, এবার খেতে এলে খ্যাংরা-পেটা করবো এই দিলুম—

কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, কর্তাবাবু বুঝতে পারতেন।

বলতেন—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো?

পয়মন্ত এসে বলে—কই, রান্নাবাড়িতে তো সবাই চুপ, ওখেনে তো কিছু গোলমাল নেই?

—গোলমাল নেই?

শেষের দিকে মা-মণি কাছে এলেই যেন একটা কী কথা বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে চাইতেন, কী যেন বলতে সাহস পেতেন না।

মা-মণি বলতেন—কিছু বলবে তুমি?

কর্তাবাবু বলতেন—খোকা কোথায়?

—সে তো নিজের ঘরে রয়েছে, ডাকবো তাকে?

—না, তুমি বোসো একটু।

মা-মণি অনেকক্ষণ বসে রইলেন পাশে। মাথায় হাত দিয়ে টিপতে লাগলেন।

বললেন—কই, কী বলবে বলছিলে যে?

কর্তাবাবু বললেন—জমা-খরচের খাতা কে দেখছে আজকাল?

মা-মণি বললেন—খোকাকে আমি দেখতে বলেছি, মাঝে মাঝে খাজাঞ্চিখানায় বসে দ্যাখে—

—হলুদপুকুরের বন্ধকী সম্পত্তির মকর্দমাটার কী হলো?

মা-মণি বললেন—ও-সব দেখবার লোক রেখেছ তুমি, তারাই দেখছে, তুমি আর ও-সব নিয়ে ভেবো না—

—ওরা কি পারবে?

—না পারলে না পারবে, তা বলে তোমাকে আর ভাবতে হবে না ও-সব।

কর্তাবাবু থেমে গেলেন। খানিক পরে বললেন—কাশী থেকে গুরুদেবকে একবার ডাকতে হবে—

—কেন?

কর্তাবাবু বললেন—অনেকদিন আগে কাশী গিয়েছিলাম, তোমার অসুখ হয়েছিল খুব—খুব অসুখ—

মা-মণি বললেন—মনে আছে—

কর্তাবাবু বলতে লাগলেন—মনে তো থাকবেই, মনে তো থাকবেই, আমারও মনে আছে, মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না, কেবল মনে পড়ছে—

—সে-কথা না-ই বা মনে করলে। আমি যে সেবার ভালো হয়েছি সে কেবল বিশ্বনাথের দয়ায়—

কর্তাবাবু আপত্তি করতে লাগলেন—না গো না, বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, সবই ভবিতব্য,—

সেদিন মা-মণি খাস-বরদারকে জিজ্ঞেস করলেন—কর্তাবাবু কেমন আছেন রে?

খাস-বরদার বললে—বাবু চিঠি লিখছিলেন মা—

মা-মণি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—এই শরীরে আবার চিঠি লিখছিলে! কোথায় এমন চিঠি লেখবার দরকার হলো এখুনি?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে—

—কাশীতে কার কাছে ?

কর্তাবাবু বললেন—গুরুদেবের কাছে—

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। এর পর থেকে মা-মণিই সংসারের সব চাবিকাঠি হাতে নিয়েছিলেন। খাজাঞ্চিখানার হিসেব রোজকার মতো তিনি বুঝে নিতেন। জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হয়েছেন। মামলা-মোকর্দমার ব্যাপারটা তিনিই এসে বুঝে-শুনে নিয়ে যেতেন। পড়াশোনা হলো না খোকনের। কিছু উপায় নেই। কিন্তু খরচটা বেঁধেছেন মা-মণি। খাজাঞ্চিখানার খাতা থেকে অনেক বাজে-খরচের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পুরোহিত-বাড়িতে মাসকাবারি বন্দোবস্ত ছিল একখানা ধুতি, একটা শাড়ি, আধমণ ডাল, একখানা সিধে, আর গামছা।

গুরুদেবের নামে বাৎসরিক প্রণামী বাবদ বরাদ্দ ছিল নগদ পাঁচশো টাকা, পাঁচখানা ধুতি, গুরুমায়ের জন্যে তিনটে শাড়ি, এককৌটা সিঁদুর, তিনমণ চাল, আর দুখানা গামছা।

তারপর দান-খয়রাতেরও বরাদ্দ ছিল নানা জায়গায়। হলুদপুকুরের জ্ঞাতিদের পুজোর সময় কাপড়, চাদর আর টাকা। এমনি কত অসংখ্য! সংসার সেনের যখন সময় ছিল, তখনকার রেওয়াজ সব। বংশের উন্নতি হয়েছে, ভোগ বেড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দান-খয়রাতের ফর্দও সব বড় হয়েছে ক্রমে ক্রমে। তখন ধানকল ছিল, তেলকল ছিল বেলেঘাটায়, খড়ের আমদানি-রপ্তানি ছিল, তেজারতী মহাজনী ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। এখন নেই, এখন সব কমাতে হবে। ভগবান দিন দেন তো আবার হবে। আবার বড় হবে ফর্দ।

মা-মণি নিজে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছেন আর কালিদাসবাবু পড়ে গেছেন।

মা-মণি বলেছেন—পাঁচখানার বদলে দুখানা ধুতি করে করে দিন—আর নগদ টাকা একশো—ওতেই চালাতে হবে—

তারপর বললেন—বড়বাবুর হাতখরচ গেলমাসে কত লিখেছেন ?

—আজ্ঞে, চব্বিশহাজার সাতশো তেষট্টি টাকা ন'আনা।

খোকনের আর সে স্বভাব নেই। অনেক শুধরেছে এখন। আগের চেয়ে অনেক শুধরেছে। আগে মাসের মধ্যে চারদিন পাঁচদিন বেরোত। এখন একদিন। কোনও কোনও মাসে বড়জোর দু'দিন। কিন্তু যাবার সময় মাস্টার জগত্তারণবাবু সঙ্গে থাকে। যাবার আগে মা-মণির পায়ের ধুলো নিয়ে যায় এখনো। বৌমার সঙ্গে দেখা করে যায়। মা-মণি পেস্তা-বাদামের শরবত তৈরি করে দেন। মাছের মুড়ো দেন পাতে। বাড়ির ঘি।

খোকন এসে প্রণাম করে পায়ে।

বলে—মা, অনুমতি করো, আসি তাহলে ?

গিলে-দেওয়া পাঞ্জাবি পরে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরে এসে বারান্দার ওপরে পম্পশু জোড়া খুলে রেখে মা-মণির মহলে আসে। নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায় খোকন।

মা-মণি বলেন—এই শরীর খারাপ নিয়ে আবার কেন যাচ্ছ বাবা!

কয়েকখানি ভালো প্রাইজ ও লাইব্রেরী বই

পালা-পার্বন ছড়াছন্দ ৩৸০

বই	মূল্য
স্বপনবুড়োর নব কথামালা—	১৸০
ম্যাদাম বোভারী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	২॥০
প্রেম ও প্রিয়া—শ্রীঅনুরাধা দেবী	২॥০
কাব্যে শকুন্তলা—শ্রীকালিদাস রায়	৩॥০
ব্রজ বাঁশরী— ঐ	২॥০
গোর্কির ছোট গল্প— ঐ	২৲
গোর্কির ডায়েরী— ঐ	২৲
গোর্কির তিনটি গল্প— ঐ	২।০
টুর্গেনিভের ছোট গল্প— ঐ	১৸০
টুর্গেনিভের তিনটি গল্প— ঐ	২৲
রেশারেকশান— ঐ	৩৲
লা' মিজারেবেল—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৸০
শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডী— ঐ	১॥০
শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্রাজেডী— ঐ	১॥০
ছোটদের শেক্‌স্‌পীয়ার— ঐ	১॥০
আরেবিয়ান নাইট্‌সের গল্প— ঐ	৩৲
বেনহুর— শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৸০
আংকল টম্‌স কেবিন— ঐ	১৸০
হ্যাঞ্চব্যাক অফ নতরদাম— ঐ	১৸০
টলষ্টয়ের ছোটদের গল্প— ঐ	১৸০
লাষ্ট ডেজ অফ পম্পেই— ঐ	১৸০
এনডারসেনের গল্প—শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু	১৸০
সোনালী নদীর রাজা—শ্রীঅনুরাধা দেবী	১৲
গ্যালিভারস্‌ ট্রাভেলস্‌— ঐ	
সাতসাগরের সাওয়ার সিন্দুবাদ—ঐ	১।০
রোবিনহুড— ঐ	১৸০
রূপবাণী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	২॥০
নূতন যুগের নূতন মানুষ—ঐ	১॥০
যুগে যুগে— ঐ	১॥০
গল্প হলেও সত্যি— ঐ	১।০
জওহরলাল— ঐ	১॥০
অমৃত কাহিনী—শ্রীক্ষিতীশ কুশারী	১।০
মজার গল্প—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
রূপলেখা—শ্রীঅনুরাধা দেবী	১৸০
বিশ্বের ইতিহাসে বাঙালী—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী	১॥০
কালের স্রোতে মানুষ—শ্রীনরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী	১।০
চলো যাই—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন	১৲
সিপাহী যুদ্ধের অমর কাহিনী—	১।০
আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১॥০
রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী—স্বামী জ্ঞানানন্দ	১।০
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী—শ্রীবিজলী মুখোঃ	১।০
গান্ধিজীর জীবন ও বাণী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর	৸৵০
নেতাজীর জীবন ও বাণী— ঐ	৸৵০
অমর ভারতী—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১।০
দেশবিদেশের রূপকথা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	১।০
গল্পে মহাভারত—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১॥০
অমর কাহিনী—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
ছেলেদের একাঙ্কিকা—শ্রীঅখিল নিয়োগী	২৲
মেবার কাহিনী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১॥০
জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা কথা— ঐ	১।০
জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—ঐ	১।০
শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের গল্প— ঐ	১॥০
অমর বাঙালী—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী	১।০
বেদ পুরাণের কাহিনী— ঐ	
গল্প লহরী—শ্রীঅরবিন্দ বড়ুয়া	১৲
খেলার ছলে ব্যায়াম—বুকানন ও রায়	১॥০
দেশী খেলা— ঐ	৸০
নীতি গাথা—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	১৲
তৈমুরলঙ্গের দেশে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
লাল ফৌজের কীর্ত্তি-কাহিনী—ঐ	
মঙ্গল-কাব্যের কাহিনী—শ্রীদিতিকুমার রায়	

এন ধর এণ্ড সনস্‌ (প্রাইভেট) লিমিটে

১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক বিভাগ—২নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা ৭

বড়বাবু বলেন—শরীরটা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে বড়ো—

মা-মণি বলেন—তাহলে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠালে হতো—

বড়বাবু বলবেন—ও ডাক্তার-ফাক্তারের কম্ম নয়, মা—ও মিছিমিছি টাকা নষ্ট, মুখ নষ্ট—

মা-মণি তখন সাবধান করে দেবেন—কিন্তু বেশি অত্যাচার যেন না হয় দেখো বাবা, শরীরটা আগে—

ভক্তি করে পায়ের ধুলো নিয়ে বড়বাবু তখন চলে যাবেন বৌ-মণির ঘরে।

বৌ-মণি এতক্ষণ সমস্ত শুনেছে। সকাল থেকেই শুনে আসছে। সকাল থেকেই আয়োজন করেছে, সকাল থেকেই সেজেছে গুজেছে। আলমারি থেকে ভালো শাড়িটা বের করে পরেছে। কানের হাতের নাকের গয়নাগুলো বার করে পরেছে। সব সাজ-গোজ এই পাঁচ মিনিটের জন্যে।

বড়বাবু ঘরে ঢুকতেই বৌ-মণি এগিয়ে এসেছে।

বড়বাবু বলেছে—আমি চললুম, জানলে—

—আবার আজকে কেন?

—যাই একটু ঘুরে আসি।

—না গেলেই নয়? তোমার শরীরটা খারাপ, এই ভাঙা শরীর নিয়ে আবার কেন যাচ্ছো?

বড়বাবু বললেন—শরীরটা বড় ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে আজ—যাই, কেমন?

তারপর গুলমোহর আলি গাড়ি জুতেছে। আবদুল দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর নফর? যে-নফরের সারা মাসে পাত্তাই পাওয়া যায় না, যে-নফরের দাম এ-বাড়িতে কানাকড়িও নেই কারো কাছে, সেই নফরেরই আবার অন্য মূর্তি তখন। ভেতরে লাল সিল্কের গেঞ্জি, টাটকা-টাটকা চুল ছেঁটেছে, পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে পয়সা ঝন্‌ঝন্‌ করছে—

চীৎকার করে ডাকে—গুলমোহর, গাড়ি লে আও—

কত কাজ তার! অ্যাটর্নী-অফিস থেকে জগত্তারণবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে-ই। একা সমস্ত ঝক্কি নিয়েছে। শুধু কি জগত্তারণবাবু! বড়বাবুর তদ্বির-তদারক তাকেই করতে হবে। বড়বাবুর ধুতির কোঁচা যদি মাটিতে লুটিয়ে কাদা লাগে তো নফরকেই তা তুলে ধরতে হবে। বড়বাবুর তোয়াজ করাই এখন কাজ নফরের। বড়বাবুর ঘুম পেলে নফর-ই তাকিয়াটা এগিয়ে দেয়। বড়বাবুর সিগারেট তেষ্টা পেলে দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

বাড়ির সামনে হৈ-চৈ বাধিয়ে তোলে নফর—অ্যাই, হট্‌ যাও সব, হট্‌ যাও—এখন নেই হোগা—বড়বাবু বেরোচ্ছে এখন—

খাজাঞ্চি কালিদাসবাবু, মুহুরিবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে আর মনে মনে গজরায়।

চুপি চুপি বলে—নফর বেটার দেমাক ছাখো—বেটা যেন আজ লাট না বেলাট—

কিন্তু নফরের মুখের ওপর কারো কথা বলবার সাহস থাকে না সেদিন। কারো সাহস হয় না নফরের ব্যাপার দেখে হাসে মুখের ওপর। বড়বাবুও সেদিন কথায় কথায় নফর আর নফর।

সেদিন সকাল থেকেই বড়বাবু ডাকাডাকি করে—হ্যাঁ রে, নফর কোথায়?

নফরও গিয়ে একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে দেয়।

বলে—আমাকে স্মরণ করেছেন বড়বাবু!

বড়বাবুর কথা বলতে যেন কষ্ট হয়। বলেন—কোথায় থাকিস তুই, জগত্তারণবাবুকে একবার খবর দিতে হবে যে—

—আজ্ঞে, এক্ষুনি খবর দিচ্ছি বড়বাবু।

বলেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমে আসে। তখন যদি কেউ সামনে পড়লো তো মার-মার কাণ্ড বেধে যাবে।

—দেখতে পাস্‌না উল্লুক কোথাকার, কানা নাকি! চল্‌ বড়বাবুর কাছে চল্‌—শিগ্‌গির চল্‌—

হাতে বোধহয় মাথা কাটতে পারে তখন নফর। তারপর যখন বড়বাবু মা-মণিকে প্রণাম সেরে বৌ-মণির সঙ্গে দেখা করা সেরে নিচে নামবে, জগত্তারণবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি এগিয়ে যাবেন। বড়বাবু আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠলে জগত্তারণবাবু পেছন পেছন উঠবেন। আবদুল দরজা বন্ধ করে দেবে।

নফর গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি মেরে বলবে—তা হলে গাড়ি ছেড়ে দেব স্যার?

বড়বাবু বলবেন—ছাড়্‌, ছাড়তে এত দেরি কেন তোদের?

আর কথা নেই। ভূষণ সিং গেট্‌ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নফর তড়াক করে ওপরে গুলমোহর আলির পাশে বসে বলবে—চালাও—চালাও পান্‌সী বেলঘরিয়া—

বড়বাবুর বাগানবাড়ি বেলঘরিয়ায়। জগত্তারণবাবুকে

অনেকবার বলেছিলেন মা-মণি—আপনি তো এ-বাড়ির সব জানেন, আইনের কাগজপত্তোর সবই তো আপনি দেখেছেন, এস্টেটের আর সে-আয় নেই, এখন একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন—

জগত্তারণবাবু বলতেন—আমি তো বলি মা-জননী, একটু একটু শুধরেছে আজকাল—এখন মাসে একবার করে যান, এর পর দেখবেন একেবারে বন্ধ করে দেব—

মা-মণি বলেন—আর শরীরটাও তো আগের মতো নেই কিনা খোকার—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এখন এক গেলাস খেলেই টলতে থাকেন।

মা-মণি বলেন—যা ভালো বোঝেন আপনি করবেন, আপনি ওর মাস্টার ছিলেন—আপনিই ওর গুরুর মতন—আপনার ওপরেই ভরসা—

ছেলে চলে যাবার পর মা-মণি ডাকেন—বৌমা—

বৌ-মণি এসে দাঁড়ান।

মা-মণি বলেন—খোকা দেখা করে গেল তোমার সঙ্গে?

বৌ-মণি বলেন—হ্যাঁ—

—কবে আসবে কিছু বলে গেল?

বৌ-মণি বলেন—তাড়াতাড়িই আসবেন বললেন—

প্রত্যেকবারই তাড়াতাড়ি করে আসার কথা দেন বড়বাবু। তবু প্রতিবারই দেরি হয়। তিন দিন তিন রাতের আগে কখনও ফিরতে পারেন না। বেলঘরিয়া গিয়ে বড়বাবু পৌঁছুবার আগেই খবর পৌঁছে যায়। নফর গাড়ি থেকে নেমেই বড়বাবুকে ধরে নামিয়ে দেয়। ধুতির কোঁচাটা নিজের হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে—আপনি নেমে আসুন স্যার, নেমে আসুন আগে—

বড়বাবু বলেন—বোতলগুলো রইল—

নফর বলে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, নফর আছে—

তারপর বাড়ির চাকর-বাকর দৌড়ে আসে। এসে বড়বাবুর পায়ের ধুলো ঠেকায় মাথায়।

বলেন—তোরা আছিস কেমন সব রে?

সবাই বলে—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি—

জগত্তারণ একপাশে নফরকে ডেকে বলে—নফর, তবলচিকে খবর দিয়েছিস তো, এখনও এসে পৌঁছুল না—

নফর বলে—সব ঠিক আছে অ্যাটর্নীবাবু, আপনি ভাববেন না, নফর ভোলে না কিছু—

—আর মালা? ফুলের মালা?

নফর বলে—ফুলওলা গাড়ি করে ফুল নিয়ে দিয়ে যাবে, সাত টাকা বায়না দিয়ে এসেছি—

হাঁফাতে হাঁফাতে বড়বাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন। নফর আগে আগে গিয়ে ফরাসের ওপর চাদরটা ঠিকঠাক করে ঝেড়ে দেয় হাত দিয়ে। তারপর তাকিয়া গোলগাল করে দিয়ে বলে—বসুন স্যার আয়েস করে—

তারপর ডাকে—অ্যাই, রাধারমণ না শ্যামরমণ—কী নাম তোর?

চাকরটা থতমত খেয়ে বলে—গোকুল—

—ওই হলো, হাওয়া কর্‌না বেটা, দেখছিস্ বড়বাবু ঘামছেন—

বড়বাবু বললেন—এক গেলাস জল—

নফর লাফিয়ে উঠলো।

—অ্যাই, কে আছিস্, ষষ্টি—ষষ্টিচরণ না গুষ্টিচরণ কী নাম যেন বেটার—

গোকুল বললে—আমি যাচ্ছি—

নফর বললে—তুই না, এই যে ষষ্টিচরণ, বেশ ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বরফ দিয়ে জল আনবি এক গেলাস,—

তারপর নিচু হয়ে বড়বাবুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে—সোডা ঢালবো স্যার?

বড়বাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন—হবে, হবে, অত তাড়া কিসের, একটু হাঁফ ছাড়তে দে রে বাবা—

নফর হাতের ধুলো-টুলো ঝেড়ে নিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার,—

জগত্তারণবাবু বললে—নফর, তবলচি এলো কিনা ত্যাখ্ তো তুই আগে—

বড়বাবু বললেন—আবার তবলচি কেন মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বললে—একটু গান-টান হবে না? অনেকদিন গান-টান শুনিনি কিনা, ভালো বাজায় আর কি, লহরাতে খুব নাম আছে লোকটার—

বড়বাবু বললেন—একটু জিরোতে এসেছিলাম এখানে, তা-ও তুমি দেবে না দেখছি মাস্টার—

—তা তুমি যদি না চাও বড়বাবু তো থাক্ না, এই তবলচি এলে তাকে চলে যেতে বলবি নফর—

বড়বাবু বললেন—এই তোমার বড় দোষ মাস্টার, তুমি অমনি রাগ করলে—বাজাতে এসেছে তো চলে যাবে কেন আবার। তামাক দিতে বল্ নফর—

নফর বললে—এই ষষ্টিচরণ, বেটা জল দিয়ে চলে

যাচ্ছিস্—তামাক দে—ততক্ষণ সিগ্রেট খান স্যার— ব'লে সিগারেটের কেস্‌টা খুলে বাড়িয়ে দিলে সামনে।

হঠাৎ পাশের দরজার পরদা নড়ে উঠলো।

নফর কানের কাছে মুখ এনে বললে—ওই মা আসছেন বড়বাবু—

তসরের কাপড়ে আগাগোড়া মুড়ে গিন্নীবান্নি মানুষটি ভেতরে এলেন।

জগত্তারণবাবু একটু নড়ে জায়গা করে দিলে। বললে—আসুন মা, এই দেখুন কাকে ধরে নিয়ে এসেছি—

বড়বাবু বললেন—না না, আমি তো ক'দিন থেকেই ভাবছি আসবো, জুৎ করতে পারছিলাম না তাই—

বড়বাবু পায়ে হাত দিতে প্রণাম করলেন।

মহিলাটি বললেন—থাক্ থাক্, বেঁচে থাকো বাবা, আমিও ক'দিন থেকে ভাবছিলাম ছেলে আসেনা কেন, আর—টেঁপিরও তো শরীরটা ভালো নেই কিনা—

নফর লুকিয়ে ছিল। বললে—কেন, বৌদিমণির আবার কী হলো মা?

—দাঁত কনকন করছে কাল থেকে, কিছু মুখে দিতে পারে না—পানের নেশা আছে তো, পান না মুখে দিলে আবার একদণ্ড থাকতে পারেনা আমার টেঁপি—

নফর বললে—এখন কেমন আছেন বউদিমণি?

মহিলাটি বললেন—আজকে দুটো পান খেয়েছে, হামানদিস্তেতে ছেঁচে দিলুম। বলি, ভাত না হলেও চলবে কিন্তু পান না হলে তো তোর চলবে না—তা সে-কথা থাক্—তোমার মা-মণি কেমন আছেন বাবা?

বড়বাবু বললেন—ভালো—

—আহা, ভালো থাকলেই ভালো বাবা, তুমি মা-মণিকে দেখো বাবা, সংসারে মায়ের তুল্য আর কেউ নেই বাবা জানলে—আর আমার বৌমা কেমন আছে?

বড়বাবু বললেন—ভালো. আপনি কেমন আছেন?

—আমার আর থাকাথাকি বাবা, টেঁপিকে আর তোমাকে রেখে যেতে পারলেই হয় বাবা। টেঁপিকে তাই বলি, ছেলের আমার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, তোর কপালেই আমার অমন ছেলে জুটেছে—। তা তোমার শরীর ভালো আছে তো? কী খাবে বাবা আজ রাত্তিরে?

বড়বাবু বললেন—আপনি নিজের হাতে রান্না করে যা দেবেন তাই খাবো মা, আমার খাওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না—

মহিলাটি বললেন—আজ মুরগীর চপ্ করেছি বাবা,—আর সরু পেশোয়ারী চালের পোলোয়া—

নফর বললে—তোফা তোফা,—

বড়বাবু বললেন—থাম্ তুই নফর, আপনার এই শরীর নিয়ে আবার এত খাটতে গেলেন কেন মা?

—খাটুনি কেন বলছো বাবা, ছেলের জন্যে কি মায়ের কষ্ট হয় বাবা? আহা, টেঁপিও সকাল থেকে খুব খাটছে আমার পেছনে—

বড়বাবু বললেন—শরীর নষ্ট করে রান্না-বান্না করার কী দরকার ছিল—

—না, তা হোক, ছেলে খাবে আর ঠুঁটো হাতে বসে থাকবো আমি, তা কি হয়, টেঁপি বললে মুরগীর চপ্ তুমি খেতে ভালোবাসো, তাই··· আচ্ছা বোসো বাবা, আমি টেঁপিকে ডেকে দিচ্ছি—

টেঁপি আসুক। সংসার সেনের আমল থেকে এ-বংশে কত টেঁপি কত পুতুলমালা কতবার এসেছে কতবার গেছে তার হিসাব খাজাঞ্চিখানার নথিপত্র দেখলে হয়ত মিলবে। হয়ত আরো অনেক কিছুই মিলবে সেখানে। এ-বংশের আয়-ব্যয়ের হিসেবের সঙ্গে সেই অন্যায় আর অপব্যয়ের একটা ফিরিস্তিও মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে একটা ধারা চলে আসতে আসতে ক্ষীণ হয়ে এলেও, তার জের শিরা-উপশিরার মধ্যে আজও চলেছে। মুরগীর চপ্, ফুলের মালা, তবলচি, টেঁপির দাঁতের ব্যথা,—কিছুই কোনদিন বাদ পড়েনি এখানে, এখনও পড়লো না। এর পর টেঁপিও আসবে। আর শুধু টেঁপি নয়, জুয়েলার্স মনসুখলাল-কোম্পানির শেঠজীও আসবে। হীরে, পান্না, চুনী, জহরত, জড়োয়া গয়নার নমুনাও বার করবে। সেবারের টাকাটা এবারে শোধ হবে। এবারের জড়োয়ার নেকলেস্‌টার দাম পরের বারে মিটলেই চলে যাবে। বড়বাবু তো নতুন অচেনা আদমী নয়। চেনা ঘর। হাজার হাজার লাখ লাখ জড়োয়া পড়ে থাক্ না—। তাগাদা করবে না জুয়েলার্স মনসুখলাল অ্যাণ্ড কোম্পানি। আর তারপরেই খাজাঞ্চিখানার খাতায় বড়বাবুর নামে এই দিনের মোট খরচা লেখা হবে—চব্বিশ হাজার সাতাশো তেষট্টি টাকা ন'আনা—

রাত তখন অনেক। মা-মণির বারান্দার জানালা থেকে যতদূর দেখা যায় সব জায়গায় অন্ধকার। সব বাড়ির আলো নিভে গেছে এখন। বৌ-মণির ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরে সিন্ধুমণি অপেক্ষা করতে করতে বুঝি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

গুরুপুত্র অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাশীর পণ্ডিত

গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে। অনেক টোল, অনেক বংশের গুরুদেব তিনি।

গুরুপুত্র যাবার আগে বলেছিলেন—এই চিঠিটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, কর্তাবাবু কুড়ি বছর আগে এ-চিঠিটা বাবার কাছে লিখেছিলেন—

তখনও চিঠিটা পড়ে আছে। কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন বটে! কিন্তু সে চিঠি যে কাশীতে বাচস্পতি মহাশয়কে লিখেছিলেন তা এতদিন পরে জানা গেল।

মা-মণি বার বার চিঠিটা নিয়ে দেখতে লাগলেন।

কখনও লেখাপড়া শেখেননি তিনি। লিখতে পড়তে কেউ শেখায়ওনি। কবে একদিন পাঁচবছর বয়সে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলেন। সে তো অনেক কাল আগেকার কথা। ভুলেই গেছেন সব। এতবড় বাড়ি, এত টাকা এদের। সব তাঁর অধিকারে।

কর্তাবাবু বলতেন—এই তো নিয়ম—

মা-মণি বলতেন—নিয়ম কি আর বদলায় না?

—কে বদলাবে?

মা-মণি বলতেন—কেন, তুমি বাড়ির কর্তা, তুমিই বদলাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—বদলে লাভ কী, এ-বাড়িতে একটু নিয়ম মেনে চলাই ভালো!

মা-মণি বলতেন—তা বলে বসে বসে সব মাইনে খাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—কিন্তু ছাড়িয়ে দিলেই বা যাবে কোথায় ওরা? ও কাজ করছে এ-বাড়িতে, ওর বাবা কাজ করেছে, ওর ঠাকুর্দা করেছে, ওর ঠাকুর্দার বাবা কাজ করেছে, আবার ওর ছেলে হলেও কাজ করবে এ-বাড়িতে—ওদের জন্মই হয়েছে আমাদের সেবা করবার জন্যে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না—

তিরিশ সের দুধ হতো গরুর। সব কি খেত কেউ! ফেলা-ছড়া ক'রে-ক'রেও ফুরোত না সব। মা-মণি হুকুম দিলেন—ঘি হবে বাকী দুধে, রান্নাবাড়িতেও লোক রয়েছে, কিছুই অভাব নেই যখন তখন নষ্ট হবে কেন?

শুধু কি দুধ! সেই ছোটবেলা থেকে যখন বুঝতে শিখলেন, দেখলেন এখানে অন্যায় করলে সইবে না, অত্যাচার করলেও সহ্য হবে না। অনিয়মও সইবে না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো আস্তে আস্তে মা-মণির অনেক কিছুই সহ্য হয়ে এলো। শুধু সহ্য হলো না মিছে-কথা।

বলতেন—মিছে-কথা বললে আমি সহ্য করবো না কিছুতেই—

প্রথম প্রথম খোকন বড় হওয়ার পর হঠাৎ এক-একদিন কোথায় থাকতো, সারাদিন সারারাত বাড়ি আসতো না। দু'দিন পরে হয়ত আবার বাড়ি এলো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলে এতদিন?

খোকন বলতো—আট্‌কে পড়েছিলুম মা, আসতে পারিনি—

—কোথায় আট্‌কে পড়েছিলে?

এর কোনও উত্তর নেই।

মা-মণি আবার বললেন—বলো?

কিছুতেই উত্তর দেয় না।

—বলো!

খোকন বললে—বন্ধুর বাড়ি।

—কোন্ বন্ধুর বাড়ি?

আর বলতে পারে না।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—সঙ্গে কে কে ছিল?

খোকন বলেছিল—মাস্টার।

—জগত্তারণবাবু? আর কে?

খোকন বললে—নফর।

জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠানো হলো। জগত্তারণবাবু এসে বললেন—মিছে-কথা আপনার কাছে বলবো না মা-জননী, আমরা গিয়েছিলাম পানবাগানে—

মা-মণি বললেন—আচ্ছা আপনি যান—

তারপর ডাক পড়লো নফরের। নফরকে অকথ্য কুকথ্য বলে ধমকালেন খুব। তারপর হুকুম হলো নিম-গাছে বেঁধে নফরকে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে। সে কী দিন একটা! নফরই খোকাবাবুকে খারাপ করে দিচ্ছে। যেখানে-সেখানে নিয়ে যায়। বদ ছেলে কোথাকার! বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকাল থেকে আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। এক কথা কেবল—নফরকে নিম-গাছে বেঁধে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে।

লোহার-নাল-বাঁধানো জুতো। নিমগাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে নফরকে।

ভূষণ সিং জুতো দিয়ে মারছে আর দর-দর করে রক্ত পড়ছে গা থেকে। আর নফর চীৎকার করছে—আর করবো না গো, আর করবো না—ছেড়ে দাও—

গুণে গুণে পঁচিশ ঘা। যখন পঁচিশ ঘা শেষ হলো, তখন নফর প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। লাক-লাইন দড়িটা খুলতেই ঝপ্ করে খসে পড়লো মাটিতে!

মা-মণি সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠালেন জগত্তারণবাবুকে।

জগত্তারণবাবু এলেন।

ওপর থেকে মা-মণি বললেন—সংসার সেনের বংশের ছেলে পানবাগানে রাত কাটাবে এটা বড় লজ্জার কথা মাস্টারমশাই,—

জগত্তারণবাবুও স্বীকার করলেন—আজ্ঞে, লজ্জার কথাই তো মা-জননী—

মা-মণি বললেন—তা আপনি এতদিন কর্তাবাবুর সঙ্গে ছিলেন, আপনার এই জ্ঞানটা হলো না? বাজারে কি আর ভালো জায়গা নেই? কর্তাবাবুর বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়িটা তো পড়ে রয়েছে, সেখানে যেতে পারেন না?

জগত্তারণবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র—

মা-মণি বললেন—না, আপনি একটা ভালো-গোছের মেয়ে দেখুন, তাকেই রাখুন বাগানে, আমি খরচা যা লাগে দেব।

জগত্তারণবাবু সেদিন পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তা সেইদিনই টেঁপিকে খুঁজে বার করলেন জগত্তারণ-বাবু। রামবাগানের একটা ঘরে মা'র সঙ্গে ছিল। বড় দুরবস্থা। তাকেই জগত্তারণবাবু এনে দেখিয়ে গেলেন মা-জননীকে। মেয়েটি বেশ মোটাসোটা। মাজা-ঘষা রং। মেয়েটি মা-মণিকে প্রণাম করতে গেল।

মা-মণি দু'পা পেছিয়ে গেলেন। বললেন—ছুঁয়োনা বাছা—থাক্—

গড়ন-পেটন দেখলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। কোনও খুঁত নেই।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললে—টেঁপি—

মা-মণি টেঁপির মাকে বললেন—তোমার মেয়ে বেশ বাছা, এখন তোমার মেয়ের বরাত—যাও তোমরা—

তারপর হুকুম হলো—বেলঘরিয়ার বাগানের বাড়িটা মেরামত করতে হবে। খাট বিছানা পালঙ সবই আছে। কিন্তু কর্তাবাবুর চলে যাবার পর কেউ আর ব্যবহার করেনি ওগুলো। তোষক বালিশ গদি সবই পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আলমারির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। সব আবার সারানো হলো। তারপর শুভদিন দেখে টেঁপি আর টেঁপির মা এসে উঠলো।

এর পর যথাসময়ে বিয়ে হলো, বৌ-মণি এল। কতদিন কেটে গেল। একলা হাল ধরে চলেছিলেন মা-মণি। একলা এই সমস্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাথায় বসে তিনি কলকাঠি নেড়ে এসেছেন এতদিন, কেউ আপত্তি করেনি। যে নিয়ম ভেঙেছে তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু আজ বুঝি তাঁরই শাস্তির পালা!

মা-মণি কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠিখানা আবার দেখলেন। ছোট ছোট কালির আঁচড়। কিছু বোঝা যায় না। কুড়ি বছর আগে কর্তাবাবু লিখেছিলেন তাঁর কুল-গুরুদেব গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতিকে।

গুরুপুত্র বললেন—কর্তাবাবু বলেছিলেন এ-সম্পত্তির যতখানি সুবর্ণর প্রাপ্য, ততখানিই প্রাপ্য নফরের। বাবা বললেন—ও-ও তো বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান—ওর সমান অধিকার আছে।

—কিন্তু আমি যে দত্তক গ্রহণ করেছি!

—কিন্তু এই নফরকেই দত্তক গ্রহণ করবেন তিনি, এ-কথা তিনি বাবাকে বলেছিলেন। কিন্তু দত্তক-গ্রহণের দিন কাশীর লোককে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয়নি আপনার দরোয়ান!

মা-মণি বললেন—কিন্তু তা হলে সে পাপ কার? তার জন্যে আমার খোকন কেন ভুগবে?

গুরুপুত্র বললেন—কাশীতে যে-সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, সে-সত্য আর বদলানো যায় না, আমার বাবা তাই বললেন।

মা-মণি বললেন—কিন্তু যিনি কথা দিয়েছিলেন তিনি তো এখন আর নেই?

—কিন্তু আপনি তাঁর ধর্মপত্নী, আপনি তো আছেন? তাঁর পুণ্যফল কিম্বা কর্মফল সব তো আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

মা-মণি কেঁদে পড়েছিলেন তখন।

সত্যিই কী নিয়ে বাঁচবেন তিনি! এই বংশের বিধবা হয়ে এরই সমাধি তিনি রচনা করে যাবেন! অনেক অপব্যয় হয়েছে অবশ্য, আজো হচ্ছে, হয়ত আরো হবে, কিন্তু তাঁর যেন মনে হলো এতদিন পরে তিনি হেরে গেলেন। কর্তাবাবু থাকলে তাঁর তেমন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাঁর পায়ের তলার মাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে খোকনেরও যতখানি অধিকার, নফরেরও ঠিক ততখানি। সে কেমন করে হয়। আর মঙ্গলা! মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। সেই মঙ্গলা! কাশী যাবার আগে বার বার সন্দেহ হয়েছিল তাঁর। তার চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।

মনে পড়লো, তিনি সেইজন্যেই সেদিন বারণ করে দিয়েছিলেন—কর্তাবাবুর সামনে আসতে—

—কিন্তু আর কারো রক্ত পাওয়া গেল না?

—আপনার সঙ্গে সকলের রক্ত তো মিশবে না। তাই বাবা লক্ষণ মিলিয়ে তাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু বিয়ে হবার কী দরকার ছিল?

—আপনাদের বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে।

মা-মণি বললেন—কত লোকের রক্ত কত লোককে দেওয়া হচ্ছে, তাতে তো কেউ আপত্তি করে না?

—তা করে না, কিন্তু বাবা কেমন করে তা অগ্রাহ্য করবেন? তাঁর শিষ্যের জীবন-সংশয় যেমন একদিকে, অন্যদিকে ধর্মরক্ষা!

একবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন—সিন্ধু—

সিন্ধুমণি সেই ছোট জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলাই গুরুপুত্র চলে যাবেন। আর দেখা হবে না। কর্তার চিঠিখানা আবার মুঠোর মধ্যে থেকে বার করলেন। স্বামীর শেষ হাতের লেখা। মাথায় ঠেকালেন একবার। তুমি এ কী করলে? আমাকে বলোনি কেন? তোমার সমস্ত কৃতকর্মফল আমি হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতাম। কিন্তু কেন তুমি অবিশ্বাস করলে? কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না? আমার সংসার, আমার সন্তান, আমার শ্বশুর-স্বামীর জন্মভূমিকে আমি কেমন করে দু'ভাগ করে ভোগ করবো? তুমি যেখানেই থাকো, এর জবাব দাও তুমি! এর উত্তর দাও! তুমি ভেবেছ তুমি তো মুক্তি পাবে! তুমি মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু আমাকে কী বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলে? আমি কেমন করে মুক্তি পাবো? এ সমস্ত যে আমার? তুমি তোমার সত্য রেখেছ, তোমার কথা রেখেছ! কিন্তু আজ কুড়ি বছর পরে আমার কাঁধে এ কোন্ বোঝা চাপিয়ে দিলে? তীর্থের সত্য যদি মিথ্যে হয় তো সে-পাপ তুমি যেখানেই থাকো তোমাকেও স্পর্শ করবে, আমাকেও করবে। তুমি আমি কি আলাদা?

কর্তাবাবু চিঠি লিখেছিলেন গুরুদেবকে—সে-চিঠি গুরুপুত্র পড়ে শুনিয়েছেন—

পরম ধ্যানেন বন্দিত শ্রীশ্রীগিরিগঙ্গাধর বাচস্পতি

মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

শত সহস্র প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান সদা সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি।...

এমনি করেই আরম্ভ করেছেন কর্তাবাবু। মৃত্যুর ক'দিন আগের চিঠি। শেষ জীবনে বড় অস্থির হতেন তিনি মনে আছে। সেই অবস্থায় কাউকেই কোনও কথা বলতে পারেননি সাহস করে। নিজের ধর্মপত্নী, নিজের ঔরসজাত সন্তান থাকতে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের সন্তান তাঁরই বাড়িতে চাকরের মতো জীবন যাপন করে। তাঁরই ধর্মপত্নী তাঁরই বাড়িতে দাসীর কাজ করে। এ তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। আপনি গুরুদেব, স্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্যে আপনার আদেশেই তা করেছি। কিন্তু আপনি আমায় জানিয়ে দিন, তাদের গ্রহণ না করে আমি মহাপাতক হয়েছি কিনা! পরজন্মে আমি মুক্তি পাবো কিনা! কিন্তু কেমন করে আমি গ্রহণ করবো তাদের! আমার সংসার, আমার বংশ এ-সমস্ত বিবেচনা করে আমি কেমন করে ওদের গ্রহণ করি। আমি লোকলজ্জা, সংস্কার এইসবের ভয়ে সন্তানকে মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। মা জানেনা তার সন্তান তার কাছেই আছে। আজ জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমি আপনার কাছে এই পত্র দিলাম। আমার শেষ ইচ্ছা আমার সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমার চোখে দু'জনেই

সম্মান। আমার কাছে আমার তুই স্ত্রী-ই আমার ধর্মপত্নী। আপনার আদেশে আমি যখন আর একজনকে গ্রহণ করেছি, তাকে আমার ধর্মপত্নীর মর্যাদা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করিনি। এখন আপনাকেই আমি সব ভার দিয়ে গেলাম। আপনার অদৃষ্ট-গণনায় আমার প্রথম স্ত্রীর জীবৎকাল আর মাত্র কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর পরে আপনি আমার এই ইচ্ছা এই আদেশ প্রকাশ করবেন। অন্যথায় পরলোকেও আমার আত্মা অশান্তিময় হয়ে বিরাজ করবে—

দীর্ঘ চিঠি!

গুরুপুত্র নিচের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। তাঁর পিতারও মৃত্যু হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই এ-সংবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকাল তো পূর্ণ হয়ে এলো। কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর। কিন্তু কুড়ি বছরের পরও যে তিনি বেঁচে আছেন। গুরুর অদৃষ্ট-গণনা কি তবে মিথ্যে!

আর একবার সিন্ধুমণির কাছে গেলেন। নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ি। একটা বেড়াল বুঝি নিঃশব্দে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। এত রাত্রে কোনওদিন মা-মণি জেগে থাকেননি।

আবার ডাকলেন—সিন্ধু, ও সিন্ধু—

সিন্ধু ধড়ফড় করে উঠে বসলো। বললে—মা—

—মঙ্গলাকে একবার ডাকতে পারিস?

সিন্ধু বললে—মঙ্গলাকে? এত রাত্রে? রান্না করতে হবে?

—না, তুই একবার শুধু ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

মঙ্গলা এসেছিল অনেক রাত্রে। মা-মণি বলেছিলেন—সিন্ধু, তুই শুগে যা—তোকে আর জেগে থাকতে হবে না—

মঙ্গলা শুধু এইটুকু জানে যে, মা-মণির চেহারা দেখে যেন চম্‌কে উঠেছিল সে। মা-মণিকে অবশ্য বেশিবার দেখেনি মঙ্গলা। তবু সেই রাত্রে যেন সত্যিই চম্‌কে উঠলো চেহারা দেখে।

মা-মণি বলেছিলেন—বোস্—

কখনও তো মা-মণির সামনে বসবার কথা নয়। বসার নিয়মই নেই এ-বাড়িতে। এ সবাই জানে। তবু মঙ্গলা বসলো। বসে মুখ নিচু করে রইল। ঘুমোতে-ঘুমোতে উঠে এসেছে, উঠে মা-মণি ডেকেছে শুনে আরো অবাক্ হয়েছে। কিছু রান্না করতে হবে। গুরুপুত্র এসেছিলেন। তিনি খাননি। রান্নার সব জোগাড় করে রেখেও তিনি খেলেন না। খবরটা পেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার। শিশুর-মা-ও পাশে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু ডাকতেই মনে হলো কে যেন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছে তাকে। স্বপ্নই দেখছে যেন সে।

—কাশীতে গিয়েছিলি আমার সঙ্গে, তোর মনে আছে?

—মনে আছে মা-মণি!

—আমার খুব অসুখ হয়েছিল তা তোর মনে আছে?

—তাও মনে আছে মা-মণি!

—আমার অসুখের সময় কর্তাবাবুকে দেখেছিলি তুই?

মঙ্গলা যেন চম্‌কে উঠলো একটু। মা-মণির মুখের ওপর মুখ তুলেই তক্ষুনি আবার নামিয়ে নিলে।

—কথা বলছিস্ না যে?

মঙ্গলা আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে বললে—সে অনেক দিন আগেকার কথা, মা-মণি।

মা-মণি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুই আমারই বাড়িতে বসে আমারই খেয়ে পরে আমারই সর্বনাশ করেছিস?

মঙ্গলা কেঁদে ফেললে, দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার কত সাধের সংসার তুই জানিস্? সেই সংসারে তুই আগুন লাগিয়ে দিলি? আমি এখন কী করবো!

মঙ্গলার হাত-পা যেন সব আড়ষ্ট হয়ে এল। এতদিন পরে এই কথা বলবার জন্যে এত রাত্রে তাকে ডাকালেন মা-মণি?

—আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ছেলের বউ—তোর জন্যে সবাইকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? তুই আমার এমন সর্বনাশ করতে পারলি?

—মা-মণি, আমি যে···

—থাম্ তুই, দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলাম কিনা, তাই এমন করে আমার সব নষ্ট করে দিলি! আমি এখন কী করবো! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো।

বললে—মা-মণি, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই, আমি পেটের দায়ে আপনার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিলাম—

মা-মণি বললেন—তোকে আমি বলেছিলাম না যে কর্তাবাবুর চোখের সামনে না-পড়তে?

—আমি তো বরাবরই চোখের আড়ালে থাকতাম, মা!

—তবে কেন এমন সর্বনাশ ঘটালি?

—আমার মরণ-দশা হয়েছিল, মা-মণি! আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিন মা এ-বাড়ি থেকে, আমি মরে বাঁচি, আমার আর বাঁচার সাধ নেই!

মা-মণি একটু যেন কী ভাবলেন। বললেন—তোর ছেলেকে তুই দেখেছিস্?

মঙ্গলা হঠাৎ চোখে আঁচল দিলে। শেষকালে আর চাপতে পারলো না। চিরকালের চাপা মানুষ মঙ্গলা। নিজের সমস্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট শোক সব যেন হঠাৎ ফেটে বেরোলো তার সেই মুহূর্তে।

মা-মণি চীৎকার করে উঠলেন—বেরো হতভাগী, বেরো—বেরো এখান থেকে—পারিস তো গলায় দড়ি দিগে যা—বেরো আমার সামনে থেকে—

অন্ধকার বাড়ি। তার খোঁদলে খোঁদলে যেন মৃত আত্মারা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। মাঝরাতের নাটকে এখানেই বুঝি যবনিকা পড়বে। তার আগে শুধু একটু একমুহূর্তের ছেদ। মঙ্গলা টলতে-টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলো, তারপর একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে। ভয় করতে লাগলো তার। সিঁড়ির ওপর টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্টানি দিলে। বেরালটা তার পায়ের কাছ দিয়ে কোন্ দিকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো যেন।

আর তারপর···

ভোর তখনও হয়নি। বেশ রাত আছে। জগত্তারণ-বাবু খুব খেয়েছিলেন সেদিন। মুরগীর চপ্ হয়েছিল। শুধু শুধু মুরগীর চপ্ই নয়। টেঁপির মা আগে চাটের দোকানের খাবার রাঁধতো। তার হাতের কাঁকড়ার দাড়া দিয়ে পেঁয়াজ-রসুনের তরকারি যারা খেয়েছে, সে-পাড়ায় তারা এখনও আফশোশ করে। বলে—আহা, টেঁপির মা'র রান্নার মতো রান্না আর খেলুম না—

তখন টেঁপির মা'র অবস্থা খারাপ ছিল। তারপর জগত্তারণবাবুর দয়ায় এখন টেঁপির বরাত ফিরেছে। বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে উঠে এসেছে। টেঁপির মা'র হীরের নাকছাবি হয়েছে, টেঁপির জড়োয়া গয়না হয়েছে। এখন অনেক সুখ।

সেই শেষরাত্রেই কে যেন বাইরে চীৎকার করে উঠলো।

—বড়বাবু, বড়বাবু!

তখন নফরও অচৈতন্য। গান-বাজনা হয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন পরে ভালো খেয়েছে। পেট ভরে খেয়েছে। মুরগীর চপ্ চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। জগত্তারণবাবু পাশে বসে খাচ্ছিল।

বললে—খাও হে নফর—খাও, পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরোনা—

নফর বলে—আজ্ঞে লজ্জা আমার নেই, লজ্জা থাকলে আমার এই দশা—

বড়বাবু বললেন—মুরগীটা বেশ ভালো, মাস্টার—

জগত্তারণবাবু বললে—রান্নাটা বড়বাবু বড্ড ভালো এর—হোটেলে রাঁধতো তো আগে—

গুলমোহর আলি, আবদুল ওরাও খেয়েছে পেট ভরে। শুধু মুরগী নয়। টেঁপির মা বললে—আজ রান্নাটা তেমন জুৎ করতে পারিনি, আদা-বাটা বেশি হয়ে গেস্লো—
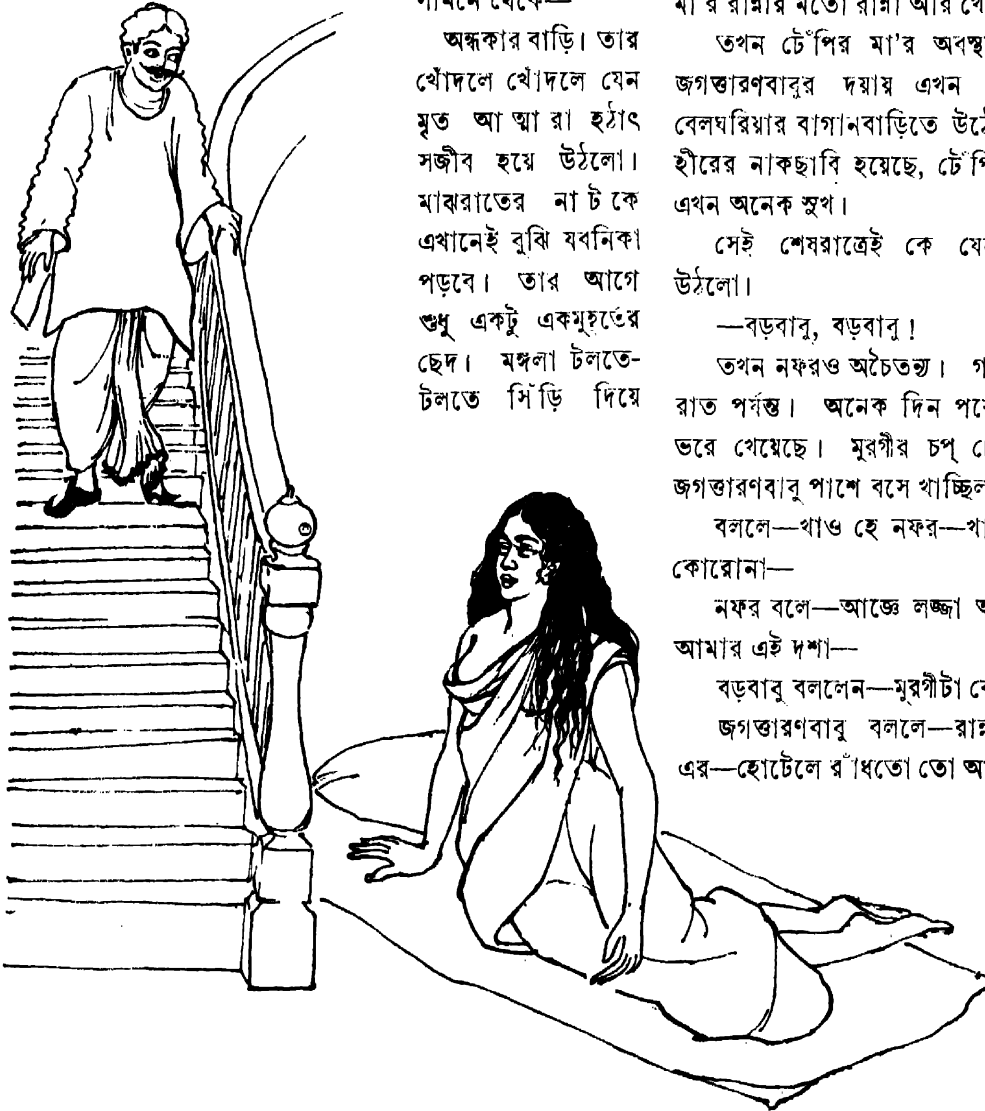
নফর বললে—পোলোয়াটাও খুব ভালো হয়েছে, মা—

খাওয়াচ্ছিল টেঁপির মা। বললে—ভালো হবে কী করে বাছা, খাঁটি ঘি কি পাওয়া যায়, নেহাত ছেলে খাবে তাই মাখন গালিয়ে নিয়েছিলাম—

—আঃ— জগত্তারণবাবু একটা আরামের ঢেকুর তুললে।

বললে—খাওয়াটা বেশ হলো বড়বাবু, কর্তাবাবুর সঙ্গে কতদিন বেলঘরিয়াতে খেয়ে গিয়েছি—

খাওয়া হয়েছে। খাওয়ার আগে আবার গান হয়েছে। টেঁপি ঠুংরিটা গায় ভালো। 'হামসে না বোল রাজা' ব'লে যখন কোমল নিখাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কি মজা! আর নিখাদ ব'লে নিখাদ! ওই নিখাদটার দাম-ই লাখ টাকা।

বড়বাবু বললেন—তোমার গলা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব এবার—

নফর শুনছিল। বললে—আহা, বউদিমণির গান শুনলেই পেট ভরে যায়—

গানের মধ্যে মনসুখলাল জুয়েলার্স কোম্পানির দালালও এসেছে। নিখাদের দাম সেখানেই উঠে গেছে বোধহয়। টেঁপির মুখেও হাসি বেরিয়েছিল নেকলেস্‌টা দেখে।

তারপর যত রাত বেড়েছে, তত মজা বেড়েছে। বড়বাবু যত বলেছে—এই শেষ, আর নয়—তত বোতল এসেছে আর খালি হয়ে গেছে। নফরও টেনেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। ভালো জিনিস। এ খেতে পাওয়ার ভাগ্য চাই।

খেতে খেতে সব যখন ফরসা, তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বাবু কাত হয়ে শুয়ে ছিল বিছানার ওপর। টেঁপির মা এসে টেঁপিকে ডেকে নিয়ে গেছে। বলেছে—আয়, ঘরের ভেতরে আয় মা,—আরাম করে শুবি আয়—

টেঁপি টেঁপির-মা'র সঙ্গে আলাদা ঘরেই শুয়েছিল। টেঁপির মা'রও বেশ নেশা হয়েছিল একটু।

হঠাৎ বাইরে চীৎকার হতেই টেঁপির মা'র নেশা কেটে গেল যেন।

বললে—ষষ্টিচরণ, ছাখ্ তো রে কে ডাকছে—

বাইরে তখনও কে দরজার কড়া নাড়ছে আর চীৎকার করছে—বড়বাবু, ও বড়বাবু—

তা সেদিন খুব ভোরেই ঠাকুরমশাই উঠেছিলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে জপ-আহ্নিক করে নিলেন। তাঁকে সকালবেলাই যেতে হবে।

পয়মন্তকে ডাকলেন—ওরে শুনছিস, মা-মণিকে একবার খবর দে, আমি যাচ্ছি—

সমস্ত বাড়ি তখন প্রায় নিঝুম। তিনি নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলেন।

হঠাৎ পয়মন্ত দৌড়তে দৌড়তে এল।

—কী হয়েছে রে?

ভেতর থেকে হঠাৎ সিন্ধুমণির আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

—কী হয়েছে রে?

—সব্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরমশাই!

এ-সব গল্প আমরা বড় হয়ে শুনেছি। আসল ব্যাপার জানতে পেরেছি পরে। কিন্তু তখন কিছুই জানতাম না আমরা।

আমরা তখন ছোট, পাড়ার সবাই বাড়িটার সামনে জড়ো হয়েছি সেদিন। লাল-পাগড়ি-পরা পুলিশ এসেছে ক'টা, আর একজন দারোগা। এ পাড়ার মধ্যে এ-বাড়িতে আগে কখনও পুলিশ আসতে দেখিনি। তবু এ বাড়ির সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের বরাবর।

—কী হয়েছে মশাই?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে লোকেরা পুলিশ দেখে থেমে যায়। বলে—কী হয়েছে মশাই এখানে? এত পুলিশ কেন?

—বাড়িতে কে গলায় দড়ি দিয়েছে শুনছি!

—কে গলায় দড়ি দিয়েছে?

—কে জানে মশাই, কে? বড়লোকের বাড়ির ব্যাপার, এ-বাড়ির খবর কে জানবে?

আস্তে আস্তে আরো ভিড় বেড়ে গেল। রোদও বাড়ছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকদের ততক্ষণ আপিস যাবার সময় হয়েছে। কয়েকজন চলেও গেল।

তারপরেই হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে এল গুলমোহর আলি।

—হট্ যাও, হট্ যাও—

বড়বাবুর গাড়ি এসেছে। ভেতরে বড়বাবু বসে ছিলেন। জগত্তারণবাবুও বসে ছিল। নফর গাড়ির মাথায়। গাড়িটা থামতেই নফর তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজাটা খুলে বললে—আসুন স্যার—নেমে আসুন—

তারপর দারোগাবাবু বড়বাবুর সঙ্গেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। কৌতূহল যেন আরো বাড়লো সকলের। আমরা আরো সামনে এগিয়ে গেলাম।

আজ এতদিন পরে এই সংকীর্তন যে গাইছি, তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

এবার পুজোর সময় কাশীতে গিয়েছিলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছি। হঠাৎ দেখি—নফর! সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, ময়লা কাপড়।

আমিই প্রথমে ডাকলাম।

—নফর!

নফর আমার ডাক শুনেই এগিয়ে এল। বললে—দাদা, আপনি এখেনে!

বললাম—তুমি এখেনে কবে এলে বলো আগে।

নফর বললে—আপনি বুঝি বাড়ি বদলেছেন? আপনাকে আর পাড়ায় দেখতে পাইনা তাই।

বললাম—তুমি এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

নফর বললে—জগত্তারণবাবুর সঙ্গে। বড়বাবু মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয়?

অবাক হলাম। বললাম—না, কবে মারা গেছেন—?

নফর অনেক গল্প বলে গেল। শেষজীবনটা বড়বাবুর স্বাস্থ্য নাকি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গলায় কিছু ঢুকতোনা আর।

খানিক পরে নফর বললে—বড়বাবুর বাড়ি-টাড়ি সব সম্পত্তি-টম্পত্তি জগত্তারণবাবু কিনে নিয়েছেন তা জানেন তো?

বললাম—সেকি! সেই অ্যাটর্নী জগত্তারণবাবু?

জগত্তারণবাবু যে শেষ পর্যন্ত সব গ্রাস করবে তা অবশ্য তখনই বুঝতে পারতাম। তবু কেমন যেন দুঃখ হলো। মা-মণি নিজেকে বলি দিয়ে সংসার সেনের বংশের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। সুবর্ণনারায়ণ সেনের ভবিষ্যৎ-ও নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শনি যে কোন্ দিক দিয়ে কখন রন্ধ্রে প্রবেশ করবে তা যদি তিনি জানতেন!

মনে আছে পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল সিন্ধুমণিকে—তোমার সঙ্গে শেষ কখন কথা হয়েছিল মা-মণির?

সিন্ধুমণি উত্তর দিয়েছিল—হুজুর, মঙ্গলাকে ডেকে দিতে বলে তিনি আমায় শুতে বললেন—আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়, তারপর আর কিছু জানিনা, সকালবেলা উঠে দেখি এই কাণ্ড—

বৌ-মণি সারারাত ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। কিছুই টের পাননি। বড়বাবু বেলঘরিয়ায় চলে যাবার পর আর মা-মণিকে দেখেননি।

একে একে সবাইকেই প্রশ্ন করেছিল পুলিশ।

মঙ্গলাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছো?

—মনে নেই কত বছর, ছোটবেলা থেকে। বিধবা হবার পর থেকেই।

—শেষ যখন তোমার সঙ্গে মা-মণির কথা হয়, তখন তিনি কী বলেছিলেন?

মঙ্গলা কী যেন ভেবেছিল খানিকক্ষণ। বলেছিল—তিনি আমার ওপর রাগ করেছিলেন—

—কেন? তোমার রান্না ভালো হয়নি বলে?

—না, তিনি বলেছিলেন আমি তাঁর ক্ষেতি করেছি।

—কী ক্ষতি?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না।

—সংসারে আপনার বলতে তোমার কে আছে?

—এক ছেলে আছে।

—কোথায় সে?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না—

এর পর বড়বাবু, জগত্তারণবাবু সকলেরই জবানবন্দী নিয়েছিল পুলিশ। শেষে ডাক পড়েছিল নফরের।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—সংসারে তোমার আপনার বলতে কেউ আছে?

—আজ্ঞে না, হুজুর।

—তোমার মা-বাবা?

—না হুজুর, আমি কাউকেই দেখিনি। তারা কোথায় তাও জানি না।

—এ বাড়িতে তোমার কাজ কী?

—আজ্ঞে হুজুর, মোসায়েবী। বড়বাবুর মোসায়েব আমি। হুজুর স্মরণ করলেই আমি সঙ্গে যাই।

—কোথায় যাও?

—আজ্ঞে বেলঘরিয়ায়।

শেষে ডাক পড়েছিল ঠাকুরমশাই-এর। তাঁরও সেদিন যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত।

পুলিশ জিজ্ঞেস করছিল—শেষ যখন আপনার সঙ্গে মা-মণির কথা হয় তখন কত রাত?

ঠাকুরমশাই বলেছিলেন—রাত বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর—

—তিনি কী-কী কথা বলেছিলেন আপনাকে?

—অনেক কথাই বলেছিলেন।

পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাঁর কি খুব মন-খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ।

—আপনি এতদিন পরে হঠাৎ কাল রাত্রেই বা এসেছিলেন কেন?

শক্তি মাদ্রাজ নস্য
রচেস্টার করোনা
Rochester Corona
25
Yencee LION
এন, সি লায়ন
হাভানা ব্লেণ্ড চুরুট
প্রস্তুতকারক :— এন, সি, আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার ফ্যাক্টরী
১১নং ডেভিডসন ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১ :: কলিকাতা অফিস ৯২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—১২

—আমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিতে। আমার বাবা ছিলেন তাঁর গুরুদেব, গুরুদেবকে তিনি খুব ভক্তি করতেন।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—শুনে কি তিনি খুব মুষড়ে পড়লেন ?

—ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর অনেক রাত হয়েছে দেখে আমিও বাইরে চলে এলাম,—

—তার পর ?

ঠাকুরমশাই বললেন—তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি—আর কিছুই জানি না, এখন ভোরবেলা শুনি এই কাণ্ড !

পুলিশ আরো সব কত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আর সে-সব কথা মনে নেই।

হঠাৎ নফর বললে—যাই দাদা, জগত্তারণবাবুর জন্যে এদিকে রাবড়ি কিনতে এসেছিলাম, তিনি আবার ঘুম থেকে উঠে রাবড়ি না খেলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন—

হাসি এলো। বললাম—কিন্তু তোমার আর কোনো বদল হলো না নফর, তুমি সেই একরকমই রয়ে গেলে—

—আর দাদা !

নফরও হাসতে লাগলো।

বললে—আর দাদা, আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—

ব'লে নফর চলে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হলো—মঙ্গলার কথাটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না নফরকে। মঙ্গলা কি তাহলে এখন জগত্তারণবাবুর বাড়ির রাঁধুনি ! কে জানে !

কিন্তু আমার কানে যেন তখনও নফরের শেষ কথাটাই কেবল কানে বাজছে—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই···
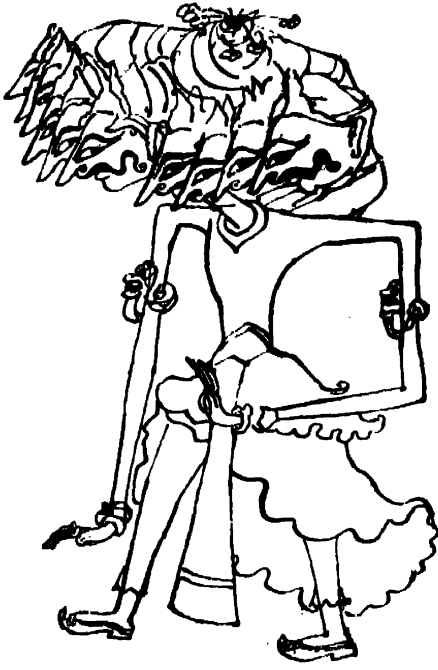
বিবর্তন

বনফুল

রাম কহে, "শর্ত তব নিদারুণ ভাই
খিচুড়িতে মশলা যে লঙ্কাই !
আঝালা খিচুড়ি কভু খাওয়া যায় বাবু–
এস তবে খেলা যাক গ্রাবু !"

এ খেলা চলেছে আজও, চলেছে নির্গম
রাক্ষস বানর নাই এসেছে অ্যাটম্ ।

ঘন-ঘোর নিবিড় শ্রাবণে
রাম কহে ডাকিয়া রাবণে—
"ক্ষান্ত দেহ রণে,
এস আজ খাইব খিচুড়ি ;
মন্দোদরী হয় নাই বুড়ি,
যুবতী সীতাও
তবে কেন রক্তে আজ ধরণী তিতাও ।"

বিশ চক্ষু বিস্ফারিয়া কহিল রাবণ
ব্যঙ্গহাসি ফুটাইয়া দশটি আননে,
"শ্রাবণ নামেনি সখা অশোক-কাননে,
সেখানে বাজিছে বেশ গরম রাগিণী,
মন্দোদরী নারী নাই, হয়েছে বাঘিনী !
কৌশল্যা-নন্দন, ভীম-বাহো,
তথাপি খিচুড়ি যদি ভুঞ্জিবারে চাহ
ব্যবস্থা করিতে পারি তার
কাল-নেমি ভালো সুপকার ।
কেবল একটি শর্ত আছে বন্ধু ইথে
লঙ্কাটি ফোড়ন আমি দিব নাকো দিতে ।"

ভেক্সী
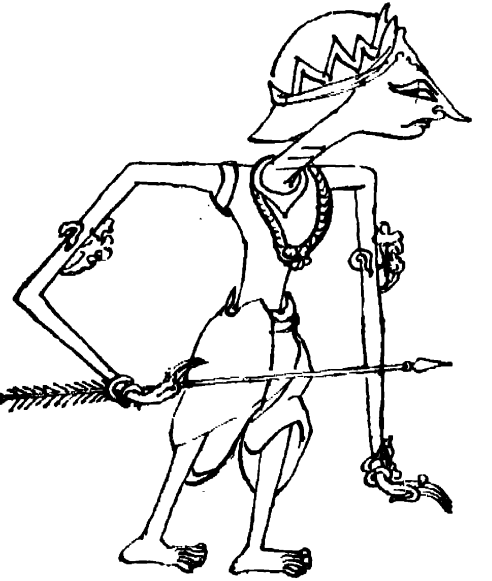
শিবরাম চক্রবর্তী

'হ্যালো—সাউথ ফোর সেভেন নাইন...'

তড়িৎ টেলিফোনের হাতলটা হাতে নিয়ে বাতলায়—দুচোখে তার স্বপ্নছায়ার আমেজ...

'...সাউথ ফোর সেভেন নাইন...'

নয়ের পরের সংখ্যাটার উচ্চারণের আগেই তার স্বপ্ন নয়ছয় হয়ে যায়। অপর দিক থেকে যে ঝঙ্কার আসে তা কোনো বাঞ্ছিত রমণীয় কণ্ঠের নয়। পরুষ গর্জনের এক দাপট যেন তার কানে এসে ঝাপ্‌টা মারে।

'হ্যালো...সাউথ ফোর...' তার পুনরুক্তির মাঝখানেই ঐ হুঙ্কার ওঠে : 'কে, হ্যালো?'

'আমি সাউথ ফোর সেভেন চেয়েছি...সাউথ ফোর সেভেন নাইন...'

'রিসিভার রেখে দিন। লাইনটা ছেড়ে দিন আমায় দয়া করে।'

'কেন বলুন তো?'

'সিভিল-সাপ্লায় দপ্তরের সঙ্গে কনেকশন চেয়েছি আমি...'

'তাতে আমার কি! আমিও চেয়েছি আমার সাউথ...'

'এখন নর্থ সাউথ রাখুন। আমার বিশেষ দরকার। একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা কইতে হবে। লাইনটা ছেড়ে দিন চট করে।'

'আপনিই ছাড়ুন না।' তড়িৎ-ও নাছোড়।—'আমার দরকারও আপনার চেয়ে কিছু কম জরুরি নয়।'

'ভদ্রভাবে বলছি মশাই, লাইনটা ছেড়ে দিন।' সিভিল-সাপ্লাই-গরজী এবার একটু সিভিলিটি সরবরাহ করে—সিভিয়ারিটি বজায় রেখেই—'নইলে ভালো হবে না বলছি।'

'আমিই কি অভদ্রভাবে বলছি আপনাকে? লাইনটা ছাড়ুন আমার—'

ভদ্রতা-রক্ষার পাল্লায় তড়িৎ-ও কম যায় না। সেও কিছু হটবার নয়।

'মন্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে হবে আমাকে। খুব—খুব—খুব জরুরি দরকার। বুঝেচেন? এখন দয়া করে...'

'আজ্ঞে, মাপ করতে হোলো। আমিও যাঁর সঙ্গে কথা কইতে যাচ্ছি তিনিও মন্ত্রীর চেয়ে কোনো অংশে কম নন। মন্ত্রীর তিনি কান কাটেন। অমন ডজন-খানেক মন্ত্রীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন তিনি।'

'বটে? পাত্রটি কে শুনি তো?'

'পাত্র নন। পাত্রী।'

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তড়িতের পাত্র যেন উছলে ওঠে—উপচে পড়ে—স্বপ্নসৌরভের সোমরসে। সেদিনের পার্টির সবে আলাপিতার ছবি যেন ভেসে ওঠে তার চোখের সমুখে। স্মৃতির পটে প্রীতির রঙ চড়ায় বুঝি।

দিনকয়েক আগে তাদের কলেজের রি-ইউনিয়ন উৎসবে দেখা। মেয়েটি এসেছিল এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। ভদ্রলোক সেই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। তড়িৎ-ও সেখান থেকেই পাস করে বেরিয়েছে বছরখানেক আগে।

কিভাবে যেন আলাপ হলো ওদের। কিন্তু আলাপটা ভাবে গিয়ে জমবার আগেই ভেঙে গেল হঠাৎ। পার্টিটাই ভেঙে গেল—রোমান্সের পার্টটা ভালো করে জমাট বাঁধার আগেই।

ক'ঘন্টারই বা পার্টি! কিন্তু কয়েকঘণ্টা-ব্যাপী এই পার্টিগুলো! একেকটা মনে হয় যেন কখনই ফুরোবে না—ফুরোবার নয় যেন—চলেছে তো চলেছেই!

সেকেলে যতো জাবর-কাটিয়ের জমায়েত! মামুলি কেচ্ছার মামলা!

আর একেকটা আবার এমন ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়—যেন চড়াই-পাখিটির মতোই। সুর চড়াতে না চড়াতেই

তার কাটে। ভালো করে চাইতে না চাইতে —দেখতে না দেখতেই—অদৃশ্য! আধখানা কথা শেষ না হতেই নিরুদ্দেশ!

সেই পার্টিগুলো আর এ জীবনে ফিরে আসে না। স্মৃতিপথে আনাগোনা করে— হয়ত স্বপ্নেও এসে হানা দেয়; কিন্তু কখনো আর তাদের এই চর্মচক্ষে দেখা যায় না।

সেই পার্টিগুলিতে জনতার অরণ্য নেই— থেকেও যেন কুয়াসার মতো মিলিয়ে গেছে কোথায়! সেখানে একের অপরিসীমা। জনতার অনৈক্য নয়—একের জনতা সেই পার্টিগুলিতে। চারিদিক ঘিরে মাত্র একজনের ভিড়। অনেকের মধ্যে একের সমারোহ। চারিধারে সংখ্যাহীন শূন্যের পাশে সে একক —শূন্যাকাশের একটি চাঁদ।

ঘুরে ফিরে সেখানে খালি সেই একজনকেই দেখা। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার সেই একটি কোণারক। অপরূপ ভাস্কর্য আর আশ্চর্য মহিমা নিয়ে একমাত্র। তাকেই ত্যাখো আর কথা বলার ফিকির খোঁজো তার সাথে।

কথার সঙ্গে কথার তার-বাঁধা—সেতারের সুর-বাঁধার মতোই। কালযাত্রায় এই অন্তহীন জনতার ভিড়ে সেই এক-জনতা এ-জীবনে বুঝি আর ফিরে আসেনা!

তাহলেও এবারের উৎসব-দিনটিকে ফেরাবার চেষ্টা করেছিল সে। চেয়েছিল—একটি পালাতেই না পালায়— আবার যেন তার জীবনে ফিরে আসে এই দিনটি…একান্ত হয়ে…একান্তে…আবার…আবার…বারবার। জনতায় নয়, জনান্তিকে। সেই আশায় মেয়েটিকে সে বলেছিল… 'আলাপ হল, কিন্তু আপনি কে, কোথায় থাকেন তার কিছুই তো জানা হলো না।'

'জেনে কী হবে! এই তো বেশ।' জবাব দিয়েছিল মেয়েটি—'ফের হয়তো আরেক পার্টিতে দেখা হবে আমাদের।'

'আরেক পার্টিতে? না, তা আর হয়না।' সন্দেহ-পরায়ণ তড়িৎ।

দাড়ি-গোঁফরা একাধিকবার দেখা দেয়—সভায় সমাবেশে ঘুরে ঘুরে এসে জমা হয়—একটা ফ্রেঞ্চকাট্‌কে তো সে কতো জায়গাতেই না দেখেছে! দাড়িরা কয়েকটা কমা-র পরে ঠিক দাঁড়ির মতোই। একান্ত অনিবার্য। কিন্তু যার দাড়িমের মতো দাঁত, গালে আপেলের টোল, আর গৌরীশৃঙ্গের মতোই…না, তাকে আর এ-জন্মে দেখা যায় না। যে-চোখে সে চেয়ে যায় সে-দৃষ্টি এ-মনে গাঁথা থাকে…চিরদিনের তরেই…কিন্তু সে আর এ পোড়া-চোখে পড়ে না।

'তা কখনো হবার নয়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে তড়িৎ। জবাবে মেয়েটি মুখ টিপে হেসেছে কেবল।

'নামটা? নামটাও যদি জানতাম আপনার। নামটা যদি বলতেন অন্তত…'

তাহলে কি সারাক্ষণ সেই মধুনাম মনে মনে জপতো তড়িৎ? দিনরাতের একখানা নামাবলী বানিয়ে জড়িয়ে রাখতো নিজের গায়?

'মঞ্জু। মঞ্জু রায়।'

'কিন্তু কোথায় থাকেন—'

'না। তা আমি বলতে পারব না।' নামের বেশি মঞ্জুর করতে পারেনি মঞ্জু। তড়িতের আর্জি নামঞ্জুর হয়েছে।—'উপায় নেই আমার বলবার।'

'না-ই গেলাম আপনার বাড়িতে, বাইরেও তো আমরা মিলতে পারি? মনে করুন ময়দানে, লেকে, কি কোনো সিনেমায়…'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। শনিবার তিনটের শো-এ যাওয়া যায় হয়ত। তাহলে কিন্তু আড়াইটার মধ্যে আমার জানার দরকার…'

'কিন্তু জানাবো যে কোথায় তাই তো জানিনে।'

তখন নিজের ফোন-নম্বর দিয়েছে মঞ্জু। ঠিকানা ঠিক পাওয়া না গেলেও ঠিক-ঠিকানা পাওয়া গেছে একটা।

'আড়াইটার আগে ফোন করবেন—যতো আগে পারেন। ফোনে যদি না পান আমায়—এলিটে পাবেন। শো শুরু হবার পাঁচ মিনিট আগে—এলিটের লবিতে পাবেন আমাকে।'

সাড়ে বারোটা বাজে। সেজেগুজে তৈরি হতে হবে তড়িৎকে—তার পরেই—তিনটের ঢের আগেই সে তড়িদ্বেগে বেরুবে—এলিটের দিকে টেলিগ্রামের মতোই— কিন্তু এদিকে, মেয়েটির সঙ্গে দূরভাষার দৌত্য সারতে গিয়ে মাঝখান থেকে পথ আগলে দুর্বাসার মতো এক দৈত্য এসে হাজির। লাইন ক্লীয়ার দেবেনা সে কিছুতেই।

'পাত্রী!' গজরায় দৈত্যটা: 'তা—পাত্র-পাত্রী-সংবাদের জন্যে তো খবর-কাগজ রয়েছে। টেলিফোন কেন?'

'সিভিল-সাপ্লাই বিভাগের জন্যেও কালোবাজার খোলা। সেখানে গিয়ে কালোয়াতি করলেই হয়।' চোটপাট জবাব

দিয়েছে তড়িৎ। ক্ষণিকের স্বপ্ন তার খানখান হয়ে গেছে। হীরে তার হারিয়ে গেছে এক কয়লার খনিতে হঠাৎ।

'বটে? বটে?? বটে???' গর্জে উঠেছেন ভদ্রলোক: 'কে হে বাপু তুমি? কোথাকার লাটসাহেব? ভালো কথায় বলছি—ফোনটা ছাড়ো—' বলে আবার তাঁর ফণা-বিস্তার: 'ছাড়বে কি ছাড়বে না? স্পষ্ট আমি জানতে চাই।'

'আপনি ছাড়ুন। আমিও মিষ্টিকথায় বলছি আপনাকে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সাড়া নেই কোনো পক্ষেই। লক্ষ্মণের ফল ধরার মতো ফোন ধরে বসে আছে তড়িৎ। নাছোড়বান্দা।

'কী হোলো? ছাড়লে?' আধ ঘণ্টা পরে আবার এলো ঝঙ্কার—'কী! ছেড়েছো ফোন?'

'আজ্ঞে না। কালোবাজারের নোংরা কাজের জন্তে আপনাকে আমি ফোন ছাড়তে পারিনে...' জবাব দিয়েছে তড়িৎ।

মাঝখান থেকে বাধা দিয়ে কে আরেকজনা গলা বাড়িয়েছে—'টেলিফোন আপিস থেকে বলছি। আপনাদের দুজনকার লাইনে জড়িয়ে গেছে—সারানো হচ্ছে এখানে। দয়া করে আপনাদের একজন ফোনটা ছেড়ে দিন। একটু-ক্ষণের জন্য অন্ততঃ।'

'উনি রাখবেন।' তড়িৎ জানায়। নিজের রোখ বজায় রাখে।

'আমার দায় পড়েছে।' ত্রিভুজের অন্য কোণ থেকে উত্তর আসে। নিজের পাওনা-গণ্ডা আদায় না করে তিনি ছাড়বেন না।

আবার কাটে খানিকক্ষণ।

ভদ্রলোক ফোড়ন কাটেন এবার—'অতো হাঁপাচ্ছো কেন হে? তোমার ফোঁসফোঁসানি যে বেশ শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। হয়েছে কী?'

'আপনার হাঁপানিও শুনতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু দোহাই, আমার জন্য হাঁপাতে যাবেন না। হাঁপানি একটা শক্ত ব্যায়রাম মশাই!'

সত্যিই কি হাঁপাচ্ছিল তড়িৎ? পর পর তিনবার ঘণ্টা পড়লো একটার। একটা বাজলো তিনবার। সাড়ে বারোটায়—

একটায়—দেড়টায়—তিনবার একঘেয়ে আওয়াজ শোনা গেল দেয়ালঘড়ির। কিন্তু দুজনের একজনাও নিজের খেয়াল ছাড়ল না। এত ঐক্যতানের পরেও উভয়ের অনৈক্য অটুট। দু পক্ষই এক লক্ষ্যে স্থির; দুজনের কেউই নিজের গোঁ ছাড়েনি—পথ ছাড়বার নামটি নেই কারোরই। এখনো কান খাড়া করে হাতল ধরে খাড়া হাজির দুজনাই।

টেলিফোনের আপিস থেকে তলব আসে আবার—

'দেখুন, আপনাদের একজনকে লাইনটা ছাড়তে হবে। একজন অন্ততঃ ছাড়ুন দয়া করে। নইলে এখানে মেরামতের অসুবিধা হচ্ছে।'

'ওঁকে বলুন না।' তড়িৎ বলে।

'ওই হতভাগাকেই ছাড়তে হবে।' তড়িৎস্পৃষ্ট ভদ্রলোকের তৎক্ষণাৎ জবাব।

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো এতক্ষণে। দুটোও বেজে গেল। কিন্তু দুটোর একটাও নড়লো না—লাইন ধরে ঝুলে রইলো এক ঝুলনযাত্রায়।

ছটফট করতে থাকে তড়িৎ। আড়াইটা বাজো-বাজো। কখন খবর দেবে মেয়েটিকে—টেলিফোনে তার পাত্তা পাবে কখন যে?

তখন থেকে এখনো তার ফোনের নম্বরটাই পুরো আওড়াতে পারল না। এর পর ডাক দিলে আর কি তাকে পাওয়া যাবে? আর, তড়িতের কোনো সাড়া না পেলে—না পেলেও কি—নিজগুণে সে এলিটে যাবে? মনে তো হয় না।

তড়িৎ চারিধার অন্ধকার দ্যাখে। লাইনের এধারে, ওধারে, চারি ধারে। এধারে এতক্ষণ ধরে প্যাকেটের পর প্যাকেট উড়িয়ে নিজের চার ধারে সে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিলো, আর ওধারে, লাইনের ও তরফে তো গোদ ধূম্রলোচন!

হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে তার পা ধরে গেছে! আর বুঝি দাঁড়ানো যায় না। ভেঙে পড়ে তড়িৎ...

'হ্যালো!' কাতর স্বরে একবার শেষ চেষ্টা করে তড়িৎ।

'হ্যালো, বলুন।'

সেতারের আওয়াজের মতোই যেন বেজে ওঠে টেলিফোনের তার। এমন মিষ্টি সুর সে সাতজন্মে শোনেনি।

জবাবে কিছুই সে বলতে পারে না। চিত্রার্পিতে মতোই শুনে যায়...

'শুনুন! আমার মামা এতক্ষণ ফোন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই খানিক আগে ক্লান্তি বোধ করে তিনি চা খেতে গেছেন। এই এলেন বলে। ভারী কড়া লোক আমার মামা। তিনি এসে পড়ার আগে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।...'

'বলুন বলুন।' তড়িৎ স্পৃষ্ট হয়।

'মামা না আসা পর্যন্ত রিসিভার হাতে খাড়া থাকতে হবে আমায় যাতে আপনি লাইনটা না ফাঁকা পান। এই কথা বলে গেছেন তিনি। কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না...'

'বসুন না।' তড়িৎ বলে: 'একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কথা কওয়া যাক।'

'বসেই তো আছি। কিন্তু বসবার আমার সময় নেই। এক্ষুনি আমায় বেরুতে হবে—এক্ষুনিই। একজনার—আমার এক বন্ধুর—ফোন আসবার কথা ছিল। কিন্তু এখন অব্দি তাঁর কোনো খবর এল না। বোধহয় আপনি লাইনটা আটকে রেখেছেন বলেই। কিন্তু সেজন্যে নয়, এক্ষুনি আমায় সিনেমায় যেতে হবে। মনে হচ্ছে আমার বন্ধু সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। দয়া করে আপনি যদি ফোনটা ছাড়েন—ছেড়ে দেন মামাকে—মামাকে কিম্বা আমাকে—তাহলে আমি ছাড়ান পাই। আপনি ছেড়েচেন এই খোশ খবরটা মামাকে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি চটপট। ছাড়বেন আপনি দয়া করে?'

তড়িৎ আর দেরি করে না। দয়া করে দেয় তৎক্ষণাৎ।

সীমান্ত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের মেয়েটির তিনটে স্বামী। বড়টি তিরিশ বছরের। রীতিমতো স্বাস্থ্যবান কর্মনিষ্ঠ পুরুষ। দ্বিতীয়টি তারই বয়সী, দোহারা চেহারা, ওরই মধ্যে একটু শৌখীন, বাঁশী-বাজানোর শখ আছে। আর তৃতীয়টি নেহাত-ই ছেলেমানুষ—বছর দশেক বয়স। এককথায় নাবালক।

সংসারে শাশুড়ী নেই, কিন্তু শ্বশুর বেঁচে, বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, কিন্তু এখনো নুয়ে পড়েনি। দীর্ঘ ছ'ফিট দেহ এখনো বনস্পতির মতো সোজা দাঁড়িয়ে আছে। 'নিয়াম্' অর্থাৎ পঞ্চায়েতের বিচারে ইরুলের সঙ্গে তার বিয়ে যখন কিছুতেই হ'তে পারে না বলে স্থির হলো, তখন ইরুল কোনো প্রতিবাদ করেনি, একটি মহিষের বদলে তাকে দিয়ে দিলে তার শ্বশুরের হাতে। দড়ি-হাতে মোষটাকে টান্‌তে টান্‌তে ইরুল চ'লে গেল একদিকে, আর শ্বশুরের পাশাপাশি তার তিন ছেলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের অন্যদিকে চলে এলো মুনিম্মা, আমরা যাকে এ-কাহিনীতে মুনিমা ব'লে ডাকব। শ্বশুর বললে,—আমাদের কথা সব তুমি ভুলে গিয়েছিলে, না?

মুনিমা অবাক হয়ে তাকালো শ্বশুরের দিকে।

শ্বশুর বললে,—তোমার নিজের মাকে মনে আছে? ঐ যে পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে কুরুম্বাজাতের মানুষগুলো থাকে, নিশ্চয়ই ওদের কেউ যাদু ক'রেছিল তোমার মাকে, নইলে অমন উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অমন বেঘোরে কেউ প্রাণ দেয়? 'বাদাগা'রা বলে, সে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল। আমি বলি, তা না-হয় হলো, কিন্তু জঙ্গলের ঐ কুরুম্বারা যাদু না করলে কেউ কি হঠাৎ অমনি পাগল হ'য়ে যায়?

মুনিমা বললে,—আমার মাকে আপনি চিনতেন?

—চিনতাম না!—আশ্চর্য হয়ে শ্বশুর বললে,—সে যে আমার মায়ের পেটের বোন।

মুনিমা চলছিল ওর পাশাপাশি, হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, বললে,—তাহলে আপনি আমার মামা!

—হ্যাঁ, তা' বলতে পারো।—শ্বশুর বললে,—এখন তোমার শ্বশুর।

তারপর পিছন-পিছন-হেঁটে-আসা তিন ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে ওর দিকে ফেরালো চোখ, আবার চলা শুরু ক'রে বললে,—এই তিন স্বামী তোমার। আরও দুটি হ'তো, কিন্তু তারা মারা গেছে সেই ছোটবেলাতেই। বড়ো, মেজো ঠিকই আছে, গেছে ওদের পরের দুটি ভাই,—তারপরে এই ছোটটি,—তিস্‌সু এর নাম।

শ্বশুর হাত বাড়িয়ে ছোটটিকে সামনে আনতেই, অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকালো মুনিমা,—বছর দশকের ছোট্ট ছেলে,—দুটি সরল ভীরু চোখ। দেখে মনে হলো, ঠিক এরই

মতো বয়স হবে, যখন সে ইরুলের হাত ধ'রে পালিয়ে গিয়েছিল দূরে।

দূরে, ঐ পর্বতের চূড়া পেরিয়ে অন্য এক জগতে।

দুদিক থেকে দুটি বিশাল পর্বতমালার বাহু এসে মিশেছে এই উপত্যকায়, তাদের গাঁয়ে। অন্যদিকে গহীন অরণ্য,—সেখানে থাকে 'কুরুম্বা' আর 'ইরুলা' নামে দুই জাতের অরণ্যচারী মানুষ। ইরুলারা বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু কুরুম্বাদের বিশ্বাস নেই, তারা যাদুকর। ইরুলারা মাঝে মাঝে উঠে আসে তাদের উপত্যকায়—সম্বর হরিণ মেরে নিয়ে। মৃত হরিণটাকে বিক্রি ক'রে হয়ত নিয়ে গেল একহাঁড়ি দুধ, কিছু চাল।

দুধ অবশ্য তাদের জাতের মানুষদের কাছে অভাবের বস্তু নয়,—অজস্র মহিষ তাদের, মহিষ-প্রতিপালনই তো তাদের একমাত্র জীবিকা। হাঁড়ি কিনতে হয় প্রতিবেশী 'কোটা'দের কাছ থেকে। আর চাল কিনতে হয় অন্য প্রতিবেশী 'বাদাগা'দের কাছ থেকে।

'কেনা' বলতে পর্বতচূড়ার অপর পারের রাজ্য 'উটকামণ্ড্'-এর মতো ব্যাপার কিছু নয়। সেখানকার মতন পয়সার চলন নেই এখানে, এখানকার নিয়ম হচ্ছে জিনিসের বদলে জিনিস।

মা মারা যাবার পর আর কোনো বাঁধনই ছিল না মুনিমার। যা' ছিল, তা' হ'চ্ছে কৌতূহল। অদম্য কৌতূহল। ঐ অরণ্যে কী আছে?

কী আছে ঐ পর্বতমালার ওপারে?

কিন্তু, কে দেবে উত্তর?

তারা 'টোডা',—দাক্ষিণাত্যের এক বিশেষ উপজাতি। কারুর সঙ্গে তাদের মেলে না, কী চেহারায়, কী আচার-ব্যবহারে। তাদের মানুষেরা খুব কালো নয়, বেঁটেও নয়। লম্বা চেহারা তাদের পুরুষদের, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, মাথার চুল লম্বা-লম্বা—অজস্র।

তবে, 'বাদাগা' বা 'কোটা'দের তুলনায় তারা নাকি খুব গরীব, খুব নিরীহ। তাদের মহিষগুলি ছোট ছোট, বেঁটে,—কিন্তু তারাই তাদের সব। মহিষের দুধ,—সেই দুধের তৈরী মাখন, সেই দুধের তৈরী ঘি, সেই দুধের তৈরী দই আর ঘোল,—এরই বিনিময়ে তাদের পরিধেয়, তাদের চাল আর হাঁড়িকুঁড়ি। 'বাদাগা'রা কৃষির কাজ করে, তারা দেয় চাল। কোটারা দেয় মাটির হাঁড়ি আর বাসন-কোসন।

তারা, অর্থাৎ টোডারা, চাষবাস তো করেই না, শিকারও করে না। প্রতিদিনের সাধারণ খাদ্য হচ্ছে দুধে-সিদ্ধ-করা চাল।

ইরুলের সঙ্গে সেই ছোট বয়সে অদ্ভুতভাবে তার ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। মাঠে মহিষদের সার দিয়ে নিয়ে যায় পুরুষেরা, সঙ্গে বালকদেরও অভাব নেই। ইরুল অমনি এক বালক, বাপের সঙ্গে মহিষ নিয়ে যেতো। জাতে সে-ও টোডা। কিন্তু ভিন্ন গ্রামের।

একদিন বলেছিল,—কে রে তুই, এই মেয়েটা? একা-একা ছুটে-ছুটে মাঠে আসিস? কুরুম্বারা দেখলে ধ'রে নিয়ে যাবে।

—ঈস্! ধরে তো তোকে ধরবে।

এক-একদিন মহিষের পিঠে চ'ড়ে বাঁশী বাজাতে-বাজাতে আসত।

—এই, কোত্থেকে পেলি রে?

মহিষের পিঠ থেকে নেমে তার কাছে চ'লে আসত, বলতো,—বাবা এনেছে 'বাদাগা'দের হাট থেকে। আমিও হাটে যাব একদিন।

—আমাকে নিয়ে যাবি?

—যাবো।

শুধু হাট-ই নয়, নানান জায়গায় তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। দুজনেই একবয়সী, দুজনেরই বয়স তখন দশ।

সবথেকে কৌতূহলের সৃষ্টি করতো ঐ পাহাড়ের চূড়াটা, যার পাশ দিয়ে ভোরবেলায় সূর্যদেব প্রথম উঁকি দিয়ে দেখেন তাদের।

মনে হতো, তিন দিকের ঐ পাহাড়,—আর অন্যদিকের ঐ জঙ্গল,—যেন মূর্তিমান নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভূতপ্রেত আর দত্যি-দানোরা যদি না থাকত, তাহলে সেই কবেই তারা চ'লে যেতো ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে।

মেঘ ডাকে, আর আকাশটা কালো হয়ে যায় মেঘে, ঝরঝর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামে,—সে-ও নাকি ঐ ভূতপ্রেতের কীর্তি।

ইরুলের বাবা না-কি ইরুলকে খুব মারতো। একদিন বললে,—চল্, চলে যাই।

—চল্।

যেন ব্যাপারটা কিছু নয়। মাঠে-মাঠে ছুটোছুটি করার মতোই ব্যাপার। 'চল্' বললেই যেন চলা যায়!

অন্য স্বভাবের দুটি ছেলেমেয়ে,—অন্যের থেকে কৌতূহলের উদগ্রতাও ওদের বেশী। এ বোধ হয় প্রতি যুগে, প্রতি জাতির মধ্যেই থাকে। এক-একটি ছেলেমেয়ে এসে জন্মায়,—যারা দলছাড়া, গোত্রছাড়া, ভিন্ন প্রকৃতির। যা করবার নয়, তা-ই ওরা ক'রে বসে,—যা ভাববার নয়,

তা-ই ওরা ভেবে বসে। শত নিষেধের উত্তুঙ্গ পর্বত, শত সংস্কারের গহীন অরণ্য,—কিছুই ওদের পথ আটকাতে পারে না। শত প্রহারে জর্জরিত হ'য়ে ওরা একদিন হঠাৎ-ই বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যায় দূরে,—এ যে কোন্ নিগূঢ় প্রেরণা, তা' কে বলবে!

দশবছরের দুটি টোডা ছেলেমেয়ে এমনি ক'রেই একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'য়েছিল অরণ্য আর পর্বতের বাধা পেরিয়ে দাক্ষিণাত্যের আধুনিক বিলাসী শৈলাবাস উটকামণ্ডের প্রান্তঃসীমায়,—বিশাল নীলগিরি পর্বতের উপত্যকার এক প্রান্তে। ক্ষুধিত, ভীত, সন্ত্রস্ত দুটি শিশু।

রেভারেণ্ড কুমারস্বামী তাদের স্থান দিয়েছিলেন প্রথমে। সেখান থেকে কেমন ক'রে আবার তারা ছিট্‌কে পড়ল,—একজন এক চা-বাগানের কর্মিণী হ'য়ে, অপরজন আরো দূরে এক হোটেলের চাকর হ'য়ে,—সে অন্য কাহিনী।

পনেরো বছর পরে আবার তাদের দেখা। ইরুল আর মুনিমা। ইরুলের পরনে ধুতি আর শার্ট, মুনিমার শাড়ী আর ব্লাউজ।

—সুখে আছো?

মুনিমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি ইরুল।

—তুমি সুখে আছো?

ইরুলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মুনিমা। দুজনেই ঘটনাচক্রে আবার হ'য়েছে কাছাকাছি। একজন—এক দেশী-সাহেবের বাড়ীর আয়া, অপরজন—অন্য এক প্রতিবেশী সাহেবের খাস বেয়ারা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হয় দুজনের, হয়ত বা পথে।

দেখে মনে হয়, দিনরাত কী যেন ভাবে ইরুল গভীর-ভাবে। কী যেন আরও কিছু জানতে চায়, কী যেন জানবার তৃষ্ণা আজও ওর মেটেনি। মুনিমা প্রশ্ন করলো একদিন,—কী ভাবো অতো?

চমকে উঠেছিল ইরুল; বললে,—কী ভাবি!

—তুমিই জানো।

আরেকদিন। মুনিমা বললে,—আমার কিছু জানতে চাও না?

—না।

আরেকদিন। এদিনও প্রথম কথা বললে মুনিমা,—আমি যে তোমার কথা জানতে চাই।

—জানবার মতো কিছু নেই।

—কেন? এ ক'বছর কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, তার মধ্য থেকে জানবার মতো কিছু নেই?

উত্তর দেয়নি ইরুল।

আরেকদিন। ইরুল বললে,—ঐ যে দূর দিগন্তে উঁচু পাহাড়টা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম জানো? দোদাবেতা। এই নীলগিরি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া।

দুটি আশ্চর্য মুগ্ধ চোখ মেলে ওর চোখের দিকে তাকালো মুনিমা।

—কী, দেখছ কী?

মুনিমা গাঢ় কণ্ঠে বললে,—কতো জানো তুমি!

উত্তেজিত হ'য়ে মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো ইরুল; বললে,—কিছুই জানি না। জানা আমার হলো না।

—আর কী জানতে চাও?

—ঐ আকাশটা যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাহাড়ের ওপরে, ওর ওপারে কী আছে? আজও জানতে ইচ্ছা করে।

মুনিমা বলেছিল,—তা' যাও না কেন চলে?

উত্তর দেয়নি সে।

আরেকদিন বলেছিল,—আমি সঙ্গে গেলে যাবে?

—না।

আশ্চর্য হ'য়ে উত্তর দিয়েছিল মুনিমা,—কেন!

অল্প একটু হেসেছিল ইরুল, কিছু বলেনি।

কেঁদে ফেলেছিল মুনিমা,—এই কথাটা তুমি বললে! অথচ, তোমার জন্য···

—জানি।—ইরুল বলেছিল,—আজও আমার সঙ্গে হাঁটতে তোমার আপত্তি নেই আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। অন্য দেশে যদি যাই ঐ পাহাড়টার চূড়োটা পেরিয়ে, তাহলে গিয়ে কী দেখব? এই একই মানুষ, একই তাদের ধরন-ধারণ, একই তাদের মনের অবস্থা। যদি অন্য কিছু না দেখতে পাই? আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। সেইজন্যই ভয় হয়।

—কী?

—অন্য কোনো দেশে কী গিয়েছিলে এই উটকামণ্ড ছেড়ে?

—হ্যাঁ, তা' গিয়েছিলাম।—ইরুল বললে,—এই একই ব্যাপার। একই ছাঁচে ঢালা মানুষ,—শুধু ভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে, আর ভিন্ন পোশাক পরে।

আরেকদিন।

ইরুল বললে,—এর থেকে আমাদের ঐ টোডাগ্রাম অনেক ভালো। আমাদের পরনে পোশাক নেই, পেটে নানারকম খাদ্যও যায় না, কিন্তু, তবু আমরা ভালো। হু-হু-করা কান্নায় এতক্ষণে ভেঙে পড়ে মুনিমা।

—চল্, আমরা চুপিচুপি পালিয়ে যাই দেশে।

মুখের দিকে কান্না-ভরা চোখেই তাকালো মুনিমা,—আমার সাহেব যদি মারে ?

—মারবে !

—হ্যাঁ, ত্যাখ্ আমার পিঠ।

ইরুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললে,—তুই না আয়া ? তোকে মারে ?

—হ্যাঁ। অন্য কারুর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেই মারে।

—সাহেবের বউ নেই ?

—না।

—ও, বুঝেছি। সাহেবের ছেলেপিলেদের দেখিস বুঝি তুই ?

মুনিমা বললে,—ছেলেপিলে কই সাহেবের ?

—নেই !

—না। সাহেবের আমি ছাড়া কেউ নেই।

মুনিমার মুখের দিকে চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ইরুল। ওর দেহের বর্ণ কোনোদিনই খুব কালো নয়। আজকাল বেশ ফর্সাই দেখায় ওকে। চোখদুটি—খুব বড়ো নয়—কিন্তু টানা-টানা—ভুরু দুটি বাঁকা আর ঘন। মাথায় একরাশ চুল, পাতলা ঠোঁট, বাঁশীর মতো নাক। নাকে ছোটবেলাকার সেই ছোট্ট সাদা পাথরের নোলকটি আজও ঝুলছে।

—একটা কথা বলবে ?

—কী ?

ইরুল বললে,—তোমার ছেলে হয়েছিল ?

আবার কেঁদে ফেলল মুনিমা,—সাহেব কী ওষুধ খাইয়েছিল,—ছেলে বাঁচেনি, আমিও মরতে বসেছিলাম।

হঠাৎ-ই এই সময় ওর হাতটি চেপে ধ'রেছিল ইরুল ; বলেছিল,—এসব আমারই জন্য। পাহাড় পেরিয়ে সভ্য দেশে কাদের আমরা দেখতে বেরিয়েছিলাম ?

আরেকদিন।

ইরুল বললে,—সেই সন্ন্যাসীকে মনে আছে ? কুমারস্বামী ? তিনি মারা গেছেন। তাঁর অনাথ-আশ্রম থেকেই তো আমাদের নিয়ে আসে ?

—আমাকেও।

ইরুল বললে,—অনেক রাত। লোকটা বললে,—এসো খোকা। সন্ন্যাসী বললেন,—যাও এঁর সঙ্গে। এখানকার শিক্ষা তো শেষ হলো। এবার ইনি তোমাদের কাজ শেখাবেন। জনা-পাঁচ-ছয় ছেলে নিয়ে ইনি বেরুলেন। বললাম,—মুনিমা ?

সন্ন্যাসী বললেন,—সে এখানে থাকবে।

বলেছিলাম,—আমি যাব না।

কিন্তু জোর ক'রে হিঁচড়ে টেনে আমাদের নিয়ে এসেছিল লোকটা।

মুনিমা বললে,—আমাকে নিয়ে এসেছিল একটি মেয়েলোক। চা-এর বাগানে। কী ভাবে যে সেখানে বড়ো হয়েছি, কী ভাবে যে সেখানে থেকেছি,—সে আর শুনতে চেও না। শেষকালে এই সাহেব—ওখান থেকে আমাকে আয়ার কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল।

আরেকদিন।

ইরুল বললে,—যাবে ?

—কোথায় ?

—আমাদের সেই গাঁয়ে। না না, তোমাকে যেতেই হবে। যা হয় হোক, এভাবে থাকলে তুমি মরে যাবে।

ওর কোলে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে কেঁদেছিল মুনিমা, বলেছিল তা-ই চলো!

কিন্তু, যাত্রা করার প্রাক্কালে আরেকবার থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল মুনিমা,—আমাদের যদি সমাজে আর স্থান না দেয় ?

—কেন!

ছুটি ভীত আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি ওর চোখের ওপর স্থাপিত ক'রে মুনিমা বলেছিল,—যদি আমাদের চিনতে না পারে!

ওর একটা হাত চেপে ধরেছিল ইরুল ; বলেছিল,—পারবে রে, পারবে।

—পোশাকটা বদ্‌লে নেবে ?

—কী ? এই ধুতি আর শার্ট ছেড়ে, খাটো ধুতি কোমরে জড়ানো ? তা আমি পারি।

ওর দিকে ভালোভাবে তাকালো ইরুল। সাহেবের বাড়ীতে থেকে যেমন ঝক্‌ঝকে চেহারা হয়েছে ওর, তেমনি ভব্য ওর পোশাক। মাথার চুল রীতিমতো সযত্নে লালিত, বেণীবদ্ধ। গায়ে লাল রঙের পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ, অন্তরাল থেকে উঁকি দেয় অন্তর্বাস। পরনের হালকা গোলাপী শাড়ীটা মাদ্রাজী ধরনে কুচি দিয়ে পরা। গলায় সরু সোনার হার, হাতে দুগাছা করে চুড়ি। একেবারে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসা।

কিছুদূর পর্যন্ত নিশ্চুপে চলবার পর ইরুল হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো ; বললে,—এইবার তোর প্রশ্নের উত্তর দেবো। ও-ভাবে শাড়ী পরা চলবে না, জামাও টান দিয়ে খুলে ফেলতে হবে।

মুহূর্তে লজ্জায় আরক্ত হয়ে গেল মুনিমার মুখখানা, মুখ নামিয়ে কোনক্রমে বললে,—যাঃ! তা হয় নাকি ?

কীরকম কঠোর নিষ্প্রাণ চোখে যেন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল ইরুল, কিন্তু আর কিছু সে বলেনি। নীরবেই শুরু করেছিল চলা, আগে-পিছে সংকীর্ণ বন্ধুর পথে।

সংকীর্ণ একটা গিরিবর্ত্ম পার হতেই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে পাহাড়গুলি চলে গেছে,—কোন-কোন পাহাড়ে ওপর-নীচ ক'রে সিঁড়ির মতো সাজিয়ে চাষ করা হয়েছে চা-এর অথবা কফি-র। তার ওপরে নীল-আকাশে-ভেসে-যাওয়া শরতের হালকা সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে এসে। দূরে, সীমান্তে,—গহীন এক অরণ্যরেখা ধূসর লিপির মতোই চোখে পড়ে,—তারই পরপারে আরেক পর্বতমালার সাক্ষাৎ মিলবে। চড়াই পথে সেই পর্বতে উঠে, এক চূড়া পেরিয়ে উৎরাইয়ের পথে তাদের গ্রামের সেই উপত্যকা। নীচে, 'বাদাগা'দের কৃষিক্ষেত, তাদের আর 'কোটা'দের গ্রাম। ওপরে,—তাদের নিজেদের একান্ত নিজস্ব গ্রাম—টোডা গাঁও। মাঝখানে শহুরে মেয়ের সিঁথির মতো সমান্তরাল এক রেখা টেনে দুধারে একই গ্রামের দুই বিভিন্ন বসতি,—বাঁয়ে থাকে 'টারথারল' গোষ্ঠীর টোডারা, ডাইনে,—'টিভালিয়ল' গোষ্ঠী।

টারথারলরা টোডাদের মধ্যে উঁচুজাতের মানুষ, আর 'টিভালিয়ল'রা নীচু জাতের। দু'জাতের মধ্যে বিয়ের প্রচলন নেই। যে-জাতের ভিতরে এক মেয়ের বিয়ে হয় বহু স্বামীর মধ্যে,—পঞ্চপাণ্ডবের মতো ভাইরা মিলে বিয়ে করে এক স্ত্রীকে,—যেখানে সভ্য জগতের মেয়েদের সতীত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে এদের সংজ্ঞা মেলে না,—সেখানেও একই সম্প্রদায়ের দুই জাতের মধ্যে বিবাহ-বিধি নেই। 'টারথারল' মেয়ে ভাব করতে পারে 'টিভালিয়ল' ছেলের সঙ্গে, সেটা নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না।

মুনিমা 'টারথালর' আর ইরুল 'টিভালিয়ল'। বিয়ে ওদের হ'তে পারে না, হলোও না। কিন্তু ওদেরও কি সে ইচ্ছা ছিল ? থাকলে, ওরা অন্যত্র চলে গিয়ে একত্র থাকতে পারত,—সভ্যজগতে পনেরো বছর কাটিয়ে মনের দৃঢ়তা ওরা অবশ্যই অর্জন করেছে।

কিন্তু ইরুলের মনের ভাব কিছুতেই বুঝতে পারল না মুনিমা।

নীলগিরি পেরিয়ে যে নির্জনতম বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পথ দিয়ে তারা আসছিল, সে-পথে কিছুটা অগ্রসর হ'তেই রাত্রি নেমে এসেছিল।

পিছন থেকে মুনিমা ওর হাত ধ'রে ফেলেছিল ভয় পেয়ে,—কী ক'রে চল্‌বি! যদি বাঘ-ভালুকে—

অদ্ভুত শান্ত আর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইরুল,—যে বাঘ-ভালুকের হাত থেকে পালিয়ে এলাম, তাদের তুলনায় বনের বাঘ-ভালুক কিছুই নয়। তুই ভাবিসনি।

আতঙ্কের মধ্যেও একটা কৌতুকের হাসি জেগে ওঠে মুনিমার ঠোঁটের কোণে। কখনো 'তুমি', কখনো 'তুই',—ওদের সম্বোধনে কোনো সমতা থাকছে না। আর, থাকছে না বলেই বুঝি কথা বলে এতো মজা পাওয়া যাচ্ছে।

—এই, তুই তো আগে-আগে যাচ্ছিস, তোর পিছন থেকে আমাকে যদি বাঘে নিয়ে যায়!

দাঁড়িয়ে পড়ল ইরুল। বললে,—পনেরো বছর আগে এই রাস্তা দিয়েই দুজনে চ'লে এসেছিলাম। সেদিন তো এ-ভয় তোর মনে জাগেনি? আজ কেন ভয়? নাকি মনে-মনে ফেরার ইচ্ছা নেই?

মুখের হাসি গোপন ক'রে মুনিমা বললে,—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা শুনছেই বা কে?

ওর হাত চেপে ধরল ইরুল,—তোর সব ইচ্ছা শুনব, গাঁয়ে ফিরে যা ইচ্ছে তুই করিস, কিন্তু, যা-ই তুই মনে করিস, তোকে গাঁয়ে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবই।

—ফিরে? ওদের কথাও হয়ত ভালো বুঝব না। নিজেদের ভাষাও তো ভুলে গেছি।

ইরুল বললে,—দূর, তা হয় নাকি! এই তো কথা বলছি আমরা দুজনে।

মুনিমা বললে,—এই কথাই কি সব নাকি! আরও কতো কথা আছে।

—কী কথা?

—কী জানি! থাকতেও তো পারে? পারে কেন, আছেই। আমরা যা জানি না, যা বলতে পারছি না, এমন কথা কি নেই সংসারে?

ইরুল এ-কথা শুনে চলা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো; বললো,—তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

—হ'য়েছে তো হ'য়েছে। এ অন্ধকারে ভয়ে-ভয়ে আর কতক্ষণ মাথা ঠিক রাখব!

—বললাম না,—ঠিক আমার পিছন-পিছন আসতে? এমন অন্ধকার নয় যে কাছের মানুষটিকে তুই দেখতে পাচ্ছিস না। ঐ তো কেমন চাঁদ উঠেছে!

—খুব চাঁদ দেখাচ্ছ যা' হোক! ওর আলোতেও কাছের মানুষকে কাছে পাচ্ছি না।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ইরুল বললে,—পাগলামি ক'রো না। এখনো অনেক পথ বাকী।

হেসে ফেলল মুনিমা,—আবার 'তুমি' কেন? বেশ তো 'তুই' হচ্ছিল?

ঈষৎ লজ্জিত হলো ইরুল; বললে,—কেমন যেন সেই পনেরো বছর আগেকার কথা মনে হচ্ছিল। সেই পনেরো বছর আগের তুই আর আমি।

বলতে-না-বলতেই ব'সে পড়ল একটা পাথরের ওপর; পকেট থেকে বার করল দেশলাই আর একটা চ্যাপ্টা শিশি।

—কী করবি?

—মশাল তৈরী করব। কেরোসিন তেল নিয়ে এসেছি শহর থেকে।

জামাটা খুলে ফেলল ইরুল গা থেকে। তারপরে গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জামাটাকেই তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে মশালের মতো ক'রে জড়ালো তা'তে।

—একী করলে!—জামাটা ছিঁড়ে ফেললে! পরবে কী?

—জামা আর পরব না!

পরনের ধুতিটা তাদের গাঁয়ের টোডাদের মতো খাটো ক'রে পরে,—ছেঁড়া জামায় তেল ঢেলে দেশলাই দিয়ে মশালটা জ্বালিয়ে ফেলল ইরুল। তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খালি শিশিটা। কোন্ পাথরে লেগে যেন চুরমার হ'য়ে গেল কাঁচ,—তারই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগল কিছুক্ষণ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে।

অন্ধকারের বুকে দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা। তারই আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ইরুলের মুখটা। যেন 'কুরুম্বা'দের মতো কোনো অরণ্যচারী মানুষ,—যাদু ক'রে নিয়ে চ'লেছে কোনো এক মানবীকে,—এক অরণ্য থেকে আরেক অরণ্যে,—এক গুহা থেকে আরেক গুহায়! এখনি বল্লম হাতে সম্বর-হরিণ মেরে আনতে পারে সে, এখুনি লেলিহান অগ্নিশিখায় সেই মৃত পশুটাকে পুড়িয়ে তার মুখের সামনে ধরতে পারে মাংসের টুকরো, বলতে পারে,—খা, পেট ভ'রে খা।

এখুনি টান মেরে খুলে ফেলতে পারে তার জামা, তার সযত্নলালিত বেণী, হাত বা তার শাড়ীর আঁচলেও দিতে পারে টান।

মুহূর্তে ওর ধরা-হাতটা ছাড়িয়ে নিলো মুনিমা, অদ্ভুত আর্তকণ্ঠেই ব'লে উঠল,—ছেড়ে দে!

ছেড়ে দিয়ে অবাক হ'য়েই ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল ইরুল, কিছু বলেনি।

থেমে থেমে চলতে চলতে একসময় ভোর হ'য়ে এলো রাত্রি। পাখীর ডাক। উপত্যকার বিস্তৃত সেই মাঠ। কচি কচি সবুজ ঘাস। দূরে দূরে অদ্ভুত তাদের সেই গোলাকার ঘর।

'বাদাগা' আর 'কোটা'দের অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে পিছু-পিছু এসেছিল ওদের। 'টিভালিয়ল' গোষ্ঠীর গাঁও-বুড়ো ঠিক চিনতে পেরেছিল তাদের ইরুলকে। কিন্তু ও-মেয়েটি কে? অমন বিচিত্র পোশাক-পরা?

সমস্ত গ্রামের লোক ঘিরে ধ'রেছিল ওদের। কারা এরা?

পরিচয় দিতে আর অচেনা থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবুও কতগুলি প্রশ্ন থেকে যায়। পনেরো বছর পরে ওরা যে ফিরে এলো, তাতে সমাজে ওদের গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু আটকায় না। কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে। ইরুলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কি? না, তা কেমন ক'রে হবে। তবুও এতদিন ও বাইরে ছিল, গিয়েছিল ইরুলের সঙ্গে, এসেছেও ইরুলের সঙ্গে। অতএব ও ইরুলেরই। কিন্তু টারথারল-এর মেয়ে টিভালিয়ল-এর ঘর করবে কী রকম?

ডাকো 'নিয়াম্' অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ। শুধু ওদের গাঁ নয়, আশেপাশের সমস্ত গাঁয়েই বিচিত্র এক উত্তেজনা। ওদের খবরের কাগজ থাকলে তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই ওরা বড়ো-বড়ো ক'রে ছাপিয়ে দিতো এই আশ্চর্য সংবাদ।

কিন্তু, 'নিয়াম্' ডেকে তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসাতেও সময় লাগল সাতদিন। এই সাতদিন ধ'রে নানান দিকে নানান তর্ক-বিতর্ক, নানান আলোচনা। ততদিন সাময়িক ব্যবস্থাক্রমে 'টিভালিয়ল'দের গাঁও-বুড়োর ঘরেই রইল মেয়েটি। ইরুলের বাপ নেই, কিন্তু খুড়োরা ছিল,—তার স্থান হ'লো সেখানে। মেয়েটি ছিল কড়া পাহারায়, বন্দিনীর মতো,—ইরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনো অবকাশই ছিল না।

'নিয়াম্'-এরও নিয়ম আছে। 'বাদাগা'দের মধ্য থেকে এলো একজন, 'টিভালিয়ল' থেকে এলো গাঁও-বুড়ো, আর বাকী তিনজন 'টারথারল' থেকে। রীতিমতো গুরুগম্ভীর আয়োজন। 'টারথারল'দের গাঁও-বুড়ো প্রায় রাজার মতো। সম্মানে সে সবার থেকে বড়ো।

'টারথারল'দের একজন 'কুড়' অর্থাৎ প্রধান-স্থানীয় একসময় উঠে দাঁড়ালো,—মেয়েটির সে মামাও বটে, শ্বশুরও বটে। তার তিন ছেলের বউ ঐ মেয়েটি।

সমস্ত সভা মুহূর্তে স্থির হ'য়ে গেল।

শ্বশুর বললে,—মেয়েটি যখন তিন বছরের, তখন আমি আমার বোন, অর্থাৎ ঐ মেয়েটির মায়ের কাছে দিয়ে এসেছিলাম লাল রঙের ছোট একটা শাড়ী। ওর মা নিয়েছিল। আর, 'কোটা'দের একজন উল্কিওয়ালাকে ডেকে আমি ঐ মেয়ের বাম বাহুর গোড়ায় দিয়েছিলাম উল্কি এঁকে,—একটা শিংওয়ালা মোষ। দেখুন তো আছে কিনা?

রাজার আদেশে একজন এসে ওর জামার হাতা সরিয়ে সত্যি সত্যি দেখে গেল। বললে,—হ্যাঁ, ওর কথা ঠিক।

—তবে ঐ মেয়েই!—শ্বশুর বলতে লাগল,—সেই ছোটবেলাতেই আমার ছেলেদের সঙ্গে ওর হ'য়েছিল 'ম্যাট্রিমনি' অর্থাৎ 'বিয়ে'। সোম-ও হবার পর ঐ মেয়ের এসে ওঠবার কথা আমার ঘরে। ইতিমধ্যে মারা গেল ওর মা, ও-ও কোথায় চ'লে গেল। 'টিয়েক জ্রি' অর্থাৎ 'দেবতা'র কৃপায় ও যখন ফিরে এসেছে, তখন ওকে আমার কাছে দিয়ে দেওয়া হোক।

কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, এমন কি ইরুলও না। ইরুলদের গাঁও-বুড়ো বার বার তাকাতে লাগল ইরুলের মুখের দিকে। অবশেষে বলেও ফেলেছিল,—তোমার কোনো বক্তব্য নেই?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ইরুল,—না।

মনে-মনে চমকে উঠেছিল মুনিমা,—তবে কি সত্যিই ওকে চায় না ইরুল? তবে এমন ক'রে তাদের গাঁয়ে ফিরে এলো কেন দুজনে?

বারংবার প্রশ্ন করেও কেউ সদুত্তর পেলো না। তার সেই এক উত্তর,—না।

কোনো বক্তব্যই তার নেই।

'নিয়াম্'-এর নির্দেশ শোনা গেল। ইরুলকে একটি মহিষ দিলেই ইরুল মেয়েটিকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়ে দিতে পারে তার শ্বশুরের হাতে।

ওদের গাঁও-বুড়ো তবু বিয়ের কথা তুলেছিল। কিন্তু টারথারল-এর সঙ্গে যে টিভালিয়লদের বিয়ে হ'তে পারে না, এ তো শিশুতেও জানে। 'টিয়েক জ্রি'র আদেশ-মতো তৈরী এই নিয়ম, এ কি কেউ ভাঙতে পারে?

এলো রাত, এলো দিন। দিন গেল, আবার এলো রাত। এমনি ক'রে ক'রে কেটে গেল আরও সাতটা দিন। গাঁয়ের উত্তেজনা ততদিনে স্তিমিত হ'য়ে এসেছে, ওকে দেখার কৌতূহলও ধীরে ধীরে গেছে ক'মে। এ সাতদিনে ইরুলের মুখ ও একবারও দেখতে পায়নি। সে কি তাকে গাঁয়ে পৌছে দিয়ে নিজে আবার পালিয়ে গেল পাহাড়ের চূড়ো পেরিয়ে?

তিস্‌মু এসে সংবাদ দিলো,—ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে ইরুল, তার মহিষটাকে যথেচ্ছ চরতে দিয়ে।

মনে মনে নিশ্চিন্ত বোধ করলেও বাইরে তার দেখা গেল প্রচণ্ড রাগ। ইরুলের উল্লেখে হঠাৎ-ই সে ক্ষেপে গেল তিস্‌মুর ওপরে,—তোমাকে খবরদারি করতে কে বলেছে! কে চায় তোমার কাছে ইরুলের খবর?

অবাক হ'য়ে তিস্‌মু তাকিয়ে থাকে বউ-এর মুখের দিকে।

সবাই বলে, মেয়েটি তার বউ। 'বউ' বলতে ঠিক কী বোঝায় কে জানে, কিন্তু ভা-রী ভালো লাগে মেয়েটিকে। সব সময় ইচ্ছা করে এমন কিছু করতে, যাতে খুসী থাকবে মেয়েটি।

সন্ধ্যা হলেই তার ঘুম পায়, খাওয়ার পালা কোনক্রমে সেরেই সে গিয়ে শুয়ে পড়ে তার বাপের পাশে। তারপর সারারাত বউ কী করে কে জানে। কিন্তু দিনমানে সে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

'দিশা' তার মেজ ভাইয়ের নাম। বউকে নিয়ে দূরে পাহাড়ের দিকে চলে যায় সে জল তুলে আনতে ঝর্না থেকে, তার বড়ো ইচ্ছা করে, তখন সে বউ-এর সঙ্গ নেয়,—কিন্তু 'দিশা' তাকে তেড়ে মারতে আসে, ভয়ে ভয়ে যাওয়া আর হয় না।

বড়ভাই ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত বুক কাঁপে। তাকে বউ-এর কাছে দেখলে দূর থেকেই ছুটে পালায় তিস্‌মু। তবে সে ভয়ানক ব্যস্ত লোক। গোটা-দশেক মহিষ তাদের,—একটা ইরুলকে দেবার পর আছে মাত্র নয়। সকালবেলা মহিষের ঘর থেকে তাদের মহিষগুলো বার ক'রে দুধ-দোওয়ার কাজ করে বুড়ো বাপের সঙ্গে সে একাই। তারপর মাঠে চরাতে নিয়ে যাবার পালা। সে কাজটা সাধারণত ক'রে থাকে দিশা—সঙ্গে কখনো-সখনো তিস্‌মু-ও থাকে। বিকেলে মাঠ থেকে মহিষরা ফিরে এলে আবার দুধ-দোওয়ানোর পালা। দু'বেলায় এই যে দুধ পাওয়া যায়, খাবার জন্য আলাদা করে রেখে, বাকীটা থেকে তৈরী করা হয় মাখন, ঘি ইত্যাদি। এ-কাজ করে থাকে বড়ভাই একা। বুড়ো বাপ সাহায্য করে মাত্র। তারপরে সেই মাখন আর ঘি নিয়ে 'বাদাগা'দের গ্রামে গিয়ে বদল দিয়ে চাল বা দরকারমতো কাপড়চোপড় নিয়ে আসা,—সে-ও বেশীরভাগ করে থাকে ঐ বড়ভাই,—বউ যাকে নাম দিয়েছে 'বড়ো স্বামী'।

মহিষের পরিচর্যা, দুধ-দোওয়া বা মাখন-ঘি তৈরী,—এসব হলো পুরুষের কাজ, মেয়েদের ওতে থাকতেও নেই।

চোঙ-এর মতো টানা লম্বা ওদের ঘর। সেই ঘরখানা আবার দু'ভাগে ভাগ করা। এক ভাগ মেয়েদের রান্নাবান্না আর গৃহস্থালির জন্য, অন্য ভাগ দুধ থেকে মাখন-ঘি তৈরীর জন্য,—সে-ঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। দুটি ঘরেই কোনো জানালা নেই, ছোট্ট একটি দরজা মাত্র।

ঘর থেকে কলসীটা বার ক'রে নিয়ে এসে অত সকাল-বেলাতে অসময়েই ঝর্না থেকে জল আনতে চললো মুনিমা। সঙ্গে দিশা নেই; দিশা মাঠে। সে গেল একা। তিস্‌মু এগিয়ে এলো; বললে,—আমি যাব।

তীব্রস্বরে বলে উঠল মুনিমা,—না।

আকস্মিক এ ধমক খেয়ে মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল তিস্‌মুর, একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। আর, দেখতে লাগল বউকে,—সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে সে চলেছে পাহাড়ের দিকে, ঝর্নার জল আনতে।

গ্রাম পেরিয়ে একটা টিলায় উঠে আবার নামতে হয়। নেমেই দেখা হ'য়ে যায় তার বড়ো স্বামীর সঙ্গে। কতগুলি দড়িদড়া আর খড়ের আঁটি সে বয়ে নিয়ে আসছিল 'বাদাগা'দের কাছ থেকে।

—কোথায় চললি বউ?

বুকটা যেন হঠাৎ-ই টিপটিপ ক'রে উঠল ওকে দেখে। শহরের সেই সাহেবটাকে মনে পড়ল, যে ওকে অপর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এসে বেত দিয়ে মারতো।

একা যাচ্ছিস জল আনতে? দিশা কোথায়?

—মাঠে।

—একা যাওয়া তো ঠিক নয়,—বড়ো স্বামী বললে,—আমাদের মেয়েদের উপরে কুরুম্বাদের ভয়ানক চোখ। তিস্‌মু কোথায়?

—গাঁয়ে।

বড়ো স্বামী বললে,—অবশ্য ভয় নেই। একটু এগিয়ে দেখবি, গাছতলায় ব'সে ইরুল বাঁশী বাজাচ্ছে। তাকে সঙ্গে নিবি।

ইরুল!—মনে মনে ভয়ানক চম্‌কে উঠল মুনিমা। তিস্‌মুর কাছে ওর খবর শুনেই তো যাচ্ছে সে,—কিন্তু, একা সে যে ওর কাছে যাচ্ছে,—এতে কোনো ঈর্ষা বোধ করছে না তার স্বামী?

খড়ের আঁটিটা মাথার ওপরে উঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে গেল বড়ো স্বামী,—তাড়াহুড়ো করিসনি বউ, আমি তো চলে যাচ্ছি, তোর কাজ ক'রে রাখব'খন।

শ্যামল আর হরিৎ ফার্ন-জাতীয় গাছ-গাছালি ভেদ ক'রে রুপোলী ধারা নেমে এসেছে ঝর্নার মতো নানান উপলখণ্ডে প্রতিহত হ'য়ে। তারই তীর ঘেঁষে ব'সে পড়ল মুনিমা, গুমরে-ওঠা কান্নার মতো স্বরে বললে,—অসহ্য! এ কোথায় তুমি নিয়ে এলে! পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,

তাতে ওরা বেত দিয়ে মারা তো দূরের কথা, একটু হিংসাও করল না!

ইরুল ওর পাশ ঘেঁষে বসতে-বসতে বললে,—কেমন সংসার করছ বলো? মন বসেছে?

—না-না, আমার একেবারেই ভালো লাগে না!—মুনিমা কান্না-ভরা কণ্ঠে বললে,—তিস্সু তো একেবারেই ছোট, তাকে স্বামী ব'লে ভাবতেও পারা যায় না। আর যে দু'জন,—তাদের মধ্যে থাকতে হয় দুদিন এর কাছে, দুদিন ওর কাছে। অসহ্য!

—কেন!— ইরুল বললে,—লোক কী ওরা খারাপ?

—ধ্যেৎ!—মুনিমার মুখখানা লজ্জায় হলো আরক্ত; বললে,—দিশাকে বলেছিলাম।

—কি?

—বলেছিলাম এই, দুজনে পালিয়ে যাই চলো। ঐ পাহাড়ের চুড়ো পেরিয়ে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল ইরুল; বললে,—কী উত্তর দিলে সে?

—কী আর? ভয় পেয়ে গেল।

ইরুল গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—এসব চিন্তা আর কোরো না। এখানেই তুমি সুখে থাকবে। অন্য পাঁচটি মেয়ে থাকছে না?

বিচিত্র মেয়েমানুষের মন। এ-কথায় হঠাৎ-ই হেসে ফেলল মুনিমা; বললে,—দিশা একেবারে তোমারই মতো। ডানপিটে, বাউণ্ডুলে। তোমারই মতো বাঁশী বাজায়।

—বুঝেছি।

—কী?

ইরুল বললে,—দিশার দিকেই মনটা ঝুঁকেছে বেশী।

মুনিমা লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে,—অন্য পাঁচটির সঙ্গে আমার তুলনা করবে বুঝি?

কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ইরুল। বয়সের হিসাবে সে যেন যথেষ্ট প্রবীণ, যথেষ্ট গম্ভীর। বললে,—বাইরে সুখ নেই, বাইরে যা আছে তা বিষ। এখানকার সহজ সরল জীবনে তোমার মন মুক্তি পাবে।

এমন ভারী গলায় বিজ্ঞের মতো কথা বলছে ইরুল, ঠিক যেন তার বড়ো স্বামী। হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠল মুনিমা; বললে,—তোমার হাতের বাঁশীটা বাজাও না? দেখি, দিশার মতো সুর ওঠে কিনা?

একটু হেসে ইরুল বললে,—পারি না তোমার দিশার মতো বাজাতে?

—ছাই পারো!

দিশার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে দুটি দুষ্টুমি-ভরা চোখে ইরুল বলে উঠল,—শোনো এবার।

সত্যিই দিশার সুর। শুনতে শুনতে হঠাৎ-ই অদ্ভুত আনন্দে ভ'রে গেল মুনিমার মন। একবার তার মনে হলো, পরনের ব্লাউজ আর অন্তর্বাস খুলে ফেলে অন্য টোডা-মেয়ের মতোই খাটো ক'রে শাড়ী প'রে ওর সুরে সুরে প্রমত্ত হ'য়ে নাচতে আরম্ভ করবে সে!

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো,—সব—সব মিথ্যে! বড়ো স্বামীর গম্ভীর স্বরের উপদেশ, দিশার বাঁশী,—সব। সত্যি শুধু সেই পনেরো বছর আগেকার বয়স, সত্যি শুধু সেদিনকার সেই দশ বছরের ইরুল, সত্যি শুধু সেদিনকার স্বপ্ন, সত্যি শুধু সেদিনকার শত নিষেধের অরণ্য আর পর্বত পেরিয়ে দুর-দুরান্তে দুজনের হাত-ধরাধরি করে ছুটে পালিয়ে যাওয়া!

বড়ো বড়ো অবিন্যস্ত মাথার চুল, বড়ো বড়ো দুটি চোখের অদ্ভুত বিস্ময়,—তিস্সুর দিকে তাকাতে তাকাতে বার বার সেই পনেরো বছর আগেকার দশ বছর বয়সের ইরুলের কথাই মনে পড়ে যায়।

—একি, তোমার চোখে জল!

চম্‌কে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায় মুনিমা।

—কী হয়েছে!

চোখ মুছে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুনিমা, ঝর্নার জল হাঁড়িতে ভ'রে নিয়ে গাঁয়ের পথে পা বাড়াতে-বাড়াতে মুখ ফিরিয়ে মুনিমা বলে,—তিস্সুকে আসবার সময় মিছিমিছি ব'কে এসেছি। ও হয়ত কাঁদছে।

দিন যায়, রাত যায়—এমন ক'রে ক'রে তারপর কেটে গেল একটি মাস। এই একটি মাসে ক'টি বার-ই বা দেখা হয়েছে মুনিমার সঙ্গে?

যতবারই দেখা হয়েছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা,—নিয়ে চলো আমাকে এখান থেকে!

তীব্রস্বরেই উত্তর দেয় ইরুল,—উটকামণ্ডের সেই সাহেব-টার কাছে?

মুহূর্তে আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে মুনিমা; আর্তস্বরে বলে,—না-না!

—তবে?

—আরও দূরে, অন্য কোনোখানে।

—না।— ইরুল দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—বাইরের জন্য তুমি নও। বাইরের হাওয়ার জন্য তুমি নও। কোনো মেয়েই বুঝি নয়।

—ঈস! ক'টি মেয়ের মনের খবর জানো তুমি!

গম্ভীর হয়ে যায় ইরুল, ঠিক তার বড়ো স্বামীর মতোই বলতে থাকে,— না-না, ঠাট্টার কথা এ নয়। মন দিয়ে ঘর করো, স্বামীরা তোমার খারাপ নয়।

—আর তুমি?

—আমি?— একটু হাসল ইরুল,—বেশ তো আছি। তোমাকে স্থিতি করতে পারলেই আমার সুখ।

—কেন? অতো সুখ খোঁজো কেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর ইরুল বললে,—সেই দশবছর বয়সে তোমাকে গাঁয়ের বাইরে—দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেটা অপরাধ।

—বেশ তো, প্রায়শ্চিত্ত করো না? একটা মহিষ 'নিয়াম্'কে দিলেই চলবে আশা করি।

ইরুল বললে,—সে তো বাইরের। মনের ভিতরে যে অপরাধ-বোধটা কুরে-কুরে খাচ্ছে, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে কেমন ক'রে?

অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকায় মুনিমা; বললে,—তুমি কি লেখাপড়া শিখেছিলে?

—তা একটু-একটু। কেন?

মুনিমা বললে,—তাই অতো বড়ো-বড়ো কথা বলতে পারো।

—না। তার জন্য নয়। আমি ব'সে ব'সে এইসবই ভাবি।

—কী সব!

ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল ইরুলের দুটি চোখ; বললে,—আমার পিঠের দিকে ভালো ক'রে তুমি তাকিয়ে ত্যাখোনি। এই ত্যাখো, এখনও দাগ খুঁজে পাবে।

আরও কাছে স'রে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর মুনিমা; আর্তস্বরে বলে উঠল,—কী সর্বনাশ! কী ক'রে হলো! এতদিনে একটিবারও জানতে দাওনি!

নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে স'রে বসল ইরুল; বললে,—সভ্যজগতের মানুষ লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে।

—কেন!

—মিথ্যে চোর বদনাম দিয়ে মুখ দিয়ে চুরির কথা কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি বলিনি। আর এক মেমসাহেবের কথা শুনবে? আমি তার চাকর ছিলাম, সাহেবের অনুপস্থিতিতে আমাকে সে কানে-শোনা-যায়না এমন এক প্রস্তাব করেছিল। আমি রাজী হইনি। কিন্তু সাহেবকে সে যা-তা বলে দিয়ে আমাকে এমন মার খাইয়েছিল যে, আমাকে হাসপাতালে থাকতে হ'য়েছিল কয়েকদিন।

হু-হু-করা কান্নায় ভেঙে পড়ল মুনিমা; বললে,—আর বলিস না! আমারও যে কী দিন গেছে! চা-বাগানের কতো লোক! আমাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছিল—পশুর মতো।

—তবে?— ইরুল বললে,—তুলনা ক'রে ছাখ্, এইখানেই তোর মুক্তি। কিছুদিন কাটুক, মনে যেটুকু দ্বিধা আছে, তা-ও কেটে যাবে।

চুপ ক'রে থাকে মুনিমা। মনে-মনে চিন্তা ক'রে দেখে, ইরুলের যুক্তিই ঠিক। কোথায় ও যাবে এই গাঁ ছেড়ে? কোথায় গিয়ে বাঁচবে?

কিন্তু তবু কেন যেন এখানে মন বসতে চায় না,—কিসের এক ভালো-না-লাগার অপ্রসন্ন সুর মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফিরতে থাকে।

ওরা ব'সে ছিল চুপচাপ, এমন সময় দূর থেকে হঠাৎ-ই ভেসে এলো একটি পরিচিত বাঁশীর সুর। চমকে উঠল মুনিমা। দিশার বাঁশী। দিশা যদি জানতে পারে, এই ঝর্নার ধারে লুকিয়ে সে এসেছে ইরুলের সঙ্গে দেখা করতে? তা হ'লে?

চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুনিমা। ওর হাত ধ'রে ওকে আবার টেনে বসালো ইরুল। বললে,—ভয় করিস না, আমার সঙ্গে মিশলে কেউ কিছু মনে করবে না।

একটু আশ্চর্য হয়েই মুনিমা বলে,—এটা কী ক'রে হয় বলো তো? ওরা জেনেশুনেও কিছু বলে না। একটু হিংসাও জাগে না ওদের মধ্যে। আগে আগে দিশা আসত আমার সঙ্গে ঝর্নার ধারে জল আনার সময়। এখন আর আসতে চায় না। বলে,—যা-না একা। ওখানে ইরুল আছে, কোনো ভয় নেই।

ইরুল হাসলো; বললো,—জানিস না বুঝি? এই-ই নিয়ম। পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে না দেওয়াটা সমাজে ভয়ানক নিন্দনীয় ব্যাপার। এতে ওদের একেবারেই আপত্তি নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ। আমাদের এই টোডাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা খুব কম, তাই মেয়েদের ব্যাপারে কোনো কড়াকড়িই এদের নেই।

হঠাৎ-ই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল মুনিমা,—তোর সঙ্গে যদি ভাব ক'রে সারাদিন এখানে কাটিয়ে দিই, তাতেও না?

—না। সত্যিই না। শুধু ওরা যাতে অযথা না ভাবে, আসবার সময় কাউকে জানিয়ে আসবি যে, আমার কাছে আসছিস।

—আসতে ওরা দেবে?

—কেন দেবে না! অভাবে পড়লে অনেক সময় ওরা বউ বাঁধা দেয়, তা জানিস্?

মুখ টিপে হাসল মুনিমা; বললে,—তা আমার স্বামীদের অভাবটা কিসের যে তোর কাছে বউ বাঁধা দিতে যাবে!

ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে এনে ইরুল বলে,—বাঁধতে আমি চাইছিই বা কই? তবে, দিনান্তে তোকে একবার দেখলে ভালো লাগে, কথা বললে ভালো লাগে।

—তাই নাকি!— ঠোঁট উলটে মুনিমা বললে,—নতুন খবর! তা কথা কইবার অতোই যদি শখ, তো আমাদের বাড়ী এলেই পারো।

—লাভ কী? তাছাড়া, টিভালিয়লরা অতো ঘন ঘন টারথারলদের বাড়ী যায় না, যেতে নেই।

মুনিমা বলে উঠল,—তাই বুঝি আমাকে তোমার পেতে হবে এই নির্জন পাহাড়ের কোলে, ঝর্নার ধারে?

হাসল ইরুল; বললে,—টোডা ছেলেদের তা-ই রীতি। তারা পাহাড়ের গুহায় বা বনের অন্তরালে, কিম্বা এইরকম কোনো ঝর্নার ধারেই আদর আর ভালোবাসা জানাতে চায় তাদের প্রিয়াকে।

—বুঝেছি!— তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুনিমা,—আমার ওভাবে বিয়ে দেওয়াটা তোমার ছল,—আসলে আমাকে তুমি পেতে চাও এই ভাবে! কেন, অতোই ইচ্ছা যদি, নিজে রাখতে পারোনি কাছে? এখানে, না-হয় অন্য কোথাও? কে আসতে চেয়েছিল এখানে? কিম্বা এখানে এসে কে পেতে চেয়েছিল এই অদ্ভুত জীবন!

—এখানকার জীবনটা অদ্ভুত?

—নয়? ছোটোটা কাছ ছাড়তে চায় না একদণ্ড, মেজোটা সর্বক্ষণ এটা-ওটা ব'লে জ্বালাতন করে। বড়োটা পশুর মতো ওৎ পেতে থাকে রাতের আঁধারের জন্য। এই কি জীবন? ছিঃ!

উঠে দাঁড়ায় ইরুল। একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বলে,—কী তুই চাস্ বল্ তো?

—এখান থেকে আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাই। ভালো লাগে না—কিছুই ভালো লাগে না। সেই ছোটোবেলায় দুজনে ব'সে যে স্বপ্ন দেখতাম, সে কি এই?

চুপ ক'রে থাকে ইরুল। মুনিমা আবার বলে,—পারো না? পারো না জোর ক'রে আমাকে কাছে টেনে রাখতে?

—রাখছিই তো!—ইরুল বললে,—আমি কি দূরে আছি! এইতো দেখা হলো। এই ভাবেই চলুক না সারাটা জীবন।

—এই ভাবে? এই চুরি ক'রে দেখা হওয়া?

—চুরি কেন?— ইরুল বললে,—এই যে তুমি এসেছো আমার কাছে, এর একটা অর্থই ওরা করবে। আমি তোমাকে ভালোবাসছি। ভালোবাসায় তো ওদের আপত্তি নেই।

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন মুহূর্তে পাগল হ'য়ে গেল মেয়েটা; তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো,—কিন্তু আমার আপত্তি আছে। এভাবে দেখাসাক্ষাৎ আর নয়! হয় আমাকে তোমার পেতে হবে একেবারে, নয় তো, আমাকে তোমায় ছাড়তে হবে চিরকালের জন্য।

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দুমদাম পা ফেলে দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আসে মুনিমা।

আরও কেটে যায় কিছুদিন। গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছে মুনিমা। বড়ো স্বামী নীল রঙের খাটো একটা শাড়ী এনে দিয়েছে, সেটা টোডাদের মতো ক'রে প'রে দিশার সঙ্গে যায় ঝর্না থেকে জল তুলে আনতে।

পথেই পড়ে সেই গাছটা, যার নীচে ব'সে ইরুল বাঁশী বাজায়,—তার মোষটা চরতে থাকে কাছেই।

কিন্তু পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙে একটু ঘুরেই যায় মুনিমা, সঙ্গে দিশা। ঝর্নার কাছে এসে বসে সেই পাথরটারই ওপর। দিশাকে বলে,—বাজা তোর বাঁশী। লম্বা বাঁশের একটা বাঁশী। দুটো কি তিনটে মাত্র স্বর বাজে একঘেয়ে সুরে। কিন্তু সেই স্বরই কানে যেন মধু বর্ষণ করে। মনে হয়—দিশা নয়, ইরুলই যেন ব'সে আছে তার পাশে,—বাজাচ্ছে ওদের সেই চির-পরিচিত মেঠো সুর।

শুনতে শুনতে চোখে জল এসে পড়ে একসময়। হাঁড়িটা জলে ভরতি করতে করতে ভাবে,—না-হয় রাগই করল মুনিমা, প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু ও কি নিশ্চিন্তে এমন ক'রে গাছতলাতেই বসে থাকবে? কী ও চায়? ওকে পেতে, না, ছাড়তে? পেতে চায় তো নিক ওকে টেনে, না-হয় এভাবেই নিক কোনো চতুর প্রেমিকের মতো তার স্বামীদের আড়াল ক'রে। আর না-হয় তো ছেড়ে দিক ওকে—আর কখনো কোনো অবস্থাতেই যেন সে দেখা না করে, কথা না বলে! দিনান্তে একবার দেখতে চায়, একটু কথা বলতে চায়? না, এক মুহূর্তের জন্যও দেখা দেবে না মুনিমা, একটি কথা ভুলেও বলবে না! জল-ভরতি হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে মুনিমা বললে,—আয়, দিশা।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। মনটা যেন অনেকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে মুনিমার। এর মধ্যে একটিবারও দেখা হয়নি ইরুলের সঙ্গে। কেমন আছে কে জানে! ভালোই আছে নিশ্চয়। ওদের গাঁও-বুড়া কি ওকে এতদিনে একটা বউ জোগাড় ক'রে দেয়নি?

তিস্‌মু পিছন থেকে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে; বলে,—বউ?

—কী?

—গল্প বল্। ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—

—ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে আছে এক দেশ। অদ্ভুত সব বাড়ী, অদ্ভুত সব আলো!

দুটি বিস্ফারিত চোখ মেলে শুনতে থাকে দশ বছরের শিশু।

—আচ্ছা, বউ?

—কী?

তিস্‌মু বলে,—যাওয়া যায় না পাহাড় পেরিয়ে?

—কেন যাবে না? খুব যায়। যেতে ইচ্ছা করে বুঝি?

—হ্যাঁ, খুব করে। যাবি?

—আমি?

—হ্যাঁ। তুই সঙ্গে না থাকলে যাবো না।

অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মুনিমা। ঠিক যেন সেই পনেরো বছর আগেকার সেই ইরুল। তেম্‌নি অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি! তেম্‌নি দূর-দিগন্তের নেশা মেশানো দুটি বন্য চোখ!

সব-কিছু মুহূর্তে বিস্মরণ হ'য়ে যায়। দুটি হাতে তিস্‌মুকে জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নেয় নিবিড় ক'রে, অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে,—ইরুল—ইরুল!

চম্‌কে ওঠে তিস্‌মু; বলে,—কাকে ডাকছিস্? ইরুল তো সেই মাঠের ধারে, গাছতলায়!

কিন্তু সাড়া আসে না মুনিমার কাছ থেকে, নিষ্প্রাণ পাষাণ-প্রতিমার মতোই ব'সে থাকে সে চুপচাপ।

তিস্‌মু ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে,—বউ?

—কী?

—ইরুলকে ডেকে আনব?

মুহূর্তে চমকে ওঠে মুনিমা। মনের কথা কেমন ক'রে বুঝতে পারে এই শিশু! বললে,—চল্ তিস্‌মু।

—কোথায়?

—ঐ গাছতলায়।

—ইরুলের কাছে?

—হ্যাঁ।

সত্যিই তিস্‌মুর হাত ধ'রে এগিয়ে চলে মুনিমা। সারা আকাশটা ঘন নীল। দুটি একটি সাদা মেঘের টুকরো এদিক-ওদিকে ভেসে আছে। শুধু, অরণ্য পেরিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, দিগন্তের সারি সারি মেঘ চলেছে নিরুদ্দেশের দিকে,—যেন কার শৈশব-স্বপ্ন! মুছে গিয়েও যা মোছেনি, ভেঙে গিয়েও যা ভাঙেনি।

ওদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ইরুল। বললে,—দূর থেকে চিনতেই পারিনি যে তুমি। এতদিন দূর থেকে তাহ'লে যাকে দেখেছি, সে তুমি? খাটো নীল শাড়ী প'রে খালি গায়ে ঝর্নায় যে একটি ছেলের সঙ্গে রোজ জল আনতে যায়, সে তবে তুমি?

তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দেয় মুনিমা,—তুমি জানতে না?

—কী ক'রে জানব!

অকারণ ক্রোধে যেন অন্ধ হয়ে যায় মুনিমা; ব'লে ওঠে,—তুমি কি চাও, আমি সেইরকম জামা আর শাড়ী প'রে শহুরে মেয়ে হ'য়ে ঘুরে বেড়াবো?

—না-না, সে আমি চাইব কেন!

—হ্যাঁ, তুমি তা-ই চাও!— উন্মত্তের মতো বলতে থাকে মুনিমা,—তুমি যা চাও, মুখে তা বলতে পারো না, কাজে তা করতে পারো না বলেই মনে মনে জ্বলে মরছ, আমাকেও জ্বালিয়ে মারছ!

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, একেবারে কেঁদেই ফেলে মুনিমা, তারপরে তিস্‌মুর হাতটা শক্ত ক'রে ধরে,—চল্ তিস্‌মু।

তাহ'লে সত্যিই কি কোনো ভুল করল ইরুল? ও কি এভাবে সুখী হবে না?— গাঁও পেরিয়ে, 'বাদাগা'দের উধাও মাঠও পেরিয়ে, পাহাড়ের পথে উঠে কিছুদূর চলবার পর এক অতি সংকীর্ণ বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে সোজা-নেমে-যাওয়া নীচেকার ভয়াবহ খাদের দিকে তাকিয়ে নানান প্রশ্ন জাগে ইরুলের মনে। এখান থেকে পা ফস্‌কে গেলেই পাথরে ধাক্কা লেগে-লেগে হাড়-গোড় ভেঙে কোথায় যে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে এই দেহটা, তার কেউ খোঁজ পাবে না। কিন্তু শেষ ক'রে দেওয়াতেই কি সব-কিছুর শেষ?

এই সংকীর্ণ বন্ধুর পথ ধ'রেই সে আর মুনিমা আজ থেকে পনেরো বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিল দূর সভ্যজগতে, আবার পনেরো বছর পরে এই পাথর-ছড়ানো পথ বেয়েই ফিরে এসছে তারা দুজনে। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে সে আসে এদিকে অন্যমনস্ক উদাসী মন নিয়ে। বিপজ্জনক এই বাঁকটার মুখে লাল চ্যাপ্‌টা পাথরটার ওপরে চুপচাপ সে ব'সে থাকে। পাখী ডাকে মাথার ওপরে, পাহাড়ের কোনো এক নাম-না-জানা গাছের ডালে ব'সে ডালপালার অন্তরাল থেকে,—কোথায় যেন কোন্ ঝোপের আড়ালে কাঠবিড়ালী নেমে এসে খেলা করে। সর্‌সর্ সন্‌সন্ হাওয়া এসে লাগে কোথাকার কোন্ বেণুবনে,—নুড়িতে নুড়িতে নাড়া দিয়ে কোথায় বুঝি কোন্ ঝর্নার রজতধারা সঙ্গোপনে সঙ্গীতে ঝংকার তোলে!

গাঁও-বুড়ো স্নেহ করে ইরুলকে। বলে,—তোর একটা বউ এনে দি'।

হেসে বলে ইরুল,—কোত্থেকে?

—তা আমি পারি। আমি তোর সম্পর্কে দাদা হই। কারুর বউকে জোগাড় ক'রে দেবো।

—কার বউ?

বুড়ো হেসে বলে,—আমাদের টিভালিয়ল-গোষ্ঠীর। টারথারলদের থেকে পারব না বাপু। সে আবদার তুমি ক'রো না। অনেক গরীব আছে, একটা মোষ দিলে, বদলে বউ দিয়ে দেবে'খন।

ইরুল গম্ভীর হ'য়ে বলেছিল,—এসব কথা তুমি কখনো তুলো না। এসব আমার ভালো লাগে না। যার বউ নিয়ে আসব, তার মনের অবস্থাটা ভেবে দেখো?

বুড়ো অবাক হয়,—মনের আবার কী অবস্থা হবে! কিছুই হবে না।

আর কিছু কথা বলেনি ইরুল, বুড়োর কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল। সত্যিই সে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে, ওদের কাছে এসব কোনো সমস্যাই নয়। বহুদিনের অভ্যাসে ব্যাপারটা এমন সহজ ওরা করে ফেলেছে যে, সভ্য মানুষের পক্ষে এসব জিনিস কল্পনারও বাইরে।

এদের 'সভ্য' ক'রে তুললে কেমন হয়? লেখাপড়া শিখিয়ে, কাপড়চোপড় পরিয়ে, মেয়েদের এক-পতিত্বের ব্যবস্থা করে?

কিন্তু করবে কে? স্বয়ং টিয়েক-জ্রি দেবীর এ ব্যবস্থা। এর বাইরে যাবে এমন কে সংস্কারবিহীন ব্যক্তি আছে এই টোডা-গাঁয়ে?

যদিই-বা বিপ্লব আনা যায়, যদি উটকামণ্ড্ থেকে পাদ্রী সাহেবদের নিয়ে আসা যায় পথ দেখিয়ে,—এদের সমাজে আমূল পরিবর্তন এনে লাভ কী হবে শেষ পর্যন্ত? আজ ওদের পয়সার দরকার হয় না, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাও কম,—কিন্তু সেদিন সব কিছুই বাড়বে। স্বল্প বস্ত্রেও চলবে না, স্বল্প বিহারেও চলবে না। টোডাদের মধ্যে মানুষ খুন করা নিষিদ্ধ, চুরি করা কাকে বলে এরা আজও জানে না, একের মুখের কথাকেই বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে অপরে। 'সভ্যতা' এলে এসব কি থাকবে? না-না,—সে বিভীষিকায় দরকার নেই,—নিজের পিঠের ছ্যাঁকাপড়া দাগের ওপরে হাত বুলোতে চেষ্টা করে ইরুল,—বেশ আছে, বেশ আছে ওরা!

মুনিমাকে এ-গাঁয়ে না ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত তার মন স্থির হচ্ছিল না। তাকে নিয়ে সে উটকামণ্ড্ থেকে পালিয়ে যেতে পারতো অন্য দিকে, অন্য শহরে,—মুনিমার 'কালো সাহেব' টেরও পেতো না। কিন্তু তারা? দারিদ্র্যের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হ'য়ে কোন্ রসাতলে যে তলিয়ে যেতো কে জানে!

সবথেকে বড়ো কথা, 'সভ্যজগৎ' সম্পর্কে এমন এক বিতৃষ্ণা জেগেছে ইরুলের মনে যে, সেখানে ফিরে যেতে, কিম্বা মুনিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কিছুতেই মন চায় না। এখানে, এই টোডাগাঁয়ে, পেয়েছে সে শান্তি, পরম শান্তি। বাইরের ছাঁচে-ঢালা মানুষদের সঙ্গে এদের ধরন-ধারণ কিছুই মেলে না বলেই যেন এখানকার বাতাসে বুক ভ'রে নিশ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে।

কেটে গেল আরও কিছুদিন। বড়ো স্বামী একদিন মুনিমাকে আদর করতে করতে বলে,—ইরুলের সঙ্গে দেখা করো না কেন? মেশো না কেন ওর সঙ্গে?

মুনিমা বিরক্ত হয়েই উত্তর দেয়,—ভালো লাগে না মিশতে।

—কেন?

এ 'কেন'র উত্তর মুনিমাই কি জানে? ভালো লাগে না আর ইরুলকে। যেন ঝর্নার স্রোত কলসীর মধ্যে ধরা পড়ে আছে। সেই ইরুল, যার মুখ মনে পড়তেই মনে হতো,—দুরন্ত বেগে সে ছুটে চলছে। আর তার হাত ধ'রে বার বার ডাকছে,—আয়, চ'লে আয়।

গত পনেরো বছর ধ'রে এই একান্ত এক স্বপ্ন দেখেছে মুনিমা। কালো সাহেবের অত্যাচারে যখন কান্না পেতো, ভেঙে যেতো বুকের ভিতরটা, তখন কল্পনা করত সে ইরুলকে। যেন তার হাত ধ'রেছে সে এসে। বলছে,—ভয় কী? আয়, চলে যাই। ছুটে চলে যাই এখান থেকে। কে জানে, ক্রমাগত ছুটে চলার নেশা এমন করে তার রক্তে ঢেলে দিয়েছিল কে? সেই দশবছর বয়সে, যা কারুর করার কথা নয়, তাই তারা ক'রে বসেছিল। সমস্ত ভয় আর শাসন উপেক্ষা ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা!

আর আজ? বড়ো স্বামীর বাহুবন্ধনে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে সে একসময়। চমকে ওঠে বড়ো স্বামী,—একি! কী হ'লো?

বিরক্ত হ'য়ে ওর হাতটা সরিয়ে দেয় মুনিমা। ঠিক যেন ইরুল। বিচক্ষণ, প্রবীণ ইরুল। উপদেশ অনুরোধ আর
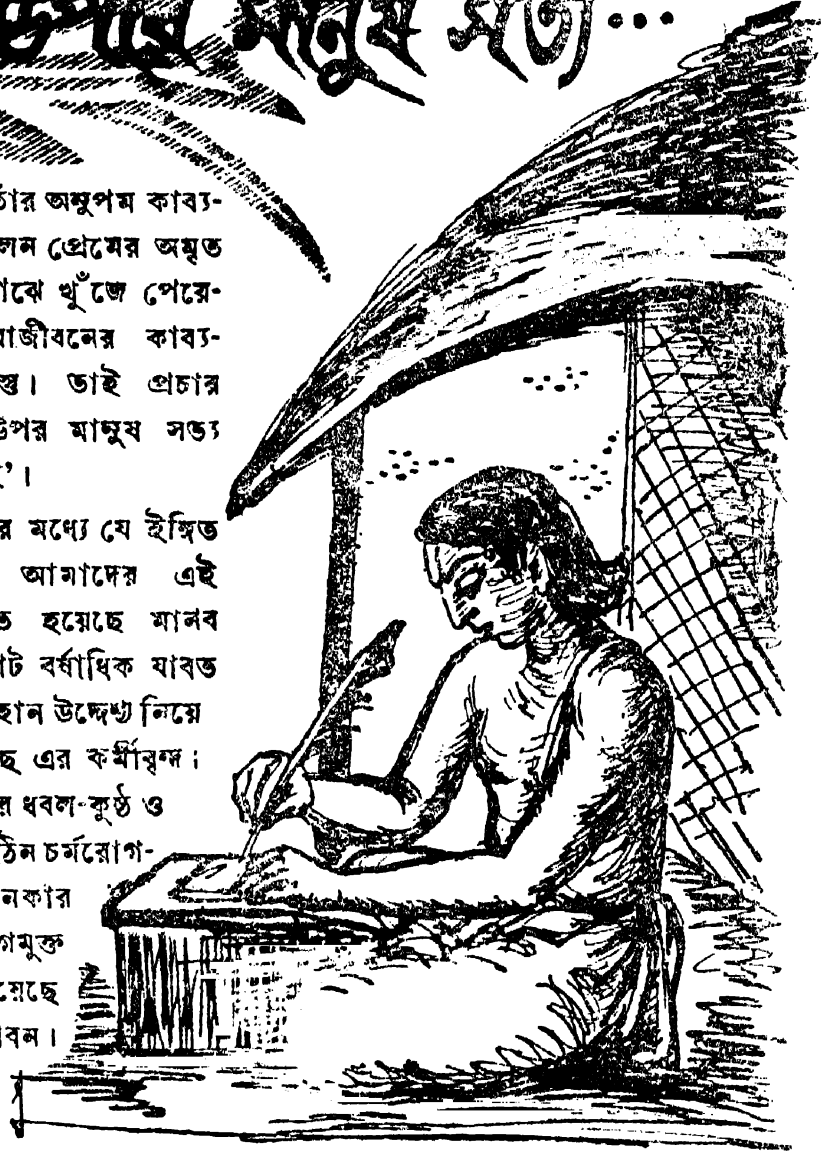
প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া, ফোন : ৬৭-২৩৫৯

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

অযাচিত স্নেহ দিয়ে তার অশান্ত মনটাকে মিছিমিছি শান্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

পরদিন ছুটে যায় খুব ভোরবেলায় সে দিশার সঙ্গে—একেবারে টেনে নিয়ে সেই পাহাড়ের পথে। নীচে ভয়াবহ খাদ,—মাথার ওপরে উত্তুঙ্গ পাহাড়। বলে,—বাঁশী বাজা তুই, আমি নাচি।

কিন্তু গায়ের জামা খুলে খাটো ক'রে শাড়ী পড়লেই কি খাঁটি টোডা-মেয়ে হওয়া যায়? রেভারেণ্ড কুমারস্বামী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, চা-বাগানে আর উটকামণ্ডের নানান লোকের সঙ্গে মিশবার ফলস্বরূপ নানান অভিজ্ঞতার আস্তরণের নিচে কোথায় চাপা প'ড়ে গেছে তার মধ্যে সেই টোডা-মেয়ের আদিম মন, তার সন্ধান কে দেবে!

সেই একই একঘেয়ে সুরে বাঁশী বাজায় দিশা; বলে,—কই, নাচ্?

—পারছি কই?

—আয় তোকে শিখিয়ে দি'। সামনে আমাদের পরব। সেদিন মোষ মারা হবে, বাদাগারা আসবে, কোটারা আসবে, ইরুলারাও আসবে সম্বর-হরিণ কাঁধে নিয়ে, সারারাত চলবে খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনা আর নাচ। নাচবে গাঁয়ের সব মেয়েরা। তোকেও নাচতে হবে।

কিন্তু, কতক্ষণ? পাহাড়ের সেই বিপজ্জনক বাঁকটা ছেড়ে দিয়ে ওরা দুজনে চলে গেল সেই ঝর্নার ধারে। গানও জমে না, নাচও জমে না। দিশাকেও মনে হচ্ছে ইরুলের মতো—যে কিছু দাবি করতে জানে না, জোর ক'রে কিছু পেতে চায় না, শুধু একটু সঙ্গ পেলেই যে খুশী। 'দিনান্তে একবার চোখের দেখা পেলেই হলো',—দিশাকে দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি সে ইরুলের প্রতিধ্বনি ক'রে ঐ কথাই বলে বসবে। হঠাৎ-ই উঠে পড়ল মুনিমা।

—কী হ'লো?

বিরস মুখে মুনিমা বললে,—ঘর চল্।

পরবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল টোডা-গাঁয়ে। সারারাত ধ'রে গান-বাজনা-নাচের মরসুম পড়ল ব'লে। কিন্তু কিছুতেই উৎসাহিত হয় না মুনিমা। বড়ো স্বামীকেও ভালো লাগে না, দিশাকেও না। ওরা যেন দুজনেই ইরুল। ইরুলের দুটি বিভিন্ন রূপ। ভালো লাগে—তার সত্তার প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে ভালো লাগে—আজকাল ছোট্ট তিস্সুকে। ছোট্ট তিস্সুও ইরুলের অন্য এক রূপ,—সেই ছোটো-বয়সের দশবছরের ইরুল যে ও!

ওকে কোলে নিয়ে এক এক সময় আদরে-আদরে অস্থির ক'রে তোলে মুনিমা; বলে,—আমি মরে যাবো তিস্সু!

দুটি নিষ্পাপ শিশুচোখ তুলে তার দিকে বড়ো-বড়ো ক'রে তাকায় তিস্সু; বলে,—কেন?

—অতো 'কেন-কেন' করিস না! তুই-ও ওদের মতো 'কেন-কেন' করবি?

কী ভেবে যেন হেসে ফেলে তিস্সু, তারপরে দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে,—বউ!

সমস্ত শরীরটা যেন শিরশির ক'রে ওঠে ওর এই মিষ্টি ক'রে 'বউ' ব'লে ডেকে ওঠায়। ওকে প্রাণপণে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে মুনিমা বলে,—আবার ডাক্!

—বউ?

—আরো—আরো। অনেক বার।

ও যেন তিস্সু নয়,—ও যেন তার সেই হারিয়ে-যাওয়া দশবছর বয়সের স্বপ্ন।

ফিসফিস ক'রে তিস্সু বলে,—যাবি?

ফিসফিস-করা স্বরেই সাড়া দেয় মুনিমা,—কোথায়?

সেই একই স্বরে তিস্সু বলে,—ঐ বড়ো পাহাড়ের চূড়োটা পেরিয়ে—

—তারপর?

তিস্সু বলে,—বাদাগাদের মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় উঠে অনেক উঁচুতে, রাস্তার একটা বাঁকে,—সেই যে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়,—সেখানে একটা চ্যাপ্টা লাল পাথরের ওপরে রোজ বিকেলে গিয়ে একা-একা বসে থাকে ইরুল।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে মুনিমা,—তুই কী ক'রে জানলি?

—জেনেছি।

—কী ক'রে? আমায় বলবি না?

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে তিস্সু বলে,—কাউকে বলবি না তো?

—না।

—তাহলে শোন্। আমি-না, পরশুদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে ইরুলের পিছন-পিছন গিয়েছিলাম! কেউ আমাকে দেখতে পায়নি!

—ইরুলও না?

—না।

—দিশাও না?

—দাদারা কেউ না, বাবাও না।

—দেখলে কী হতো?

—জানিস্ না ?

—না।

—টিয়েক-ভ্রি'র কাছে পুজো দিতে হতো। ছোটোদের পাহাড়ে যাওয়া বারণ।

—কে বললে ?

—আমি জানি। ঐদিকে বাদাগাদের গাঁও পর্যন্ত আমরা যেতে পারি, তার বেশী গেলেই পাপ হবে।

পনেরো বছর আগেকার দিনগুলিকে মনে পড়ল মুনিমার। পাপ যে হয়, সে তো তারাও জানতো। তবু যেতে চাইতো। ইরুল বলতো,—আয় আয়, চল্!

আজও রাত্রে, ঘুমের ঘোরে চম্‌কে-চম্‌কে ওঠে মুনিমা। সেই দশবছরের ছেলেমানুষ ইরুল যেন আজও ডাকছে,—আয় আয়, চল্!

কিন্তু, এক এক সময় নিজেরই ওপর অসীম বিরক্তিতে মন ভ'রে যায়। কেন ? এতো ছুটে-চলার নেশাই বা কেন ? মেয়ে হ'য়ে—এক সংসারের বউ হ'য়ে—কেন তার এই গণ্ডীর বাইরে যাবার নিষিদ্ধ আকর্ষণ ? এ কী অদ্ভুত মন তার! এ কী জ্বালায় জ্বলছে সে অনুক্ষণ! আর কোনো মেয়ে তো এমন করে না! হাসিমুখেই তো ঘর করছে তারা। তবে ? তার কেন এমনটি হল ? কে বলে দেবে ? যে বলতে পারত, তার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, তার মুখখানাও দেখতে ইচ্ছা করে না! সেই পনেরো বছর আগেকার ছোট্ট ছেলেটিকে সে যেন গ্রাস ক'রে বসে আছে!

—বউ!

দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল এসে তিস্‌সু।

যাকে সে অতো ভালোবাসে, যাকে না দেখলে তার মনটা অস্থির-অস্থির করে, হঠাৎ সেই তিস্‌সুকেই দু'হাতে ঠেলে দেয় মুনিমা; বলে,—সরে যা। এখন বিরক্ত করিস না।

চুপচাপ কিছুক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে তিস্‌সু পাথরের খণ্ডের মতো। তারপরে এক সময় পায়ে-পায়ে আবার কাছে আসে সে মুনিমার; বলে,—আমি জানি।

—কী ?

হঠাৎ-ই তিস্‌সু বলে ফেলে,—ইরুলের সঙ্গে দেখা না হ'লে তোর মন ভালো থাকে না।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুনিমা,—কে বললে রে তোকে ?

কৌতুকে হাসি-হাসি মুখে বলতে থাকে তিস্‌সু,—আমি জানি। দাদারা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

—কী বলছিল ?

—ইরুলকে ঘরে ডেকে আনবার কথা।

বলতে-বলতে ওর খুব কাছে এসে দাঁড়ায় তিস্‌সু, ওর হাতটা ধ'রে বলে,—বউ ?

সুপ্তোত্থিতের মতো ব'লে ওঠে মুনিমা,—উঁ ?

—আমি ডেকে আনবো ইরুলকে ? বিকেল হয়ে এলো। ঐ দ্যাখ্ না, পাহাড়ে-পাহাড়ে বনে-বনে কেমন ছায়া প'ড়ে এসেছে। ও নিশ্চয়ই গেছে সেই পাহাড়ী রাস্তায়, সেই খাদের ধারে চ্যাপ্‌টা লাল পাথরটার কাছে। যাব ?

দু'হাতে ওকে মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে মুনিমা, বসে প'ড়ে টেনে নেয় কোলের কাছে, কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোনোক্রমে বলে,—কাকে ডাকবি ? সে কি আর বেঁচে আছে ? মরে গেছে রে, একেবারে মরে গেছে!

ওর কথা কিছুই বুঝতে পারে না তিস্‌সু, তার অবাক-হওয়া বড়ো-বড়ো দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মুনিমার দিকে। ডাকে,—বউ ? তুই কাঁদছিস্!

—না!— চোখ মুছতে-মুছতে মুনিমা বলে,—কাল পরব, না-রে ?

—হ্যাঁ।— পরবের কথায় মুহূর্তে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে তিস্‌সু বলে,—কাল রাতে কতো গান, কতো নাচ! তুই নাচবি তো ?

—আমি নাচলে তুই খুশী হবি ?

—হ্যাঁ।

—না।— মুনিমা বললে,—যারা খুশী হবার হোক, তুই হোস না। তোর বউ কারুর সঙ্গে নাচবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, শুধু গল্প করবে সারারাত তোর সঙ্গে। তোকে আমি ঐ পাহাড়ের গল্প করব। ঐ পাহাড়ের চূড়োটা পেরিয়ে—

—মুনিমা!— যেন মুহূর্তে বজ্রপাত হলো ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠল মুনিমা। দরজা পেরিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে ইরুল।

—দিশা আমাকে ডেকে নিয়ে এলো।

—কেন!

অল্প একটু হেসে ইরুল বললে,—তোর নাকি মন ভালো নেই, তুই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস!

—কে বললে!— মুনিমা বলে,—আমার মনের খবর জানালো কে এতো ?

—কেন ? তোর স্বামীরা ?

—খুব জেনেছে তারা!— মুনিমা বলে,—কিন্তু তুমি এলে কেন ? এমন ক'রে ?

—দেখা করতে। দেখা তো পাই-ই না।

তীব্রস্বরে বলে উঠল মুনিমা,—পেতে হবে না দেখা। যাও এখান থেকে। এখুনি যাও!

—তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি।— মুনিমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হ'য়ে যায়,—তুমি যাবে কিনা?

রুদ্ধবাক্ চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ইরুল, তারপর ধীর কণ্ঠে বলে,—যাচ্ছি।

ব'লেই আর দাঁড়ায় না, দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি ইরুল।

—বউ?

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নেয় মুনিমা; বলে,—তিস্‌সু! তুই কিন্তু ওর মতো বড়ো বয়সে এরকম বাঁধা প'ড়ে থাকবি না। যে যতই মারুক, তুই বুক টান ক'রে সোজা হাঁটবি। চলে যাবি ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—ঘুরবি এ-দেশ থেকে ও-দেশ—

ওকে থামিয়ে দিয়ে তিস্‌সু বললে,—ঠিক বলছ?

—কী?

—পাহাড়ের ওপারে ভালো দেশ আছে?

—আছে। ভালো মানুষও আছে। আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তুই তো খুঁজবি ইরুল! তোর কি এভাবে চুপ ক'রে এক জায়গায় ব'সে থাকা সাজে! আমি যে তোকে এমন ভাবে দেখতে চাই না,—কোনোদিন চাইওনি!

তিস্‌সু অবাক হ'য়ে বললে,—আমাকে ইরুল বলছ কেন?

একটুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মুনিমা বলে,—তাইতো রে! বড্ড ভুল হ'য়ে যায়!

পরবের দিন। যতো বেলা প'ড়ে আসে, উৎসবের তত ঘটা প'ড়ে যায়। আজ সমস্ত বিধিনিষেধ শিথিল। টিভালিয়ল—টারথারল,—সব একাকার! অরণ্যের দিক থেকে দু'একজন ইরুলা সত্যিই আসে সম্বর-হরিণ বিক্রি করতে। আর আসে কোটারা, বাদাগারা।

লাল-টকটকে একটা শাড়ী তাকে এনে দিয়েছে বড়ো স্বামী। দিশা বললে,—এই কাপড় প'রে আজ তোকে আমার সঙ্গে সারারাত নাচতে হবে বউ, বুঝলি?

ওদেরও দেশী প্রথায় তৈরী করা মদ আছে। সেই মদ্যপান মধ্যাহ্ন থেকেই চলেছে সারা গাঁয়ে। তিস্‌সু বললে,—খাবি বউ?

নাক টিপে কোনোক্রমে তা পান করে মুনিমা। গলা দিয়ে যেন এক অগ্নিস্রোত নেমে যায়। দিশা ছুটে আসে, বলে,—একবারে অমন ক'রে খেতে নেই, ভীষণ নেশা হবে।

মুনিমা তিস্‌সুকে জড়িয়ে ধ'রে বার বার বলতে থাকে,—ইরুল—আমার ইরুল! তুই যা, পাহাড় পেরিয়ে তুই চ'লে যা। ফিরে এসে অন্ততঃ এই খবরটি আমায় দিস যে, ভালো লোক এখনো সংসারে আছে! সেই কালো সাহেব আর চা-বাগানের সেই পশুগুলো ছাড়াও লোক আছে দেশে, যারা আজও মানুষকে স্নেহ করতে জানে, ভালোবাসতে জানে, জংলী বলে দূরে ঠেলে রাখতে চায় না, বা জংলী বলেই টোডারা যে মানুষ নয়, এ-কথাটা বিশ্বাস করতে চায় না। ওরা আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে রে, আমার বাচ্চা ছেলেটিকে পর্যন্ত মাটির মুখ দেখতে দেয়নি!

দিশা এসে ওকে তুলে ধরে,—ঈশ! ভয়ানক নেশা হয়েছে দেখছি! আয়, নাচের আসরে আয়, মেয়েদের সঙ্গে নাচবি।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশাল জ্বলে উঠেছে সারি সারি। লম্বা-ধরনের ঢোলের মতো বাজনা আর বাঁশী, আর বিচিত্র লতাপাতা, পাখীর পালক আর মোষের শিং মাথায় কাপড় দিয়ে বাঁধা পোশাকের মানুষগুলো। সত্যই অদ্ভুত নেশায় যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে মুনিমাকে। তিস্‌সুকে জড়িয়ে ধ'রে বলে,—ইরুল—ইরুল কই?

সারা আসরে ইরুলকে কেউ দেখতে পায়নি। তিস্‌সু বলে,—আমি দেখছি বউ।

—না, তুই যাস না!— মুনিমা ওর হাতটা চেপে ধরে, তারপরে ওর গালে নিজের গাল দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ক'রে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে,—এই তো, এই তো আমার ইরুল!

কিন্তু তিস্‌সুর মনে আজ জাগে অন্য এক ভাব। বার বার তার আজ মনে হয়, বউ তাকে ভালোবাসেনা—কোনওদিন ভালোবাসেনি। বউ চায় ইরুলকে—শুধু ইরুল আর ইরুল!

টোডাদের দশবছরের ছেলের মনেও অদ্ভুত ভাব জাগে,—আসুক না ইরুল। বউ ভালোবাসুক না ইরুলকে, তাতে হয়েছে কী? আসলে বউ তো রইল তাদেরি হয়ে, তাদেরই ঘরে?

নাচতে নাচতে সত্যিই জাগে অদ্ভুত প্রমত্ততা। আদিম

টোডা-নারীই যেন জেগে ওঠে মুনিমার মধ্যে। টোডাদের নিয়ম অনুসারে মাত্র তিন-চার বছর বয়সেই শিশুকালে যাদের হয়ে যায় 'ম্যাট্রিমনি' অর্থাৎ বিয়ে—যৌবনে পা দিয়েই যারা আসে পূর্ব-নির্ধারিত স্বামীঘর করতে, বহুপতিত্বের বন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সহজভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়, মানসিক তেমন গভীর কোনো সমস্যাই বোধ করে না,—দাম্পত্যজীবনের কোনো নিদারুণ মানসিক সংঘাতই বাজে না যাদের মধ্যে—ঘর করে, হাসে, কাঁদে,—পরব উপলক্ষে মিলিত নৃত্যসভায় উদ্দাম হয়ে নাচে!

দু'হাতে দিশাকে টেনে নিয়ে একটা টিলার আড়ালে গিয়ে বসে মুনিমা। পূর্ণিমা-চাঁদের উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায় নীলগিরির টোডা-উপত্যকা এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যের মতোই প্রতিভাত হয়।

কতো পল, অনুপল, দণ্ড কেটে যায় কে জানে, হঠাৎ চৈতন্য হয় সমস্ত টোডা-পল্লীর। নিচে থেকে বাদাগাদেরই একটি লোক এসে দিয়ে যায় দুঃসংবাদটা। সেই পাহাড়ী পথের বিপজ্জনক বাঁকের মুখে সেই যে চ্যাপ্‌টা লাল পাথর, তারই কাছে ঘটেছে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা। আকস্মিক, অভাবনীয় শোকে নিথর-নীরব হয়ে যায় মুহূর্তে সমস্ত টোডা-গাঁওয়ের লোকেরা।

ওরা দুজনে বুঝি টের পায়নি, টিলার বুকে মাথা এলিয়ে দুজনে চুপচাপ শুয়ে ছিল পাশাপাশি।

খুঁজতে খুঁজতে সমস্ত দলটা এসে দাঁড়ায় ওদের মুখোমুখি। শত-শত টোডা। সেই চ্যাপ্‌টা লাল পাথরের তলাকার খাদের নীচ থেকে রক্তাপ্লুত নিষ্প্রাণ দেহটা দু'হাতে ব'য়ে নিয়ে এসে ওদের দুজনের সামনে যখন দাঁড়ায় বড়ো স্বামী,—মুনিমা উঠে দাঁড়িয়ে সব-কিছু লক্ষ্য ক'রে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়,—এ যেন অবিশ্বাস্য কোনো এক নিদারুণ দুঃস্বপ্ন মূর্তিমান হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে! একি কখনো হ'তে পারে। অসম্ভব। তার সামনে অনর্থক একটা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে টিয়েক-ভ্রি দেবী তাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

তার সামনে কাপড়ে-মোড়া মৃতদেহটা সাজিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে বড়ো স্বামী। হাঁটু গেড়ে আশেপাশে ব'সে আছে আরও কে-কে যেন। আর সমস্ত লোক চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চুপ—নিশ্চল! কত দূরে কোথায় যেন একটা রাত-জাগা পাখী ডাকছে—কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে কোনো এক গিরিনন্দিনী ঝর্নার কলস্বর। কিন্তু কী হলো মুনিমার? তার মনে হচ্ছে, দুরন্ত নেশায় সে এখনও আচ্ছন্ন, দুরন্ত নেশা-ই তার চোখে এঁকে দিচ্ছে বিভীষিকা,—প্রচণ্ড ভীতি—দুর্দমনীয় আতঙ্ক! অকস্মাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ক'রে সেই মৃতদেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুনিমা, বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে,—ইরুল—আমার ইরুল!

মুহূর্তে গুঞ্জন ওঠে সমস্ত দলে। কোথায় ইরুল? কাকে ও ডাকছে ইরুল বলে? ভিড় ঠেলে এতক্ষণে সত্যিই সামনে এসে দাঁড়ায় ইরুল,—কোথায় সে যে ছিল সারা সন্ধ্যা কে জানে!

—এই যে আমি।

ধীরে ধীরে তার দিকে মুখ তুলে তাকালো মুনিমা, তারপরে উঠে দাঁড়ালো এক প্রেতিনীর মতো, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বলে উঠলো,—কে মেরেছে আমার ইরুলকে!

—ইরুল নয়, ও তিস্‌সু।

ওদের গাঁও-বুড়োই বোধহয় উত্তর দেয়,—মেরেছেন স্বয়ং টিয়েক-ভ্রি। ছোটো ছেলেদের পাহাড় পেরুনো বারণ।

বাদাগাদের যে-লোকটি এনেছিল দুঃসংবাদ ব'য়ে, সে প্রতিবাদ ক'রে বলে ওঠে,—না-না, পা পিছলে পড়ে গেছল খাদের মধ্যে।

—কিন্তু ওখানে ও একা গিয়েছিল কেন?

—সয়তানের ডাকে।

—না!— বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ইরুল; বলে,—কেউ জানো না, আমি ওকে মেরেছি!

সমস্ত দলের মধ্যে দেখা দেয় মুহূর্তে তীব্র এক উত্তেজনা। রুখে দাঁড়ায় মুনিমার বৃদ্ধ শ্বশুর, রুখে দাঁড়ায় বড়ো স্বামী,—মারমুখো হয়ে তেড়ে যায় দিশা।

গাঁও-বুড়ো থামিয়ে দেয় সকলকে। মানুষ খুন করা টোডাদের রীতি নয়।

টিভালিয়লদের গাঁও-বুড়ো বলে,—সব মিথ্যে। ইরুল সারাটা বিকাল থেকে চুপচাপ তার ঘরে ব'সে। ও আজ বাইরেই বেরোয়নি।

অন্য সবাই সহজেই সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু মুনিমা নয়। তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। হিংস্র আদিম নারীর মতোই সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরুলের ওপর, দুটি দৃঢ় হাতে ওর গলা টিপে ধরে উন্মত্তের মতো বলতে থাকে,—কেন মারলি আমার ইরুলকে—কেন মারলি!

বড়ো স্বামী আর দিশা মিলে কোনোক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে নেশাচ্ছন্ন নারীকে। আকুল হয়ে সে কাঁদতে থাকে, পাগলের মতো সে নিজের মাথা ঠুকতে থাকে টিলার পাথরের ওপরে।

টিভালিয়লদের গাঁও-বুড়ো ইরুলকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে,—কেন মিছিমিছি নিজের ঘাড়ে টেনে নিলি সব দোষ!

—মিছিমিছি নয়!— ইরুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়,—আমি রোজ বিকেলে ওখানে গিয়ে বসি, অনেক রাত অবধি ওখানেই এক-এক দিন আমার কেটে যায়। তিস্‌সু তা জানতো। ও বোধ হয় আমাকেই আজ ওখানে খুঁজতে গিয়েছিল একা-একা। আমি যদি রোজকার মতো আজও ওখানে থাকতাম, তাহ'লে এ দুর্ঘটনা ঘটতো না।

ও তোকে একা-একা খুঁজতে গিয়েছিল কেন? কেউ কি ওকে পাঠিয়েছিল?

—না।

—তবে?

—ও নিজেই গিয়েছিল।

—কেন?

এই 'কেন'র উত্তর দিল না ইরুল। সে জানে তার হিসাবে ভুল হয়ে গেছে। পনেরো বছর পরে 'সভ্য' মেয়েকে তার পূর্বতন সংস্কারের সীমান্তে ফিরিয়ে আনা যায়,—মিলিয়ে দেওয়া যায় না, মিশিয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এটাও কি সত্য? কিছুদিন পরে, জলাশয়ে বুদ্‌বুদ উঠে আবার মিলিয়ে যাবার মতো সব-কিছু যখন স্থির হয়ে গেল আগেকার মতো, তখন একদিন সকালে হঠাৎ-ই মুনিমার ঘরে এলো ইরুল। স্তম্ভিত পুত্তলিকার মতো চুপচাপ বসে ছিল মুনিমা একা। ইরুল বললে,—যাবে? ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে—

যেন ইরুল নয়, তিস্‌সুই কথা বলছে। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে মুনিমা বললে,—কোথায়!

—শহরে। আবার পালিয়ে। দুজনে।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালো মুনিমা, ধারে-কাছে কেউ আছে কিনা লক্ষ্য ক'রে সাগ্রহে ঈষৎ চাপাস্বরে প্রশ্ন করল,—কখন?

—ঠিক সন্ধ্যায় আসব। তৈরি থেকো।

দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ইরুল। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝড় ওঠে মুনিমার মনে,—কিন্তু সে কোথায়? তিস্‌সু? কোথায় তার তেমন ক'রে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ডাকা: বউ?···বউ?···বউ?

তাই, সন্ধ্যায় এসে মুনিমার কোনো সন্ধানই পায় না ইরুল। শুধু, পথ চলতে-চলতে সেই ঝর্নার কাছ থেকে শুনতে পায় দিশার সেই পরিচিত বাঁশীর স্বর, আর ঝর্নার-ই মতো কোন্ রহস্যময়ী নারীর প্রমত্ত কলকাকলি।

শৈলশিখরের অন্য সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে একাই এবার পথ চলতে থাকে ইরুল, একটা জিজ্ঞাসার গুঞ্জনকে বারংবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এবারেও কি তার বুঝবার ভুল হলো মুনিমার মনকে?···

বক্তব্য

হরপ্রসাদ মিত্র

পাখিটা উড়ছে শূন্যে শূন্যে
মেঘের ঢেউয়েতে বিন্দু,—
নীচে রাস্তায় হাঁকে ফেরিওলা
বাতাসে উড়ছে পর্দা,—
আর, অহরহ মানুষগঙ্গা,
ইচ্ছে, ইচ্ছে, ইচ্ছে—
মাটি ভিজে-ভিজে, গাছটা সবুজ,
—এই শুধু বক্তব্য !

ঘোড়াটা পরেছে সাতনরী হার,
মেয়েটি ফুলের পাপড়ি,
ঘুঁটেকুড়ুনীরা পুড়ছে এখনো,
রাজপুত্তুর চলছে—
তেপান্তরের সীমানা ছাড়িয়ে,
সাতসমুদ্র পেরিয়ে ।

নেশা কেটে যায়,—
জং ধরে তাই অয়স্কান্ত গর্বে ॥

প্রবীণ চোখেতে পুরোনো দৃশ্য :
পাখিটা উড়ছে শূন্যে !
সত্যও নয়, মিথ্যেও নয়,
কবিতা প্রাণের ঝঙ্কার ।
জীবন হয়তো বন্দিনী সীতা
পৃথিবী-স্বর্ণলঙ্কার !

পাখিটা উড়ছে শূন্যে শূন্যে
—এই শুধু বক্তব্য !

রঙ্গওয়ালী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
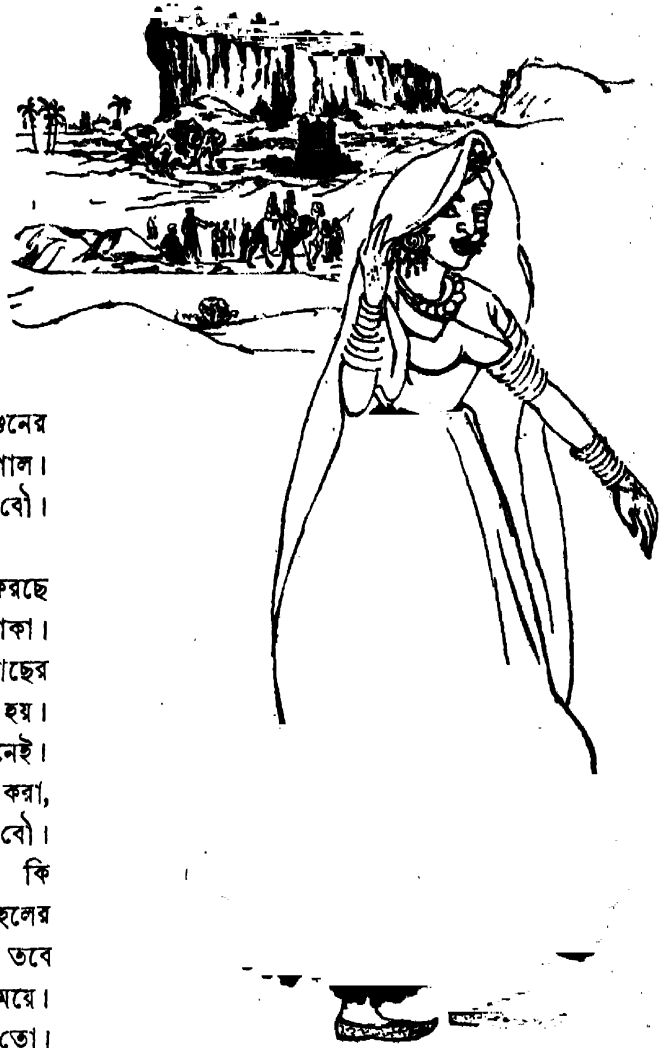
মাজা রঙ, ছোটখাটো মানুষ। কালো চোখে আগুনের ফুল ফুটে ওঠে। আর সেই আগুনে পুড়ে মরে গোপাল। তবু ঘরের মানুষ। পরের নয়। বিয়ে-করা বৌ। ফুলকুমারী নাম। গোপাল বলে ফুল্‌কি।

গোয়ালিয়র ফোর্ট। জমি ছেড়ে আশমানে বসত করছে মানুষ। অনেক বাড়ী-ঘর। আবার অনেক ফাঁকা। ফুল্‌কির ঘর একেবারে পুব কোণাতে। বড় বড় নিমগাছের ছায়াতে আড়াল করা। একটু নেমে যেতেও হয়। ঘরখানি যেন ঝুল-বারান্দা। তারপরে আর কিছু নেই। সব ফাঁকা। ভাগ্যে লোহার রেলিং দিয়ে আড়াল করা, নয়তো ভয়ে মরেই যেতো ফুল্‌কি। দোজপক্ষের বৌ। পারে তো চোখের মণিতে রাখে বৌকে গোপাল। কি ভাগ্য যে, বুকখানা তার মস্ত চওড়া। ঐ গুজারীমহলের চওড়া কপাটখানার মতো! সেই বুকে মিলিয়ে গিয়ে তবে কিছু ভরসা পায় ফুল্‌কি। সেও এক গুজারী মেয়ে। গোপাল যদিও রাজা নয়, তবু পুরুষের মতো পুরুষ তো। ফোর্টের প্রহরীর পোশাকে মানায়ও তাকে চমৎকার। জুলপির কাছে একটু পাক ধরেছে অবশ্য। বুকের লোমও কাঁচাপাকা মেলানো। তাতে ফুল্‌কির এতটুকু দুঃখ নেই। সেই বুকে মাথা রেখে নিজেকে তার অনেক রানীর থেকে অনেক সুখী মনে হয়। এই মুহূর্তে গোপাল অনেক সুন্দর কথা বলতে পারে না। শুধু বলে,

—বড় বুঢ়া হয়ে গেলাম রে ফুল্‌কি!

—কে বলেছে?

—সবাই বলে।

—তোমার ঐ ছত্রী তো? কি জানে ছত্রী?

অল্প অল্প ফুল্‌কি ছিট্‌কে ওঠে কথায় আর চোখে। হা-হা করে হাসে গোপাল। বলে,

—না রে, না। পরমানুষকে তুই দোষ দিস্‌না ফুল্‌কি। এ আমারই কথা।

—তুই অমন মুর্দা-কথা বলিস কেন?

—বলবো না।

—না, বলিস না।

—কেমন আশমান ভাখ্‌ ফুলকি।

সত্যিই চমৎকার। কাটা জানলার ফাঁক দিয়ে যেন আকাশখানাই এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। তারা-ভরা আকাশ। কালো শালের ওপর সপ্তর্ষি আর কালপুরুষের নক্সা-কাটা বন্দী মুরাদের দীর্ঘশ্বাসে করুণ আকাশ।

ঘরই যেন আকাশ। আর ফুল্‌কি যেন বর্ণালীতে উজ্জ্বল সুন্দর একটি ছোট্ট পাখি। সেই পাখিকে এই রাতে মুঠোয় ধরেছে গোপাল। ফুল্‌কির লাল ঘাগরা, হলুদ ওড়নী আর জর্দা চোলী-ও রাতের রঙে রহস্যমাখা দেখায়। পান্নার মতো জ্বলে দুটি চোখের তারা। ঝুরো চুল মাথা মুখখানা ভাখে গোপাল। গোপালের চোখ অনিমিখ। ফুল্‌কি কি সে চোখের ভাষা বোঝে? বোঝে যে, এখনি মনে মনে

নিজেদের এই সুখের সংসারটাকে ছায়াকালো করতে চায়না গোপাল। এই ছোট ঘরখানাতে যেন দুনিয়ার যত ভালো সব এসে বাসা বেঁধেছে। গোপাল তাই সদাজাগ্রত ঈর্ষায় এই ঘরখানাকে বাঁচিয়ে চলে। ফুল্‌কিকে চোখের আড়াল হতে দেয়না। এত ভালবাসা নিয়ে-নিয়ে আর পারেনা ফুল্‌কি। হাঁপিয়ে ওঠে। সে আর নিতে পারেনা।

এতেই যদি ভরতো তবে কথা ছিলনা। এমনি সময়ে গোপাল আর ফুল্‌কির সেই আকাশে ঝোলানো ঘরখানার সব তারা-ভরা বর্ণালীর রঙে নতুন ভাগীদার এসে জুটলো। গোপালের-ই এক জীবনের বন্ধু আনোখী। বে-পরোয়া দিলদার মানুষ। সরঞ্জাম এক হারমোনিয়াম। গোপালের অনেক দুঃখের দিনের বন্ধু। মাঝারি মানুষ। হাসিখুশী চেহারা। শৌখিন পোশাক।

গোপাল যেন হাতে চাঁদ পেল। ফুল্‌কিকে বললো,

—খুব আদর-যত্ন করবি। পুরনো বন্ধু।

আজ গোয়ালিয়র কেল্লায় সাহেব-মেম ট্যুরিস্ট এসেছেন। শহরের মান্য অতিথি। গাইডের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ফুল্‌কি। ফুল্‌কি সঙ্গে থাকলে দেখতে শোভা হয়। এ কথাটা বুঝেছেন থেকে আর আপত্তি ওঠাননি কেউ। কালোর ওপর লালফুল-ছাপা পুরোহাতা জামা, সবুজ ওড়নী আর লাল ঘাঘরা। পায়ে নাগরা। সব চুল টেনে তুলে বেণী বাঁধা। হাতে মেহেন্দী, চোখে সুর্মা। কে বলবে কোনো গুজারী মেয়ে? যেন এই কেল্লার পুরনো কোন্ বাসিন্দা চলেছেন মহল দেখতে।

বৌকে দেখে সপ্রশংস চোখে তারিফ করলো গোপাল। আর মুচকি হেসে হারমোনিয়ামে একটা বেলোয়ারী সুর তুলে ছেড়ে দিলো আনোখী। বললো,

—গোপাল, খুব ভাগ্য তোমার!

একদিন আনোখী গোপালের সত্যিই বন্ধু ছিলো। যদিও সে পাঁচবছরের কথা। তখন গোপাল ছিলো বিষণ্ণ, গম্ভীর আর আত্মকেন্দ্রিক একটা মানুষ। নিজের মনে কাজ করে যেতো। কথা কইতে জানত না। সময় মিললে রামায়ণ পড়তো ব'সে। আনোখী হারমোনিয়ামে ছোট ছোট সুরের ফুলঝুরি তুলতে তুলতে গোপালকে ঠাহর করলো। মনে হলো মানুষটা আগের চেয়ে ভ'রে উঠেছে। ভালো লাগলো। একেবারে পথ-বসতি মানুষের স্বভাব আনোখীর। তেমনিই দরদী আর প্রেমিক। তাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় সে বললো,

—বলো গোপাল, তোমার কথা বলো।

অস্থির তিনটে আঙুলে কুশলীর মতো হারমোনিয়ামে ছোট ছোট সুরের কাঁপন জাগিয়ে ঘরটার প্রভাতী আবহাওয়া সুরেলা করলো আনোখী। তারপর সুর থামিয়ে ঘাড় কাত করে চাইলো। বললো,

—বলো?

প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করেছিলো গোপাল, তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলো ফুল্‌কির কথা তৃতীয়জনের কাছে বলতে খুব ভালো লাগছে তার। বললো,

—খুব দুখিয়ারী মেয়ে। চাচার ঘরে পড়ে ছিলো। সেই সময়...

বিয়ের আদ্যোপান্ত কথা বললো গোপাল। বললো,

—তুমি থাকো দু'চারদিন। একলা থাকে ও।

—বড় সুন্দর ঘরখানা তোমার। ঘর সুন্দর সাজিয়েছে ভাবী।

—যতদিন চাও থাকো।

আনোখী হাসলো; বললো,—না, গোপাল। আমি ঘুরতি-ফিরতি মানুষ। এইরকম একখানা ঘরে বেশীদিন থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠবো।

[illegible]-তে চলতে চলতে গোপাল ভাবলো ফুল্‌কিও সেই কথাই বলে। ফুল্‌কি আর আনোখী। ফুল্‌কি চায় শহর বাজার, গাঁয়ের মাটি—আর আনোখী? ফুল্‌কি নয় সে জীবনের ক্লান্তি জানেনি। কিন্তু হাজার বাটের পোড়-খাওয়া মানুষ আনোখী-ই বা কেন বাঁধা ঘর আর নিরাপদ আশ্রয়ের নামে নাক সিঁটকোয়? নাকি পথঘাটের রাহী জীবনটা গোপালের একলার কাছেই ক্লান্তিকর? তাকেই শুধু ভয়ের মুখোশটা দেখিয়েছে দুনিয়া। আর আনোখীর মতো ভবঘুরের কাছে নিজের রূপ-রঙের জেল্লাটা খুলে ধরেছে, যাতে নেশা ধরে যায় আনোখীর? বুঝতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল গোপালের মন।

পাঁচটাকা বখশিশ নিয়ে ঘরে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল ফুল্‌কির। ঘরে ঢুকতে মনে হলো মেহমান আছে ঘরে। গোপালের ওপর রাগ হলো। জামায় ধুলো, ময়লা পাগড়ী—কি-একটা মানুষকে ঘরে তুললো গোপাল! ঘরে এসে চৌকা ধরিয়ে কাপড় বদলে জল আনতে যাবে ডাক্তার-সাহেব কুয়ো থেকে, এমন সময় চমৎকার সুরের একটা ঝঙ্কার কানে গেল। তার-ই ঘরের সামনে নিম-গাছতলায় বসে সুর তুলেছে আনোখী। মানুষটার গুণ আছে তো? সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো আনোখী। বললো,

—বসুন ভাবী। শুনুন···

বাজনাওয়ালার জীবনের সংগ্রহ মামুলী গজল-গান। যার কথা-সম্পদ হচ্ছে চাঁদ ও বুলবুলের প্রেম আর মাশুকের জন্য আশীক মনের বেদনা—

'মেরে ইয়াদ্ মেঁ তুম্ ন আঁসু বহানা
ন দীপ জলানা
মোহে ভুল যানা···'

হারমোনিয়ামটার ব্যথার ভাণ্ডার কোথায় তা ঠিক জানে আনোখী। এই পুরনো প্রেয়সীর মর্মে ঠিক-ঠিক ঘা দিয়ে ঠিক তান-লয়ে কাঁদিয়ে তুললো তাকে আনোখী। আর ফুল্‌কি মুগ্ধ হয়ে গেল। এমনিধারা কিছু সে শোনেনি জীবনে। আমীন্ থেকে ঘর করতে এসেছিলো। কেল্লার ওপর এসে উঠেছে। এমনি একটা মানুষও সে দেখেনি আর হাতের মামুলী পাঁচটা আঙ্‌লের এমন যাদু জানা থাকে সে-ও তার অজানা।

সেই রাতে যখন কাটা জানলা দিয়ে আকাশটা নেমে এসেছে ঘরের মুখোমুখী, রাতটা সুরে সুরে ভরে তুললো আনোখী। খাটিয়ায় বসলো আনোখী আর স্বামী-স্ত্রী বসলো মাটিতে। ফুল্‌কির চোখ সুর শুনতে শুনতে ঘন সবুজ কোনো দুর্লভ পান্নার মতো দেখালো, আর তার মুগ্ধ মনোনিবেশ দেখে ঈষৎ হেসে আনোখী আরো অনেক সুর তুললো। সিনেমা দেখে যে-সব প্রেমের গল্প শিখেছে, তার-ই সঙ্গে গান গেঁথে গেঁথে বেশ মন-ভোলানো পরিবেশ তৈরি করলো। বললো,

—শুনুন ভাবী, লায়লা-মজনুর কিস্‌সা। যখন কিস্‌মৎ দুজনকে দুদিকে ঠোক্কর লাগিয়ে দিলো, লায়লী মজনুর মনে গাইলো কি—

'আশমাঁওয়ালে তেরী দুনিয়া হামেঁ বরবাদ কিয়া
সারে দুনিয়ামেঁ চাঁদনী মেরী লিয়ে আগ হো গিয়া।'

চট্ করে এই গজলের সুর তুললো আনোখী আর মুগ্ধ হয়ে ফুল্‌কি গোপালের দিকে চেয়ে হাসলো। বললো,

—কী চমৎকার!

গোপালও খুশী হলো। তার ফুল্‌কির মুখে এমন চমৎকার হাসি এনে দিয়েছে আনোখী! এখন কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে ফুল্‌কিকে। বললো,

—আনোখী, ভাবী তোমার বাজা খুব পশন্দ্ করলো।

রয়ে গেল আনোখী।

তার চলাফেরা, কথাবার্তা, আদব-কায়দা সব-কিছু সবসময় তারিফ করবার একজন গুণী মানুষ পেয়ে ফুল্‌কি অনেক উচ্ছল হয়ে উঠলো। ফুল্‌কির সম্পর্কে গোপাল এমনিতে কতো সজাগ। কিন্তু এইখানে সে বে-হিসেবী হলো। তার এক কারণ বোধহয় আনোখীর স্বভাব। ফুল্‌কির সম্পর্কে তার বিশেষ আগ্রহ খুব বেশী দেখা যায়না। আর ফুল্‌কিও আচার-আচরণে কখনো অশোভন নয়। গোপাল মনে করলো—একলা একলা থাকে ফুলকি, নয় একটু আমোদ করলো। একটু উচ্ছল হলো, তাতে দোষ কি! আর আনোখীর সঙ্গে মিশে মিশে ফুল্‌কির মধ্যে যেন আরো অনেক নতুন রং জাহির হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে যখন তাকায়—গোপালের মনে হয় গ্যালারির ছবিতে যা দেখেছে; সেই মোগল রাজপুত্রের হাতে বসানো নানারঙা পাখির মতো সুন্দর ফুল্‌কি। 'বেশক্', 'কিঁউ নহী', 'শায়েদ্' এইসব সুন্দর কথার বুকনি দিতে শিখেছে। তাতে এই মামুলী মানুষটার কথাও যেন হয়েছে মঞ্জুল। চেনা ফুল্‌কি একটু একটু করে নতুন হচ্ছে, আর দেখে মুগ্ধ হচ্ছে গোপাল।

একটা রক্তমাংসের মানুষ, তার মনে যে এমনি করেই কোনো নতুন ভাব আসতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা ভাবেনি কোনদিন গোপাল। গোপাল, ফুল্‌কি আর

আনোখীর সেই দিন ক'টা ছিলো একান্তই নিশ্চিন্ত নির্ভর।

ঘরে তালা লাগিয়ে ফুল্‌কি আর আনোখী চলে আসে 'শাসবহু মন্দির' বা 'তেলী মন্দির'-এ। এতদিনকার চেনা জায়গা। তবু আনোখী যখন বলে,

—কী সুন্দর মনে হয়—যেন এমন আর কোথাও দেখিনি।

তখন ফুল্‌কিরও মনে হয়, সত্যিই তো! রোজকার দেখা জায়গাগুলো যে এমন চমৎকার তা তো জানতোনা সে! 'শাসবহু'র সামনের অলিন্দতে দাঁড়িয়ে গোয়ালিয়র শহর ছাখে তারা। ফুল্‌কির চুলগুলো ওড়ে, রঙীন ওড়না বাতাসে ঝাপ্‌টায়। যৌবন-সুঠাম শরীরের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়। আনোখীর অনেক দেশ আর অনেক মেয়ে দেখা দৃষ্টিও মুগ্ধ হয়। ফুল্‌কি বলে,

—কত কিস্‌সা জানো তুমি, কত দেশের—শোনাও।

—ঘরে কাজ নেই ভাবী?

—রোজ ভালো লাগেনা।

হাসে আনোখী। বলে,—একটা কথা বলি?

—বলো।

—যত কিস্‌সা জানি আমি, তাদের সবায়ের চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর।

—ঠাট্টা করছো।

—ঠাট্টা করছি? না, ভাবী।

ঈষৎ গভীর হলো আনোখী। এই কথা বলা উচিত হচ্ছেনা তার। তবু বলতে ভালো লাগছে, আর এই সত্য যেন বিস্মিতও করছে তাকে, এমনই গম্ভীর ও পরিহাস-বর্জিত কণ্ঠে সে বললো,

—ঠাট্টা নয়, ফুল্‌কি। দু'দিনের জায়গায় দশদিন থেকে গেলাম, সে কিসের জন্যে তুমি বোঝনা?

—না! তা হয়না আনোখী— ব'লে ছুটে বেরিয়ে গেল ফুল্‌কি। ছুটে চললো ত্রস্ত পায়ে। নিজের ঘরে দোর দিয়ে খাটিয়ায় বসে মুখ ঢাকলো সে। কান মাথা মুখ গরম হয়ে উঠেছে। 'তুমি অনেক সুন্দর'—এই কথাটি তার কানে বেজে উঠলো রিম্‌ঝিম্ করে। আর এই প্রথম যেন নিজের মনের চোরা গতিও বুঝলো ফুল্‌কি।

তার কথায় কি চটে গেল ফুলকি? ভাবতে ভাবতে এলো আনোখী। কিন্তু ফুল্‌কির ভাবগতিকে কোনো দ্বিধা দেখা গেলনা। তেমনিই সহজ!

সন্ধ্যাবেলা গোপাল রসদ কিনতে গেল শহরে। সুযোগ ছিলো। তবু গেলনা ফুল্‌কি। বললো, মাথা ধরেছে।

মাথা-ধরা যে ফুল্‌কির অছিলা মাত্র, তা জানতো আনোখী। তাই আজ বাইরেই বসে ছিল। আঁধারের সবটুকু রহস্য গায়ে মেখে এসে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। বসলো আনোখীর পাশে। ভয়ও করে, ভরসাও হয়। আনোখী বললো,

—ফুলকি, ঘরে যাও।

—যাব না।

—ফুল্‌কি! তুমি সত্যিই আগুন। আমার ভয় করে। আমি-ই চলে যাব।

—আমাকে নিয়ে যাবে আনোখী?

—তোমাকে?

—হ্যাঁ, আনোখী।

হাসলোনা আনোখী। নিরীক্ষণ করে দেখল। বললো,—কতটুকু জানো আমাকে ফুল্‌কি? গোপালের কথা ভাবো।

ফুল্‌কি যখন এত কাছে তখন আনোখী বে-পরোয়া হতো কিনা বলা যায় না। শুধু কাঁকরের ওপর গাড়ী থামবার শব্দ হলো। এক নিমিষে ঘরে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বকবক সুরু করলো ফুল্‌কি।

—রোজ রোজ এত দেরী! আটা নেই, ঘি নেই। পারবো না আমি সংসার করতে।

কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে নেমে এল গোপাল। বললো,

—নে তোর জিনিসপত্র।— আনোখীকে বললো,

—বিয়ে করোনি ভালো আছ। দেখছ তো?

আনোখীর গলার হাসিটা কেমন শুকনো শোনালো। আনোখী বললো,

—গোপাল, কাল আমি চলে যাব ভাই।

—কোথায় যাবে? মেলা লাগবে কাল থেকে। মেলা দেখে যাও।

—মেলাতেই তো যাব। বাজা বাজিয়ে পারি তো দু'পয়সা কামাই করে নেব। দেখা হবে সেখানেই।

তার যাবার কথা শুনে ফুল্‌কি বড় আনন্দিত হলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। বললো,

—সত্যিই তো। কতদিন আর ভালো লাগে বলুন! তা যাবার আগে আজ একটা কিস্‌সা হোক।

গোপালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। ফুল্‌কির হাসি দেখে গা জ্বলে গেল আনোখীর। বললো,

—বাজাবো বইকি।

যাবার আগের দিনে কি আনোখীর ঘাড়ে ভূত চাপলো? আজ শুধু বে-শরম বে-দরদী সব পাথরের

দিলের কথাই বাজালো সে। কিস্‌সায় তাদের কথাই বললো, যারা পতঙ্গের মতো রূপের আগুনের দিকে ছুটে যায়। আর যাদের জ্বালিয়ে দিয়ে আনন্দ করে আগুন।

মেলায় যাবার দিনে খুব সাজলো ফুল্‌কি। বড় ভীড় মেলাতে। মানুষের গায়ে গা দিয়ে চলতে-চলতে এমন দিঠি হানলো এ-পাশে ও-পাশে যে, মানুষ না তাকিয়ে পারলোনা। গোপাল যখন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাই-পাহারাদারের সঙ্গে কথা কইতে ব্যস্ত—ফুল্‌কি বললো,

—ঐ-যে মাস্টার-সাহেবের বোন আর আওরৎ। আমি আসছি।

পাশ কাটিয়ে এসে ছুটে চললো ফুল্‌কি। এদিকে, ওদিকে, কোন্‌দিকে রয়েছে আনোখী? হঠাৎ পাশ থেকে কানে বাজনা এলো। ঘুরে দ্যাখে এইতো! লায়লীর সেই গান বাজাচ্ছে আনোখী:

—'আসমাঁওয়ালে তেরী···'

ফুল্‌কির চোখে চোখ পড়তে যে আলো ঝল্‌কে উঠলো আনোখীর চোখে, তাতে মনে হলো—না, আশমানের মালিকের অবিচারে আজকে এই সন্ধ্যায় তার দুনিয়া একেবারে বরবাদ হয়নি। ঝম্‌ঝমিয়ে বাজনা তুলে মুগ্ধ শ্রোতার হাত থেকে রুমাল-বোঝাই পয়সা নিয়ে পকেটে রাখলো আনোখী। বললো,

—চলো।

এগিয়ে এসে দাঁড়ালো দুজন একটা গাছের কাছে। আনোখী বললো,—এত দেরী করলে কেন? কখন থেকে খুঁজছি তোমাকে?···আর···

—কি?

—এত সেজেছ কেন ফুল্‌কি?

—ভালো দেখাচ্ছে?

—কলিজা খুলে দেখাবো? দেখবে?

—না।

দুজনেই একটু ঘামছে, একটু হাসছে। উত্তেজনায় দুজনের বুক-ই টিপটিপ করছে। আনোখী বললো,

—চলো মেলা দেখাই। চুড়ি পরবে?

—তুমি আমার হাতে কাঁচের চুড়ি পরাবে? মানুষ কি বলবে?

—বলবে, তার মনের মানুষকে আনোখী সোহাগ-চুড়ি পরাচ্ছে।

কাঁচের চুড়ি পরলো ফুল্‌কি। পান খেল। ফুলের গুঞ্জা পরলো মাথায়। তারপর গোপালকে খুঁজবার কথা মনে পড়লো। আনোখী ফুল্‌কির হাত চেপে ধ'রে বললো,

—কালকে-ও এসো। ওখানেই থাকবো আমি।

—এত ভীড়ে যদি দেখতে না পাই?

—তোমার জন্যে ঐ লায়লীর গীত বাজাবো।

গোপালকে দেখে দুজনেই হেসে এগিয়ে এলো। ফুল্‌কি বললো,

—খুব খুঁজেছ? আনোখীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গোপাল, চলো মিঠাই খাওয়াব। অনেক পয়সা কামাই করেছি।

গোপাল আর ফুল্‌কিকে পেট ভরে মিঠাই পুরী খাইয়ে দিলো আনোখী। ফুল্‌কি বললো,

—আনোখী আমাকে কত-কি কিনে দিলো দ্যাখো!

পরদিন গোপাল এলোনা। তার বদ্‌লী ডিউটি পড়েছে। ফুল্‌কিকে পাঠিয়ে দিলো। বললো,—রাত আটটায় গাড়ী আসবে, তুই চলে আসিস্‌।

আজকে গোপাল সঙ্গে ছিলোনা বলেই হয়তো ফুল্‌কি প্রথম থেকেই বে-পরোয়া হলো। আনোখী বললো,—লায়লীর গান বাজিয়ে আঙুল আমার ব্যথা হয়ে গেল ফুল্‌কি!

দুজনে চলে এলো মেলার পিছনে। চালাঘরগুলির পিছনে উট আর বয়াল-গাড়ী। সেখানে দাঁড়ালো আনোখী। বললো:

—তার পর?

—কাল ঘরে ফিরে মনটা এমন হলো! একি হলো বলো তো আনোখী?

—তুমি আমায় মারলে ফুল্‌কি! গরীব বাজাওয়ালা, তাকে খতম করলে!

—আমিও মরলাম।

—চলো ফুল্‌কি, কোথাও চলে যাই।

—গিয়ে কি করবো?

ভীরু গলা ফুল্‌কির। আর আনোখীর কথাগুলি যেন দুরাশার গুনগুন গান:

—চলে যাবো দিল্লী-আগ্রা-কলকাতা। আমি বাজা বাজাবো, তুমি গান করবে ফুল্‌কি···পথে ঘুমোব, চানা-মকাই খাব, দেশ-দেশ ঘুরব।

—যাব···যাব আনোখী! কিন্তু তোমার বন্ধু?

—সব ঠিক হয়ে যাবে ফুল্‌কি, দু'দিনে জখম শুকিয়ে যাবে।

—ঠিক বলছো?

বলতে-বলতে ফুল্‌কি সত্যিই জ্বলে ওঠে। মদের মতো টলমল করে ফুল্‌কি। বলে,

—আমার দিন-রাত তোমার বাজার সুরে ভরে গিয়েছে, আনোখী—ও-ঘর থেকে মন আমার ছুটে গিয়েছে!

—সত্যি বলছো?

—সত্যি।

আনোখীর যাযাবর রক্তে নীতির শাসন বড় কম। সে রক্ত সহজেই চঞ্চল হলো। ফুল্‌কির মন কী কথা বললো? গুজারী মেয়ের দুরন্ত যৌবন। নিষিদ্ধ ব'লেই প্রেম আরো মধুর মনে হলো। আনোখীর কাঁধে মাথা রাখলো ফুল্‌কি। বললো,

—যাব। গেলে সর্বনাশ হবে। তবু যাব।

চমক ভাঙলো যখন, তখন অনেক রাত। মেলার জৌলুষ নিভে এসেছে। ভয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ফুল্‌কি। বললো,

—ক'টা বাজে?

ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজলো। ফুল্‌কি বললো,

—সর্বনাশ হলো আনোখী, কেল্লার বাস তো চলে গিয়েছে। কি হবে?

মেলায় দোকান দিয়েছে যারা, তাদের শরণাপন্ন হবে ফুল্‌কি? আনোখী বললো,

—আমি পৌঁছে দেব তোমায়?

—না না, গোপাল জানলে পরে···

—গোপাল জানলেও কিছু হবে না। শোনো ফুল্‌কি···

ফুল্‌কির নাম ধরে ডাকছে গোপাল।

—আনোখী, কাল আমি আসবো···

ব'লে ছুটে চলে গেল ফুল্‌কি। এগিয়ে গিয়ে আনোখী গোপালের হাত ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে ফুল্‌কি।

পরদিন-ই মেলা শেষ হবে। সম্ভবতঃ আজই চলে যাবে আনোখী। আর ফুল্‌কিও যাবে তার সঙ্গে। গোপাল তো জানেনা, যে এই ঘরে শুয়ে আশমানের তারা দেখার দিন ফুরিয়েছে ফুল্‌কির। গোপাল হয়তো ভাবতেও পারেনা যে, ফুল্‌কি তাকে ছেড়ে যেতে পারে। গোপালের এই বিশ্বাসের গুরুভার-ই তো ফুল্‌কির পায়ে বেড়ি হয়েছে। সারাদিন মনটা থমথম করলো।

সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে বেরুবার মুখে গোপালের সামনে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। বললো,

—দ্যাখো—

—ভাঙা-মেলার দিনে বুঝি আগুন জ্বালাতে যা্চ্ছিস?

—না?

মাথা নাড়লো ফুল্‌কি। বললো,—একলা ছেড়ে দিচ্ছ, যদি ফিরে না আসি?

—না-ই বা এলি।

—কী বললে?

তীব্র গলা ফুল্‌কির। গোপাল হাসে। বলে,—যেতে হয় যা-না! যেখানে মন চায় থাকবি—তুই খুশী থাকলেই হলো।

এই কথাতে খুব রাগ করতে চাইলো ফুল্‌কি। কিন্তু রাগ হলো কই? গোপালের মুখের দিকে চেয়ে বুকটা তার যেন কেমন করে উঠলো। হাজার হলেও তিন বছরের সম্পর্ক তো?

মেলায় অপেক্ষা করছিলো আনোখী। উত্তেজনায় পাণ্ডুর মুখ, জলজ্বলে চোখ, ফুল্‌কি এসে পাশে দাঁড়ালো। বললো,

—চলো আনোখী!

—গোপাল?

—এখনো গোপালের কথা ভাবছ? চলো!

টাঙ্গা চলেছে। মোরারের রাস্তায় দু'পাশে গাছের ছায়া। আনোখী বলে,

—কিছু বললো না গোপাল?

আঁধারে ফুল্‌কির উচ্ছ্বসিত হাসির ফেণা ছড়িয়ে পড়লো।

—কিছু বললো না।

ফুল্‌কির মুখ দেখা গেল না, কিন্তু হাসির সুরটা এমন চমৎকার ভাবে খানিকটা অন্য সুর জড়িয়ে বেজে উঠলো যে, অবাক হয়ে গেল আনোখী। হাসতে-হাসতেই ফুল্‌কি বললো,

—খুব আজব লোক। বুঝলে আনোখী? বলে কিনা, যেখানে খুশী যা তুই। তুই খুশী থাকলেই হলো!

—ঠাট্টা করে বলেছে।

—ঠাট্টাই তো! এ-সব কথা ওর কাছে ভীষণ ঠাট্টা। মনে ভাবে আশমানের ওপর ঘর দিয়ে একেবারে বেঁধে ফেলেছে আমাকে···মনে ভাবে কোনদিনও ফুল্‌কি চলে যেতে পারবে না! কিন্তু সে-সব কথা থাক। তুমি অন্য দেশের কথা বলো আনোখী···আগে তো আমরা আগ্রা যাবো, তাই না? তাজ দেখবো আমরা, আনোখী?

—হাঁ পিয়ারী, তাজ তো দেখাবোই···আরো কত কি! নিয়ে যাবো কলকাতা, বোম্বাই।

—সেখানে আমি কি করবো?

—আমি বাজা বাজাবো পিয়ারী, তুমি গাইবে নাচবে।

হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ফুল্‌কি। পৌঁছে গেল স্টেশন।

ট্রেন আসবে। টিকিট খরিদের ঘণ্টা পড়েছে। কেল্লার উপরের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। কী চমৎকার দেখাচ্ছে! তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুল্‌কি বলে,

—আনোখী, ঐ গীত একবার বাজাও।

—এখন?

—হ্যাঁ, আনোখী।

ফুল্‌কির মুখের দিকে চায় আনোখী। বলে,

—যো হুকুম।

—আর কিস্‌সা-ও শুনাও।

—শোনো রঙ্গওয়ালী—এই গীত গাইল মজনু যখন মরুভূমি ধরে উটের কারোয়াঁ চলে যাচ্ছে লায়লীকে নিয়ে।

—মজনুর গীত নয়, লায়লীর গীত—

হারমোনিয়ামে হালকা ঠেকা দেয় আনোখী। নীল আলো প'ড়ে ফুল্‌কিকে আরো আশ্চর্য দেখায়। সত্যিই রঙ্গওয়ালী। এক এক সময় এক এক রং। মেলাতে এলো জ্বলতে-জ্বলতে, যেন ফুলঝুরি। এখন ছাখো কেমন উদাস। আনোখী সুর তোলে,

'আশমাঁওয়ালে তেরি দুনিয়া হামেঁ বরবাদ কিয়া···' ফুল্‌কি কাছে ঘেঁষে আসে। বলে,

—কেমন করে তুমি বাজাও আনোখী? সব মরমের দুখ নিঙড়ে নাও!

আনোখী অল্প হাসে। বলে,—বুঝলাম।— তারপর বাজায়—'সারে দুনিয়ামেঁ চাঁদনী, মেরে লিয়ে বাদল হো গয়া···'

অনেক দূরে ট্রেনের হুইশল শোনা যায়। ফুল্‌কি বলে, —ট্রেন এসে গেল, আনোখী।

—তব্ ভি তো সুন্ লে!··· আনোখী বাজায়, 'এ মালিক, ইয়ে তামাশা মুঝেকো কিঁউ দিখা দিয়া?'

আনোখীর বাজনা থামে না। তারপর চলে যায় অন্য গানে। বলে,

—এই গীতে আমারও মরম নিঙড়ে দিলাম, কিস্‌সাওয়ালী!

ফুল্‌কির চোখ ভরে অশ্রু নামে। প্রেমের কিস্‌সা ফেরী ক'রে ফেরে যে-আনোখী সে বলে,

'আঁসু কো সম্‌ঝো তুম্ আঁখো কা পানি
ম্যয়ঁ সম্‌ঝেঁ য়ো মোতি কী লড়িয়াঁ···'

তোর আঁসু-ভরা চোখ তুই আমাকে দেখাস্ না ফুল্‌কি। ঐ ছাখ্, আমাদের ট্রেন চলে এলো।

বাজাওয়ালা আনোখী আর গীত-পাগল ফুল্‌কি মুখোমুখী দাঁড়ায়। ফুল্‌কি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আনোখীকে জড়িয়ে ধ'রে বলে,

—আমার মন বাঁধা আছে আনোখী, আমি আগে বুঝিনি,—আমি যাবো না!

পাঁচ আঙুলে হারমোনিয়ামের গলা টিপে সুর থামিয়ে দেয় আনোখী। ট্রেনের তীব্র হুইশিলের সঙ্গে সে যেন তারই আর্তনাদ শোনে। ক্ষণিকের জন্যে ভাবে, নির্মম একটানে ছিঁড়ে নিয়ে গেলে কেমন হয় ফুল্‌কিকে! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় কিস্‌সাওয়ালার, কিস্‌সার তাতে অপমান হবে। বাজাওয়ালার বাজায় আর গান জমবে না।

—আনোখী!

কথার জবাব না করে ট্রেনে লাফিয়ে ওঠে আনোখী।

ট্রেনের কামরার কাঠে কৌশলে পা বাধিয়ে ঝুঁকে পড়ে সামনে। পাঁচ আঙুলে হারমোনিয়ামে সুর তুলে বলে,—ভালোই হলো।

—আনোখী!

—তুই জানিস্না, এ খুব ভালো কিস্সা হলো। তোর কাছে সেলাম কিস্সাওয়ালী, তুইও আনোখীকে শেখালি।

—তুই চলে যাচ্ছিস্, তোর জন্যেও মনটা আমার দুখাচ্ছে আনোখী, তুই বিশ্বাস কর্।

—অবিশ্বাস তো করিনি।

আনোখী হাসতে-হাসতেই গাড়ী চড়ে। হাত নাড়ে আনোখী। আনোখীর হাসিটার ওপর অনেক রঙের আলো ঝল্কায় প্ল্যাটফর্মের কাঁচের শো-কেস্ থেকে, আর ফুল্কির বুকটা দরদে নিঙড়ে যায়। চোখ মুছে বেরিয়ে আসে ফুল্কি।

ঘরে এসে ফুল্কি আজ কেন এমন পাগল হলো বোঝে না গোপাল। গোপালকে ফুল্কি বলে,

—তুই আমায় ধরে রাখ্। কেন ছেড়ে-ছেড়ে দিস্ আমায়?

—ছেড়ে দিলাম কোথায়? তুই তো রঙ্গিলী নাজ্নী সেজে মেলা দেখতে গেলি।

মাথা চুলকোয় গোপাল। ফুল্কি জ্বলে ওঠে,

—তাই বলে তুই আমায় ছেড়ে-ছেড়ে দিবি? যা চাইবো তাই করতে দিবি? কেন? তোকে অত ভালো হতে কে বলেছে?

রাগ করতে-করতেই অঝোরে কাঁদে ফুল্কি। গোপাল ছাখে তার ভালবাসার ফুল্কি ঝড়ে-ঝাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাছে টেনে নেয় গোপাল। গায়ে মাথায় হাত সাপ্‌টে দেয়। বলে,—তুই কাঁদলি কেন ফুল্কি?

—বেশ করেছি।

গোপাল বলে,—তুই কিস্সা ভালবাসিস্, গীত ভালবাসিস্—তোর ঘুরতে-ফিরতে ইচ্ছে করে···

—না। তুই কিছু বুঝিস্ না।

দুজনে চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ফুল্কি বলে,—আমার এই ঘরখানারও একটা কিস্সা আছে।

—কে বললো?

—আমি বলবো তোকে। আমি কিস্সাওয়ালী···

—পরে বলিস্।

গোপালের বুকে মিলিয়ে ফুল্কি চুপ করে থাকে আর তাদের দুজনকে দেখতে তারার নক্সা-কাটা আঁধার লুটিয়ে আকাশখানা নামতে থাকে সেই ঘরের ভেতরে। আজকের রাতটায় অনেক গীত আর অনেক কিস্সার স্বাদ পায় ফুল্কি।

আস্তিক

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভেবেছি যে ভাব, নেই ভাবনা
শুকনো ডাব।
করেছি যে কাজ, নেই কামনা
ভগ্ন তাজ।
বলেছি যে কথা, উহ্য টীকা
অপূর্ণতা।

চেয়েছি যে বিবি, হয়নি নিকা।
জমল ঢিবি
মনের মাটির ; গন্ধ উড়েছে
শূন্য ভাঁটির : ছড়িয়ে পড়েছে
পয়সা ঘষা।

তবু সে আকাশ-নিকষে কষা
দূর রহস্য
ক্ষণিক ঝিলিক
চেতনাস্তিক
চির নমস্য।

অভিগমন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাদা পাতায় যারা সাদা
ফুলের ছবি আঁকে,
পটভূমির একটু সবুজ
কিংবা ঈষৎ নীল—
তারি মধ্যে শুভ্র মনের
স্বপ্নটিরে রাখে,
তাদের সঙ্গে আমার গানের
বাল্যে ছিলো মিল॥

তখন আমি তরল ছিলাম ···
আজকে আমার চোখে
শ্বেত কপোতের আলোয় ওড়ার
নেইকো স্বচ্ছ মানে ;
এখন গভীর অন্ধকারে
সত্য জানি : কালো
পটভূমির আবছা ছবিই
কথা ব'লতে জানে॥

কুরূপা

আনন্দ বাগচী

রূপকথায় ছিলে তুমি কিংবদন্তী এমন শুনিনি,
ছিলেনা প্রেমের গল্পে, লাজরক্ত পরথম যৌবনে
খেলনি মায়ার খেলা, প্রথমদর্শনে যাকে চিনি
সে নায়িকা তুমি নও, প্রিয়নির্বাসনে গেছ বনে
এমন-ও উল্লেখ নেই, বইয়ের পাতায় মুখ ঢেকে
নিজেকে লুকিয়ে রাখলে আজীবন, কেউ কাছে ডেকে
শোনেনি তোমার গল্প অথবা গহীন গাঙ ভেবে
অন্ধ বাসনায় ডুবে মরতে চায়নি, বেদনা কি দেবে!

একাঙ্কিকা জুড়ে তুমি একা আছো, বুকের গহনে
যে মায়া দর্পণ জলছে তাতে ছায়া পড়ে অনুরূপ,
যেমন রয়েছো তেমনি থাকো, ছল কুঙ্কুমে চন্দনে
কাজ কি, গোলাপে কাঁটা, চাঁদেও কলঙ্ক অপরূপ
জেনে মিথ্যে ব্যথা পেয়ে, সুন্দরের ক্ষমা চিরকাল!
তুমি তো সুন্দরী নও, ছায়াচ্ছন্ন দূরের দেয়াল।

আমার যন্ত্রণা তুমি, রাজরাজেশ্বরী অন্ধকারে
পরজে বেজেছে বাঁশি, যদিও পৃথিবী বন্ধদ্বারে॥

কল্পনা

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আমার কল্পনার মরুতে
শুধু ধূ-ধূ বালু,
আর রুক্ষ বাবলার গাছ,
যত যাই পায়ে ফোটে তীক্ষ্ণ কাঁটা।
অসহ্য উত্তপ্ত হাওয়া,
তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়।
তবু—মাঝে মাঝে চলেছে উটের দল,
উৎকট কুরূপ জীব,
বালির পাহাড়ে মুখ গোঁজে,
লজ্জায় নয়,
জলের সন্ধানে।
লাল নীল হলদে সবুজ
বিচিত্র বর্ণের ঘাঘরা ঘুরিয়ে
রাজপুত মেয়েরা চলে
গাগরী মাথায় নিয়ে—
এক ঝাঁক ময়ূরকণ্ঠী পাখী,
তুমি কি তাদেরি একজন!

একটি হৃদয়ের প্রেমে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখন কোথায় যেন একদিকে চুপচাপ থাকি
একা-একা, হৃদয়কে কোলে নিয়ে নিবিড় নীরব,
তখন হয়ত বৃষ্টি, এলোমেলো বাতাসের রব
দামাল শিশুর মতো একরোখা, তারার জোনাকী
মুছে যায় মেঘে-মেঘে, সে খেয়াল নেই পরিচয়
কখন কী হয়, কেন ভর্ৎসনার মতো নিদারুণ
এক শব্দ জলে ওঠে আচমকা বিদ্যুতে আগুন,
কে জানে—কুড়িয়ে পাই অপরূপ একটি হৃদয়।

কিছুই খেয়াল নেই। শুধু মন হৃদয়কে নিয়ে
অবলীন স্বপ্নে যেন, কুসুমের বুকের ভিতরে
যেমন মৌমাছি প্রাণ ডুব দেয় বিহ্বলতা ভরে,
তেমনি বাসনা শুধু এ-হৃদয় সৌরভে হারিয়ে
বিভোর বেহুঁস থাকি, নীড়মাটি—পৃথিবীর মনে
চাইনা ফেলতে ছায়া পুনরায় আর পর্যটনে।

আজ এলে পরে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

যে মনে একদা ফাল্গুন এসে নানা রঙে ছবি আঁকতো
স্বপ্ন এবং গানের তুলিতে, আজ এলে পরে জানবে
মধু-প্রত্যাশী সেই রাঙা মন কী দারুণ লবণাক্ত।

জানি জানি তুমি এরপরে রাঙা ঠোঁটের ডগায় আনবে
মৃগতৃষ্ণার উষ্ণতা-ঝরা বানানো কথার অর্ঘ্য,
এবং হয়তো অভ্যাসবশে মেয়েলি ভাগ্য মানবে।

এবং আমিও হয়তো তখন পুরোনো ফুলের স্বর্গ
অম্লান ভেবে বলবো: 'যেহেতু নিঃসীম নীলকান্ত
ব্যথার আকাশে প্রেম খুঁজে পায় সার্থক অপবর্গ,

আজো তাই দুটি হৃদয় কালের যমুনার দুই প্রান্ত,
যেন বেঁধে রাখে, চিরজীবী সেই প্রণয়ের সেতুবন্ধ,
তারপরে তুমি সে-সেতু ভেঙেই চলে যাবে, উদ্‌ভ্রান্ত

উদাস আঁধারে ভাববো তখন, প্রেম কি সত্যি অন্ধ
না কি অন্ধের ছলনা করে সে? কিংবা কাঁটার বন্য
লাবণ্যে বেঁধে হৃদয়?—ফুলের ভীরু নির্জন গন্ধ

শিশিরের গানে ভিজে সান্ত্বনা আনবে আমার জন্য,
মনে মনে তাই বলবো তখন: 'পেছনের কথা থাক গে,
তোমার ছোঁয়ানো ভালোবাসা পেয়ে আমি যে হয়েছি ধন্য;

শ্রমণ হৃদয়ে পৃথিবী পেরোবো?—যাক গে সে কথা যাক গে,
অন্ধ চাঁদের জ্যোৎস্না আমার অনেকখানি যে ভাগ্যে॥'

মেঘের স্তব

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সকাল বেলায় কেবল মেঘের ছায়ায় আকাশ ঢাকা
কেমন অলস ক্লান্ত এদিন স্তব্ধ,
কী মহা ক্ষুব্ধ জ্যৈষ্ঠ দিনের দীর্ঘ মাঠের প্রান্ত
মৃত্যুর মতো সমাহিত নিঃশব্দ।
সূর্য-দেবতা ঢেকেছে আপন মুখ
তৃণ-মৃত্তিকা তারি পানে উৎসুক।
হঠাৎ আকাশে বর্ষা ধারার পূজা হ'ল আরব্ধ।

সারা পৃথিবীর এই ধ্যানক্ষণ ভেঙোনা এখন ভেঙোনা,
নতুন ঋতুর তপস্যা হোক পূর্ণ,
কঠোর তৃষ্ণা জমা হয়েছিল যে মাঠের ফাটা বুকে
বর্ষণ-ধারা সেথা পড়ে হোক চূর্ণ।
সবুজ ঘাসের গীতি কবিতার গানে।
প্রান্তরে সুর ভরে যাক্ সবখানে,
শ্যামল প্রাণের বিজয় ঘোষণা আজি যেন হয় তূর্ণ।

আকাশে মেঘেতে মাঠেতে নদীতে নিবিড় শালের বনে
ঘরেতে দূরেতে প্রান্তে,
কী যেন গভীর ধ্যানের আসনে বসেছে পৃথিবী আজ
জীবনের কোনো দর্শনবাণী জান্‌তে।
যত কোলাহল থামাও থামাও শোনো,
হৃদয়ে কোথাও বেজেছে বেদনা কোনো?
এই সকালের ঘনকালো মেঘে কি যেন হারিয়ে গেছে
জীবনে যা আজো পারিনি কাছেতে আন্‌তে।

বৃষ্টির দিন

অসিতকুমার

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার শহরের গায়।
কখনো বা গুঁড়িগুঁড়ি, কখনো বা ভয়ার্ত হাওয়ায়
ভর করে ছুটে আসে। কাদায় পাথরে পথে পথে
যেন এক রোগিণীর ক্লান্তিঘন বিষণ্ণ জগতে
ঘুরে ঘুরে কাকে খোঁজে; তারপরে দূরে চলে যায়
যেন দূর ইতিহাসে, দূরতর স্বপ্নচেতনায়
দূরে ফেলে আমাদের চাওয়াপাওয়া হাওয়ায় হাওয়ায়।

এখন আমাকে আর কোনো হাওয়া নেবেনা'ক ডেকে
দরোজা ভেজিয়ে দূর প্রসারিত পৃথিবীর থেকে
নিজেকে নিয়েছি কাছে। ঘন মেঘ থাকে যদি থাক্
এখানে আকাশ নেই হাওয়া নেই শুধু থেকে থেকে
শুনি কেন শূন্যতায় ডেকে ওঠে সঙ্গীহীন কাক?

বাংলা ছবির নায়িকা

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

বাংলা ছবি চিত্র-জগতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রায় বছর চল্লিশ আগে ১৯১৯ সন নাগাদ ম্যাডান থিয়েটার্স প্রযোজিত ও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা নির্বাক ছবি 'বিল্বমঙ্গল' আত্মপ্রকাশ করে। তারপর যুগের সঙ্গে তাল রেখে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলা ছবি অগ্রগতির পথে চলেছে।

অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, চিত্রনাট্যকার প্রভৃতি আরো অনেকের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ছবির এ-রকম বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তার ভেতর প্রধানা অভিনেত্রী বা চিত্র-তারকার অবদান বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, চিত্র-তারকার আকর্ষণ দর্শকের কাছে সবচেয়ে বেশী। চিত্র-তারকার অভিনয়-নৈপুণ্যের ওপর ছবির সাফল্য বহু অংশে নির্ভর করে।

সেকালের প্রধানা চিত্র-তারকাদের মধ্যে সাধনা বসু, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, রাণীবালা, উমাশশী ও ছায়া দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই কয়জন চিত্র-তারকাদের মধ্যে রাণীবালা ইহলোকে নেই। সাধনা বসু এবং উমাশশী অবসর গ্রহণ করেছেন। চন্দ্রাবতী ও ছায়া দেবীকে ছোটোখাটো ভূমিকায় এখনো মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। কানন দেবী অভিনয় ছেড়ে প্রযোজক হয়েছেন।

একদা অভিজাত-বংশীয়া সাধনা বসুর অভিনয়-জ্যোতিতে বাংলার রূপালী পর্দা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। একটি বিশেষ গুণের জোরে তিনি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের ভেতর বাংলা চিত্র-জগতের পুরোভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে তাঁর নৃত্য-পারদর্শিতা। তাঁর অভিনয় ছিল চটুল, কিন্তু সাবলীল ও প্রাণবন্ত। নৃত্য-পটিয়সী সাধনা বসুর অভিনয়-সাফল্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'আলিবাবা'। এ ছাড়া তাঁর প্রধান আর দুটি ছবির নাম 'রাজনর্তকী' ও 'অভিনয়'।

কানন দেবীর বৈশিষ্ট্য অন্যপ্রকার। নিজের আন্তরিক চেষ্টা ও অভিনয়ের প্রতি মমত্ববোধ,—এই দুটি গুণের জন্য তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে এসে পৌঁছেছিলেন। অভিনয়-সাফল্য অর্জন করতে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার, প্রথমে তাঁর তা সম্পূর্ণরূপে ছিল না। কিন্তু নৃত্য, গীত ও শিক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি তা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। তাঁর অভিনয়ের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ,—মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত,—উভয়বিধ ভূমিকায় সমধিক কৃতিত্ব। 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'অভিনেত্রী', 'বিষবৃক্ষ', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'প্রভাস-মিলন' প্রভৃতি বহু ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন।

চন্দ্রাবতীর প্রতিভা প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়,—হালকা, চটুল চরিত্রে তাঁর প্রতিভা-স্ফুরণ হয়নি। নৃত্য বা গীতে দখল না থাকলেও, নায়িকার ভূমিকায় তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় যিনি একবার দেখেছেন, তিনি তা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। তাঁর কয়েকটি প্রধান ছবির নাম,—'দক্ষযজ্ঞ', 'দিদি', 'দেশের মাটি', 'মীরাবাঈ', 'প্রতিশ্রুতি', 'দেবদাস', 'বিজয়া', 'প্রিয়বান্ধবী'।

ছায়া দেবী মধ্যবিত্ত ঘরের নায়িকা-চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কয়েকখানি প্রধান ছবির নাম,—'রাঙা-বৌ', 'সোনার সংসার', 'রিক্তা'।

সবরকম ভূমিকায় সমধিক অভিনয়-পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন রাণীবালা। রাণীবালার শেষ অভিনয় সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর'-এ একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। তাঁর আরো কয়েকখানি ছবির নাম,—'তরুণী', 'তটিনীর বিচার', 'প্রফুল্ল', 'অপরাজিত'।

উমাশশী দেবকী বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস' চিত্রে রামীর ভূমিকায় নিজেকে বাংলার চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,—কিন্তু এই অভিনেত্রী বেশীদিন পর্দায় অভিনয় করেননি। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করবার পর পর্দায় তাঁকে আর দেখা যায়নি। তাঁর আরেকখানি ছবির নাম—'দেশের মাটি'।

এ ছাড়া সেকালের আরো যে-সব চিত্র-তারকা নায়িকারূপে যশ অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে লীলা দেশাই-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একালের চিত্র-নায়িকার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় সুচিত্রা সেনের।

সুচিত্রা সেনের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য—মিলনান্ত, বিয়োগান্ত, চটুল ও হালকা ভূমিকা এবং রোমান্টিক ভূমিকায় তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্য। ক্ষেত্রবিশেষে বড় বড় চিত্র-তারকাদের অভিনয়ও আতিশয্য-দুষ্ট হয়। এ বিষয়ে সুচিত্রা সেন মুক্ত। যেখানে যতটুকু প্রকাশভঙ্গী বা ভাবাবেগ দরকার, ঠিক ততটুকুই তিনি পর্দায় প্রকাশ

করেন। তার কমও নয়, বেশীও নয়। কাজেই দেবকী বসু পরিচালিত 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চিত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় তিনি যেরকম অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি 'জীবন-তৃষ্ণা' চিত্রে অতি-আধুনিকার চরিত্রেও সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'কাজরী'; অন্যান্য কয়েকখানি ছবির নাম,—'ওরা থাকে ওধারে', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'অগ্নি-পরীক্ষা', 'সাগরিকা', 'বলয়গ্রাস', 'ঢুলী', 'একটি রাত', 'হারানো সুর', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', 'চন্দ্রনাথ'।

সুমিত্রা দেবী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী অভিনেত্রী। সুমিত্রা দেবীর প্রথম চিত্র 'সন্ধি'। তারপর বাংলাদেশের কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার পর তিনি বোম্বাই-এর হিন্দী চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এ 'পটেশ্বরী'-চরিত্রে অভিনয়সূত্রেই তিনি আবার বাংলা ছবির জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এ তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য তিনি সমস্ত বাঙালী দর্শকের অভিনন্দন পান নতুন ক'রে। বিশেষ এক-জাতীয় চরিত্রের অভিনয়ে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অন্যান্য ছবি,—'একদিন রাত্রে', 'আঁধারে আলো', 'নীলাচলে মহাপ্রভু' প্রভৃতি।

সন্ধ্যারাণী বহু বাংলা ছবিতে নায়িকার ভূমিকা রূপায়িত
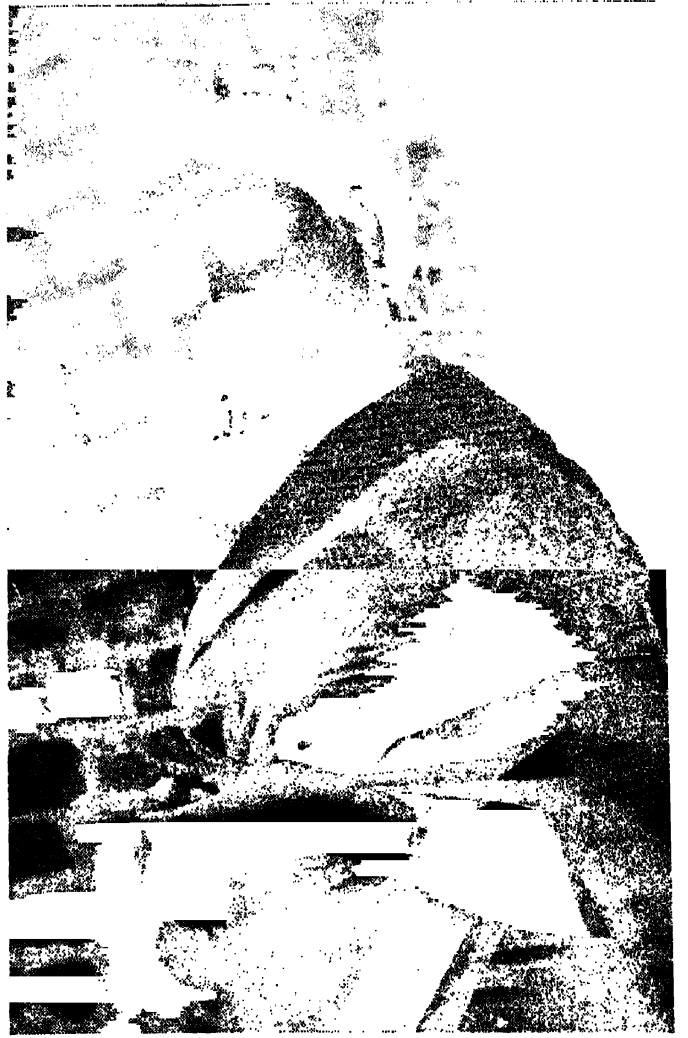
করেছেন। কিছুকাল বাংলার পর্দায় অভিনয়-নিপুণা নায়িকার অভাব তিনি একাই প্রায় পূরণ করেছেন বললে চলে। এক অতি-আধুনিকা শহুরে মেয়ের চরিত্র ছাড়া অন্য সব চরিত্রেই তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন,—বিশেষ ক'রে পল্লীবধূর চরিত্রে। তাঁর কয়েকখানি ছবির নাম,—'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'পণ্ডিতমশাই', 'নিষ্কৃতি', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র', 'মহানিশা'।

উচ্চশিক্ষিতা চিত্র-তারকাদের মধ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের স্থান সর্বাগ্রে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্র-সংগীতে পারদর্শিনী এই উচ্চশিক্ষিতা অভিজাতবংশীয়া

চিত্র-তারকা আধুনিকা-চরিত্রে ও মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রাভিনয়ে সাবলীল অভিনয়গুণে যশোলাভ করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। তাঁর অন্যান্য কয়েকখানি ছবির নাম,—'সতী', 'ছেলে কার', 'মা', 'গোধূলি', 'প্রশ্ন', 'চলাচল', 'পঞ্চতপা'।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নৃত্য ও গীতে পারদর্শিনী। অভিনয়-নৈপুণ্যেও তিনি প্রথমশ্রেণীর অভিনেত্রী। চিত্র-তারকা না ব'লে অভিনেত্রী বললাম এইজন্যে যে, মঞ্চাভিনয়েও তিনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রকৃত-পক্ষে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবার পূর্বে তিনি সখের নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয় করতেন। পর্দায় তাঁর অভিনয় দেখে মঞ্চে তাঁর অভিনয় দেখলে মনে হবে—দুজন স্বতন্ত্র সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ থেকে মনে হয়, অভিনয়ে যেন তাঁর জন্মগত অধিকার। তাঁর প্রথম ছবি 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ'। অন্য কয়েকখানি বিশিষ্ট ছবির নাম,—'পাশের বাড়ি', 'নতুন ইহুদী', 'বিধিলিপি', 'দুই বোন', 'বসু পরিবার', 'পরাধীন', 'ভাঙা-গড়া', 'দানের মর্যাদা', 'ডাক-হরকরা'।

এই প্রসঙ্গে সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও কাবেরী বসুর নামও উল্লেখযোগ্য।

লিলি বিস্কুট
জনপ্রিয়তায়
সবার উপরে
রকমারিতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট)
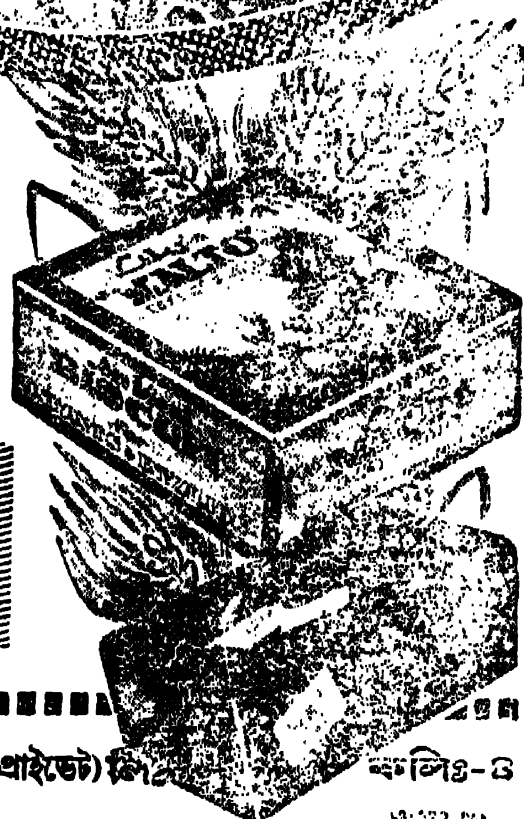
মেয়েটি ও একটি সকাল

মতি নন্দী

ক্লাসে মেয়েরা বসে ছিল। বেয়ারা এসে জানাল প্রফেসর আসবেন না। সবাই খুশি হল কেন-না এটা লাস্ট পিরিয়ড।

ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েরা দাঁড়াল দোতলার করিডরে। করিডরের এক কোণায় প্রফেসরদের ঘর, তার সামনেই প্রিন্সিপ্যালের, তার পাশে সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে মেয়েরা নিচের করিডরে নেমে এল। সেখান থেকে রাস্তায়। ছোট ছোট দল করে ওরা এধার-ওধার ছিটকে গেল। শুধু একটিমাত্র মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থেকে সে চারপাশে তাকাল, তারপর মুখ তুলে দেখল আকাশটাকে।

রোদ্দুরটা আজ ভারি মিষ্টি। ভারি সুন্দর। বিকেলে ঘুম-ভাঙার পর হাই তুললে শরীরটা এমন লাগে। আমার ভাল লাগছে এই সময়টা। এখন সবে সাড়ে ন'টা। বাড়ি পৌঁছনর কথা সাড়ে দশটায়। একঘণ্টা সময় এখন আমার। শুধু আমার। এখন আমি কি করব! বাড়ি ফিরে যাব? রাস্তাটা পার হতে হবে ওই ওষুধের দোকানটার সামনে দিয়ে। তারপর একটা গলি। গলিটা মস্তো লম্বা, সেটা শেষ করে আবার বড় রাস্তা। তাই ধরে কিছুটা গিয়ে আবার পার হব, তারপর সরু গলিটা। গলিটা এপাশ-ওপাশ করে অনেকদূর। আর একটা সরু গলিতে ঢুকে শেষ বাড়ির কড়াটা যখন নাড়ব, তখন দোতলার জানলায় এসে দাঁড়াবে ভোম্বল। শব্দ করে থুথু ফেলবে। দরজা খুলে দিয়ে মা গম্ভীর ভাবে বলবে, আসতে এত দেরী হল যে, ছুটি তো হয়েছে স'দশটায়? না, আজ মা বলবে, এত তাড়াতাড়ি যে!

ওই একঘেয়ে রাস্তা ধরে রোজ-রোজ বাড়ি ফিরি। আজ ফিরতে ইচ্ছে করছে না। একঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে। নতুন একটা রাস্তা দিয়ে যদি হাঁটি! ঠিক একঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরব। মা কিছু জানতে পারবে না। রোজকার মতো চান করব, খাব, ঘুমোব।

মায়া বলে, স্টেট-বাসের জানলাগুলো এমন অদ্ভুত, চললেই নাকি ঝমঝম্ শব্দ হয়, চোখ বুজে শুনলে মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে। ওই বাসটার ঝকঝকে রঙ। ওটা নতুন তৈরী হয়েছে নিশ্চয়। ওর জানলাগুলো নড়বড়ে নয়। ওর মধ্যের লোকগুলো বৃষ্টি-পড়ার মজা পাচ্ছে না। আমার বৃষ্টি ভাল লাগে। এই রোদ্দুরটাও ভাল লাগছে। শীতকালের রোদ সব্বায়ের ভাল লাগে। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? হাঁটলেই তো পারি, যে-দিকে খুশি, যে-দিকে ইচ্ছে। পুবদিকে হাঁটলে কেমন হয়, ও-দিকে অনেক দোকান, অনেক মানুষ।

মেয়েটি ছোট ছোট পা ফেলে পুবদিকে হাঁটতে লাগল। হাত দোলাল। রুমালে মুখ মুছল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল। আবার হাত দোলাল। তারপর এসে গেল পাঁচমাথার মোড়ে।

এখন অফিস যাবার সময়। ট্রামে-বাসে এই-যে ভিড় শুরু হল, কখন যে থামবে ভগবান জানেন। গীতার মুখ রোজই কাঁদ-কাঁদ হয়ে যায়। বাসের লোকেরা নাকি নানান কথা বলে এ-সময়ে মেয়েরা উঠলে। গীতা মেয়েটা বড্ড ভীতু। ভিড় দেখলে বাসে ওঠে না। জোড়াসাঁকো না জোড়াবাগান পর্যন্ত হেঁটে যায়। ও পিসীমার বাড়িতে থাকে। পিসীটা দারুণ পাজি। একটু জিরোবার পর্যন্ত সময় দেয় না। দেশে মা, বাবা, আরো কে-কে যেন আছে। গীতা বলেছে চাকরি করবে, বিয়ে করবে না।

ওই মেয়েটি এমন কচকচ করে পান চিবোচ্ছে যেন দুপুরে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে। ও কোথায় যাবে এখন! জামাটা কী পাতলা! লোকগুলো তাকিয়ে যাচ্ছে। ওর পাশের মেয়েটির দিকে কিন্তু কেউ নজর দিচ্ছে না। কী ঘন আর লম্বা চুল! ব্যাগটাকে বুকের কাছে এমন ভাবে আঁকড়ে রয়েছে যেন এখনো ঝুলে পড়ে। মুখখানা গীতার মতো কাঁদ-কাঁদ। বোধহয় অনেকক্ষণ বাসে উঠতে পারেনি। বড্ড রোগা, চাকরি করার মতো স্বাস্থ্য নয়। বাবা অফিস থেকে ফিরেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। অফিসে খুব খাটুনি।

একটা বাস আসছে। লোকগুলোর কোন হুঁশ নেই।

ওকে যে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। আহা রে! পান-চিবোনো মেয়েটি কি ঝুলে-ঝুলে যাবে অমন করে! পড়ে যাবে যে!

রোগা মেয়েটি এ-বাসে উঠতে পারলো না। পরেরটাতেও হয়ত পারবে না। দেরী করে পৌঁছে নিশ্চয় বকুনি খাবে। আবার ফেরার সময়ও এমন করে অনেকগুলো বাস ফস্কে বাড়ি পৌঁছবে। এমনি করে ও রোজ যাবে আর আসবে, যাবে আর আসবে। তারপর? কতদিন ও এমনি করে চাকরি করবে? ও কি গীতার মতো ঠিক করেছে বিয়ে করবে না!

আজকের সকালটা ভারি সুন্দর, ভারি ভাল। আমি ওর কথা ভেবে মন খারাপ করব না। রোদ্দুরটা ভারি মিষ্টি। রোদে গা লাগিয়ে চলব। দোকানগুলো ঝকমকে। দোকান দেখতে দেখতে যাব। কী সুন্দর আপেল ঝুলিয়ে রেখেছে। টাইফয়েড থেকে ওঠার পর বাবা ক'দিন আপেল এনেছিল। ক'দিন কেন, তিন কি চার। ছেলেদের সঙ্গে পড়তে কেমন লাগে! ওই মেয়েটি নিশ্চয় এখন কলেজ যাচ্ছে। ও কি স্কটিশে পড়ে? ও লেখাপড়া শিখে কি করবে, চাকরি করবে? ওর গোড়ালি সেদ্ধ আলুর মতো। নিশ্চয় বাড়ির কাজ করে না। করলে ফাটা-ফাটা দেখাত। ও নিশ্চয় বিয়ে করবে।

ন্যাপথলিনের গন্ধটা বেশ লাগে। আমার গা ঘেঁষে লোকটা গেল। ওর গরম পাঞ্জাবি থেকে গন্ধটা এল। পাঞ্জাবির রঙটা সুন্দর।

ডিম-ভাজার গন্ধ আমার ভাল লাগে। কোথায় যেন ভাজছে। এইতো এই দোকানটায়। ওমা, রেবার সঙ্গে ওই ছেলেটাকে যে একদিন দেখেছি। রেবা ওর সঙ্গে সিনেমা দেখে। কী ওর নাম, সুব্রত কি? কাল রেবাকে বলব, আমি সুব্রতকে দেখেছি দোকানে চা খাচ্ছিল।

আমায় দেখে কি সুব্রত চিনতে পেরেছে আমি রেবার বন্ধু? এখন যদি ওর সঙ্গে কথা বলি তাহলে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। দোষ অবাক করে? না থাক। তার চেয়ে মানুষ দেখি, রাস্তা দেখি। চটির শব্দ শুনতে বেশ লাগছে। সুব্রতকে রেবা বিয়ে করবে। নিশ্চয় করবে, করুক, তাতে আমার কি। সুব্রত চাকরি করে কোথায় যেন। সেই মেয়েটা এতক্ষণে নিশ্চয় বাসে উঠেছে।

আঃ, সেই ছেলেটার সঙ্গে যদি এখন হঠাৎ দেখা হয়ে যায়! বিজয়ার প্রণাম করতে বাসে করে যাচ্ছিলাম ন'মাসীর বাড়ি। বাসে ভিড় ছিল। আমার হাঁটুতে হাঁটু ঠেকতেই মুখ লাল করে ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল। খুব লাজুক। একবারও আর মুখ তুলে তাকায়নি। একটু ফাঁকা হতেই সরে দাঁড়িয়েছিল। খুব ভদ্র। এখন যদি হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তা হলে আমি কি করব! দু'মাসেই কি সে আমার মুখ ভুলে যাবে? নিশ্চয়ই চিনতে পারবে, আমিও পারব। ও যদি বলে, ইচ্ছে করে আমি আপনাকে ছুঁইনি, বাসে ভীষণ ভিড় ছিল তাই। তখন আমি কি বলব! একটা কথাও বলতে পারব না। জানি, আমি জানি আমি খুব লাজুক। ও অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে যাবে। ও চলে যাবে। এই রাস্তার মানুষগুলোও চলে যাচ্ছে। ও অবাক হয়ে চলবে, মনে মনে একটু দুঃখ পেয়ে চলবে, কিংবা কিছুক্ষণ রাগ করে থাকবে। এই মানুষ-গুলোও কি অবাক হয়ে, দুঃখ পেয়ে, রাগ করে চলছে? এত, এত মানুষ! কি আছে ওদের মনে! আহা আমি যদি ভগবান হতুম, তা হলে জানতে পারতুম। কিন্তু জেনেই বা কি হবে। এত মানুষের মনের কথা আমি কোথায় রাখব। তার চেয়ে এই ভাল—এই সুন্দর সকাল, এই মিষ্টি রোদ্দুর, ট্রাম, বাস, শব্দ, আলো, মানুষ!

কি সুন্দর, কি সুন্দর রঙগুলো! থোকো থোকো ফুল ফুটে আছে যেন। যদি উলের বলগুলো নিয়ে ঘাঁটি, বেড়াল-বাচ্চার মতো ঘাঁটি, তা হলে দোকানি কি কিছু বলবে? নিশ্চয় বলবে না। খদ্দেররা তো নাড়াচাড়া ক'রে দেখবেই। তারপর ও জিজ্ঞেস করবে কোন্ রঙেরটা আমার দরকার। তখন আমি কি বলব? বলব, সব, সব রঙের আমার দরকার। ও বিশ্বাস করবে না। তখন কি আমি ওকে বিশ্বাস করাব? কি করে করাব, আমি তো কিনব না। আমার কাছে কেনবার মতো পয়সা নেই। একটা সিকি আছে মাত্র। পুরনো কাগজ বিক্রির অর্ধেক পয়সা আমার। এ দিয়ে কি উল কেনা যায়?

আমার একটা উলের জামা দরকার। ভোরবেলায় কলেজে আসতে কষ্ট হয়। গলির মধ্যে ততটা বোঝা যায় না, কিন্তু বড়রাস্তায় পড়লেই চামড়া জ্বালা করে। কুয়াশায় চোখ জ্বালা করে। দূরের মানুষ দেখা যায় না। আর কত দূর থেকেও বাসের শব্দ শোনা যায়। মনে হয় একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে ছুটতে ছুটতে হাঁপাচ্ছে আর ডাকছে। তখন ভয় করে। একলা রাস্তায় গা শির-শির করে। কুয়াশা ফুঁড়ে ভূতের মতো যে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে তাদের দেখলে মন ছমছম করে। অথচ কী ভাল

লাগছে এখন। ভোরবেলার মানুষগুলো আর এখন ভূত নয়। একলা থাকলেই ভয় করে। গীতা বিয়ে করবে না, ও সারা জীবন ভয়ে ভয়ে থাকবে। রেবা এখনকার মতোই ডানপিটে থাকবে সারা জীবন। আমি কেমন থাকব? লাজুক, মুখচোরা, ভীতু! কেন আমি কথা বলতে পারি না, মনের কথা বলতে পারি না। সেটা কি অভ্যেস না থাকার জন্য? কেমন করে অভ্যেস করব, কার সঙ্গে কথা বলব! আমার মনে কী এমন কথা আছে যা বলতে হবে। আমি জানি না, আমার মনের কথা কিছু জানি না। শুধু ভাল লাগছে। এই সকালটা, এই রোদ্দুরটা, এই রাস্তাটা।

মেয়েটি একটুখানি দাঁড়াল। চটি থেকে পা বার ক'রে, সিমেন্টের ফুটপাথ যেখানে ভাঙা, যেখানে মাটি বেরিয়ে রয়েছে, সেখানে রাখল। ঝাঁকি দিয়ে বিনুনিটাকে দোলাল। তার পাশ দিয়ে যত মানুষ গেল, সকলের দিকে সে তাকাল। তারপর মুখটা উপর দিকে তুলে হাসল। হেসে মাথা নামিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আবার থামল সে। রুমাল থেকে একটা সিকি খুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় রাখল। রেখে হাসল। হেসে চলতে শুরু করল। এমনি ভাবে থেমে থেমে, এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে সে হাঁটতে লাগল।

ঘড়ির দোকানের লোকটাকে ঠিক বাবার মতো দেখতে। ঘড়ির দোকান দেখলে হাসি পায়। কিন্তু লোকটাকে দেখে নয়। ওকে বাবার মতো দেখতে। অফিসের ছুটি পাওনা থাকলেও বাবা নেয় না। বলে, ওতে নাকি ধারণা খারাপ হবে। কিন্তু শীগ্‌গির তো রিটায়ার করবে, তবু এত ভয় কেন! এতকাল ভয়ে ভয়ে চাকরি করে এসেছে! কিসের ভয়, কাকে ভয় করে? বাবা খুব দরকার না হলে পয়সা খরচ করে না। সবাই নিন্দে করে, কিপ্টে বলে। সকালে রুটি খেয়ে কলেজে আসি, ছুটির সময় ভীষণ খিদে পায়। বাবা অফিসে রুটি নিয়ে যায়। ছুটির সময় নিশ্চয় খিদে পায়। বাবা কিছু খাবে না। আমি জানি বাবা পয়সা জমাচ্ছে। রমুকে, তপুকে, টুকিসোনাকে মানুষ করার জন্য। আমার বিয়ের জন্যে পয়সা জমাচ্ছে। আমাদের জন্যে বাবা ভীতু হয়ে পড়ছে। মা খিটখিট করে, বিচ্ছিরি সন্দেহ করে। যদি এখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাই! বাবা প্রত্যেক মাসে লটারির টিকিট কেনে। হঠাৎ যদি জিতে যায় তা হলে কি সাহসী হবে? কিন্তু এত মাস চলে গেল বাবা কিছু পায়নি। তবু আশা ক'রে প্রত্যেক বার কেনে। অমন কত হাজার হাজার লোক কেনে। অথচ টাকা পায় একজন। বাবা ভাবে এবার ঠিক পাবে। হাজার হাজার লোক ভাবে এবার তারা পাবে। এমনিভাবে মাসের পর মাস শুধু আশা করে যাবে। তারপর বাবা একদিন মারা যাবে, হাজার হাজার লোক একদিন মারা যাবে। তারপর আবার হাজার হাজার লোক লটারির টিকিট কিনবে। প্রত্যেকবার টিকিট কিনে, মুখখানাকে কেমন করে বাবা বলে, কতোদিকে তো কত পয়সা যায়, দুটো তো মোটে টাকা, যদি লেগে যায় একবার। এই যে লোকগুলো, ট্রামে বাসে চলেছে, আমার গা ছুঁয়ে চলেছে, এরাও তো অমন করে বলে। মানুষের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হচ্ছে। মানুষের মনে কি যেন হয়েছে, না হলে ভীতু হয়ে পড়ছে কেন, লটারির টিকিট কিনছে কেন।

আজ সকালটা আমার ভাল লাগছে। কোন কষ্টের কথা আমি ভাবব না। মানুষ ভীতু হবে কেন? আমাদের ভালবাসে বলেই বাবা ভীতু হয়ে পড়ছে। এই মানুষগুলোও ভালবাসে। ঘড়ির দোকান দেখলে আমার হাসি পায়। এক গাদা ঘড়ি আর এক এক রকম সময়। কলেজের তিনটে ঘড়ি কিছুতেই এক সময় দেয় না। চিত্রা মাঝে মাঝে পূরবীর ঘড়িটা হাতে লাগিয়ে চাল মেরে বেড়ায়। পূরবীর দিদি বিলেতে ডাক্তারি পড়তে যাবে। ও বলেছে দিদিকে একদিন দেখাবে। ওর দিদির ছবি নাকি কোন এক ফটোর দোকানে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে। ওই দোকানটায় আছে কি?

এমন ঢঙ করে তোলা ছবি বাইরে টাঙিয়ে রাখে কেন! আর যারা তোলায় তাদেরও কি লজ্জা করে না! মেয়েটা কি সত্যিই এত ফরশা। খুব আলো দিয়ে তুললে নাকি কালোকেও ফরশা দেখায়। শিবুদা আমার ফটোটা দুপুরে ছাদে তুলেছিল। একদম ঝাপসা হয়ে গেছল। খুব লজ্জা পেয়েছিল। পাবেই তো, তোলার আগে কত কারিকুরি! মুখ তোলো, পাশ ফেরো, চুল ছড়াও, গালে হাত দিয়ে ভাবুক-ভাবুক হও। হেসে ফেলেছিলাম। খুব রেগে গেছল শিবুদা। হাসাটা কি খুব দোষের হয়েছিল? আর যদি হয়েই থাকে, তাই বলে অমন রাগ দেখাবার কি দরকার ছিল। তিন চার দিন আর আসেনি। অথচ রোজ সন্ধ্যেবেলায় আসত। বিচ্ছিরি লেগেছিল ওই তিনটে দিন। তারপর যেদিন এল কথা বলিনি। তার কদিন পরেই তো মা দেখে ফেলল। কি হয়েছিল সেদিন ওর কে জানে, হঠাৎ হাতটা চেপে ধরল। অবাক হয়েছিলুম। আমায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। মুখটা ওর ঝুঁকে পড়ল, আমি মুখ সরালুম না। শিবুদার ঠোঁট আমার গালে ছুঁয়েছিল আর তখনই মা দেখে ফেলল। ন'পিসীকে মা চিঠি লিখেছিল, তোমার দেওর যেন আর আমাদের বাড়িতে না আসে। শিবুদা আর আসেনি। এখন যদি হঠাৎ শিবুদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! তাহলে কি হবে! ও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে? কিংবা বলবে, তোমার মা আমায় যা-তা বলে অপমান করেছে। অপমান মা করেছে, আমি তো করিনি। তবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না কেন! যদি বলে তাহলে আমি কি বলব! বলব, আমাদের বাড়িতে এসো। কিন্তু আমি বললে শিবুদা আসবে কেন, বাড়ি কি আমার! তাহলে কি বলব? ইস্, অনেকক্ষণ রোদ্দুরে হাঁটছি। এবার গরম লাগছে। ক'টা বাজে এখন? শিবুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি বলব জানি না। আমার গরম লাগছে। উঠোনে এখন রোদ এসে গেছে। বালিশের ওয়াড়গুলো আর বাবার গামছাটা সেদ্ধ করে কাচতে হবে। উঠোনটা এত ছোট, অতগুলো জিনিস কিছুতেই তারে ধরবে না। যদি এই রাস্তাটা উঠোন হত, তাহলে যত কাপড় আছে সবগুলো কেচে শুকোতে দিতুম ট্রামের তারে। কতদূর গেছে ট্রামের তার? ধর্মতলা, তারপর ভবানীপুর, তারপর বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জের লেকে পরশু প্রতিমা বেড়াতে গেছল। প্রতিমা একা একা বেড়ায়। তার বাড়িতে কেউ বকে না। এখন যদি আমি বাসে উঠে লেকে চলে যাই তাহলে কি হয়! বাস থেকে নেমে হাঁটব আর হাঁটব। আর যদি বাড়ি না ফিরি তাহলে কি হবে? বাবা অফিস থেকে ফিরে সব শুনে পুলিশে খবর দেবে, হাসপাতালে খোঁজ নেবে। শঙ্করকাকা একদিন অমন কাণ্ড করেছিল। অফিস থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। কাকীমা কেঁদে-কেটে একশা। বাচ্চাগুলোর কান্না চোখে দেখা যায় না। শঙ্করকাকা ছাড়া ওদের বাড়ি দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ আর কেউ নেই। আমি যদি না ফিরি তা হলে টুকিসোনা কাঁদবে। দিদি না খাইয়ে দিলে ওর খাওয়া হয় না। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরব না কেন! শঙ্করকাকার মতো চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের খবর কি আমি পেয়েছি? তবে কী পেয়েছি!

এই আলো, এই রঙ, এই শব্দ, আর মানুষ আর মানুষ! আমার ভাল লাগছে না বাড়ি ফিরতে। সেই একঘেয়ে গলি দিয়ে, ইঁদুরে-কাটা কাগজের গন্ধওলা ঘরটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি হাঁটব, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। আমাদের ঘরে শীতে রোদ, গরমে হাওয়া ঢোকে না। রমু ছাদে উঠতে পারে না। কড়িকাঠগুলো কবেকার যেন, ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু হয়ে গেছে। দুপদাপ করলেই বালি খসে পড়ে। জানালা বন্ধ করলেও বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যায়। উঠোনটা শুকনো থাকে শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে। ঘরের সেই আদ্যিকালের খাটটা আর জায়গা বলতে কিছু রাখেনি। নড়াচড়া করলেই হাঁটুতে লাগে।

এখন কত সহজেই হাঁটছি। যতক্ষণ ইচ্ছে এমনি করে হাঁটতে পারি। দেয়াল নেই, খাট নেই, পেছল উঠোন নেই। ইচ্ছে করলে বাসে উঠতে পারি। সিকিটা ভাঙিয়ে ভাড়া দোব। দু'আনায় যতদূর যাওয়া যায়, যাব। সেখান থেকে আবার হাঁটব। হাঁটব, হাঁটব, হাঁটব।

মেয়েটি রুমাল দিয়ে মুখ মুছল জোরে জোরে। কাঁধটা

পিছনে ঠেলে পিঠ মোচড়াল। দুটো আঙুল দিয়ে খসখস করে মাথা চুলকাল। চটির মধ্যে গুঁড়ো-গুঁড়ো মাটি ঢুকেছে তাই পা ঠুকে মাটি ঝাড়ল।

এবার সে মাথা নামিয়ে চলছিল। হঠাৎ চমকে উঠল হর্নের শব্দ শুনে। ফুটপাথ থেকে নেমে ছোট রাস্তাটা পার হচ্ছিল, এমন সময় ট্যাক্সিটা মোড় ফিরেছে। থতমত খেয়ে কেঁপে উঠল মেয়েটি। মুঠো থেকে সিকিটা পড়ে গেল। জোরে হেসে উঠল ট্যাক্সিওয়ালা। ওর পাশের লোকটা গলা বাড়িয়ে কি যেন বলল। সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল।

আমায় দেখে হেসে গেল। আমি দেখতে পাইনি ট্যাক্সিটা। আমার দোষ ছিল। এমন করে বেহুঁশের মতো পথচলা অন্যায়। কিন্তু লোকটা বলল কেন যে, এটা কোলকাতার রাস্তা। কথাটা খুবই সাধারণ, আমি তা জানি। কিন্তু লোকটার বলার মধ্যে কি যেন ছিল। আমার রাগ হচ্ছে, লজ্জা করছে, শরীর জ্বালা করছে। মা আমায় বলেছিল, হারামজাদী, গলায় দড়ি জোটে না? মরগে যা, তা হলে হাড়ে বাতাস লাগবে। সেদিন আমার এই রকম অবস্থা হয়েছিল। তবু রক্ষে, শিবুদার সামনে মা কথাগুলো বলেনি। সেদিন মরার কথা ভেবেছিলুম। সারারাত ঘুমোইনি। শেষরাতে কেঁদেছিলুম। তারপর দিনগুলো কেমন ভাবে যেন কেটে যেতে লাগল। মরা আর হ'ল না।

আজ মরতে পারতুম। ট্যাক্সিওলা যদি চাপা দিত, তা হলে ওর কোন দোষ থাকত না। কিন্তু ও আমায় বাঁচিয়ে দিল। ওর ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তা হলে আমি রাগ করছি কেন! বাঃ, কী সুন্দর সুন্দর রুমাল! একটা কিনব কি? ওই সবুজ পাড়ের দেওয়াটা। কত করে বলল? সাড়ে ছ'আনা। না, কেনা হল না। একটা সিকি মাত্র রয়েছে। তাছাড়া কাজ চালাবার মতো একটা তো রয়েছে। সাড়ে ছ'আনায় কি ভাল রুমাল হয়? ভাল রুমাল ফুটপাথে নয়, দোকানে বিক্রি হয়। সে রুমালের অনেক দাম। মীরা একটা কিনেছে দেড় টাকা দিয়ে। আমি পরে কিনব। শিবুদা বলেছিল, কাপড় কিনে আনব, একটা রুমাল করে দিয়ো। ওর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তা হলে মনে করিয়ে দেব।

প্রতিমা যে ছাপা শাড়ির দোকানের কথা বলে, এইটেই বোধ হয়। এমন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে কি করে! যারা কিনতে আসে পছন্দ করে কি করে! দেখলে সব-ক'টাই তো কিনতে ইচ্ছে করবে। আমায় যদি কেউ পছন্দ করতে বলে তা হলে কোনটি করব? কিন্তু এমন হাঁ করে শাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলে লোকে কি ভাববে! আশ্চর্য, কেউ কিন্তু আমার দিকে তাকাচ্ছে না। বোধহয় ভেবেছে কিনব ব'লে পছন্দ করছি। ট্যাক্সিওলা ঠিক বলেছে, এটা কোলকাতার রাস্তা। কিন্তু আমাদের বাড়িটা কেন রাস্তার মতো হয় না! রাস্তায় মানুষ শুধু চলছে তো চলছেই, অন্যের সম্পর্কে কৌতূহল নেই। এখানে মনের খুশিতে হাঁটা যায়। কেউ চাপ দেবে না, জোর করবে না আমার মনের মধ্যে এখন কী কথা জমা হয়েছে জানবার জন্য। ওরা ব্যস্ত নিজেদের ভাবনা নিয়ে, আমি আছি আমার ভাবনা নিয়ে। ওরা একবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে, তাও সবাই নয়। আমিও দেখছি ওদের, তাও সবাইকে নয়। এমনি ভাবে আমাদের সময়টা, গলিটা, বাড়িটা আমায় মুক্তি দিক না। আমি ভাবব, অনেক অনেক কথা ভাবব। মানুষ যেমন সব সময় চলছে তেমনি আমার ভাবনাগুলোও চলবে। মনের মধ্যে আলো, রঙ, গন্ধ ফুটবে। আমার মন এই সকালটার মতো, রোদ্দুরের মতো, রাস্তার মতো হয়ে যাবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরলেই মা বলবে, এত দেরী হল যে! মা সন্দেহ করে। দুপুরের কলেজে আমায় ভর্তি হতে দেয়নি। তা হলে নাকি আমি নষ্ট হয়ে যাব। বাবা মা'র কথার ওপর কথা বলে না। ভীতু-ভীতু মানুষ আমার ভাল লাগে না। শঙ্করকাকাদের ঝগড়া ভাল লাগে না। ওর ছেলেদের ঘ্যানঘ্যান আর হ্যাংলামি দেখলে রাগ হয়। ভোম্বল দিনরাত আমাদের কলঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। জানলায় দাঁড়ালে, উঠোনে গেলে মা রাগ করে। আমি নড়াচড়া করতে পারি না, আমি হাঁফ ছাড়তে পারি না, আমি সুন্দর হতে পারি না।

এখন ক'টা বাজে? যটাই বাজুক, ঘড়ি দেখব না। আমি এখন হাঁটব। যতদূর রাস্তা গেছে ততদূর হাঁটব। সারি সারি জুতোর দোকান, আমি প্রত্যেকটা দোকানের সামনে দাঁড়াব। প্রত্যেকটা জুতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব। দেরী হয় হোক, আমি দেখব।

জুতোর সঙ্গে দাম লিখে রাখেনা কেন? বাবার সঙ্গে জুতো কিনতে এসে ঠকেছিলুম। দর জানা থাকলে ঢুকতুম না। আমার লজ্জা করেছিল, যখন দোকানি বাবাকে বলেছিল, দরাদরি ফুটপাথে চলে, এখানে এক দাম। বাবা ভেবেছিল চার-পাঁচ টাকাতেই চটি কেনা যায়। শেষকালে রাস্তার দোকান থেকেই চটি কিনেছিলুম। এটা ছিঁড়ে গেছে। বাবা হয়তো আবার ফুটপাথ থেকেই আর একজোড়া

কিনে দেবে। আমায় দাঁড় করিয়ে দোকানির সঙ্গে একঘণ্টা দরাদরি করবে। আমার ভাল লাগে না এমন করে জিনিস কিনতে। আমায় যদি টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে পছন্দমতো নিজেই জুতো কিনতে পারি। কিন্তু আমার পছন্দমতো কিনতে পারব না, বাবা টাকা দেবে না। তাহলে ওই সাদায় জরির-কাজ-করাটা কিনতুম।

লোকটা আমায় ভিতরে এসে জুতো দেখতে বলছে। গিয়ে কি হবে, আমি তো কিনব না। ওর জামার কলার ফেটে গেছে। বোধহয় ওর ছোট বোন নেই, থাকলে কলারটা উল্টে সেলাই করে দিত।

এক জায়গায় আর বেশিক্ষণ দাঁড়ান যাচ্ছে না। রোদ্দুর চড়ছে। জ্বালা করছে শরীর। আমি যদি গাড়ি-বারান্দাটার তলায় দাঁড়াই তাহলে লোকে ভাববে, হয়তো কারুর জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু সত্যিই-তো তা নয়।

এই ষাঁড়গুলো ভয়ানক বিচ্ছিরি। নিরীহের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও শিঙগুলো দেখলে ভয় করে।

লোকটা বাসের জন্য ছুটছে। পারবে কি ধরতে! পেরেছে। একটা ঠাকুর-মন্দির ফেলে এলুম। মনে মনে এখন প্রণাম করলে দোষ হবে না। কী ঠাকুর ছিল? শেতলা, শনি, না রাধাকেষ্ট?

ফুলকপির সিঙাড়া লিখে এমন ভাবে টাঙিয়ে রেখেছে মনে হয় যেন সরস্বতী-পুজো এসে গেছে। রমু বলছিল এবারও পাড়ায় জলসা হবে।

সুলেখার দিদি টাইপ শেখে কি এইখানে? টাইপ জানলে চাকরিতে সুবিধে হয়। কিন্তু শঙ্করকাকাও টাইপ জানে।

হরতালের পোস্টার দিয়েছে। কলেজেও একদিন হয়েছিল। বাবা বলেছিল জোর করে ঢুকবি। নন্দিতাদিরা সিঁড়িতে হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল। ঢুকতে পারিনি শুনে বাবা ভয় পেয়েছিল, বকেছিল।

ভিক্ষে চাইছে। বিচ্ছিরি এদের স্বভাব। মেয়েদের দেখলে আরো বেশি ঘ্যানঘ্যান করে। যদি চায় তো এক পয়সাও দেব না।

চায়নি। বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। ভালই করেছি ওপাশ দিয়ে ঘুরে এসে। ভিখিরীদের তাড়াতে লজ্জা করে, মা কিন্তু খুব সহজে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এইবার রাস্তাটা দেখে পার হতে হবে। রিক্সাটার আগে কি পার হবো? না, ওটা চলে যাক।

আমার মতো নিশ্চয় রাস্তার সব লোক রিক্সাটার দিকে তাকাবে। তাকিয়ে হাসবে। অমন করে আমিও অষ্টমীর রাতে রিক্সায় মা'র কোলে বসে বাড়ি এসেছিলুম। সেদিন রাস্তায় ভিড় ছিল। কেউ হয়তো লক্ষ্য করেনি। করলে হাসত নিশ্চয়। মা বলেছিল একটা গাড়ি করতে। টুকিসোনাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। রমু অনেকক্ষণ জুতোটা হাতে নিয়েছে। মোজা না পরলে নতুন জুতোয় ফোস্কা তো পড়বেই। ভেবেছিলুম বাবা একটা ট্যাক্সি করবে, করেনি। বাড়ি ফিরে দু'আনার জন্য বাবা অনেকক্ষণ রিক্সাওলার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। শেষটায় রিক্সাওলা হেরে গেছল। যাবার সময় যা-তা কথা বলেছিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটারে লেখা থাকে। ঝগড়া হবার কোন উপায় নেই। আমার রিক্সার থেকে ট্যাক্সি ভাল লাগে।

ওখানে লোকগুলো ভিড় করে কি দেখছে! কোলকাতার রাস্তায় অল্পেই ভিড় জমে। একটু জোরে কথা বললেই লোক জড়ো হয়ে যায়। সিনেমার জন্য দেয়ালে ছবি আঁকছে। আমার ছবি-আঁকা দেখতে বেশ লাগে। শিবুদা যেমন করে পেন্সিল দিয়ে ব্লাউজে ফুল এঁকে দিয়েছিল, ঠিক

তেমনি করে দেয়ালে মুখ আঁকা। ওর ওপর রঙ করা হবে। পেন্সিলের মুখ ভরাট হয়ে যাবে। এক-একটা তুলির আঁচড় পড়বে আর অল্প অল্প করে একটা জিনিস তৈরী হবে। কী ভাল লাগত যখন ব্লাউজে ফুলগুলো ফুটে উঠত। আর ফুল ফুটবে না। শিবুদা আর আসবে না। দুপুরবেলায় আমি কি করব? ঘুমোব। চুপ করে শুয়ে শায়া-ব্লাউজ-ওলার ডাক শুনব। উঠোনের এঁটো বাসন কাক কিংবা পায়রা যখন ফেলে দেবে, তখন উঠে গিয়ে দেখে আসতে হবে চোর এসেছে কিনা। আর কি করব দুপুরে, পড়তে বসব। সন্ধ্যেবেলায় শিবুদা ক'দিন পড়িয়েছিল। শিবুদা আসবে না আর, সন্ধ্যেবেলায় কি করব তাহলে।

আমি কি করব কিছু জানি না। এমনি করে কতক্ষণ আর হাঁটব। এই সিনেমা-বাড়িটা আমাদের কলেজের মতো দেখতে। ভেতরে ফটো সাজানো আছে, গিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু দেখে কি করব, এ ছবিটা তো কোনদিনই দেখতে পাব না। বাবা পছন্দ করে না, মা পছন্দ করে না সিনেমা-দেখা। রেবা গল্প করছিল এই বইটার। ও দেখে এসেছে সুব্রতর সঙ্গে। সিনেমায় নামলে নাকি অনেক টাকা পাওয়া যায়। বম্বেতে লাখ টাকা করে দেয়। এত টাকা নিয়ে ওরা কি করে। আমি যদি একখানা বইতে নামি, তাহলে সারাজীবন আর কিছু করতে হবে না। অত টাকা নিয়ে আমি কি করব। জমিয়ে রাখব? বাবা টাকা জমায়, বাবা ভীতু হয়ে গেছে। আমি জমাব না। ঝি রাখব বাসন মাজার জন্য। পূরবীর বাবা চাকর নিয়ে বাজার যায়, পাঁচ টাকার বাজার করে। ফুলু-মাসির বিয়েতে মা একটা রুপোর সিঁদুর-কৌটো দিয়েছে; পূরবীর ঘড়িটা, জন্মদিনে ওর মাসিমা দিয়েছে। ও যদি জন্মদিনে আমায় নেমন্তন্ন করে তাহলে অনেক দামি জিনিস দোব। আর কি করব? এই গলি থেকে উঠে যাব। সুন্দর একটা বাড়ি ভাড়া নোব। ছাদে ওঠা যাবে। মা বসে বসে শুধু বড়ি দেবে। রমুকে বিলেত পাঠাব। রমু রবার-দেওয়া একটা পেন্সিল চেয়ে ধমক খেয়েছে বাবার কাছে। ওকে শেফার্স কিনে দোব। ছাপা-শাড়ির দোকানটায় একদিন যাব। উলের দোকানে গিয়ে যত খুশি ঘাঁটব।

সিনেমার ডিরেক্টাররা কি কালো চশমা পরে? জুলফি রাখে না? সাদা প্যান্ট পরে? সাদা জুতো পরে? রেবা বলেছিল ওরা নাকি খুব বাবুগিরি করে, খুব সিগারেট খায়। ও লোকটা কি সিনেমা-ডিরেক্টার? যদি ও এসে বলে আপনার নাম কি, বাড়ির ঠিকানা কি, আমি একটা বই তুলব, আপনি নামবেন? তাহলে কি বলব। রেবা বলেছিল কাকে যেন এমনি করে রাস্তা থেকে নিয়ে গেছল বইতে নামাবার জন্য। সে এখন তিনখানা গাড়ি কিনেছে। রেবা গাড়ির নম্বর পর্যন্ত জানে। কিন্তু লোকটা এসে যদি জিগ্যেস করে, তাহলে কি বলব।

লোকটা আমায় দেখতে পায়নি। ওর পাশ দিয়ে যদি আমি হাঁটতে থাকি, আর হাঁটবার সময় সিকিটা ফেলে দিই। নিশ্চয় ও সিকিটা কুড়িয়ে দেবে, তখন আমার দিকে তাকাবে। তাকিয়ে অবাক হয়ে যাবে। কিছু একটা ভাববে। তারপরে আমায় বলবে। আমি জানি কি বলবে, তখন আমি কি বলব।

হঠাৎ মেয়েটি জোরে হাঁটতে শুরু করল। গগল্‌স-পরা লোকটি ফুটপাথের ভিড় এড়াবার জন্য রাস্তায় নামল। মেয়েটিও রাস্তায় নামল। ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোক রাস্তা খুঁড়ছে। লোকটি আবার ফুটপাথে উঠল, মেয়েটিও উঠল। কিন্তু ওদের ব্যবধান বেশি কমল না।

ফুটপাথের অর্ধেক জুড়ে ফেরিওলারা বসেছে। চলবার রাস্তাটা সরু হয়ে গেছে। মেয়েটি কয়েকজনকে ধাক্কা দিল। তারা মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল। মেয়েটি কিছুই ভ্রূক্ষেপ করল না। জোরে, আরো জোরে সে হাঁটতে লাগল।

ওদের ব্যবধান কমে এসেছে। লোকটিকে প্রায় ধরে ফেলেছে। হাতের মুঠো খুলে সিকিটা একবার দেখল। তারপর হাতটা একটু দোলাল। আর সেই সময়েই মেয়েটির চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল।

আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা চলে যাচ্ছে। যেমন ভাবে হাঁটছিল, এখনো ঠিক তেমনি ভাবেই হেঁটে যাচ্ছে। ও কি সত্যই সিনেমার ডিরেক্টার? আমি তো ভুল করতে পারি। কেন, কেন এমন ভুল হল। এখন চটিটা সারাতে হবে।

কোথায় মুচি? ও-ফুটে লোকটা বসে, ও কে? না, একটা পুরনো বইওলা। ও-ধারের লোকটা কে? নাপিত। আশ্চর্য, মুচি কেন নেই? আর একটু এগিয়ে গেলে হয়তো পাব।

রাস্তার লোক এইবার তাকাচ্ছে আমার দিকে। ওরা কি ভাবছে? বুঝতে পেরেছে আমার বিপদটা। কেউ হাসছে না তো।

কি বলল বুড়ো ভদ্রলোক? মুচি খুঁজছি কিনা। নিশ্চয়। ওই কোণের দিকটায় পাব?

বুড়ো চলে গেল অথচ ধন্যবাদ দিলুম না। ধন্যবাদ কথাটা বলতে কেমন লজ্জা করে। কোনদিন তো বলা অভ্যেস নেই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি, আর সব লোক কত জোরে হেঁটে চলেছে। লোকটাকে ধরার জন্য যদি অত জোরে না হাঁটতুম তাহলে চটি ছিঁড়ত না। কেন আমি জোরে হাঁটতে গেলুম? কেন আমার মনে অনেক টাকার জন্য লোভ তৈরী হল। এত, এত মানুষ আগের থেকেও যেন জোরে ছুটে চলেছে। সত্যিই কি চলেছে, না আমি আগের থেকে আস্তে হাঁটছি বলে এমন মনে হচ্ছে! চাঁদ একজায়গাতেই থাকে, মেঘগুলো ভেসে যায় বলেই মনে হয় চাঁদটাও ভেসে যাচ্ছে।

এই তো একটা মুচি!

মেয়েটি একপাটি চটি খুলে দিল। কোন কথা না-বলে মুচি তুলে নিল চটিটা। চামড়া কেটে সেলাই করে সে পেরেক বসাল। তারপর মেয়েটির পায়ের কাছে এগিয়ে দিল।

মেয়েটির হাতের মুঠোয় সিকি ছিল। মুচির হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাকি পয়সার জন্য।

মুচি সিকিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ফুটপাথে বাজাল, তারপর হাতের তালুতে ঘষে ফিরিয়ে দিল।

অস্ফুট শব্দ করে মেয়েটি নিজের তালুতে সিকিটা ঘষল। কালো-কালো দাগ ফুটল। তারপর তাকিয়ে রইল সে মুচির মুখের দিকে। মুচি হাসল। হেসে হাত নেড়ে ওকে চলে যেতে বলে নতুন কাজে মন দিল।

আমার দেরী হয়ে গেছে বাড়ি ফিরতে। মা আজ অনেক কথা শোনাবে, দেরীর কারণ জানতে চাইবে। তখন আমি কি বলব! আমি জানি না, আমি জানি না।

বাড়ি থেকে অনেকদূর চলে এসেছি। এখন অনেক পথ আমায় চলতে হবে। আমায় জোরে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হবে।

আমি ঠকে গেছি। এই আকাশ, আলো, রোদ্দুরের রঙ ঘষা সীসের মতো হয়ে যাচ্ছে। কী দরকার ছিল এই সকালটায় আমাকে ভোলাবার?

আমি কি পেলুম, কি পেলুম এই হাঁটার মধ্য দিয়ে? আনন্দ পেলুম, কতটুকু পেলুম, কতক্ষণের জন্য পেলুম? কেন এই সকালের মতো মন আমার সারাক্ষণ রইল না?

এই আকাশটা আমায় ঠকিয়েছে। পরশু টুকিসোনার দুধ কেটে গেছল। কাটা-ছেঁড়া মেঘ আকাশে বেড়াচ্ছে। মা বকেছিল আমায়। সেদিন টুকিসোনা দুধ খেতে পায়নি। আমার বিচ্ছিরি লাগছিল।

আমার বিচ্ছিরি লাগছে এই রোদ্দুর। সকালের সেই মিষ্টিভাবটা আর নেই। আশ্চর্য, সকালটাই তো আর নেই! বেলা বেড়ে গেছে, ক'টা বাজে এখন? বাবা অফিস চলে গেছে। রমু ইস্কুল চলে গেছে। তপু এক্কা-দোক্কা খেলছে। টুকিসোনা হয়তো মাটি থেকে কুড়িয়ে কিছু-একটা খাচ্ছে।

আমার দেরী হয়ে গেছে। আমায় এখন ছুটে বাড়ি পৌঁছতে হবে। এই সকালটা আমায় ভুলিয়ে অনেকদূর নিয়ে এসেছে। মুচিটা খুব ভালো লোক। ওকে কাল পয়সা শোধ করে দোব।

কিন্তু এই রাস্তাটা দিয়েই আমায় আসতে হবে। সুন্দর সকাল, রোদ্দুর, দোকান, মানুষ, গাড়ি আমায় ভোলাবে। আমি নিজেকে ভুলে যাব। তারপর হঠাৎ মনে পড়বে বাড়ি ফিরতে হবে। কেন, কেন এমন হয়! কেন আমাদের বাড়িটা এই সকালের রাস্তার মতো হয় না! আমি আসব না। মুচিটা আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে, করুক। আমি আর আসব না।

আমি এখন খুব জোরে হাঁটছি। কিন্তু কত জোরে? সকালটা আমায় ছাড়িয়ে দুপুরের দিকে চলেছে। আমি পিছিয়ে গেছি কি? দুপুরটা বিকেল হবে, বিকেলটা রাত্তির হবে। দিনটা শেষ হবে ঠিক একটা মানুষের জীবনের মতো। আমার কি হবে? আমি কোথায়, কেমন করে শেষ হব? এই রোদ্দুরের জ্বালা কতক্ষণে জুড়োবে। জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।

মাথায় ঝাঁকুনি দিল না, হাত দোলাল না—শুধু মাথা নামিয়ে মেয়েটি প্রায় ছুটে চলল।

একবার হঠাৎ সে দাঁড়াল। মুখ তুলল আকাশে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। ফুটপাথের ধারের নর্দমায় সিকিটা আলতো করে ফেলে দিল।

তার পর মেয়েটি আবার প্রায় ছুটে চলল।

মহাদ্বীপের কাহিনী

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

মহাদ্বীপের অনেক কাহিনী আছে; তাদেরই একটি আজ বলছি।

কিন্তু তার আগে মহাদ্বীপ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মহাদ্বীপ দ্বীপও বটে, মহাও বটে, এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেনা এমন লোক বেশি নেই। দু-চারজন আছে, তাদের কেউ গ্রাহ্য করে না। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভৌগোলিকের বিভিন্ন মত। কেউ বলেন, কোনো এক সুদূর অতীতে জলের উপর ভেসে উঠেছিল মহাদ্বীপ; সেই সুদূর কতদূর তা নিয়ে অনেক মন-কষাকষি হয়ে গেছে। কেউ বলেন, জলের বুকে মহাদ্বীপ জেগেছিল এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক; প্রকৃতপক্ষে এখন যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড মহাদ্বীপ রূপে জলবক্ষে বিরাজমান, এককালে তা মহাভূখণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত ছিল, তারপর জলের তলায় গিয়েছিল তার চারিদিকের ডাঙা তলিয়ে। এই তলিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কখন এবং কেমন করে ঘটেছিল, তাই নিয়ে বহু গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হচ্ছেও।

ক্ষুদ্র ভূখণ্ড 'মহা' কেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। তাতে কাহিনী পিছিয়ে যাবে; সুতরাং কাহিনীই শুরু করি।

কম্বুরাজ্যের যুবরাজ যখন হঠাৎ অসুখে পড়ে দ্রুতবেগে মুমূর্ষু হয়ে উঠলেন, তখন পরম চিন্তিত হয়ে কম্বুরাজ বললেন, "মন্ত্রী!"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ!"

কম্বুরাজ বললেন, "এখন কর্তব্য কি?"

মন্ত্রী বললেন, "কম্বুরাজকুমারকে অবিলম্বে মহাদ্বীপে প্রেরণ করা, যেন তাঁর শেষনিশ্বাস মহাদ্বীপেই পরিত্যক্ত হয়। তা না হলে জম্বুরাজ্যের কাছে কম্বুরাজ্যের মাথা চিরদিন হেঁট হয়ে থাকবে।"

শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করে কম্বুরাজ বললেন, "এ কথার অর্থ?"

মন্ত্রী সসম্ভ্রমে মাথা নত করে বললেন, "মহারাজ সম্ভবত জানেন, জম্বুরাজ্যের রাজকুমারেরও—বিধাতার কি বিচিত্র বিধান, কি বিস্ময়কর যোগাযোগ!—এখন প্রায় অন্তিম অবস্থা। যে-কোনও মুহূর্তে পটল তুলতে পারেন। সে রাজ্যের সেরা সেরা বদ্যিরা একযোগে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে রাজকুমারকে পাঠানো হয়েছে মহাদ্বীপে। মহাদ্বীপের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে দক্ষিণ-তীর্থ নামে যে মহাব্যয়সাপেক্ষ হোটেল, সেটি সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে দখল করে আছেন জম্বুরাজকুমার। বাতায়ন থেকে তিনি সমুদ্র দেখছেন আর অন্তিম লগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। হোটেল-ভাড়া দিচ্ছেন দৈনিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। তার ওপর অন্যান্য খরচা তো আছেই। ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে ব্যয়-সাপেক্ষ স্থান এই মহাদ্বীপ।"

কম্বুরাজ শুধালেন, "তাতে জম্বুরাজ্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে কেন মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, ঈশ্বর না করুন, আমাদের যুবরাজ যদি কম্বুরাজ্যেই চক্ষু বোজেন, আর জম্বু-যুবরাজ মহা কাপ্তানী করে দুনিয়ার পয়লা-নম্বর খরুচে জায়গা মহাদ্বীপে দৈনিক দু-হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভাড়ার হোটেলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহলে বিশ্বভুবনের কাছে আমরা মুখ দেখাব কেমন করে? নিখিল বিশ্ব কি বলবে না আমরা রাম-কিপ্‌টে দিল্‌-চৌবাচ্চা; দরিয়া হবার মতো দিল্ আমাদের নেই। যা আছে জম্বুরাজ্যের? মহারাজ, মহাদ্বীপের

উত্তর সমুদ্রতীরে উত্তর-তীর্থ নামে যে হোটেল আছে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটি অবিলম্বে ভাড়া নিয়ে সেখানে আমাদের যুবরাজকে পাঠানো। জম্বুরাজ্য হোটেল-ভাড়া দিচ্ছে দৈনিক দু-হাজার স্বর্ণমুদ্রা; আমরা দেবো আড়াই হাজার। জম্বুরাজকুমারের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ গেছে সবসুদ্ধ একশো ছাপ্পান্ন; আমাদের যুবরাজের সঙ্গে যাবে দুশো ছাপ্পান্ন। মানে, জম্বুরাজ্যের ওপর সবরকমে টেক্কা দিতে হবে; জম্বুবানদের কাছে মান খোয়ানো কোনোমতেই চলবে না।"

শুনে কম্বুরাজের ললাটের ওপর চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি ভেবে দেখলেন মন্ত্রী যা বলেছেন তা যথার্থ। কম্বুরাজ্যের সঙ্গে জম্বুরাজ্যের খোলাখুলি কোনো ঝগড়া নেই, কিন্তু বরাবরই কম্বুরাজ্যের ওপর টেক্কা মারবার দিকে জম্বুরাজ্যের আপ্রাণ চেষ্টা। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে গত তিনবছরে জম্বুরাজ্যের লোকসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটেছে, কম্বুরাজ্যের লোক তার সিকিভাগও বাড়েনি। মহাপ্রাচ্য ভোজন-প্রতিযোগিতায় জম্বুরাজ্যের প্রতিনিধি কম্বুরাজ্যের প্রতিনিধির চাইতে পঁয়তাল্লিশখানা (!!!) বেশী লুচি খেয়ে চ্যাম্পিঅন পদক পেয়েছিল, সে পরাজয়ের ব্যথা কম্বুরাজ্য আজও ভুলতে পারেনি। এ ছাড়া আরো বহু বিচিত্র রকমে কম্বুরাজ্যের ওপর টেক্কা মেরেছে জম্বুরাজ্য। সেই'রকম'-গুলো একে একে মনে পড়তে লাগল কম্বুরাজের।

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আমি সন্দেহ করি জম্বুরাজ্যের কাছে কম্বুরাজ্যের মাথা হেঁট করাবার মতলবেই বিধাতা একই সময়ে ওদের আর আমাদের যুবরাজকে মরো-মরো বানিয়েছেন। আমাদের জব্দ করবার জন্যেই জম্বু-যুবরাজকে তিনি ধাঁ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন মহাদ্বীপে স্বর্ণমুদ্রার ছিনিমিনি খেলতে। ছিনিমিনি খেলতে আমরাও জানি, এইটে বেশ ফলাও করে দেখাতেই হবে, মহারাজ। বিধাতাকে জব্দ করতেই হবে, খরচার ভয় পেলে চলবে না।"

মহারাজ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু অত লম্বা টান সামলাবার মুরোদ কি কম্বুরাজ্যের রাজকোষের আছে মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এ তো প্রবাদেই বলে, আমি আর নতুন করে কি বলব? রাজকোষে বাড়ন্ত হলে নতুন ট্যাক্‌সো বসাতে হবে।"

"কিন্তু প্রজারা…" বলতে গেলেন কম্বুরাজ।

"এম্নিতে তারা বাবা না বললে তখন গুঁতোর চোটে বলাতে হবে, মহারাজ। জম্বুরাজ্যের কাছে মাথা হেঁট করা কোনোমতেই চলবে না।

কম্বুরাজ ভেবে বললেন, "যথার্থ বলেছ, মন্ত্রী।"

*

মহাদ্বীপের উত্তর সমুদ্রতীরে উত্তর-তীর্থ হোটেলে এসেছেন কম্বুরাজ্যের মুমূর্ষু রাজপুত্র। সঙ্গে দুশো-ছাপ্পান্ন-জন সাঙ্গোপাঙ্গ। তার ভেতর আছেন স্বয়ং মন্ত্রী; তিনি এসেছেন যেমন করে হোক বিধাতাকে জব্দ করে কম্বুরাজ্যের মান রাখতে। মহাদ্বীপের আনাচে কানাচে, হাটে বাটে মাঠে সবাই জেনেছে কম্বুরাজকুমার হোটেল-ভাড়া দিচ্ছেন জম্বুরাজকুমারের চাইতে দৈনিক পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা বেশী, আর কম্বুরাজকুমারের সাঙ্গোপাঙ্গের সংখ্যা থেকে জম্বুরাজ-কুমারের সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা বাদ দিলে হয় একশো। এ খবরের হাওয়া পৌঁছেছে দক্ষিণ-তীর্থে, সাড়া জেগেছে জম্বুরাজকুমারের সাঙ্গোপাঙ্গ-মহলে। জম্বুরাজ্যের মহা-অমাত্য (যুবরাজের সঙ্গে এসেছেন তিনি, আমার কাহিনীর শ্রোতারা হয়তো আগেই আন্দাজ করে নিয়েছেন) বলেছেন, "আচ্ছা।" অর্থাৎ যেমন করে হোক এর পাণ্টা জবাব দিতে হবে কম্বুরাজ্যের দলকে।

মহাদ্বীপের ইতিহাসে এমন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আর কখনো উপস্থিত হয়নি। দ্বীপসুদ্ধ সবাই পরম উত্তেজনার সঙ্গে অনুভব করছে বিধাতা স্বয়ং এই মহাদ্বীপের রঙ্গমঞ্চে এক অসাধারণ তামাশা দেখবার আর দেখাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন। দুনিয়ার সেরা সেরা ধনকুবের এবং কাপ্তানের দল শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে আসেন এই মহাদ্বীপে, কিন্তু অন্তিম আড়ম্বরের এমন এলাহি লড়াই এই প্রথম। সারা মহাদ্বীপ জুড়ে কৌতূহল আর উত্তেজনার সাড়া জাগল।

দক্ষিণ-তীর্থে জম্বুরাজকুমার মরো-মরো, আর উত্তর-তীর্থে মরো-মরো কম্বুরাজকুমার। যে-কোনো মুহূর্ত যে-কোনো রাজকুমারের শেষমুহূর্ত হতে পারে। দুজনেরি জীবন-প্রদীপের তেল দ্রুতবেগে ফুরিয়ে আসছে। নতুন তেল দেবার ক্ষমতা রাজবৈদ্যের আর নেই।

পরলোক-ভারতীর দূরভাষণ-যন্ত্রে সহসা আহ্বান-ধ্বনি জাগল। প্রধান পরিচালক দূরভাষণীর শ্রবণী কানে লাগিয়ে বললেন, "অহো! পরলোক-ভারতীর প্রধান পরিচালক বলছি। আপনি? দক্ষিণ-তীর্থ থেকে জম্বুরাজকুমারের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক বলছেন ????? বিনীত দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। কি আজ্ঞা হয়? জম্বুযুবরাজের অন্তিম আসন্ন? মহামূল্য অতুলনীয় শবাধার চান? কি আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন, সম্পূর্ণ চন্দনকাষ্ঠের তৈরী একটি অপূর্ব শবাধার সংগ্রহ করেছি, তার ওপর আগাগোড়া বহু বিচিত্র নক্‌শা

খোদাই করে দিয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ-ভাস্কর দারুকেশ্বর শর্মা। খোদাই শেষ করেই তিনি বিগত হয়েছেন, সুতরাং এই শবাধারের জুড়ি আর কখনো মিলবে না। এ অমূল্য।"

দক্ষিণ-তীর্থ থেকে দূরভাষণ-পথে কী বাণী এলো তা ভালো করে বুঝবার আগেই সহসা—বোধ করি কোনো-রকম যান্ত্রিক গোলযোগের ফলেই—যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরলোক-ভারতীর প্রধান পরিচালক বারকয়েক যথারীতি "অহো! অহো!" করলেন। সাড়া পেলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে দূরভাষণ-যন্ত্রে বাণী এল উত্তর-তীর্থ থেকে। বাণী দিলেন কম্বুরাজ্যের মন্ত্রী। অদ্বিতীয় শিল্পীর ভাস্কর্য-সমন্বিত চন্দনকাঠের শবাধারটির কথা শুনে তিনি হুকুম করলেন, "ওটি আমার নিশ্চয়ই চাই।...না না, কিন্তু-টিন্তু নয়। যত স্বর্ণমুদ্রা চায় পরলোক-ভারতী, দেবো। ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্ শবাধারটি কম্বুযুবরাজের জন্যে চাই-ই। ওটিকে ভালো মতন সাজিয়ে-গুজিয়ে পরিষ্কার করে মজুদ রাখুন।"

"কিন্তু ওটার যে আরেকজন খদ্দের—"

"আরো দু-হাজার যাক্, দু-লাখ যাক্, কুছ্ পরোয়া নেই। যে ওর জন্যে যত দাম দিতে চাইবে আমরা তার চাইতে একশো স্বর্ণমুদ্রা বেশী দেব।"

দো-টানায় পড়ে গেল পরলোক-ভারতী। জরুরী গোপন-সভা বসল পরলোক-ভারতীর পরিচালক-মণ্ডলীর। সভার মীমাংসা অনুসারে পরলোক-ভারতীর পরিচালক একই সঙ্গে দক্ষিণ-তীর্থে এবং উত্তর-তীর্থে পরম বিনীত বাণী প্রেরণ করলেন: "কম্বুরাজ্য এবং জম্বুরাজ্য—উভয় রাজ্যই মহাদ্বীপের সমান প্রিয় বন্ধুরাষ্ট্র। দুজনের কাহাকেও ক্ষুণ্ণ, খর্ব বা অপদস্থ করা মহাদ্বীপের আদি ও একমাত্র এহেন প্রতিষ্ঠান পরলোক-ভারতীর পক্ষে সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নহে। অথচ একটিমাত্র শাবাধার দুই যুবরাজকে দেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং দুই যুবরাজের মধ্যে যিনি আগে পটল তুলিবেন, শবাধারটির প্রাপক তিনিই হইবেন।"

এ মীমাংসা পরম যুক্তিপূর্ণ। দু-পক্ষই মেনে নিলেন।

*

কাহিনীর বাকী অংশটুকু যেমন দ্রুত তেমনি করুণ, লিখতে কলম অগ্রসর হতে চায় না, দু-চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে।

কম্বুরাজ্যের মন্ত্রী 'উত্তর-তীর্থ' হোটেলের একটি নিভৃত কক্ষে যুবরাজের বৈদ্য উপগুপ্তকে বললেন, "বৈদ্যবর, আপনাদের চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে যুবরাজের আর কতকাল বাঁচবার সম্ভাবনা আছে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে?"

উপগুপ্ত লম্বা একফালি কাগজ বার করে দেখিয়ে বললেন, "মন্ত্রিবর! যুবরাজের শোণিতবিন্দু, পুরীষ, নিষ্ঠীবন, হৃৎযন্ত্র ইত্যাদি পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হয়েছে, যুবরাজ গ্রহণীমিশ্রিত মহাহলীমক রোগের চরম অবস্থায় উপনীত। মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু এ-রোগের একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, সে অনুসারে নিশ্চিত বলা যায় আসন্ন পূর্ণিমা-রজনীর আগে যুবরাজের শেষনিশ্বাস পতন অসম্ভব। এবং পূর্ণিমা-রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের জীবন-দীপ-নির্বাপণ কেউ রোধ করতে পারবে না।"

মন্ত্রী বললেন, "পূর্ণিমার এখনো দু'দিন বাকী। ওদিকে দক্ষিণ-তীর্থে জম্বুযুবরাজ হয়তো আজকের দিনটাও টিকবে না। তার আগেই আমাদের যুবরাজ পটল না তুললে অতুলনীয় শবাধারটি ফস্‌কে যাবে। তাই বলি, দু'দিন বাদে যে মরবেই, সে এই মুহূর্তে মরলে কি ক্ষতি, যখন তার আশু মৃত্যুতে কম্বুরাজ্যের এতবড় গৌরব? আপনি আপনার সূচিকাভরণ-যন্ত্রে আপনার সেই অমোঘ অন্তিম দাওয়াইটি অবিলম্বে গোপনে যুবরাজের দেহে প্রবিষ্ট করে দিন, যাতে..."

বৈদ্য উপগুপ্ত শিহরিত হলেন। কিন্তু মন্ত্রীর কঠোর আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। সাহসও ছিল না, উপায়ও ছিল না। তা ছাড়া ভেবে দেখলেন সেই যখন দু'দিন বাদে মরবেনই যুবরাজ, তখন জম্বুরাজ্যকে জব্দ

ক'রে আগে মরাই ভালো। তখন গোপনে তিনি সূচিকা-ভরণ-যন্ত্রে যা করবার তা করলেন, এবং ফলে যা হবার তা হলো। সেইদিন দ্বিপ্রহরেই বেতারযন্ত্রে বিশ্বময় ঘোষিত হল কম্বুরাজ্যের যুবরাজ সহসা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অনন্তধামে যাত্রা করেছেন।

মহা ধুমধামের সঙ্গে বিরাট শোভাযাত্রা করে চন্দন-কাষ্ঠের সেই অতুলনীয় শবাধারটি দক্ষিণ-তীর্থের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে উত্তর-তীর্থে আনা হল। সেই শবাধারে শয়ন করে কম্বুরাজ্যের ৺যুবরাজ যাবেন মহাদ্বীপের মহাসমাধি-ক্ষেত্রে। দক্ষিণ-তীর্থে সে সংবাদ শ্রবণ করে পরাজয়ের গ্লানিতে জম্বুযুবরাজও সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে মারা গেলেন। কিন্তু হায়! মিনিট পনেরো আগে মারা গেলেও পরাজয়ের এ গ্লানি তাঁকে সইতে হত না।...

ঠিক সেইক্ষণে দূর-বার্তা এলো কম্বুরাজ্যের রাজপ্রাসাদ থেকে। রাজ্যের প্রধান ভিষগাচার্যের বার্তা। তিনি জানিয়েছেন, "যুবরাজের রোগ-নির্ণয়ে একটি মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। যুবরাজের ব্যাধিতে গ্রহণী বা হলীমকের আভাসমাত্র নাই। অচিরে মৃত্যুরও কোনো সম্ভাবনা নাই। যুবরাজ দীর্ঘায়ু হইয়া আরও বহুদিন কম্বুরাজ্যবাসিগণের আনন্দ বিধান করিবেন। অন্যান্য সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া যুবরাজকে অজাদুগ্ধ অল্পমাত্রায় সেবন করাইতে থাকো। তাহা হইলেই সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন।"

মন্ত্রী ফেরত ডাকেই দূর-বার্তা পাঠালেন। জানালেন, অজাদুগ্ধ যুবরাজকে সেবন করানো আর সম্ভব নয়; কম্বুরাজ্যকে বিজয়গৌরব দিয়ে যুবরাজ অনন্তধামে রওনা হয়ে গেছেন।

চুপি চুপি আসে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কার্তিকের মাঝামাঝি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে নাগাড়ে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়ে একেবারে শীতের কাঁপুনি যেন ধরিয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

কালো রঙের মিলিটারি গোছের ওয়াটারপ্রুফে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে একটি লোক গিরি মাঝি লেনের একটি বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ল। মাথায় গাল পর্যন্ত ঢাকা বর্ষাতি টুপিতে মুখের অধিকাংশ আড়াল, তার ওপরে আবার চোখে কালো রঙের গগ্‌ল্‌স্। এই মেঘলা সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখে গগ্‌ল্‌স্ কেউ সাধ করে পরে, ভাবা শক্ত।

ভেতরে কলতলায় বাসন-কোসন নাড়ারই যেন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কারুর দরজা খোলবার নাম নেই।

লোকটি আবার সজোরে কড়া নাড়লে।

এবার ভেতর থেকে গজগজানি শোনা গেল। —"ভালো জ্বালা হয়েছে আমার। সারাক্ষণ শুধু ঘটর ঘটর কড়া নাড়ার আর কামাই নেই। দরজা খোলো আর দরজা বন্ধ করো।"

ওপর থেকে বর্ষীয়সী কোন মহিলার বিরক্ত গলাও শোনা গেল,—"ও হরির মা! বাইরে কে নড়া নাড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না? দরজাটা কি আমি খুলে দেব!"

"দিচ্ছি গো: দিচ্ছি! আর তো কাজকম্মো নেই,—দরজা খুলতে বন্ধ করতেই ত আছি।"

হরির মা বিরক্ত মুখে এসে দরজাটা খুলে একটু বুঝি চমকেই গেল। ঠিক এই চেহারা দেখবার আশা সে নিশ্চয় করেনি।

গলার ঝঙ্কার তাই একটু মৃদুই শোনাল,—"কাকে চাই গা?"

"মোক্ষদা ঠাকরুন আছেন?"—লোকটি ধরা গলায় প্রায় যেন চুপিচুপিই জিজ্ঞাসা করলে।

"আছেন! ওই ওপরে উঠে বাঁ দিকের ঘর।"—ব'লে হরির মা আর সময় নষ্ট না করে তার কাজে গেল।

বাসন মাজা উনুন ধরানো সব শেষ করে ঘরে যাবার জন্যে যখন সে তৈরী তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে বেশ রাত হয়েছে।

নিত্যকার নিয়মমত সে নিচে থেকে হাঁক দিলে,—"আমি চন্দু গো দিদি-ঠাকরুন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও।"

ওপর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এমন অনেকদিনই যায় না, সুতরাং হরির মার তাতে ভাবনা করবার কিছু নেই। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিট্‌পিটে বৃষ্টিতে মাথায় আঁচলটা ঢাকা দিয়ে সে চলে গেল।

সে দরজা সারারাত যে আর বন্ধ হবে না তা সে জানবে কি করে?

জানলে অচেনা লোকটাকে হয়ত আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করত।

থানার দারোগা সাহেব মিঃ চৌধুরী সেই কথাই জিজ্ঞাসা

করছিলেন তাঁর কামরায় বসে,—"লোকটাকে আপনারা ভালো করে লক্ষ্যও করেন নি ?"

দারোগা সাহেবের চেয়ারের পাশে সার্জেণ্ট গুপ্ত সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে। সামনের দুটি চেয়ারে যে দুজন বসে—তাঁদের চেহারা পোশাকে সাধারণ কেরানী বলে মনে হয় না। আপাততঃ হাতে ধরে রাখা সোলার টুপি ও শার্ট হাফপ্যাণ্ট জুতো থেকে বোঝা যায় চেয়ারে বসে কাজ তাঁদের অল্পই করতে হয়।

"আজ্ঞে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেও ত পারতাম না।" —মাথার টাকে ও কাঁচা পাকা গোঁফে যাঁর প্রবীণতা পরিস্ফুট তিনিই বলেন,—"বৃষ্টি পড়ছে ঝুপঝুপ করে, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তার ওপর প্রায় সর্বাঙ্গই তার ওয়াটারপ্রুফ আর বর্ষাতি টুপিতে ঢাকা। চোখের গগ্‌লস্‌টাই যা একটু অদ্ভুত লেগেছিল—না রাধেশ ?"

রাধেশের বয়স অল্প, রোগা পাকানো চেহারা। তারও পরনে থাকি হাফ্‌প্যাণ্ট ও শার্ট, কিন্তু এমন ঝলঝলে যে মনে হয় যেন কারুর কাছ থেকে ধার করে আনা। থানায় এসে একটু যে ঘাবড়ে গেছে তা তার ঘন ঘন ঢোক গেলা থেকেই বোঝা যায়।

প্রশ্নটার চট করে জবাব সে দিতে পারে না। 'আজ্ঞে হ্যাঁ!' শব্দটা বার করতেই তার ঢোক গেলার সঙ্গে কণ্ঠার ঠেলে-ওঠা ডেলাটা দু'তিন বার ওঠা-নামা করে।

মিঃ চৌধুরী ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছেন যে এঁদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দিলে সমস্ত কাহিনী টেনে বার করতে ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। সাক্ষাৎকারটা তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করবার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাটার যেটুকু জানা গেছে দু'কথায় তার বিবরণ দিয়ে আসল প্রশ্নে গিয়ে ওঠেন।

"—আচ্ছা ব্যাপারটা তাহলে এই। আপনারা বিনয় সরকার স্ট্রীট আর গিরি মাঝি লেনের মোড়ে ইলেকট্রিক লাইনটা মেরামত করছিলেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখেন যে দেশলাই-এর কাঠি নেই…"

মিঃ চৌধুরীর বিবরণ সংক্ষেপ করা আর হয়ে উঠল না।

প্রবীণ ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন,—"রাধেশের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে দেখি তারও একটি কাঠি মাত্র সম্বল। বৃষ্টিতে এমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে যে ধরানই গেল না। ঠিক তখন ওয়াটারপ্রুফ-ঢাকা এক ভদ্রলোক গিরি মাঝি লেন থেকে বেরিয়ে আসছেন। গায়ে যখন ওরকম দামী ওয়াটারপ্রুফ তখন তাঁর পকেটে একটা দেশলাই থাকবে না হতে পারে! আমাদের পাশ দিয়েই ভদ্রলোক শিস দিতে দিতে যাচ্ছেন, আমি তখন…"

মিঃ চৌধুরী এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দিয়ে বললেন,—"থামুন থামুন! ঘটনাটা সবই আমাদের জানা আছে। আপনি দেশলাই চাইতে তিনি দেশলাই বার করে দিলেন। আপনি সিগারেট ধরিয়ে তাঁকে ফেরত দিতে গিয়ে দেখেন, দেশলাই না নিয়েই তিনি চলে গেছেন। বৃষ্টি আর সন্ধ্যার অন্ধকারের দরুন আপনারা তাঁর গায়ের ওয়াটারপ্রুফ, মাথা-ঢাকা টুপি আর চোখের গগ্‌লস্‌ ছাড়া কিছু লক্ষ্য করেন নি…"

"লক্ষ্য করবার কথা যে মনেই হয়নি ছাই!"—টাক-মাথা ভদ্রলোককে আর বুঝি থামান যাবে না।—"দেশলাই পেয়েই তখন বর্তে গেছি। সিগারেট ধরাতে গিয়ে নজর ত আর তাঁর দিকে নেই। তিনি যে দেশলাইটা ফেলেই চলে যাবেন ভাবতেই পারিনি। তখন এই রাধেশটাও যদি একবার বলে…"

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন,—"রাধেশই বা জানবে কি করে বলুন যে লোকটির চেহারাটা লক্ষ্য করা দরকার। শুনুন—চেহারা আপনারা লক্ষ্য করেন নি যখন, তখন তার আর চারা নেই। কিন্তু লোকটি কি শিস দিতে দিতে যাচ্ছিল কিছু মনে আছে ? কোন সুর-টুর কি… ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাঁড়ান দাঁড়ান!"—টাক-মাথা চুলকে ভদ্রলোক বলেন, "খুব একটা চেনা সুর! কি বলে একটা ফিল্মের গানই হবে যেন। কি হে রাধেশ, মনে পড়ছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—রাধেশ যেন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে স্বীকার করে।

মিঃ চৌধুরী ও সার্জেণ্ট গুপ্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। টাক-মাথা ভদ্রলোক আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে মিঃ চৌধুরী রাধেশকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি সুর আপনার মনে আছে ?"

রাধেশ বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে হঠাৎ একনিঃশ্বাসে বলে ফেলে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সুর সবাই জানে।"

"সবাই জানে মানে!"—মিঃ চৌধুরী অবাক।

"আজ্ঞে, 'মনের মানুষ' ছবির গানের সুর কি-না! ও গান কে না শুনেছে!"—রাধেশ এতক্ষণে একটু সহজভাবেই কথা বলে।

মিঃ চৌধুরী নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হ'ন মনে হয়। গান শোনা দূরে থাক, 'মনের মানুষ' ছবিটার নামটাও তাঁর জানা নেই। সার্জেণ্ট গুপ্তর দিকে চেয়ে কিন্তু তাঁর কেমন সন্দেহ হয়, এ ছবি তার অদেখা নয়। গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেন—"কি হে গুপ্ত, 'মনের মানুষ' না 'বনের মানুষ' গোছের কোন ছবি দেখেছ নাকি ?"

সার্জেন্ট গুপ্ত যথাসম্ভব বিরাগের ভান করে বলে—"হ্যাঁ স্যার, একটা ছবি যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে ত আগাগোড়াই গান।"

মিঃ চৌধুরী আবার রাধেশের দিকে ফেরেন,—"কোন্ গান কিছু বলতে পারেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই হিরোইনের মুখের থার্ড গানটা!"—রাধেশের সাহস অনেকখানি বেড়েছে বোঝা যায়,—"ওই যে গানটার ফার্স্ট লাইন হ'ল, 'সে যে চুপি চুপি আসে'!"

"সে যে চুপি চুপি আসে!"—মিঃ চৌধুরী ক' সেকেণ্ড কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন,—"আচ্ছা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ! খবরের কাগজে গিরি মাঝি লেনের খবর পড়ে আপনারা নিজে থেকে এই ব্যাপারটুকু যে জানাতে এসেছেন তার জন্যে সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।"

টাক-মাথা ভদ্রলোক এতক্ষণ রাধেশের একটু পেছনে পড়ে গেছলেন, এবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে আবার একটু জাহির করেন,—"আজ্ঞে রাধেশ ত ভয়ে আসতেই চায় না। আমি জোর করে নিয়ে এলাম। যেমন তেমন ব্যাপার ত নয়, যাকে বলে খুন! তাই আমি···"

মিঃ চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেন,—"তাই আপনি ঠিক উচিত কাজ করেছেন। আচ্ছা নমস্কার!"

টাক-মাথাকে নমস্কার করে এবার উঠে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু শেষ বাহাদুরীটা তিনি না নিয়ে ছাড়েন না।

পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটি জিনিস বার করে টেবিলের ওপর রেখে বলেন,—"এটিও আপনাদের কাজে লাগতে পারে বলে নিয়ে এসেছি!"

মিঃ চৌধুরী সবিস্ময়ে বলেন,—"কি ওটা ?"

"আজ্ঞে সেই দেশলাইয়ের বাক্সটা! অপরাধ নেবেন না, না জেনে ওর কটা কাঠি কিন্তু খরচ করে ফেলেছি।"

মিঃ চৌধুরী হাসি চেপে বলেন,—"না, না, তাতে কি হয়েছে। কিন্তু কাগজে মোড়া কেন ?"

"আজ্ঞে, আপনাদের ওই যে কি বলে ফিঙ্গার-প্রিন্ট-ট্রিন্ট যদি কিছু থাকে! তাই ওই কাগজটাতেই মুড়ে নিয়ে এলাম। কাগজটাও সে লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল কিনা!"

"কোন্ কাগজটা!"—মিঃ চৌধুরী সত্যিই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি টান হয়ে বসলেন।

"আজ্ঞে ওই যে-কাগজটায় মুড়ে এনেছি। দেশলাই বার করতে গিয়ে সে লোকটার পকেট থেকে পড়ে যায়। আমি দেখিনি। রাধেশ সিনেমার বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন ভেবে কুড়িয়ে নিয়েছিল।"

মিঃ চৌধুরী ততক্ষণে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলেছেন। খুলে তাঁকে হতাশই হতে হয় বোধহয়। ভেতরে একটা টেক্কা মার্কা দেশলাইয়ের বাক্স, আর কাগজটা সত্যিই একটা সাধারণ হ্যাণ্ডবিল।

তবু রাধেশকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"কাগজটা সেই লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল ঠিক দেখেছিলেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দেশলাই বার করতে গিয়ে কাগজটা পড়ে গেল। পঞ্চুদা তখন সিগারেট ধরাচ্ছেন আর আমি যন্ত্রপাতি-গুলো ব্যাগে ভরছি। লোকটা অমন হঠাৎ চলে যাবার পর···"

টাক-মাথা পঞ্চুদা মূল-গায়েনের পদ আর রাধেশকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তিনিই আবার শুরু করলেন,—"আমি বললাম,—আরে দেশলাইটা না নিয়েই চলে গেল যে! রাধেশ তখন কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখছে। বললাম,—"দে দে। পকেটটা ত ভিজে গেছে। শুকনো কাগজটায় মুড়ে রাখি। ভাগ্যিস রেখেছিলাম।"

পঞ্চুদার আগেকার সঙ্গে এখনকার বিবরণের তফাতটুকু মিঃ চৌধুরী আর ধরিয়ে দেন না, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, বুদ্ধি করে যে রেখেছিলেন, তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার।"

নমস্কার করে পঞ্চুদা ও তাঁর সাকরেদ বিদায় নেবার পর চেয়ারে একটু ক্লান্ত ভাবে হেলান দিয়ে মিঃ চৌধুরী বলেন,—"যাই হোক একটা জিনিস কিন্তু জানা গেল। শিস-এর সুরটা। গিরি মাঝি লেনের সেই বাড়ির ঝি হরির মা-ও শিস শোনার কথা বলেছে। পোশাকটা যে ভাবে মিলে যাচ্ছে দুজনার বর্ণনায়, তাতে একই লোককে যে এরা দেখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি এই শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজায়। সবেমাত্র ওই রকম একটা পৈশাচিক খুন করে এসে শিস দিয়ে কেউ গানের সুর ভাঁজতে পারে ? তাও একটা সস্তা ফিল্মের গানের সুর!"

"ভেবে দেখুন স্যার, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি!"—সার্জেন্ট গুপ্ত মাথা চুলকে বলে,—"মোক্ষদা ঠাকরুন ব'লে যাঁকে গলায় ওয়াটারপ্রুফের বেল্টের ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর সমস্ত খবরই নেওয়া হয়েছে। কোনও শত্রু কোথাও তাঁর ছিল ব'লে কেউ অন্ততঃ জানে না। ভদ্রমহিলার সেকালের শিক্ষিত পরিবারে জন্ম। যতদূর জানা গিয়েছে তাঁর স্বামী এককালে একটি অনাথাশ্রম চালাতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সে কাজ বহুদিন ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িটি নিজ নিয়ে দিনের বেলা একটি সেলাই-টেলাই-এর স্কুল চালান। স্বামী যা রেখে গেছেন তার সঙ্গে এই আয়ে তাঁর একরকম

চলে যায়। নেহাত উন্মাদ না হলে কেউ এ ভাবে তাঁকে মারতে পারে—এটা কল্পনা করা যায় না।"

মিঃ চৌধুরী খানিক চুপ করে কি যেন ভাবছেন মনে হ'ল। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বলেন—"না, উন্মাদ হলেও সাধারণ উন্মাদ নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছে বলেই মনে হয়। মোক্ষদা দেবী যে সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ ওপরে একেবারে একা থাকেন, নিচে ঝি ছাড়া আর কেউ যে তখন বাড়িতে থাকে না, এ-সব মনে হয় খুনী আগে থাকতেই খবর নিয়েছে। তার পোশাক ও চালচলন যেটুকু জানা গেছে তার মধ্যেও কোন পাগলামী ধরা পড়েনি। তা ছাড়া বদ্ধ উন্মাদ হলেও তার একটা হদিস এ দুদিনে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কোন উন্মাদাশ্রম থেকে ওরকম কেউ পালিয়েছে বলে এখনও ত জানা যায়নি।"

"আমি সে রকম উন্মাদের কথা বলছি না স্যার! সাধারণ স্বাভাবিক চেহারার মানুষের ভেতরেই কখনো কখনো ওরকম উন্মাদের লক্ষণ ত প্রকাশ পায়।"—সার্জেন্ট গুপ্ত একটু সঙ্কুচিত ভাবে নিজের মতটা জানায়,—"অকারণে যাকে-তাকে খুন করা তখন নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়।"

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বলেন,—"ও রকম খুনে বানানো গল্পেই দেখা যায়। তা ছাড়া আগেই যা বললাম,—খুনী-মাত্রেই একরকম পাগল হলেও, there is method in his madness—বেশ প্ল্যান করা ব্যাপার। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কোন খেই যে পাওয়া যাচ্ছে না!"

হঠাৎ কি ভেবে তিনি যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন,—"দাঁড়াও দাঁড়াও। দেশলাই মোড়বার কাগজটা হাতে নিয়ে তিনি আবার বলেন—"এই কাগজটা লোকটার পকেট থেকে পড়ে গেছল বললে না?"

"হ্যাঁ স্যার! কিন্তু ওটা ত একটা সাধারণ হ্যাণ্ডবিল!"

"হ্যাঁ সাধারণ হ্যাণ্ডবিলই বুঝলাম, কিন্তু এটা সে যত্ন করে পকেটে রেখেছিল কেন?"

"যত্ন করে যে রেখেছে তাই বা কি করে বুঝছি!"—সার্জেন্ট গুপ্ত সবিনয়ে হলেও প্রতিবাদ না করে পারে না,—"হয়ত আমরা সবাই যেমন করি তেমনি রাস্তায় কারুর হাতে পেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে রেখে দিয়েছে।"

যুক্তিটা অগ্রাহ্য করবার নয়। তবু মিঃ চৌধুরী কাগজটা আর একবার ভালো করে পড়ে বলেন,—"বিজ্ঞাপনটা কিসের দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, একটা হোটেলের হ্যাণ্ডবিল। কোথায় বাইরে কোন স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপন।"

মিঃ চৌধুরী চিন্তিত ভাবে বলেন,—"সেই জন্যেই ওই লোকের পকেটে থাকাটা একটু অদ্ভুত লাগছে না?"

বিজ্ঞাপনটা তিনি জোরে জোরে পড়েন এবার,—"কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস। মনোরম পরিবেশে বরাকর নদীর তীরে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বৈদ্যুতিক আলো টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত নাগরিক সুখসুবিধা সমেত আধুনিক হোটেল। মধ্যবিত্তের সুবর্ণ-সুযোগ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। নিজস্ব গাড়িতে স্টেশন হইতে হোটেলে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা।"

বিজ্ঞাপনটা পড়ে মিঃ চৌধুরী সার্জেন্ট গুপ্তর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান।

"এ হ্যাণ্ডবিলের কোন তাৎপর্য নেই বলছ?"

"কিছু হয়ত থাকতে পারে?"—সার্জেন্ট গুপ্তকেও একটু ভেবে বলতে হয়,—"হয়ত কোনো দিন এই লোকটি সেখানে ছিল, কিংবা হয়ত এ খুনের পর গা ঢাকা দেবার জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেখে জায়গাটার কথা ভেবেছে। কিন্তু সেখানেই যে সে যাবে বা কখনো গিয়েছিল তার ঠিক কি? এ বিজ্ঞাপন থেকে কোন সুবিধে আমাদের হচ্ছে কি এখন?"

"না, তা হচ্ছে না।"—ব'লে কাগজটা আবার টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ চৌধুরী চম্‌কে ওঠেন। বিজ্ঞাপনের উল্টোদিকের সাদা পিঠটা চোখের কাছে এনে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে খানিকটা দেখে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলেন,—"শীগ্‌গির বরাকর পুলিশ স্টেশনকে ফোনে ধরো। আর দেখো ডি-সি ইসমাইল সাহেবকেই কোথাও পাও কিনা!"

সার্জেন্ট গুপ্ত হঠাৎ এই আদেশে একটু হতভম্ব হয়ে বলে,—"কেন, কি হ'ল স্যার?"

চৌধুরী অধৈর্যের সঙ্গে বলেন,—"আগে তুমি ফোনটা লাগাও ত, পরে বলছি।"

বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি বোধহয় খানিকটা মার্জনীয়। বিজ্ঞাপনের বিশেষণের সঙ্গে আসল জিনিসের পরিচয় অনেক সময়েই মেলে না এটা আমরা ধরেই নিই। কিন্তু কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের বেলা এই সাধারণ নিয়মের সত্যিই একটু ব্যতিক্রম বোধহয় দেখা যায়। বিজ্ঞাপন যে-ই লিখে থাকুক, স্বাস্থ্যনিবাসটির পরিচয় দিতে বাড়াবাড়ি অন্ততঃ কোথাও করেনি।

বরাকর নদীর ধারেই সত্যিই অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে প্রথম ইংরেজ আমলের থামওয়ালা বেশ বড় একটি বাড়ি। ঢেউ-খেলানো রাঙামাটির দেশ। দূরে ছোট-খাট পাহাড়ও

দেখা যায়। জায়গাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার নির্জনতা। ধারে-কাছে সাত-আট মাইলের মধ্যে একটা-দুটো চাষীদের কুঁড়ে ছাড়া কোনো বসতি নেই।

স্বাস্থ্যনিবাসটির মনোরম পরিবেশ আপাততঃ অবশ্য আবিষ্কার করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ দিন ধরে নাগাড়ে ঝড়-বৃষ্টি চলেছে। মাঠঘাট জলে জলময়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চারিদিক এমন ঝাপসা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। একটিমাত্র যে পাকা রাস্তা দূরের বরাকর শহর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসটির সংযোগ রক্ষা করে, তা ইতিমধ্যেই নানা জায়গায় বর্ষার জলের স্রোতে প্রায় অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাকর নদীর জল তার ওপর যে রকম বেড়ে কূল ছাপাবার উপক্রম হয়েছে, তাতে বন্যা হলেই সর্বনাশ।

বরাকর থেকে ভাড়া-করা মোটরে স্বাস্থ্যনিবাসে আসতে-আসতে কণিকা সেই কথাই ভাবছিল। রাস্তায় এর মধ্যেই দু জায়গায় আটকে যেতে হয়েছে। মাঠের জল নদীর স্রোতের মত রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে। মোটরের ভেতর পর্যন্ত জল উঠে ইঞ্জিন গেছে বন্ধ হয়ে। কোনো রকমে ঠেলে-ঠুলে মোটরটাকে সেই জলের স্রোত পার করে নিয়ে গিয়ে আবার চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ড্রাইভারকে। নেহাত মেয়েছেলে বলেই সশব্দে সে নিজের বিরক্তি বোধহয় প্রকাশ করেনি। কিন্তু রামসেবকের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে এক-কোমর জলে মোটর ঠেলবার সময় মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়েছে নিশ্চয়, এমন দিনে এ রকম ভাড়া জুটিয়ে দেওয়ার জন্যে।

হোটেলে এতক্ষণ কি হচ্ছে তাই বা কে জানে! ভোর-বেলাতেই স্বামী স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে কুল্‌টি চলে গেছেন স্টেশন থেকে গোটাকতক পার্শেল খালাস করে আনবার জন্যে। দশটার ট্রেনে একজন বোর্ডারের আসবার কথা। তাঁকেও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বেলা দুটো পর্যন্ত স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে কণিকা নিজেই ফোন করে বরাকর থেকে ভাড়াটে গাড়ি আনিয়ে বরাকর গিয়েছিল কয়েকটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস কেনার সঙ্গে বাজারটাও সেরে আসবার জন্যে। তখন বৃষ্টিটা যেন একটু ধরবার আশা দেখা দিয়েছিল। বাইরের পথঘাটের চেহারা যে কি হয়েছে তাও ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি।

বেরুবার পর থেকে ঝড় ও বৃষ্টি দুই-ই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। বরাকরে কি কষ্টে যে বাজার সেরেছে সে-ই জানে! দূরে নির্জনে স্বাস্থ্যনিবাস খোলার সুবিধে যেমন, দায়ও ত তেমনি

দারুণ। এখন হোটেলের প্রত্যেকটি জিনিস বয়ে এনে মজুত না রাখলে নয়। খরা শুখনোর সময় তেমন কোনো ঝামেলা নেই। ফোন করে দিলেও দু-একটা বড় দোকান সব জিনিসপত্র গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে উপ্‌রি ভাড়া শুধু ধরে নেয়। কিন্তু এই দুর্যোগে সে দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী নয়। কণিকাকে তাই নিজেকেই আসতে হয়েছে।

নিজেকে আর কোন্ কাজটা না তাকে দেখতে হয়। স্বামী অলস কি অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু কেমন একটু অগোছালো অন্যমনস্ক। কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। এই আজকেই স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে কি গোল বাধিয়েছেন কে জানে!

কিন্তু এই দুর্যোগ এইভাবে চললে তাদের ব্যবসার যে দফা রফা। পুজোর পর এই সময়টাই এ-ধরনের স্বাস্থ্যনিবাসের মরশুম। এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনজন বোর্ডার এসেছেন। আর জন-কয়েকের আজকের মধ্যে আসবার কথা। তাঁরা কেউ এসে পৌঁছোতে পারবেন বলে ত ভরসা হয় না।

যে তিনজন ইতিমধ্যে এসেছেন তাঁদের যত্নের ত্রুটি অবশ্য যাতে না হয় তার ব্যবস্থা সে প্রাণপণে করতে প্রস্তুত। এই

ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে নইলে বরাকরে বাজার করতে আজ সে বেরুত না। কিন্তু তাতেই কি তাঁদের সন্তুষ্ট করা যাবে? প্রথম নতুন স্বাস্থ্যনিবাসে এসে তাঁরা খুব ভালো ধারণা নিয়ে যাবেন বলে মনে হয় না।

অথচ বাইরের বিজ্ঞাপনের চেয়ে যাঁরা নিজেরা থেকে গেছেন তাঁদের মতামতের দামই যে এ ব্যবসায় বেশী তা কণিকা ভালো করেই বোঝে।

এখানে স্বাস্থ্যনিবাস করবার পরিকল্পনাটা তারই। লাহিড়ী প্রথমে ত কথাটাকে আমলই দিতে চায় নি। "তুমি পাগল হয়েছ কণিকা! স্বাস্থ্যনিবাস মানে হোটেল করা কি চারটি-খানি কথা! বিশেষ করে বাংলার ভেতরে ওই বেপোট জায়গায় লোকে পয়সা খরচ করে থাকতে যাবে কেন? রাঁচি হাজারিবাগ পুরী না যাক, তারা অন্ততঃ মধুপুর যশিডি যাবে।"

"তেমন স্বাস্থ্যনিবাস করলে এখানেও যাবে। আর বাংলার ভেতরে বলেই ত আরো যাওয়া উচিত।"—কণিকা যুক্তি দেখিয়েছে,—"বাংলার ভেতরে ভালো স্বাস্থ্যনিবাস কেউ কোথাও করেছে! আছে ত যাবার জায়গা ওই এক দীঘা। সেখানেও আমাদের মত সুবিধে পাবে কোথায়?"...

কণিকা যে সুবিধের কথা বলেছে সেটা এরকম জায়গায় একটু দুর্লভ সন্দেহ নেই। আগেকার এক বিদেশী কয়লার খনির ইংরেজ ম্যানেজারের প্রাণে একটু কবিত্ব ছিল বোধহয়। এই নির্জন জায়গায় ছোটখাট একটি বিলিতী ধরনের বাড়ি তিনি কোম্পানির পয়সাতেই বানিয়েছিলেন, কোম্পানির যারা ম্যানেজার হবে তাদের থাকবার জন্যে। তখন কয়লার খনিতে ধুলোমুঠো সোনা হচ্ছে। সৌখীন ম্যানেজার বাড়িটিতে বিজলী-বাতি টেলিফোনের বন্দোবস্ত ত করেই ছিলেন, তার ওপর বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে আসবার একটা নিজস্ব রাস্তাও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। কিছুকাল আগে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে সে কোম্পানি লাটে উঠেছে। কোম্পানির পাত্তাড়ি গুটোবার ভার যাদের হাতে তারা কোম্পানির অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে বাড়িটি বিক্রির চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যবসার হাল-চাল ও-অঞ্চলে তখন বদলে গেছে। শুধু কবিত্বের খাতিরে অতদূরের অতবড় বাড়ি কেনবার গরজ কারুর হয়নি। নতুন মুরুব্বিদের বাধ্য হয়েই তারপর বাড়িটি ভাড়া দেবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। সে বিজ্ঞাপনে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বাড়ি ভাড়ার পরিমাণও তাই ক্রমশঃ কমে এসেছে। এই সময়ে কণিকার স্বামী প্রবীর লাহিড়ীর-ই একদিন বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে।

"দেখেছ কণিকা, দুটো ঘরের জন্যে আমরা হা-পিত্যেশ করে মরছি, আর বড় বড় সাতখানা শোবার-ঘর হল বৈঠকখানা রান্নাঘর নিয়ে গোটা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে!"

"কোথায়, কোথায়?"—বলে কণিকা উদ্‌গ্রীব হয়ে স্বামীর হাতের কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

একটু মজা করবার জন্যেই প্রবীর কথাটা বলেছিল। কণিকার করুণ ব্যাকুলতা দেখে কিন্তু মায়া হয়েছে তার। তাড়াতাড়ি হেসে বলেছে,—"আরে না, ঠাট্টা করছিলাম। এ-বাড়ি হ'ল জনমানবহীন তেপান্তরে। নইলে অত বড় বাড়ি মাসে একশ টাকা ভাড়া হিসেবে লীজ দিতে চায়!"

কণিকার আগ্রহ কিন্তু তাতেও কমে নি। প্রবীরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞাপনটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কি ভেবেছে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে,—"তুমি চিঠি লেখ এখুনি। ও-বাড়ি আমরাই ইজারা নেবো।"

"মানে!"— কলকাতা শহরে বাসার খোঁজে হয়রান হয়ে স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়েছে বলেই প্রবীরের সন্দেহ হয়েছে।

"মানে ওই বাড়িতেই আমরা থাকব—আর, আর—" কণিকা একটু দ্বিধা করে, তারপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বলেছে,—"ওখানে হোটেল—মানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস করব নতুন ধরনের।"

তারপর যে তর্ক হয়েছে তার আভাস আগেই কিছুটা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কণিকা কিন্তু প্রবীরকে এ-পরিকল্পনায় সায় দিতে বাধ্য করেছে নানান যুক্তিতে।

যুক্তিগুলো তাদের তখনকার অবস্থার দরুনই অকাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবীরের পক্ষে।

প্রথমতঃ, প্রায় দেড় বছর আগে আকস্মিকভাবে বোম্বাই শহরে বিয়ে হবার পর থেকে তারা দুজনে দেশে ফিরে এতদিনেও একটা মনের মত বাসা সংগ্রহ করতে পারেনি। কোনো একটি হোটেলেই তারা সেই কারণে একটা কামরা নিয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিয়ের পর কণিকার কথায় মার্চেন্ট-নেভির চাকরি ছাড়া অবধি দেশে প্রবীর কোনো কাজ যোগাড় করতে পারে নি। প্রবীরের অবস্থা এমনিতে অবশ্য ভালো। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা ছেলেবেলা মারা গেছেন। কিছুদিন আগে সদাগরী জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সময়ই পিতার মৃত্যুর খবর সে পেয়েছে। অন্য কিছু না রেখে যান প্রবীরের বাবা, মোটা একটা ইনসিওরেন্সের টাকা ছেলের

নামে লিখে দিয়ে গেছেন। চাকরি না থাকলে সুতরাং তার আর্থিক দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। এর ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে ধনী এক মাতামহের উইলে সম্প্রতি কণিকার বেশ ভালোরকম একটা মাসোহারার ব্যবস্থা হওয়ায় এদিক দিয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু কাজ না করে চুপ করে বসে থাকা যে পুরুষের পক্ষে ক্ষতিকর এটা কণিকা কিছুদিন ধরে ভালো করেই বুঝতে পারছে। বরাকরের ধারে গিয়ে একটা স্বাস্থ্যনিবাস-গোছের গড়ে তুললে তাদের রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হ'য়ে অনেক সমস্যাই এক সঙ্গে মিটে যায়। নিজেদের চমৎকার থাকবার জায়গা ত মেলেই, সেই সঙ্গে প্রবীরও করবার মত কাজ পায়, আর একা-একা অত দূরে থাকা যাতে একঘেয়ে না হয় সেই জন্যেই এমন কিছু সঙ্গীর ব্যবস্থা হয়, যারা নিজের পয়সা খরচ করে সঙ্গ দিতে আসবে।

না, সমস্ত সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। কণিকার আগ্রহে মাস-ছয়েকের মধ্যে বাড়ি লীজ নেওয়া থেকে স্বাস্থ্যনিবাসের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যায়, বিজ্ঞাপন হ্যাণ্ডবিল পর্যন্ত ছাড়া হয়ে গেছে।

তারপর কণিকাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন স্বাস্থ্য-নিবাস ঠিক খোলার দিন থেকেই এই দুর্যোগ।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের একটি বিশেষ নিয়ম কণিকা এই করেছিল যে, সাধারণ হোটেলের মত আজ এসে কাল সেখান থেকে চলে যাওয়া যাবে না। অন্ততঃ সাত দিনের কম কোনো বোর্ডারের সেখানে থাকবার নিয়ম নেই। মোট বোর্ডারের সংখ্যাও পরিমিত। তিনটি সিংগল-সীটেড ও তিনটি ডবল-সীটেড ঘরে সবসুদ্ধ ন'জনের বেশী বোর্ডার কখনও নেওয়া হবে না—এই কণিকার ব্যবস্থা।

কণিকার পরিকল্পনা যে খুব আজগুবি নয়, বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল ছাড়বার কিছুদিন বাদেই তা টের পাওয়া গেছে। তিনজন চিঠি লিখে এক মাসের জন্য ঘর রিজার্ভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনে আবার অগ্রিমও টাকা পাঠিয়েছেন মনি-অর্ডারে। যাঁরা চিঠি লিখে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারজন শেষ পর্যন্ত আসছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম বোর্ডার এসেছেন গত পরশু দিন। বয়স্কা মহিলা। এককালে বুঝি স্কুল-ইন্সপেক্ট্রেস ছিলেন। বিয়ে-থা করেন নি, কিন্তু সাজ-পোশাকে এখনো একটু বাড়াবাড়ি আছে। কথাবার্তা চালচলনে দুনিয়ায় কেউই যেন তাঁর সমকক্ষ নয় এমনি একটা অহঙ্কারের আভাস।

বৃষ্টি তখন দুদিন ধরে পড়ছে। স্টেশন-ওয়াগনে অত্যন্ত সমাদর করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকেই তিনি কটু সমালোচনা শুরু করেছেন,—"ছিঃ ছিঃ, এমন জানলে আমি আগাম টাকা পাঠিয়ে এখানে আসি! শুনেছিলাম নদীর ধারে বাড়ি। সারা রাস্তাই ত দেখলাম নদী আর নালা!"

কণিকা কোনো রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করে তাঁর জন্যে বরাদ্দ ঘরে নিয়ে গেছে। ঘরের চেহারা দেখে খুঁত ধরবার মত তখুনি কিছু না পেয়ে তিনি বলেছেন,—"দেখুন, একটা কথা আপনাদের আগেই জানিয়ে দিই। খাবার-দাবার যা খাওয়াবেন তা ত এই তেপান্তরের মাঝখানে জেলখানা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রত্যেক দিন চারবার করে আমায় চা দিতে যেন ভুল না হয়। একবার ভোর পাঁচটায়, তারপর সকাল সাতটায়, তারপর বিকেল তিনটেয়, আবার সন্ধ্যে ছ'টায়। যান, টুকে রাখুন গিয়ে, পাঁচটা সাতটা তিনটে ছ'টায়।"

"আচ্ছা তাই হবে!"—বলে কণিকা চলে আসবার জন্যে ফিরতেই আবার পিছন থেকে ডাক পড়েছে,—"শোনো!"

কণিকা একটু বিরক্ত মুখেই ফিরে দাঁড়ালেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভদ্রমহিলা বলেছেন,—"তোমার মত ওই বয়সের মেয়েকে আপনি আজ্ঞে আমি বলতে পারব না। তবে তোমাদের পরিচয়টা একটু দরকার। তোমার নামটা কি?"

"কণিকা।"

"গাড়িতে যিনি নিয়ে এলেন তিনি তোমার কে হ'ন!"

—বিরক্তির সঙ্গে হাসিও পেয়েছে এবার কণিকার এই জেরার ধরনে! একবার ইচ্ছে হয়েছে বলে,—'কেউ নয়, বন্ধু আর এই হোটেলের অংশীদার'। তারপর অস্থানে রসিকতার লোভ সংবরণ করে বলেছে,—"আমি ওঁর স্ত্রী।"

"ওঃ"—ভদ্রমহিলা যেন অন্য কিছু আশা করেছিলেন, এই ভাবে বলেছেন,—"কত দিন বিয়ে হয়েছে?"

"বেশী দিন নয়"—বলে কথাটা এড়াবার জন্যেই কণিকা বলেছে,—"আপনার স্নানের গরম জল যদি লাগে ত বলুন, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কিন্তু তবুও তখুনি নিষ্কৃতি মেলেনি।

"কি শীত, কি গ্রীষ্ম আমি ঠাণ্ডা জলে স্নান করি।"—বলে কণিকাকে যেন স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দিয়ে ভদ্রমহিলা বলেছেন,—"আমার নামটাও তোমাদের জানা দরকার। আমি মিস্ ধর, এক্স্ স্কুল-ইনস্পেক্ট্রেস, মজঃফরপুর। আমায় মিস্ ধর বলেই ডাকবে।"

"যে আজ্ঞে!"—বলে কণিকা সিঁড়ি দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে আসতে স্বাস্থ্যনিবাস চালানোর প্রথম অভিজ্ঞতায় বেশ একটু চিন্তিতই হয়েছে।

মিস্ ধরের পর সন্ধ্যেবেলা নিজেই ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছেন ডাঃ জনার্দন বাজপেয়ী। বয়সে চল্লিশের চেয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ। একটু বেশী গম্ভীর। কথাবার্তা মনে হয় নেহাত দরকারে ছাড়া বলেন না। যখন বলেন তখন একটু অদ্ভুতই শোনায়।

প্রবীরই তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেছে। কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করায় মুখের পাইপটা নামিয়ে যা বলেছেন, তাতে প্রবীর প্রথমটা চমকেই গেছে।

ডাঃ বাজপেয়ী এক গ্লাস জল চাওয়ার মত বলেছেন,—"একটু—শান্তি!"

প্রবীর একটু বিমূঢ় ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে তারপর হেসে ফেলেছে। বলেছে,—"আশা করি তা এখানে পাবেন।"

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখে কিন্তু হাসির কোনো আভাস দেখা যায়নি। গম্ভীর ভাবে বলেছেন,—"আপনার কথাই সত্য হোক।"

নেমে এসে প্রবীর কণিকাকে সবিস্তারে সব শুনিয়ে বলেছে,—"স্বাস্থ্যনিবাসের বদলে উন্মাদাশ্রম নাম দেওয়াই বোধ হয় আমাদের উচিত ছিল। যা সব নমুনার আমদানি হচ্ছে!"

কিন্তু আরো এক নমুনা তখনও দেখতে বাকী।

তিনি এলেন রাত প্রায় ন'টার পর।

সারাক্ষণ সমানে বৃষ্টি পড়ছে।

মিস্ ধরের শরীর খারাপ বলে তাঁর খাবার তাঁর ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ বাজপেয়ী, প্রবীর ও কণিকা তিনজনে নিচের খাবার ঘরে একসঙ্গে বসে খেয়েছেন। খাওয়া নামেই এক সঙ্গে, নইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের খোলসের মধ্যে ঢাকা। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো কথা হয়নি। নিজেরা থাকলে কণিকা ও প্রবীর অবশ্য এভাবে চুপ করে নিশ্চয়ই থাকত না, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ীর গম্ভীর নীরবতার মর্যাদা রাখবার জন্যেই তাদেরও মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়েছে তাঁর শান্তির বায়না মেটাতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঃ বাজপেয়ী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর ঘরে উঠে গেছেন। রামসেবককে টেবিল পরিষ্কার করবার হুকুম দিয়ে কণিকা ও প্রবীর তাঁদের নিজের ঘরে গিয়ে বসেছে।

এ ঘরটা নিচের তলায় তারা ইচ্ছে করেই নিজেদের জন্যে রেখেছে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘর কাছে হওয়ার দরুন শুধু কাজের সুবিধে হয় বলেই নয়, এখান থেকে গেট পার হয়ে বাইরের রাস্তা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় বলে।

এই বর্ষার রাত্রে অবশ্য সেখানে দেখবার কিছু নেই।

কাঁচের শার্সি বৃষ্টির জলের ছিটেতে ঝাপসা। গাড়ি-বারান্দায় বাতিটার আলোয় ঝিকমিক করে বাইরে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির একটা পর্দা যেন শুধু দুলে দুলে নেমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটটায় টান দিয়ে প্রবীর কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে ব'সে সে বলেছে—"কে যেন আসছে না?"

ঝাপসা শার্সির ভেতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বাইরের বৃষ্টির ঝিকমিকে পর্দার ওপর দিয়ে কিছু একটা সরে গেল বলেই মনে হয়েছে—।

কণিকা তাড়াতাড়ি উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেখান থেকে আর কিছু দেখা যায়নি।

পরক্ষণেই বাইরের দরজার ভারী কড়া সজোরে নাড়ার শব্দ পাওয়া গেছে।

সত্যিই কেউ তাহলে এই দুর্যোগের মধ্যে এত রাত্রে এসে হাজির হয়েছে। কণিকা জানলার কাছে যাবার আগেই গাড়ি-বারান্দার তলায় সে পৌঁছে গেছে বলে বোধহয় কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু গাড়িটাড়ির কোনো শব্দ ত পাওয়া যায়নি! মানুষটা এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এরকম দুর্গম পথে এল কি করে?

এই কথাই ভাবতে ভাবতে কণিকা প্রবীরের সঙ্গে বাইরের হলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীর ভারী লোহার খিলটা নামিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার একটা দমক বৃষ্টির ছাটে ভেতরের হলের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে।

আগন্তুক ভেতরে পা দিয়ে হাতের সুটকেসটা নামিয়েই—প্রবীরের সঙ্গে দরজা বন্ধ করবার দুঃসাধ্য ব্যাপারে নিজে থেকে যোগ দিয়েছে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করা সোজা ব্যাপার নয়। দুজন জোয়ান পুরুষকে বেশ নাজেহাল হতে হয় তা বন্ধ করে খিলটা লাগাতে।

কণিকা লোকটিকে এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে। দোহারা চেহারা, মাঝারি গোছের লম্বা। প্রায় প্রবীরেরই সমান। মাথায় কান-ঢাকা বর্ষাতি টুপি, গায়ে বেশ দামী লম্বা ওয়াটার-প্রুফ, পায়ে গাম-বুট্স্।

আনন্দের পরিবেশ
উৎসবের পরিবেশে যে তৃপ্তি, যে আনন্দ
মনকে মাতায়,
মুক্ত বাতাস আর শ্যামলতার মায়া
দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও
এনে দেয় সেই সজীব উজ্জ্বলতা।
সহজ-সুন্দর জীবনের জন্য কল্যাণীতে একটি নিজস্ব বাসগৃহ

দরজা বন্ধ হবার পর মাথার টুপিটা খুলতেই একরাশ এলোথেলো ঈষৎ কটা চুল—যেন ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। সেই টুপিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে এক হাতে দুলিয়ে আগন্তুক বলেছে,—"এই অসময়ে আপনাদের জ্বালাতন করবার জন্যে মাপ চাইছি। অধীনের নাম মধুসূদন দত্ত।"

শুধু বলার ধরনে নয়, নামটা শুনেও কণিকার হাসি পেয়েছে। শুধু ভঙ্গিতেই নয়, চেহারায় ও গলাতেও মধুসূদনের ছেলেমানুষীটা এখন ধরা পড়ে যায়। মুখটা টুপিতে ঢাকা থাকার দরুনই গোড়ায় বোধহয় কেমন একটু অদ্ভুত লেগেছিল।

কেউ কিছু বলবার আগেই মধুসূদন একগাল হেসে বলেছে,—"নামটা শুনে মেঘনাদবধ-কাব্য যদি আপনাদের মনে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি নাচার। বাপ-মার নামকরণের ভুলে সব জায়গায় এই লজ্জাই আমায় পেতে হয়। তাঁরা অনেক আশা করে হয়ত ও-নাম রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পুত্ররত্নটি যে একটা ছড়া কাটতেও শিখবে না তা তাঁরা কি করে জানবেন। হ্যাঁ, আসল কথাই ভুলে গেছি জিজ্ঞাসা করতে! আমি ঠিক জায়গায় এসেছি ত? এইটিই ত কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস—স্বাস্থ্যোদ্ধার বাংলাদেশেই করুন—যার ধুয়া! ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারে সাইনবোর্ড-টোর্ড কিছু দেখতে পাইনি কিনা!"

"না দেখতে পেলেও ভুল জায়গায় যাওয়া বোধহয় সম্ভব ছিল না!"—কণিকা হেসে বলেছে,—"কারণ এ তল্লাটে দশ মাইলের মধ্যে আর কোঠাবাড়িই নেই।"

"তার মানে চোখ বুঁজেও চলে আসতে পারতাম বলছেন? তা একরকম তাই এসেছি!"—বলে মধুসূদন হেসেছে।

প্রবীর এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার যেন একটু অপ্রসন্নভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে,—"কিন্তু আপনি এলেন কি করে?"

"এক রকম উড়েই এসেছি ভেবে নিতে পারেন!"—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই মধুসূদন সজোরে হেসেছে।

রসিকতাটা ঠিক উপভোগ না করে প্রবীর আবার গম্ভীর ভাবে বলেছে,—"আপনার গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাইনি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"না, আপনাদের রহস্যের মধ্যে রাখা আর উচিত নয়। গাড়িতেই আমি এসেছি। তবে মাইলখানেক দূরে গাড়িটা হঠাৎ বেঁকে বসল কি-না, তাই সুটকেসটা নিয়ে হেঁটে আসা ছাড়া আর উপায় রইল না।"

"আপনার আর সব জিনিস কি গাড়িতেই পড়ে রইল!"

"আর সব জিনিস!"—প্রবীরের প্রশ্নে যেন একটু অবাক হয়েই মধুসূদন বলেছে,—"আর সব জিনিস আমার কোথা থেকে আসবে! আমার যা কিছু সব এই সুটকেসে।"

অবাক হয়ে প্রবীর কিছু বলবার আগেই কণিকা বলেছে—

"কিন্তু এই দরজায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এমন আলাপ করবেন! আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।"

"ধন্যবাদ!"—বলে সুটকেসটা তুলে নিয়ে মধুসূদন কণিকার পিছুপিছু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে,—"এখুনি যেন ঘুমোতে যাবেন না। সুটকেসটা রেখেই আপনাকে আবার বিরক্ত করতে আসছি।"

প্রবীর কিছু উত্তর দেয়নি, কিন্তু হঠাৎ লোকটার প্রতি কেন বলা যায় না কেমন একটা বিদ্বেষই যেন অনুভব করেছে।

মধুসূদন তারপর সে রাত্রে কিন্তু বিরক্ত করতে আর আসেনি। কণিকা খানিক বাদে নেমে আসবার পর প্রবীর তার অপ্রসন্নতাটুকু না লুকিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে,—"কি, তোমার সিনেমা-হিরোর কি হ'ল?"

"আমার সিনেমা-হিরো!"—কণিকা ভুরু কুঁচকে প্রবীরের দিকে তাকিয়েছে, তারপর হেসে ফেলে বলেছে,—"ও!

মধুসূদনের কথা বলছ! বলো—মহাকবি, সিনেমা-হিরো বলছ কেন?"

"সিনেমা-হিরোর charming personality দেখে বলছি! তা তিনি বিরক্ত করতে নামলেন না যে বড়?"

"না, আমিই বারণ করলাম। বললাম, এই ঝড়বৃষ্টিতে এতখানি হেঁটে এসেছেন। আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। আপনার খাবার ওপরে দিয়ে যাচ্ছি।"

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশ-ট্রেতে ঘষে নেভাতে নেভাতে একটু যেন তিক্ত স্বরে প্রবীর বলেছে —"তুমি আবার ওপরে যাবে খাবার দিতে! এটা অতিথি-সংকারের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু উপায় কি বলো! চাকর-বাকরদের ত ছুটি দিয়ে দিয়েছি। তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেছে। এখন এই বৃষ্টিতে বাগান দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে ডাকতে যাওয়ার চেয়ে নিজে দিয়ে আসাই সুবিধের নয় কি!"

"কিন্তু তিনি নিজে নেমে এসে খেয়ে গেলেই বা দোষ কি ছিল!"—প্রবীর কণিকার যুক্তি মানতে না পেরে বলেছে।

"দোষ ছিল এই যে, এখন এসে বকবক করে আমাদের কতক্ষণ জাগিয়ে রাখত কে জানে! কী বকবক করতে পারে দেখেছ ত!"

"হুঃ"—বলে প্রবীর এবার চুপ করেছে।

কণিকা নিজে থেকেই বলেছে,—"ছেলেটা কিন্তু ভারী আমুদে ভালোমানুষ, বাপু। নিজে থেকেই বললে,—'এত রাত্রে আমার খাওয়ার জন্যে যেন ব্যস্ত হবেন না, কালিয়া-পোলাও যা হোক দুটো দিয়ে যান, তাতেই আমার চলবে।'—বললাম—'অত সস্তা জিনিস আমরা রাখিনা, তার বদলে খানিকটা রুটি মাখন আর জ্যাম দিয়ে যাচ্ছি, হবে ত?' বললে—'খুব হবে!' আমি···"

হঠাৎ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে কণিকা থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—"কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে এরই মধ্যে!···"

*

পরের দিন মধুসূদনের আরো নতুন পরিচয় পাওয়া গেছে। সকালবেলাই একটা পা-জামা পাঞ্জাবি পরে নিচে নেমে একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির।—"কি রাঁধছেন কণিকা দেবী, আমি একটু সাহায্য করতে পারি?"

প্রবীর স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরুবার আগে তখন কণিকার কাছে কুলটি থেকে আরো কিছু আনবার আছে কি-না জানতে এসেছে।

বিরক্তিটা গোপন না করেই সে বলেছে,—"সাহায্য করবার যদি অত আগ্রহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন না। কুলটি পর্যন্ত যাচ্ছি। সারা রাস্তা অনেককিছু সাহায্য করতে পারবেন।"

মধুসূদন প্রবীরের শ্লেষ যেন টেরই পায়নি। হাসিমুখে বলেছে,—"ওরে বাবা, এই বৃষ্টিতে সেই কুলটি! গাড়ি হয়ত মাঝপথেই কোথাও বিগড়ে আটকে থাকবে! আমি ওসব বীরত্বের মধ্যে নেই। আর আমি শুধু রান্নার সাহায্য করতেই ভালোবাসি।"

"বুঝেছি!"—প্রবীর বেশ একটু বিদ্রূপের সুরেই বলেছে, —"আপনার বীরত্ব শুধু হেঁসেলেই আপনি দেখাতে পারেন! আচ্ছা, আমি চললাম কণা, তোমার হেঁসেলের কাজে ত মস্ত সহায় পেয়েছ। রান্নাবান্নাগুলো আজ ভালোই হবে আশা করি।"

প্রবীর বেরিয়ে যেতে মধুসূদন হেসে বলেছে,—"আপনার স্বামীর আজ বেরুবার ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়!"

কথাটা কণিকার কেমন যেন অবান্তর মনে হয়েছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রবীর ফেরেনি।

কণিকাকে আর সকলের সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে। টেবিলে তারা চার জন। মিস্ ধর আজ অনুগ্রহ করে সকলের সঙ্গে খেতে রাজী হয়েছেন। খাওয়ার টেবিল একাই মাৎ করে রেখেছে মধুসূদন। এমনিতে তার আমুদে স্বভাব ভালোই লেগেছে কণিকার, কিন্তু এক-এক সময়ে সে যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়েছে।

খাবার টেবিলের সেই ব্যাপারটাই কেমন যেন একটু বাড়াবাড়ি।

কথাটা মিস্ ধরই তুলেছেন,—"এ রকম ভুতুড়ে বাড়িতে হোটেল খোলার কোনো মানে হয় না।"

"ভুতুড়ে বাড়ি!"—কণিকা অবাক হয়ে বলেছে।

চির-নীরব ডাঃ বাজপেয়ীও প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

মধুসূদন গম্ভীর হবার ভান করে জিজ্ঞাসা করেছে,—"ভূত-টুত কিছু দেখেছেন নাকি সত্যি! ও, তাহলে ত এ বাড়ির তুলনা নেই।"

মধুসূদনের দিকে ভ্রূকুটি করে মিস্ ধর বলেছেন,—"না, ভূত-টুত এখনো দেখিনি। কিন্তু সারারাত অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনেছি। একবার ত মনে হ'ল কে যেন আমার দরজাটা খোলবার চেষ্টা করছে।"

কণিকা একটু হেসে বলেছে,—"ঝড়বৃষ্টিতে ওরকম আওয়াজ ত স্বাভাবিক। আর এ-বাড়ির যা সব মজবুত দরজা, ভূতের হাতে কুড়ুল না থাকলে খোলা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু কুড়ুল দিয়েই যদি কেউ খোলে!"—মিস্ ধর তর্কে হারতে রাজী হননি,—"যা জন-মনিষ্যিহীন জায়গা, এখানে এক দল ডাকাত এসে আমাদের খুন করে রেখে গেলেই বা রুখবে কে!"

"আমি ত অন্ততঃ নয়!"—মধুসূদনের কথার ধরনে কণিকা হেসে ফেলেছে।

মিস্ ধর আরো বিরক্ত হয়ে বলেছেন,—"এ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এখানে ডাকাত পড়া কি এমন অসম্ভব? এই ত কলকাতা শহরেই কদিন আগে সন্ধ্যেবেলা কিভাবে একজনকে খুন করেছে, পড়েছ।"

কণিকা আগের দিন কাগজে খবরটা পড়েছিল। বললে, —"সে ত কোনো পাগলের কাজ। নইলে ওই নিরীহ প্রৌঢ়াকে অমন গলায় ফাঁস দিয়ে কেউ অকারণে মারতে পারে?"

"অকারণে কেন বলছেন!"—মধুসূদন বলেছে,—"হয়ত বুড়ীর ঘরে মোহরের ঘড়া লুকোনো ছিল।"

"না, পুলিশ সে রকম কোনো প্রমাণ পায়নি।"—ডাঃ বাজপেয়ী তাঁর নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করায় সবাই অবাক হয়েছে।

"পুলিশ কি পেয়েছে তা কি সবাইকে জানায়!"—মধুসূদন হালকা স্বরে বলেছে,—"নির্ঘাৎ বুড়ীর লুকোনো পয়সাকড়ি ছিল, আর নয় বুড়ী কোনো চোরাই ব্যবসার মালিক, নাম ভাঁড়িয়ে ওই গিরি মাঝি লেনে ছিল। শত্রুপক্ষের কেউ এসে দিয়েছে সাবাড় করে। যাক, বুড়ী বেশ আরামেই গেছে!"

মিস্ ধর চটে উঠে বলেছেন—"গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে মারল, আর বলছ আরামে গেছে!"

"হ্যাঁ, ফাঁস দিয়ে মরার মজা জানেন না বুঝি! ভারী আরাম!"—বলে মধুসূদন যেভাবে হেসেছে কণিকার কাছে তা একটু অদ্ভুত বিসদৃশই লেগেছে।

মিস্ ধর বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়েই উঠে গেছেন। ডাঃ বাজপেয়ী পর্যন্ত সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছেন।

*

ঝড়জলের ভেতর নানা জায়গায় মোটর প্রায় নৌকোর মত চ'লে কণিকাকে যখন স্বাস্থ্যনিবাসে পৌঁছে দিল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

এখনও প্রবীর ফেরেনি দেখে কণিকা বেশ একটু চিন্তিতই হ'ল। কোনো কারণে আটকে গেলে প্রবীরের ত ফোন করাও উচিত ছিল। কেন যে সে তা করেনি কে জানে! উদ্বিগ্ন হয়ে কণিকা কুলটির একটি বড় দোকানে নিজেই ফোন করে খোঁজ নিলে। কিন্তু সেখানেও কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রবীর সেখানে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেলা এগারোটাতেই দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

বোর্ডারদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। মিস্ ধর ও ডাঃ বাজপেয়ী নিজের নিজের ঘরে চলে গেছেন। মধুসূদনও আশ্চর্যভাবে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে। মধুসূদনের পক্ষে সেটা একটু অস্বাভাবিক-ই বটে।

কণিকা রাত্রের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা রামসেবককে বলে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পুরোনো খবরের কাগজটা নিয়েই গিয়ে বসল। পড়ায় কিন্তু মন বসতে চায় না। ঝড়বৃষ্টি যেন ক্রমশঃই আরো তুমুল হয়ে উঠছে। শেষপর্যন্ত সত্যিই বন্যা হবে নাকি! রামসেবক এ অঞ্চলেরই লোক, তার কাছে বছর-পঁচিশ আগের ভয়ঙ্কর এক বন্যার গল্প সে শুনেছে। বরাকরের জল কূল ছাপিয়ে এসে সমস্ত এলাকাটাই নাকি ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই সমুদ্রের মধ্যে এই বাড়িটিই নাকি ছিল একা দাঁড়িয়ে।

তাই যদি হয় আবার! অন্য কোনো ভয় না থাক, এতগুলো মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। কতদিনে জল নেমে পথঘাট খুলবে কে জানে! তার ভাঁড়ার অবশ্য সে ভর্তি করেই রাখবার ব্যবস্থা করেছে। কিছু না-হোক, চালে ডালে খিচুড়ি করে দিতে পারবে। কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসের ত তাহলে ভবিষ্যৎ ঝাঁঝরা। শুরুতেই যে বদনাম তাহলে রটবে, সে কি আর কখনো কাটানো যাবে?

হঠাৎ চমকে কণিকা কান খাড়া করে রাখল। যেন একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না! ঝড়বৃষ্টির শব্দ যা বেড়েছে তাতে অবশ্য বোঝা শক্ত। কিন্তু স্টেশন-ওয়াগন এলে ত তার আলো দেখা যেত দূর থেকেই।

কণিকা আবার তার হাতের কাগজটায় মন দেবার চেষ্টা করলে। খবরগুলো সবই প্রায় পড়া হয়ে গেছে। কলকাতার সেই খুনের খবরটাই আর একবার পড়ে দেখলে। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। অকারণে এ-রকম খুন কি কেউ করে! লোকটার যা বর্ণনা দিয়েছে, তাতে ত অল্পবয়সী ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। মাথায় বর্ষাতি টুপি, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, বর্ষার দিনে যে কোনো ভদ্রলোকেরই ত এই পোশাক। সেই পোশাকের তলায় উন্মাদ এক খুনী চলাফেরা করেছে কে ভাবতে পারে!

নাঃ, কি রকম অস্বস্তি লাগছে। মধুসূদন এ-সময়টায় থাকলেও দুটো গল্প করে সময় কাটানো যেত। মানুষটা বকবক

করে বেশী, রসিকতাগুলোও বেয়াড়া, তবু বেশ হাসিখুশি বলে সঙ্গী হিসেবে ভালোই লাগে।

"কে!"—আপনা থেকেই কণিকার গলা দিয়ে চীৎকারটা বেরিয়ে গেল।

বৃষ্টির ঝাপটাটা অন্য দিকে বলে জানলার শার্সি দিয়ে গাড়ি-বারান্দার দিকের রাস্তাটা খানিকটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আগাগোড়া ঢাকা একটা মূর্তি যেন সেখান দিয়ে চলে গেল।

পরমুহূর্তে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠতে কণিকার হাসি পেল নিজের আকস্মিক ভয়ে। খবরের কাগজের কাহিনীটা পড়েই মনটা অমন হয়েছিল।

এ ত স্পষ্ট প্রবীরের কড়া-নাড়া। তার কড়া-নাড়ার ধরনই আলাদা।

কিন্তু প্রবীর এল কিসে! তার গাড়ির শব্দ বা আলো কিছুই ত দেখতে পায়নি!

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে খুলতে সে সেই কথাই ভাবছিল।

দরজা খুলতে প্রবীর ভেতরে না ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে বললে,—শীগ্‌গির কণা, ছাতাটা নিয়ে এসো শীগ্‌গির!"

"ছাতা!"—কণিকা বেশ অবাক্।—"প্রবীরের ত মাথায় বর্ষাতি টুপি, গায়ে ম্যাকিন্টস্! মাথায় ছাতা কি হবে!"

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ছাতাটা নিয়ে এসো। অতিথিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে হবে ত!"

কণিকা একটু বিমূঢ় ভাবেই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে ছাতাটা নিয়ে এসে প্রবীরের হাতে দিলে। প্রশ্নটা কিন্তু সেই সঙ্গে না করে পারলে না,—"অতিথি নিয়ে তুমি এলে কিসে?"

"এলাম গাড়িতে, আবার কিসে? ঠিক বাড়ির কাছে এসেই মোটরটা একেবারে গেল বিগড়ে। আর তার এমন অপরাধই বা কি! একরকম অন্ধের মত ভাসতে ভাসতেই ত এসেছি। হেডলাইট পর্যন্ত গিয়েছে নিভে!"

প্রবীর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতিথিদের আনবার কথা বলেছে যখন, তখন একজনের বেশী নিশ্চয় এসেছেন। এই দুর্যোগেও তাহলে তাঁরা এলেন! হেডলাইট নিভে গেছে বলেই কণিকা গাড়ির আসা টের পায়নি। কিন্তু এত দেরীতে ভাসতে ভাসতে আসার মানে কি? বন্যা কি সত্যিই তাহলে শুরু হয়েছে?

অতিথিরা এসে যে-যার ঘরে যাবার পর জানা গেল কণিকার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে সত্য।

প্রবীরের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বন্যার জল ইতিমধ্যেই চারিদিক ডুবিয়ে দিতে শুরু করেছে। আব-হাওয়ার যা গতিক, তাতে সে জল আরো বাড়বে বলেই মনে হয়।

"সেই জন্যেই কি তোমার এত দেরী হল?"—জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

"শুধু সেই জন্যে নয়। প্রথমতঃ, ট্রেন প্রায় তিনঘণ্টা লেট বলে স্টেশনেই বাধ্য হয়ে থাকতে হ'ল বিকেল অবধি। বেণীবাবু এই ট্রেনে আসবেন লিখেছিলেন। তাঁকে ছেড়ে ত আর আসা যায় না। তারপর রাস্তায় আবার মিঃ বীরস্বামীকে উদ্ধার করতে বেশ খানিকটা সময় গেল।"

"উদ্ধার করতে কি রকম? নামটাও বলছ বীরস্বামী। উনি বাঙালী নন?"

"না, দেশ দক্ষিণ ভারতে কোথাও ছিল, তবে শুনলাম বাংলাদেশেই বহুকাল ধরে আছেন বলে বাংলাটা মাতৃভাষার মতই হয়ে গেছে।"

"কিন্তু ওঁকে উদ্ধার করতে হ'ল কেন?"—কণিকার কাছে ব্যাপারটা যেন কেমন আজগুবি মনে হচ্ছিল।

"উদ্ধার করতে হ'ল—ওঁর গাড়ি বানের জলে অচল হয়ে যাওয়ার দরুন উনি একেবারে তেপান্তরের মাঝখানে সত্যিই কূল পাচ্ছিলেন না বলে। অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মাঝে দূরে একটা আলো জ্বলতে-নিভতে দেখেই আমাদের প্রথম কেমন অদ্ভুত লাগে। তারপর মোটরের হর্ন শুনে সেদিকে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের ওই অবস্থা। ওঁকে তুলতে গিয়ে আমাদের গাড়িই ত খানায় পড়ে প্রায় উল্টে গেছল আর কি!"

"কিন্তু ভদ্রলোক ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?"—কণিকা প্রশ্ন না করে পারল না।

"অত কথা জিজ্ঞাসা করিনি।"—প্রবীর একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললে,—"কেউ বিপদে পড়লে কি অত জেরা ক'রে তবে তাকে সাহায্য করতে হয়!"

"না, তা হয় না। তবে কোথায় দেশ, বাংলা ভাষায় কি ক'রে এত দখল, এত কথা যখন জেনেছ, তখন ওই কথাটাও জিজ্ঞাসা করতে পারা যেত না!"

"তোমার কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রবীর।

"জানি না, কিন্তু আমার কেমন ভালোও লাগছে না! একে এই দুর্যোগ ঠিক হোটেল খোলার পরই, তার ওপর আমাদের বোর্ডাররাও কেমন যেন সব অদ্ভুত জুটেছে আমার মনে হচ্ছে।"

প্রবীর হেসে ফেলে বললে,—"বোর্ডার ত আর নিজেরা বাছাই করে নেওয়া যায় না। তাহলে তোমার ওই সিনেমা-হীরো, থুড়ি, মহাকবিকে আগেই বিদেয় করতাম।"

এবার কণিকা হেসে ফেলেছে,—"তোমাদের সত্যি কুক্ষণে দেখা হয়েছে। নইলে মধুসূদন ছেলেটা সত্যি খারাপ নয়। একটু মাত্রাজ্ঞান কম, এই যা।"

প্রবীর কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

"এখন আবার ফোন করে কে!"—ব'লে কণিকাই গিয়ে ফোনটা ধরলে।

"হ্যালো!"— একটু অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল,—"কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস?"

কণিকা 'হ্যাঁ' বলবার আগেই ওধার থেকে আবার প্রশ্ন হল,—"ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"—উচ্চারণে একটু রাঢ় দেশের টান।

"যা বলতে চান আমাকেই বলতে পারেন!"—কণিকা জানালে।

"কে আপনি?"—আবার প্রশ্ন হ'ল।

"আমি—মানে—এ স্বাস্থ্যনিবাস আমরাই খুলেছি। আমি মিসেস লাহিড়ী।"

"ওঃ, আপনি মিসেস লাহিড়ী! আচ্ছা শুনুন,"—আওয়াজটা এবার বেশ গম্ভীর হয়ে এল,—"আমি বরাকর থানা থেকে ইসমাইল সাহেব বলছি।"

নিজের অজান্তেই কণিকা বুঝি একটু চমকে উঠল,—"ও, থানা থেকে বলছেন! কি ব্যাপার বলুন ত!"

"দেখুন একটা বিশেষ দরকারে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালকে আপনাদের ওখানে পাঠিয়েছি। ফোনে বেশীকিছু আর বলতে চাই না। যা বলবার তিনিই গিয়ে বলবেন। তাঁর পৌঁছোতে বিশেষ দেরী হবে না।"

"কিন্তু—কিন্তু এখানে আসবার ত কোনো উপায় নেই। রাস্তাঘাট সব বন্যার জলে ডুবে গেছে যে। বন্যা ক্রমশঃই বাড়ছে।"—কণিকার আশঙ্কাটা যেন আশার মতই শোনাল।

ওধার থেকে একটু যেন কড়া গলাতেই শোনা গেল,—"প্রলয় হলেও তিনি ঠিকই পৌঁছোবেন। আপনাদের ভাবনা নেই। আর শুনুন, আপনার স্বামী মিঃ লাহিড়ীকে তাঁর সব কথা ভালো করে শুনে তাঁর নির্দেশ মত সবকিছু করতে বলবেন। কোনো ত্রুটি যেন না হয়।"

"কিন্তু ইসমাইল সাহেব!…" কণিকা আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওধারে লাইন কেটে দেবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কণিকার দিকের একতরফা কথা শুনেই চিন্তিত মুখে প্রবীর তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন ভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি, ব্যাপার কি? কি বলছে বরাকর থানা থেকে?"

কণিকা তখনও নিজেকে ভালো করে সামলাতে পারেনি। ধরা-গলায় বললে,—"কে একজন সি-আই-ডি অফিসার না ইন্‌স্পেক্টরকে এখানে পাঠাচ্ছে।"

"সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর!"—প্রবীরের চোখ বড় হয়ে উঠল,—"কেন?"

"জানি না। ইন্‌স্পেক্টরই এসে আমাদের জানাবে বললে।"—কণিকা অসহায় ভাবে প্রবীরের দিকে তাকাল।

"কিন্তু পুলিশ আসবার একটা কারণ ত চাই!"—প্রবীর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলে,—"এখানে কিছু ত হয় নি!"

"কি করে তা জানছ!"—কণিকা কাতর ভাবে বললে, "আমরা—আমরা কোনো অন্যায় কি করেছি?—কোনো আইন ভেঙেছি কি ভুলে? সেদিন ওপার থেকে গরুরগাড়িতে চাল আসছিল। একটু সস্তা বলে তাই কয়েক বস্তা কিনেছিলাম। কিন্তু তা ত বে-আইনী নয় আজকাল।"

"কি বাজে বকছ!"—প্রবীর একটু বিরক্ত হয়েই বললে,—"বে-আইনীও যদি হয়, যদি চোরাই মালও কিনে থাকো, তার জন্যে এই বন্যার মধ্যে সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর আসে নাকি?"

"তাহলে? তাহলে?—" কণিকা উদ্বেগের সঙ্গে বললে,—"আমাদের এখানে এমন কোনো লোক কি এসেছে পুলিশ যাকে খুঁজছে? আমরা কিন্তু তা কি করে বুঝব?"

"নিশ্চয়ই—আমাদের কি দোষ! তুমি মিছিমিছি ভেবোনা!"—বলে প্রবীর কণিকাকে কাছে টেনে একটু আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু কণিকার মন এত সহজে শান্ত হবার নয়। স্বামীর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সে অনুশোচনার সঙ্গে বললে,—"এখন মনে হচ্ছে এ স্বাস্থ্যনিবাস না খুললেই হ'ত। গোড়াতেই এই দুর্যোগ, তার ওপর কি হাঙ্গামা এখন হবে কে জানে!"

হাঙ্গামা যে তাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে কে জানত। পরের দিন সকালেই জানা গেল বন্যার জল দ্বীপের মত তাদের বাড়িটাকে ঘিরে প্রায় নিচের তলার ঘরগুলোতে ঢোকবার

উপক্রম করছে। ভিত্ নেহাত উঁচু বলেই এখনো তারা রক্ষা পেয়েছে। এ জল কতদিনে নামবে কে জানে!

ভোরে উঠে বোর্ডারদের ঘরে চা পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেদের ঘরেই বসে প্রবীর ও কণিকা এই সমস্যারই আলোচনা করছিল,—এমন সময় ঘরের আধ-ভেজানো দরজাটায় এবার টোকা সোনা গেল।

কণিকা 'আসুন' বলার আগেই মিস্ ধর বেশ একটু অপ্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকেই গলা ছাড়লেন।

"এই যে তোমরা এখানে! বলি পয়সা-কড়ি ত কিছু কম নেবে না, কিন্তু সাধারণ সুবিধাগুলোও না দিয়ে কি ডাহা ফাঁকি দেবে এমন করে?"

"কি, হয়েছে কি?"—প্রবীর একটু রূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

"কি হয়েছে? ওপরের বাথরুমে এক ফোঁটা জল নেই। ওপরে ঘর নিয়ে জলের জন্যে কি নিচ-ওপর করব নাকি রাতদিন।"

প্রবীরের ইচ্ছে হ'ল বলে,—'জলের অভাব কি? বাইরে বানের জলে ত ডুবে মরতেও পারেন!'—কিন্তু নিজেকে সামলে সে গম্ভীর ভাবে বললে,—"আচ্ছা, আমি দেখছি।"

প্রবীর বেরিয়ে যাবার পর মিস্ ধর কণিকাকে নিয়ে পড়লেন,—"দেখো বাপু, কিছু মনে না করো ত বলি। ওই ছোকরার রকম-সকম আমার ভালো লাগছে না!"

ছোকরা বলতে যে মধুসূদনের কথাই বলছেন, তা বুঝেও কণিকা জিজ্ঞাসা করলে ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করে—"কার কথা বলছেন?"

"ওই যে তোমার ফাজিল অসভ্য ছোকরা—চুলগুলো যার কাকের বাসা হয়ে আছে। চুলগুলোও আঁচড়াতে পারে না?"

চুল না আঁচড়ানোটা কত বড় অপরাধ বুঝতে না পেরেই বোধহয় কণিকা চুপ করে রইল। মিস্ ধর আবার বললেন,—"ওর নামটাও আমার যেন ভাঁড়ানো মনে হয়। কোথায় মহাকবি মধুসূদন দত্ত, আর কোথায় এই বকাটে একটা বাউণ্ডুলে!"

মনে মনে চটলেও বাইরে হালকাভাবে কণিকা মিস্ ধরকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলে,—"কানা ছেলের নামও পদ্মলোচন হয় ত?"

"হয়, কিন্তু এ ছোকরাকে দেখেই মনে হয় ওর ভেতর গণ্ডগোল আছে। কি জানো তুমি ওর সম্বন্ধে?"

এবার আর কণিকা বিরক্তিটা চাপতে পারলে না, একটু কঠিন স্বরেই বললে,—"এই, আপনার সম্বন্ধেও যতটুকু জানি ততটুকুই। আপনি একমাসের জন্যে, আর মধুসূদন সাত দিনের জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে এসেছেন। আপনারা যা নাম দিয়েছেন তা-ই আমাদের খাতায় লেখা হয়েছে। তার জন্যে পুলিশে খবর নিতে যাইনি। আপনারা এখানে কে কি, তা ত আমার জানবার দরকার নেই। আমার ন্যায্য পাওনা শুধু চুকিয়ে দিয়ে এখানে অন্য গোলমাল না করে যে খুশি আপনারা থাকুন না! আপনাদের ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে আমার কি দরকার?"

মিস্ ধর একটু যেন জব্দ হলেন, কিন্তু গলার ঝাঁঝ তাতে ক'মল না।—"তোমাদের বয়স কম, দুনিয়ার কিছুই জানো না, তাই ভালো দুটো পরামর্শই দিতে এসেছিলাম। পছন্দ না হয় নিওনা। এই যে, কোত্থেকে উটকো একজন লোক না-বলে-কয়ে কাল রাত্রে এসে উঠেছে এখানে। বাঙালীও নয়। কি মতলবে কে অমন এসেছে তাই বা কে জানে?"

এই ধরনের প্রশ্ন নিজেই কাল রাত্রে করেছে মনে ক'রে কণিকার গলায় বিরক্তিটা এবার আর প্রকাশ পেল না। স্বাভাবিক গলাতে প্রবীরের কথাগুলোই সে বললে,—"কিন্তু আমাদের উপায় কি বলুন। বন্যার জলে মোটর খারাপ হয়ে ভদ্রলোক বিপদে পড়েছিলেন। তাঁকে আশ্রয় না দিয়ে ফেলে আসা যায়?"

"কিন্তু যাই বলো, ওই বীরস্বামী না কী নাম নিয়ে যে এসেছে, আমার ত মনে হয়…"

"ব'লে ফেলুন যা মনে হয়, ব'লে ফেলুন।"—আসামীর নাম করতেই সে হাজির।

মিস্ ধর ও কণিকা দুজনেই চমকে সে-দিকে তাকাল। মিঃ বীরস্বামী কখন নিঃশব্দে যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরও পায়নি তারা।

"ওঃ—একেবারে চমকে গেছলাম!"—মিস্ ধর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বীরস্বামীর দিকে তাকালেন,—"কখন এসেছেন টেরও পাইনি!"

"হ্যাঁ, আমি একেবারে চুপি চুপি আসি!—এমনি করে পা টিপে টিপে!"—বীরস্বামী একটু হেঁটে চুপি চুপি আসাটা দেখিয়েও দিলেন।—"কেউ কিছু টের পায় না ব'লে কত মজার কথা শুনতে পাই। আর যা শুনি, আমি কখনো ভুলি না।"

মিস্ ধর কেমন যেন একটু ভড়কে গেছেন মনে হ'ল।—"যাই বাথরুমের কি হল আবার দেখি।"—বলে আর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না।

বীরস্বামী তার পেছনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, তারপর কণিকার দিকে ফিরে একটু সকৌতুক স্নেহের সুরেই বললেন,—"আমাদের গৃহিণী দেবী একটু যেন ভাবনায় পড়েছেন মনে হচ্ছে!"

চেহারা ভারিক্কি এবং মাথার চুল পাকা হ'লে কি হয়, বীরস্বামীর ধরন-ধারণ কেমন একটু ভাঁড়ের মত। চলন-বলনও ঠিক বয়সের উপযোগী নয়,—যেন বুড়ো খোকা ধরনের।

প্রবীরের যেমন মধুসূদনকে, কণিকার তেমনি লোকটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লাগেনি। তবু জবাব একটা না দিলে নয়, কণিকা তাই একটু হেসে বললে,—"ভাবনার আর অপরাধ কি বলুন! এই বন্যায় কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে!"—ব'লে বীরস্বামী আবার হো-হো ক'রে হাসলেন।

বিমূঢ় ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে কণিকা বললে,—"বুঝতে পারলাম না আপনার কথা!"

"পারলেন না বুঝি!"—বীরস্বামীর চোখে যেন দুষ্টুমির হাসি,—"এখন না পারুন, পরে হয়ত পারবেন। তবে অনেককিছুই আপনি বোঝেন না তা দেখতেই পাচ্ছি।"

"যেমন?"—কণিকা এবার একটু উষ্ণ।

"যেমন অতি সরল হওয়া ভালো নয়।"

"আমি যে অতি সরল তা এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছেন?"—কণিকা বিদ্রূপের স্বরে বলবার চেষ্টা করলে।

"তা আর বুঝিনি? এই ভারতবর্ষের সাতঘাটের জল এই বয়স পর্যন্ত কি খেয়ে বেড়াচ্ছি মিছিমিছি?"

"আপনি সারা ভারতবর্ষই ঘুরে বেড়ান বুঝি?"

"দরকার হলেই বেড়াই, আবার ঘাপ্‌টি মেরেও থাকি কখনো কখনো।"—বলে বীরস্বামী আবার হাসলেন।

বীরস্বামীর যাবার কোনো নাম নেই। তাই নেহাত আলাপ চালাবার জন্যেই কণিকা বললে,—"বাংলাটা বেশ ভালো বলতে পারেন ত দেখছি?"

"আপনি তারিফ করছেন তা হলে! বাংলা কিন্তু আমার মাতৃভাষা নয়।"

"তা ত নাম শুনেই বুঝছি!"—মুখে বললেও কণিকার কেমন হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, হয়ত বীরস্বামী নামটাই মিথ্যে।

তার সন্দেহটা যেন বুঝতে পেরেই বীরস্বামী বললেন,—"অবশ্য আমি বলছি বলেই যেন সব কথা বিশ্বাস করে বসবেন না। বিশ্বাস কাউকেই করবেন না, অতি আপন জনকেও।"

"আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ!"—কণিকার গলাটা কিন্তু অপ্রসন্নই শোনাল।

"কথাটা আপনার ভালো লাগলো না বুঝতে পারছি।"—বীরস্বামী তার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসলেন,—"কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়ে খাঁটি কথা নেই।"

একটা জানলার ছিট্‌কিনি বুঝি একটু আলগা ছিল। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় পাল্লা দুটো সশব্দে খুলে গিয়ে বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজে গেল।

কণিকা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই বীরস্বামী "থাক্, আমিই বন্ধ করছি"—ব'লে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

এবারেও কণিকা লক্ষ্য করলে যে বয়সের তুলনায় বীরস্বামীর চলাফেরা বেশ চটপটে যুবকের মত।

জানলাটা বন্ধ ক'রে বীরস্বামী পাশের টেবিলের একটা বই হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এমন সময় যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে কণিকা সত্যিই অবাক! দু'বেলা খাওয়ার সময়টিতে ছাড়া নিজের ঘর থেকে যিনি বার হননা, সেই ডাঃ বাজপেয়ী নিজে থেকে এ ঘরে নেমে আসবেন, কণিকা ভাবতেই পারেনি।

ডাঃ বাজপেয়ীর সদা-গম্ভীর মুখে সাধারণতঃ কোনো ভাব-টাব বিশেষ ফোটে বলে মনে হয় না। এখনও তিনি ঘরে ঢুকে সেই কাঠের মূর্তির মত চেহারা নিয়েই উচ্ছ্বাসহীন ভারী গলায় বললেন,—"মাফ করবেন। মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেলাম না। ওপরের ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমার ঘরের আলো জ্বলছে না।"

'দিনের বেলায় আলো নিয়ে কি করবেন!'—কণিকা হয়ত বলতে পারত। কিন্তু দিনের পর রাত ত আসবে। কোনো মিস্ত্রী পাবার যেখানে আশা নেই সেখানে ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হলে অবস্থা কি হবে কল্পনা করে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

"কি বিপদ দেখুন ত! এদিকে বন্যা, ওদিকে পুলিশ আসছে, তার উপর আবার এই ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হওয়া!"—তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

কারুর কাছে কোনো সহানুভূতি পাবার আশায় কণিকা কথাটা বলেনি, কিন্তু ওই ক'টা কথায় অমন ফল হবে সে জানত না।

বীরস্বামীর হাতের বইটা সশব্দে পড়ে গেল। ডাঃ বাজপেয়ীর ভাবলেশহীন মুখখানাতেও কেমন যেন একটা বিমূঢ়তার চেহারাই ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রায় ধরা-গলায় বললেন,—"কি বললেন? পুলিশ আসছে?"

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখোশের মত মুখের পেছনেও একটা কিছু আবেগের আলোড়ন যে চলছে তা কণিকার অগোচর রইল না। সেটা সন্দেহ, না ভয়, না উত্তেজনা, তা ঠিক বোঝা শক্ত। কণিকার হঠাৎ মনে হ'ল এই নিরীহ চেহারার গম্ভীর লোকটির ভেতরে গভীর কোনো রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাঃ বাজপেয়ী প্রায় স্বাভাবিক গলাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"পুলিশ আসছে বললেন না? কি ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, বরাকর থানা থেকে কাল রাত্রে ফোন করেছিল। কে একজন সি-আই-ডি অফিসারকে ওঁরা এখানে পাঠিয়েছেন বললেন।"—জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কণিকা একটু আশার সুরেই বললে,—"এখনও পর্যন্ত যখন আসেনি, তখন এই বন্যায় আর আসতে পারবে বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু পুলিশ আসছে কেন?"—ডাঃ বাজপেয়ী কণিকাকেই যেন জেরা করলেন।

কণিকা কিছু বলবার আগেই, "ঝকমারী হয়েছে হোটেল খোলা"—ব'লে প্রবীর ঘরে ঢুকল। তারপর বোর্ডার দুজনকে ঘরে দেখে ও তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি, হয়েছে কি?"

ডাঃ বাজপেয়ী-ই তার দিকে এগিয়ে গেলেন,—"শুনলাম সি-আই-ডি পুলিশ এখানে আসছে। কেন বলুন ত?"

"কে জানে কেন!"—প্রবীর বিরক্তির সঙ্গে বললে,—"কিন্তু আসছে বললেই ত হয় না। ওপর থেকে যা দেখলাম, চারিধার একেবারে সমুদ্র হয়ে গেছে। দিগ্বিদিক চেনবার উপায় নেই। পুলিশ কেন মিলিটারী হলেও আজ আর আসবার উপায় নেই।"

হঠাৎ জানলায় সজোরে শক্ত-কিছুর দুবার ঘা দেওয়ার শব্দ শুনে চারজনেই চমকে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শার্সিটা বৃষ্টির ছাটে প্রায় ঝাপসা। কিন্তু তারই ভেতর অস্পষ্ট একটা মূর্তি যেন শূন্যে কে এঁকে দিয়েছে। হাতে তার একটা যেন মুদ্গর বলেই মনে হল।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থেকে ডাঃ বাজপেয়ী-ই প্রথম জানলার দিকে ছুটে গেলেন। ক্ষিপ্র হাতে জানলা খুলতেই শূন্যে আঁকা মূর্তির রহস্য খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ওধারে একটি লোক ছোট একটি ফাঁপানো রবারের ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে জানলার একটা গরাদে ধরে আছে। তার অন্য হাতে ছোট একটা বৈঠা। বন্যার জল প্রায় জানালার তলা পর্যন্ত পৌঁছোবার দরুনই নৌকোর ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে ঠিক শূন্যে ভাসছে বলে মনে হচ্ছিল।

ডাঃ বাজপেয়ী জানলা খুলতেই সে একটু মাথা নুইয়ে হেসে বললে,—"ধন্যবাদ! আপনাদের দরজাটা একটু যদি খুলে দেন। আমি ইন্‌স্পেক্টর ঘোষাল।"

"ইন্‌স্পেক্টর ঘোষাল!" ডাঃ বাজপেয়ী সবিস্ময়ে আপনা থেকেই বলে উঠলেন।

অন্য সবাইও তখন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবীর নিজেই এবার এগিয়ে গিয়ে বললে,—"বাইরের দরজা তা ওদিকে। অতদূর ঘুরে আপনাকে যেতে হবে না। এর পরেরটা ফ্রেঞ্চ-উইনডো। আমি খুলে দিচ্ছি, দাঁড়ান।"

'ফ্রেঞ্চ-উইনডো'-টা খোলবার পর ঘোষাল নৌকো নিয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকলেন। রবারের ভেলার ভ্যাল্‌ভটা তারপর খুলে দিয়ে বললেন,—"দরজাটা এখন বন্ধ করে দিতে পারেন। আর আমার এই অকূলের কাণ্ডারীটিকে রাখবার একটা জায়গা যদি দেখিয়ে দেন।"

ফ্রেঞ্চ-উইনডোর পাল্লা দুটো বন্ধ করে প্রবীর বললে,—"আসুন আমার সঙ্গে।" হাওয়া বেরিয়ে ভেলাটা তখন চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। একহাতে সেটা তুলে নিয়ে ঘোষাল প্রবীরের পেছনে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু যাবার আগে একটু বাধা পড়ল। মিস্ ধর ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন,—"আপনি ইন্‌স্পেক্টর ঘোষাল? রবারের
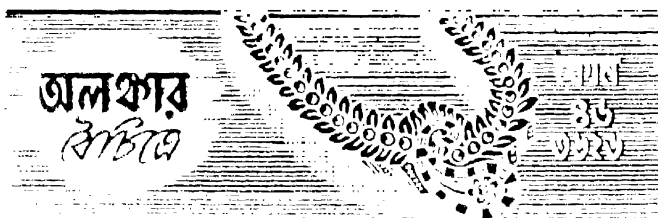
নৌকো বেয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে আসতে হয়, এমন কি ব্যাপার এখানে হয়েছে ?"

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"একটু সবুর করলেই সব জানতে পারবেন।"

"আচ্ছা, কি জানান দেখি! পুলিশের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। হেলে ধরতে পারেনা কেউটে ধরতে যায়। আর পাঠিয়েছে কিনা আপনার মত এক ছোকরাকে! এই বয়সে ইন্‌স্পেক্টর! কোনো খুঁটির জোরে বোধহয় প্রমোশন পেয়েছেন!"

"তা হয়ত পেয়েছি!"—ঘোষাল আবার হাসলেন,—"কিন্তু আমার বয়স যত কম ভাবছেন তত নয়।"

ঘোষাল প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার পর বীরস্বামী-ই প্রথম কণিকার কাছে এসে তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"পুলিশ কেন ডাকিয়েছেন মিসেস লাহিড়ী ?"

এ যেন আরেক বীরস্বামী। চোখ দেখলে ভয় করে। কণিকা তাড়াতাড়ি বললে,—"আমরা ডাকিনি বিশ্বাস করুন। ওই ত শুনলেন কি জন্যে এসেছে খানিক বাদে জানাবে।"

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত মধুসূদন এসে ঘরে ঢুকল, যেন দারুণ মজার ব্যাপার, এই ভাবে সোল্লাসে সে বলে উঠল,—"আরে, নরক ত একেবারে গুলজার! শুনলাম, শুনলাম কেন দেখলাম, পুলিশ এসেছে রবারের ভেলায় ভেসে। দারুণ একটা-কিছু তাহলে ঘটছেই। একেবারে রোমাঞ্চকর উপন্যাস!"

তার স্ফূর্তিতে কিন্তু আর কারুর সায় দেখা গেল না।

ডাঃ বাজপেয়ী তার দিকে একবার ভ্রূকুটি করে বললেন,—"আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি, মিসেস লাহিড়ী ?"

"নিশ্চয়ই পারেন।"

ডাঃ বাজপেয়ী ফোন করতে যাবার পর মধুসূদন আর একবার স্ফূর্তির স্বরটা ধরাবার চেষ্টা করলে,—"ইন্‌স্পেক্টর কিন্তু বেশ দেখতে! আজকাল বাঙালী পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে বেশ ভালো ভালো চেহারা দেখা যাচ্ছে। আমার ছেলেবেলা পুলিশ সার্জেন্ট হবার খুব শখ ছিল···"

তার কথার মাঝখানে ডাঃ বাজপেয়ীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল।—"ফোনে যে কোনো আওয়াজ নেই, মিসেস লাহিড়ী! একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

"সে কি!"—কণিকা ডাঃ বাজপেয়ীর কাছে ছুটে গেল।—"এই খানিক আগেই ত ঠিক ছিল, উনি বরাকরের একটা দোকানে ফোন করে বন্যার খবর নিলেন।"

হঠাৎ মধুসূদনের উচ্চহাসিতে সবাই চমকে উঠল।

"ফোনটাও গেছে তাহলে! ব্যস্, দুনিয়ার সব সম্পর্ক খতম। এই থই-থই জল, এই বাড়ি আর আমরা ক'জন। তারমধ্যে আবার একজন টিকটিকি অফিসার। বাঃ, নাটক যা জমবে!"—আবার মধুসূদনের হাসি আর থামতে চায় না।

"থামুন!"—বীরস্বামী-ই ধমক দিলেন,—"এটা হাসির ব্যাপার নয়।"

মিস্ ধর সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন,—"ফোনের লাইন কেউ নিশ্চয় ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছে। তুমি, তুমি মধুসূদন কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"আমায় সন্দেহ করছেন!"—মধুসূদন আবার হেসে উঠল,—"কাটতে চাইলেও আমার দ্বারা ও-কাজটি হ'ত না। ও ইলেকট্রিক-টিলেকট্রিকে আমার বড্ড ভয়। কখন কোথায় শক্ খেয়ে মরি আর কি? কিন্তু আপনি?"—হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে মধুসূদন বললে, "আপনাকে পেছনের দিক দিয়ে ভেজা-কাপড়ে যেন আসতে দেখলাম ওপর থেকে! আমি চিলের ছাদ থেকে বন্যার দৃশ্য দেখছিলাম কিনা!"

"আমি!"—মিস্ ধর একেবারে আগুন।—"আমি ত আমার—আমি, একটা জিনিস আনতে গেছলাম। ওপর থেকে জানলা দিয়ে পড়ে গেছল।"

"কি পড়ে গেছল ?"—বীরস্বামী-ই জিজ্ঞাসা করলেন।

"তাতে আপনাদের কি দরকার ?"—মিস্ ধর রেগে ঘর থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রবীর ও ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালকে ফিরতে দেখে তাঁকে থামতে হ'ল।

ঘোষাল মিস্ ধরের মুখ দেখেই কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ব্যাপার কি,—কি বলে··· ?"

"আমার নাম মিস্ ধর।"—মিস্ ধর নিজেই ঝাঁঝালো গলায় জানালেন।

"তা, মিস্ ধর, হঠাৎ এত চটেছেন কেন ?"—একটু মধুর ভাবেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন।

"চটব না! এত বড় আস্পর্ধা! বলে কি-না আমি ফোনের তার কেটেছি!"

"তা ত বলিনি মিস্ ধর···"—মধুসূদন আরো কি বলতে যাচ্ছিল, ঘোষাল বাধা দিয়ে বললেন,—"ফোনের তার কি কাটা নাকি!"

"কাটা কি-না জানি না!"—ডাঃ বাজপেয়ী বুঝিয়ে দিলেন,—"কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আশ্চর্য!"—ঘোষাল এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা

তুলে নিলেন। খানিক নাড়াচাড়ার পর হতাশ মুখ করে ফিরে এসে বললেন,—"নাঃ, একদম dead! বন্যার দরুন অবশ্য খারাপ হতে পারে। কিন্তু তা নয় বলেই সন্দেহ হচ্ছে।"

একটু চুপ করে কি যেন ভেবে নিয়ে ঘোষাল পকেট থেকে একটা নোটবই বার করলেন। তারপর সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—"চাকর-বাকর বাদে এখানে ত আপনারা সবাই উপস্থিত?"

কণিকা জানালে,—"না, বেণীবাবু ব'লে আর একজন আছেন। তিনি বৃদ্ধ লোক, কাল এই দুর্যোগের মধ্যে এসে অসুস্থ হয়ে ঘরেই আছেন।"

"আচ্ছা, তিনি ছাড়া আপনারা সবাই এখানে আছেন। মিঃ লাহিড়ী ও কণিকা দেবীর কাছে কয়েকটা কথা আমার জানবার আছে। সেটা সেরেই আমি আসছি। আপনারা ততক্ষণ অনুগ্রহ করে এখানে থাকলে ভালো হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর ঘোষালের অনুরোধে প্রবীর ও কণিকা পাশের ছোট লাইব্রেরী-গোছের ঘরটিতে গিয়ে বসল।

ঘোষাল দরজাটা ভালো করে বন্ধ করার পর কণিকা আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি ব্যাপার বলুন, মিঃ ঘোষাল! কিছু অন্যায় কি আমরা করেছি?"

"অন্যায় করেছেন!—ঘোষাল সবিস্ময়ে খানিক কণিকার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন,—"না, না, সে-সব কিছু নয়। আপনারা ভুল বুঝেছেন বলে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে আমি আসিনি, আপনাদের বিপদ যাতে না হয় সেই জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

"বিপদ?—আমাদের কি বিপদ?''—প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"বিপদ মোক্ষদা দেবীর খুন হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। কলকাতায় গিরি মাঝি লেনের সে ঘটনার কথা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে?"—ঘোষাল দুজনের দিকেই চাইলেন।

"হ্যাঁ পড়েছি!"—স্বীকার করলে কণিকা,—"কে না পড়েছে?"

"প্রথমে আমি জানতে চাই যে সেই মোক্ষদা দেবীর সঙ্গে আপনাদের কারুর পরিচয় ছিল কি-না?"

"নামও কখনও শুনিনি!"—বললে প্রবীর। কণিকাও সায় দিলে।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"—ঘোষাল একটু থেমে বললে,—"কারণ গিরি মাঝি লেনে আসবার আগে মোক্ষদা ঠাকরুণ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তখন সবাই তাঁকে মিসেস এম. ডি. বলেই জানত। ওইটেই তাঁর চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আসল নাম যে মোক্ষদামণি দাস, তা অনেকে জানতই না। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটা অনাথাশ্রমের ম্যানেজারী করতেন। 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের কথা শুনেছেন বোধ হয়? অনাথাশ্রমের কেস্‌টা নিয়ে কাগজে তখন খুব হৈচৈ হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা অনাথ হয়েছিল, এমন অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে থাকত। তার মধ্যে তিনটি ভাই-বোন ছিল। অনাথাশ্রমের ছেলে-মেয়েদের ওপর ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস এম. ডি. অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। তিন ভাই-বোন সেই অত্যাচারে একদিন পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী তাদের অত্যন্ত মার-ধোর করেন। একটি ভাই তাতেই জখম হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। মিসেস এম. ডি.-র কথা সাধারণে জানতে পারেনি, কিন্তু তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ কেস্ করে। বিচারের সময়েই মিসেস এম. ডি.-র স্বামী কেমন করে পালিয়ে যান। কিন্তু মানুষের বিচার এড়িয়েও বিধাতার বিচারকে ফাঁকি দিতে পারেননি। তার কয়েকদিন বাদেই মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মারা যান। কেস্‌টা তাতে চাপা পড়ে যায়। মিসেস এম. ডি.-ও অনাথাশ্রম ছেড়ে দিয়ে একটু ভোল পাল্টে ওই গিরি মাঝি লেনে এসে ওঠেন।"

বিবরণ শেষ করে ঘোষাল একটু থামলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—"এই মিসেস এম. ডি.-কে কেউ আপনারা চিনতেন, বা, এই অনাথাশ্রমের সঙ্গে কোন সংস্রব আপনাদের ছিল?"

প্রবীর ও কণিকা দুজনেই দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়ল।

কণিকা তারপর জিজ্ঞাসা করল,—"কিন্তু আমাদের এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"করছি আপনারা বিপন্ন ব'লে।"

"আমরা! আমরা কেন বিপন্ন হব?"—কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"বিপন্ন ত হয়েই আছেন, শুধু কেন হয়েছেন সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করছি।"—ঘোষাল একটু হেসে আবার বললেন,—"জানেন বোধহয় যে, খুনীর পকেটের একটা হ্যাণ্ডবিল পুলিশ পেয়েছে? সে হ্যাণ্ডবিলে আপনাদের এই স্বাস্থ্যনিবাসেরই বিজ্ঞাপন।"

"শুধু সেই হ্যাণ্ডবিল খুনীর পকেটে ছিল ব'লেই এই স্বাস্থ্য-নিবাসে সে হানা দেবে, বুঝতে হবে?"—প্রবীরের স্বরটা অবিশ্বাসের।

"না, শুধু তাই জন্যে নয়। সে হ্যাণ্ডবিলের পেছনে পেন্সিলে কয়েকটা কথাও লেখা ছিল। পুলিশের পক্ষে সে লেখা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।"

"কি লেখা ছিল ? কারুর নাম ?"—উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

"না, নাম নয়। লেখা ছিল—'গিরি মাঝি লেনে শুরু, স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ'। সেই জন্যেই জানতে চাইছি মিসেস এম. ডি.-র বা তাঁর সেই 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনাদের কোন সংস্রব ছিল কি-না। আপনাদের না থাক, বোর্ডারদের আর কারুর ছিল নিশ্চয়। নইলে খুনীর ও-লেখার কোনো মানে হয় না।"

"মানে হয়ত সত্যিই নেই!"—প্রবীর তার সন্দেহটা জানালে।

ঘোষাল হেসে বললে,—"অত সহজে পুলিশ ত আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারে না!"

"তার মানে এখানেও কেউ খুন হবে, বলতে চান!"—কণিকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল ধীরে ধীরে বললেন,—"আপনাদের আমি ভয় পাওয়াতে চাইনি, কিন্তু আমাদের অনুমান তাই। খুনীর অভিসন্ধি যাতে ব্যর্থ করা যায় সেই জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের আন্তরিক সাহায্য পেলে আশা করি আমি বিফল হব না।"—ঘোষালের গলার স্বরে একটু আবেদনের সুরই পাওয়া গেল।

"কিন্তু, এই দুর্যোগে খুনীর পক্ষে এখানে আর আসা সম্ভব ?"—প্রবীর তার মনের সন্দেহটা ব্যক্ত করলে।

ইন্‌স্পেক্টর ঘোষাল একটু যেন অনুকম্পাভরে বললেন,—"আপনি তাই ভেবে আনন্দে আছেন বুঝি ? কিন্তু খুনীর আর আসবার দরকার নেই, এমনও ত হতে পারে।"

"তার মানে ?"—কণিকা অবাক হয়ে ঘোষালের দিকে তাকাল।

"তার মানে, সে হয়ত আগেই এখানে এসে বসে আছে।"

"তা কি করে হতে পারে! এক বীরস্বামী ছাড়া বোর্ডাররা সবাই আগে থাকতে চিঠি দিয়ে ঘর রিজার্ভ করে এসেছেন—"

"আগে থাকতে চিঠি দেওয়ার মত এই খুনের ব্যাপারও সব আগে থাকতে প্ল্যান করা। তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলবেন না। গত শুক্রবার গিরি মাঝি লেনে মোক্ষদা দেবী খুন হয়েছেন। আপনার সমস্ত বোর্ডার-ই এসেছেন তার পরে।"

"তাহলে—তাহলে কি বলতে চান, সেই 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সেই তিনটি ভাইবোনেরই কেউ এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ? তারা ত নেহাত বাচ্ছা!"

"বাচ্ছা তখন ছিল। আজ এত বছর বাদে কি আর তাই আছে ?"

"কিন্তু একজন ত মারা গেছে।"

"হ্যাঁ, যে মারা গেছে সে ছিল সবচেয়ে ছোটো। বয়স তখন তার দশ মাত্র। তার বড় ভাই-এর বয়স তখন পনরো-ষোলো, আর বোনের বারো; বড় ভাই কিছুকাল বাদে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে যায়। বোনটি কোনো একটি ভালো পরিবারে জায়গা পায়। কিন্তু সে পরিবারের কর্তা-গিন্নী দুজনেই হঠাৎ পর পর মারা গেলে কোথায় যে যায়, কোনোও খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"সেই বড় ভাই-ই এ সবের মূলে আছে সন্দেহ করছেন ? কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে তাহলে ও একমাত্র—" এই পর্যন্ত বলেই কণিকা চুপ করে গেল। কণিকা কি যেন একটা কথা চেপে গেল বুঝেও ঘোষাল তা জানবার চেষ্টা করলেন না।

শুধু তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—"বয়স ত ভাঁড়ান যায় মিসেস লাহিড়ী!"

"হ্যাঁ, তা যায়।"—ব'লে কেমন যেন একটু বিব্রত ভাবে কণিকা রান্নাবান্নার ব্যাপারটা একটু তদারক করবার জন্যে একবার রান্নাঘরে যাবার অনুমতি চাইলে।

"না না, এর আবার অনুমতি চাইবার কি আছে!"—ব'লে কণিকাকে ছেড়ে দিয়ে ঘোষাল প্রবীরকেও বোর্ডারদের কাছে গিয়ে তাদের প্রত্যেকের কয়েকটা বিবরণ একটা কাগজে টুকে রাখতে বললেন।

"আপনি এই সাধারণ খবরগুলো নিয়ে রাখুন। আমি খানিক বাদেই যাচ্ছি।"—বলে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষাল ওপরের তলাটা একবার ঘুরে এসে প্রথমে রান্নাঘরেই গেলেন। সেকেলে বিলিতি কায়দার রান্নাঘর। জায়গা প্রচুর।

"আপনার কাজ কি হ'য়ে গেছে, মিসেস লাহিড়ী ?"—একটু সঙ্কুচিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

"হ্যাঁ, এই হয়ে গেল ব'লে! রামসেবককে একটু মসলা বাটতে পাঠিয়েছি, চাকরটাও ওপরে সব পরিষ্কার করতে গেছে। এই ডালটা না দেখলে পুড়ে যাবে।"—একটু

লজ্জিত ভাবে কণিকা বললে,—"যা খাওয়া আজ খাওয়াব, গোয়েন্দাগিরি ভুলে যাবেন !"

"আমায় খেতে দেবেন বলছেন, এই ত আমার ভাগ্য !" —ব'লে ঘোষাল হাসলেন।
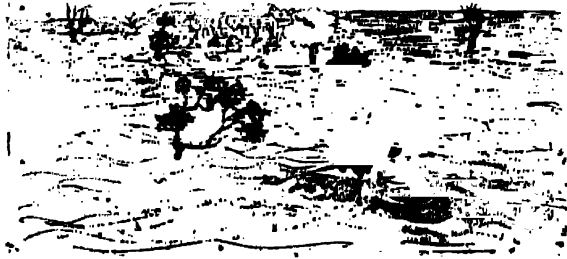
ডালটা নাড়তে নাড়তে কণিকা বললে,—"কিন্তু দেখুন, যত ভাবছি, আমার কেমন সব আজগুবি মনে হচ্ছে।"

"আজগুবি নয় মিসেস লাহিড়ী, একেবারে খাঁটি সত্যি।" —ঘোষাল রান্নাঘরে পাতা একটা ছোট চৌকিতে গিয়ে বসলেন।—"কাগজে খুনীর পোশাকের বর্ণনা ত পড়েছেন। আপনাদের এখানে তিনটি ঘরেই ত সেরকম ওয়াটারপ্রুফ আর বর্ষাতি টুপি টাঙানো রয়েছে দেখলাম। তিনজনের যে-কেউ হয়ত সেদিন কলকাতায় ছিলেন।"

"কিন্তু যাঁদের ওয়াটারপ্রুফ দেখেছেন, তাঁদের কেউই কলকাতার লোক নয়। একটা বীরস্বামীর। তিনি ত পরেই এসেছেন। আর দুটো মধুসূদন আর আমার স্বামীর। আমার স্বামী ত এখানেই থাকেন, আর মধুসূদন পাটনা থেকে এসেছে।"

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"তবু এখানকার কেউ যে খুনের দিন গত শুক্রবারে কলকাতায় গেছলেন, তার ত স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।"

"প্রমাণ! কি প্রমাণ?"—কণিকার ডাল-নাড়া থেমে গেল।

মেঝে থেকে খবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে ঘোষাল বললেন,—"এই কাগজটা।"

"কিন্তু ওটা ত আনন্দবাজার। আমরা ওর গ্রাহক।"—কণিকা ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

কাগজের পাতার মাথার দিকটা দেখিয়ে ঘোষাল বললেন, —"হ্যাঁ, আপনারা গ্রাহক হিসেবে যে কাগজ পান সেটা ডাক এডিশন্, মানে মফস্বল-সংস্করণ। কিন্তু এ কাগজটা কলকাতার। সেখানেই কেনা হয়েছে।"

"কিন্তু ও কাগজ—ও কাগজ কোথা থেকে এল!"—কণিকা ভাববার চেষ্টা করলে।—"পুরোনো কাগজ ব'লে আমি হল থেকে ওটা রান্নাঘরের কাজে লাগাতে নিয়ে এসেছিলাম।"

"মনে করতে চেষ্টা করুন, কে কাগজটা এনেছিল?"—ঘোষাল কণিকাকে উৎসাহ দিলেন।

"না, মনে প'ড়েও পড়ছে না!"—বলে কণিকা হতাশভাবে ঘোষালের দিকে চাইল।

"চেষ্টা করুন। এক সময়ে ঠিক মনে পড়ে যাবে।"

"তাহলে?"—কণিকা সভয়ে প্রশ্নটা আর শেষ করতে পারলে না।

"হ্যাঁ, তাহলে একটা সূত্র অন্ততঃ পাওয়া যেতে পারে এ রহস্যের।"—ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"এখন বুঝতেই পারছেন কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস খুব নিরাপদ জায়গা আর নয়। আচ্ছা, আপনারা ত সবে এটা খুলেছেন। এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে?"

"হোটেলে থাকবার অভিজ্ঞতা আছে, চালাবার নয়। বিয়ের পর বাসার অভাবে হোটেলেই বেশিরভাগ কাটিয়েছি কি-না।"

"বিয়ে আপনাদের কতদিন হয়েছে? কিছু যদি মনে না করেন অবশ্য—"—ঘোষাল একটু কুণ্ঠিত।

"এই দেড়বছর মাত্র।"

একবার যেন ইতস্ততঃ ক'রে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন,—"জানাশোনা অনেক দিনের?"

কণিকা লজ্জিতভাবে বললে,—"না, একরকম হঠাৎ। উনি তখন সদাগরী জাহাজে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আমি এয়ার-হোস্টেসের কাজ করি। বোম্বেতে ক'দিনের দেখা। তারপরই বিয়ে। আমি এক দাদুর কিছু টাকা পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলাম, ওঁকেও ছাড়ালাম। তারপর দেশে ফিরে হা-ঘর জো-ঘর করে দেড় বছর কাটিয়ে এই স্বাস্থ্যনিবাস খোলা!"

"আপনার স্বামী কি কলকাতার লোক?"

"না, ওঁরা প্রবাসী বাঙালী। আগ্রাতেই বুঝি দু-তিন পুরুষ কেটেছে।"—বলতে বলতে কণিকার মনে হ'ল স্বামীর আগের জীবনের কথা কতটুকুই বা সে জানে। প্রবীর সে বিষয়ে কখনো বিশেষ কিছু বলেনি। সে-ও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অতীত নিয়ে মাথা-ঘামাবার দরকারই বা কি, বর্তমান যদি মধুর হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন ত বলি,"—ঘোষাল একটু হাসলেন,—"হোটেল চালাবার মত [illegible] আপনাদের হয়নি। আপনি ত বলতে গেলে—"

কণিকা একটু হাসল,—"তা বয়স কম কি? এই ত তেইশ হ'ল আমার, আর—"

কণিকার কথা শেষ হবার আগেই প্রবীর ঘরে ঢুকল।

"ওঁদের ত যা-যা বলেছেন বুঝিয়ে দিয়ে মোটামুটি খবর নিয়েছি। এবার চলুন।"

"হ্যাঁ, আসুন মিসেস লাহিড়ী!"—ব'লে ঘোষাল এগিয়ে গেলেন।

প্রবীর ও কণিকার সঙ্গে ঘোষাল ঘরে ঢুকতেই সেখানকার গুঞ্জন থেমে গেল।

তারপর প্রথমেই শোনা গেল মিস্ ধরের ঝাঁঝালো গলা—"যা জানতে চান চটপট জিজ্ঞাসা করুন। ভালো হোটেলেই এসেছিলাম! একদণ্ড এসে অবধি স্বস্তি পেলাম না। দোষ পুলিশের! কোথায় কলকাতায় কি হয়েছে তার খোঁজ নিতে এসেছে এখানে? সব অকর্মার ধাড়ি। নইলে এতদিনে একটা খুনের কিনারা হয় না!"...

মিস্ ধরের মুখের তোড় বোধহয় সমানে চলত, কিন্তু ঘোষাল হাত তুলে তাঁকে থামালেন।

"আপনারা ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছেন। এখন শুধু একটি প্রশ্ন আমার করবার আছে।"—ঘোষাল সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন,—"'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনারা কে কে জড়িত ছিলেন?"

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই একদৃষ্টে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে।

"আমার কথাটার মানে ভালো করে নিশ্চয় বুঝেছেন।"—ঘোষাল আবার বললেন,—"আপনাদের একজনের বিপদ একেবারে আসন্ন। কার মাথায় সেই খাঁড়া ঝুলছে আমি জানতে চাই।"

তবুও কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

ঘোষালের গলার স্বরে এবার একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল।—"আচ্ছা আমি এক এক জন করে সকলকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি..." —ঘোষাল প্রবীরের দেওয়া কাগজটা একবার দেখে বললেন,—"আপনি বলুন, মিঃ বীরস্বামী!"

"আমি!"—বীরস্বামীর মুখে একটু হাসির আভাস খেলে গেল,—"আমি ত এদিকের লোক নই। নানা জায়গা ঘুরে বেড়াই। কলকাতার ওই ব্যাপারের কথা শুনিনি পর্যন্ত।"

ঘোষাল মিস্ ধরের দিকে ফিরলেন,—"আপনি?"

"আমি,—আমি?"—মিস্ ধর একটু যেন থতমত খেয়ে বললেন,—"এসব প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না। আমার কোনোও সম্পর্কই নেই ও-ব্যাপারের সঙ্গে।"

"মধুসূদনবাবু?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া আর কাকে?"—ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"আপনার নামই ত মধুসূদন দত্ত।"

"হ্যাঁ,—তবে আমি ত তখন নেহাত ছোটো!"—মধুসূদন যেন অনুশোচনার সঙ্গে বললে,—"এমন একটা দারুণ ব্যাপার জানবার বয়সই হয়নি। তা যদি..."

"ডাঃ বাজপেয়ী!"—মধুসূদনকে কথা বাড়াতে না দিয়ে ঘোষাল ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে ফিরলেন।

ডাঃ বাজপেয়ীর উত্তর দিতে একটু যেন দেরী হ'ল। "আমি—দাঁড়ান মনে করি—হ্যাঁ, আমি তখন ব্যাঙ্গালোরে একটা লেবরেটরিতে কাজ করি।"

"তাহলে কেউই আপনারা অনাথাশ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করছেন না?"—ঘোষাল হতাশ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—"তাহলে কেউ যদি আপনারা খুন হ'ন, তার জন্যে নিজেই দায়ী হবেন।"

কথাটা ব'লে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর মধুসূদন হেসে উঠে বললে,—"ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর হচ্ছে কিন্তু। এই আমরা ক'জন। এর মধ্যে একজন মারা পড়বেন!"

"চুপ করো ফাজিল ছোকরা?"—মিস্ ধর ধমকে উঠলেন।

কিন্তু মধুসূদন অত সহজে থামবার ছেলে নয়। মিস্ ধরের দিকে ফিরে সে বললে,—"ধরুন, চুপিচুপি ঠিক আপনার পেছনে গিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আপনি ফিরতে-না-ফিরতেই গলায় একটি ফাঁস। ব্যস্।"

"থামুন মধুসূদনবাবু!"—প্রবীর সরোষে যেন গর্জন ক'রে উঠল,—"রসিকতার একটা সীমা আছে!"

"কিন্তু এটা যে সীমা-ছাড়ানো রসিকতা। আর রসিক
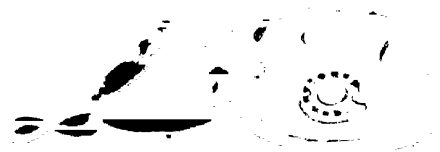
সেই খুনে আমাদের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে!"—হঠাৎ সজোরে হেসে উঠে সে সকলের দিকে চেয়ে বললে,—"নিজেদের মুখগুলো যদি আপনারা দেখতে পেতেন!"

হাসতে হাসতেই মধুসূদন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"অসভ্য বেয়াড়া মর্কট!"—মিস্ ধর তিক্তস্বরে বললেন,—"পাগলা-গারদে রেখে ওর চিকিৎসা দরকার!"

"চিকিৎসা হয়ত আমাদের অনেকেরই দরকার, মিস্ ধর!"—কণিকা মধুসূদনের পক্ষ নিয়ে না ব'লে পারলে না।—"মধুসূদনের একটু মাত্রাজ্ঞান কম। কিন্তু তার কারণও আছে। শুনলাম, একবার ট্রেন-অ্যাক্সিডেণ্টে প'ড়ে ও নাকি বারো ঘণ্টা গাড়ির তলায় চাপা পড়ে ছিল। নেহাত ভাগ্যের জোরে উদ্ধার পায়। তাইতেই একটু কেমন হয়ে গেছে।"

"বিপদে পড়লেই যদি মাথা খারাপ হয়, তাহলে অমন ননীর পুতুলের তুনিয়ায় বাস করাই উচিত নয়। দাঙ্গার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে…"

হঠাৎ মিস্ ধরকে থামিয়ে ডাঃ বাজপেয়ী কঠিন স্বরে বললেন,—"আপনি— দাঁড়ান। ঠিক দাঙ্গার সময় আমিও কলকাতায় এসেছিলাম। আপনার ছবি যেন তখন খবরের কাগজে দেখেছি! গোড়া থেকেই তাই আমি ভাবছিলাম কেমন আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে!"

"আপনার স্মৃতিশক্তি ত খুব!"—বীরস্বামী একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন,—"খবরের কাগজের ছবি এতদিন আপনি মনে করে রেখেছেন!"

"মনে রাখবার একটু কারণও যে আছে।"—ডাঃ বাজপেয়ী নিজের সাফাই দিলেন,—"ওঁর বিবৃতি যে বড় ক'রে ছবিসুদ্ধ কাগজে বেরিয়েছিল। আর সে বিবৃতি একটু অসাধারণ। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না।"

"হ্যাঁ!"—মিস্ ধর একটু গর্বভরেই স্বীকার করলেন,—"আমি তিনদিন মড়ার গাদায় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে ছিলাম। তিনদিন বাদে উদ্ধার যখন হই, তখন যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, তাদের…"

হঠাৎ মিস্ ধর থেমে গেলেন।

"থামলেন কেন? বলুন, মিস্ ধর!"—ডাঃ বাজপেয়ীর স্বর বেশ রূঢ়।

"না, বলছিলাম,—তিন দিন বাদে উদ্ধার পেয়ে আমায় একটা জায়গায় নিয়ে যায়।"

"সাধারণ জায়গা নয়, সেটা 'চাঁপাখোলা' আশ্রম!"—ডাঃ বাজপেয়ী কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ, 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রম-ই হ'ল! তাতে হয়েছে কি?"—মিস্ ধরের ঝাঁঝটা যেন আর নেই।

"হয়েছে এই যে, ওই তিনটি ভাইবোন আপনার বাড়িওয়ালারই ছেলেমেয়ে। আপনার সঙ্গেই তারা ওই আশ্রমে আশ্রয় পায়। তাদের আপনি চিনতেন।"

"হ্যাঁ, চিনতাম, কিন্তু তাই ব'লে তাদের ভার নিতে বললে আমি নেব কোথা থেকে! আমি একলা মানুষ। ও-সব ঝামেলা আমার পোষায়!"—মিস্ ধর যেন কাতর ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলেন।

"তাহলে ওই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনারও সংস্রব ছিল? আপনাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি ওদের ভার নেন নি?"—প্রবীরই এবার জিজ্ঞাসা করলে।

"না, নিই নি, নিইনি!"—মিস্ ধরের গলা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল,—"তখন কি করে জানব যে ওই অবস্থা তাদের ওখানে হবে? আমি ত জেনেশুনে তাদের ক্ষতি করিনি!"

"কিন্তু ইন্স্পেক্টর ঘোষালকে এ কথা তাহলে জানালেন না কেন?"—ডাঃ বাজপেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস্ ধর এবার নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন,—"জানাতে যাবই বা কেন? যতসব বাজে প্রশ্ন! পুলিশ কি-ই বা করতে পারে! তাদের সাহায্য না হ'লেও আমার চলবে।"

"কিন্তু তবু কথাটা জানালে ভালো করতেন।"—ব'লে ডাঃ বাজপেয়ী চলে যাচ্ছিলেন। বীরস্বামীর কথায় তাঁকে থামতে হ'ল।

"আপনি কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে, ডাঃ বাজপেয়ী? শুধু খবরের কাগজের ছবি দেখে আর বিবৃতি পড়ে ত এত জানবার বোঝবার কথা নয়!"

"আমি—মানে—" ডাঃ বাজপেয়ীকে এই প্রথম একটু অপ্রস্তুত দেখা গেল,—"আমার জানা-বোঝাটা খানিকটা স্মরণশক্তি, খানিকটা অনুমান থেকে ব'লে ধরে নিতে পারেন।"

ডাঃ বাজপেয়ী আর ঘরে দাঁড়ালেন না।

কণিকা এতক্ষণ মিস্ ধরকে একটু বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। এবার সে বললে,—"হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। আপনি 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমে অনেক দিন ছিলেন।"

"তুমি! তুমি কি করে জানলে কণিকা!"—প্রবীর তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

কণিকা কিছু বলবার আগেই বীরস্বামীর হাসি শুনে সবাই চমকে উঠল। বীরস্বামী নিজের মনেই খুক্ খুক্ করে হাসছেন। তাঁর দিকে সকলকে চাইতে দেখে তিনি অপরাধীর মত বললেন,—"আমায় মাফ করবেন। মধুসূদনবাবুর মত আমারও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা যত ভয়ঙ্কর, তত মজার লাগছে আমার।"

"ও! আপনার মজার লাগছে বুঝি!"—ঘোষাল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

"মাফ করবেন, ইন্‌স্পেক্টর সাহেব। মাফ করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। নাক-কান-মলা খেয়ে আমি চলে যাচ্ছি।"

বীরস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু যাওয়ার ধরনে মোটেই লজ্জা পাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। যেন ভেতরে-ভেতরে একটা মজা উপভোগ করছেন, এইভাবে চলে গেলেন। এবারও কণিকার মনে হ'ল চটপটে চলার ভঙ্গিটা মোটেই পাকা-চুলের সঙ্গে খাপ খায় না।

"এক কিম্ভূতকিমাকার!"—মন্তব্য করলে প্রবীর।

"ভেতরে গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়। চেহারাটাই কেমন শয়তানের মত।"—ঘোষালও মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন,—"ওরকম লোককে এক-চুল বিশ্বাস করতে নেই।"

কণিকা হঠাৎ বলে উঠল,—"আপনারও তাই মনে হয়েছে তাহলে। কিন্তু ওঁর বয়স ত অনেক বেশী—তবে সত্যিই কি তাই? ভদ্রলোক যেন ঠিক সেজে থাকেন মনে হয়। হাঁটেন কিন্তু জোয়ান পুরুষের মত। হয়ত বুড়োর ছদ্মবেশ ক'রে থাকেন। আপনার কি মনে হয় মিঃ ঘোষাল?"

ঘোষাল একটু যেন রূঢ় ভাবেই কণিকাকে দমিয়ে দিলেন,—"আজে-বাজে জল্পনা করে কোনো লাভ আছে কণিকা দেবী? অনুমান নয়, আমাদের প্রমাণ দরকার। আপাততঃ ফোনটা মেরামত করবার ব্যবস্থা না করলে নয়। আসুন মিঃ লাহিড়ী, দেখি কি করা যায়।"

প্রবীরকে নিয়ে ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন।

*

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোষাল টেলিফোনের তারটা বাড়িতে যেখান দিয়ে গেছে, দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে প্রবীর।

"ওপরে Extention Line গেছে না?"—প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

"হ্যাঁ, ওপরের হলে একটা টেলিফোন আছে।"

"আচ্ছা দেখে আসি।"—ব'লে ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

*

সেই সময়টাতে বীরস্বামীকে এদিক একটু ঘুরে ওপরের হল-ঘরে ঢুকতে দেখা গেল।

হল-ঘরের এক কোণে বড় একটা অর্গ্যান আগেকার দিনের চিহ্নস্বরূপ প'ড়ে আছে। ওপরের ঢাকনাটা সরিয়ে বীরস্বামী এক আঙুলে ক'টা চাবি টিপে একটু বাজাবার চেষ্টা করলেন।

না, অর্গ্যানটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। একটু বেসুরো হ'লেও এখনো আওয়াজ বার হয়।

বীরস্বামী বাজাবার চরকি-টুলটায় ব'সে এক-আঙুলে একটা গানের সুর বাজাতে লাগলেন। গানটা যার জানা সে বুঝতে পারত, সেটা হালফিল হুজুক-তোলা একটা ফিল্মের গান—"সে যে চুপি চুপি আসে!"

*

মধুসূদন তার নিজের শোবার ঘরে শিস দিতে-দিতে পায়চারি করছিল। হঠাৎ শিস থামিয়ে সে বিছানার ধারে ব'সে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে হতাশ ভাবে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল,—"পারব না, আমি পারব না!"

তারপর নিজকে বুঝি সে সামলে নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিজেকেই যেন উৎসাহ দিলে,—"না, শক্ত আমায় হতেই হবে।"

*

প্রবীর নীচের ঘরে টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ টেবিলের ঢাকনার নিচে একটা আধখানা-বেরিয়ে-আসা কাগজ তার চোখে পড়ল। কাগজটা বার করে দেখে তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। কাগজটা কলকাতার এক নাম-করা স্টেশনারি দোকানের রসিদ।

রসিদের তারিখ ৬ই নভেম্বর।

৬ই নভেম্বরই ত সেই শুক্রবার। সেদিন নিজে সে স্বাস্থ্য-নিবাসে ছিল না। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরেছিল।

কণিকা তাহলে কলকাতাতেই গেছল তারই মধ্যে!

*

কণিকা রান্নাঘরে বিকালের জলখাবারের ব্যবস্থা করছিল। ভাগ্যে সেদিন বরাকরে গিয়ে গাড়ি-ভর্তি জিনিসপত্র এনেছিল তাই। নইলে এতগুলো মানুষকে ত উপোস করে মরতে হ'ত। কিন্তু জলখাবারের কিছু অদল-বদল করা ত অসম্ভব।

যা জিনিসপত্র ভাঁড়ারে আছে তা দিয়ে জলখাবারের কী নতুন কিছু করা যায়—ভাবতে-ভাবতে প্রথমে খবরের কাগজের নতুন রান্নার নির্দেশ, এবং তা থেকে সেদিনের সেই আনন্দবাজার পত্রিকার কথা মনে পড়ল।

কার হাতে কাগজটা সেদিন যেন দেখেছিল, কিছুতেই মনে পড়ছে না। হল-ঘরে ডাঃ বাজপেয়ী কি?—না না, বাজপেয়ী নন, কাগজটা কে যেন এনে এক কোণে ফেলে—

হঠাৎ কণিকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মনে হ'ল যেন নিশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে।

না, না—এ হতে পারে না! কখনো হতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে রান্নাঘর থেকে বার হ'ল।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। না, নিস্তব্ধ ঠিক নয়। কোথা থেকে অস্পষ্ট ভাবে শিস শোনা যাচ্ছে। সেই হতচ্ছাড়া ফিল্মের গানটার সুর।

না, আপাততঃ তার আবার রান্নাঘরেই ফিরে যাওয়া ভালো। সেখানে অন্ততঃ খানিকটা একা-একা সমস্ত ব্যাপারটা ভাবা যাবে।

*

ডাঃ বাজপেয়ী ওপরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলেন।

"কেমন আছেন আজ বেণীবাবু?"

বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বৃদ্ধ বেণীবাবু শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছেন। বইটা মুড়ে রেখে হাসিমুখে বললেন,—"ভালো, বেশ ভালো।"

বাঁধানো দাঁতগুলো খোলা থাকার দরুন কথাগুলো অত্যন্ত

"তা ভালো হয়েও বিছানায় শুয়ে-শুয়েই কাটাবেন? একটু উঠে হেঁটে বেড়াবেন না!"

বেণীবাবু ফোকলা মুখে বললেন,—"বেড়াবার জায়গা কি কোথাও রেখেছেন?"—তারপর নিজেই আবার বললেন,—"আমার এই শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম করবার জন্যেই আসা। আমার জন্যে ভাববেন না।"

"আচ্ছা, তাহলে বিশ্রামই করুন।"—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক একবার চেয়ে ডাঃ বাজপেয়ী হঠাৎ মেথরদের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

নিচে নেমে আবার তাঁকে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক চাইতে দেখা গেল। না, কেউ এদিকে নেই।

এবার তিনি সন্তর্পণে পেছনের দিকের একটা বড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের দরজাটা বন্ধ, তবে তালা-দেওয়া নয়। একটা দড়ি দিয়ে কড়া-দুটো বাঁধা।

যা করতে চান, এই তার ঠিক সময়!

ডাঃ বাজপেয়ী ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে দড়ির বাঁধন খুলে ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন।

*

মিস্ ধর নিজের ঘরে ব'সে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। নিচের হল-ঘর থেকে জেদ করে এটা তিনি নিজের ঘরে আনিয়েছেন। রেডিও শোনবার জন্যে নিচ-ওপর তিনি করতে পারবেন না, আর অন্য কারুর যখন আগ্রহ নেই তখন তাঁর ঘরে এটা থাকলে দোষ কি! ওপরের ইলেকট্রিক লাইনের নতুন ফিউজটা লাগাবার সময়ে প্রবীরকে দিয়েই তিনি এ কাজটা করিয়ে নিয়েছেন।

প্রথম চাবি ঘোরাতেই কি একটা বকবকানি শোনা গেল। বিরক্ত হ'য়ে চাবিটা আর একটু ঘোরাতেই একটা গান ভেসে এল।

কি ছাই গান! যেমন গানের কথা, তেমনি সুর!

"সে যে চুপি চুপি আসে:
জানি না কখন এল, কাছে এসে হাসে!"

গানটাও বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকালেন।—"আরে, আমি ভাবলাম..."

কি ভাবলেন তা আর না বলে মিস্ ধর রেডিও নিয়ে পড়লেন,—"কি সব আজে-বাজে গান যে দেয় ছাই! শুনলে গা জ্বালা করে।"

"শুনে আর কি হবে!"

"কিন্তু না শুনে কি করি কি? আগে জানলে এমন জেলখানায় আসতাম! চারিদিকে জল, আর তার মাঝখানে ঠুঁটো হয়ে কোন্ এক খুনে বদমাশের সঙ্গে দিন কাটানো। আমার অবশ্য ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস নেই।"

"বিশ্বাস সত্যি নেই?"

"তার মানে? কি,—কি ব্যাপার—" মিস্ ধর চীৎকার করে উঠলেন।

মিস্ ধরের চীৎকার মাঝখানে থেমে গেল। ওয়াটার-প্রুফের বেল্টটা নিপুণ হাতে ছুঁড়ে গলায় লাগিয়ে তখন ফাঁস টেনে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

রেডিওর চাবিটা আর একটু ঘুরিয়ে দিতেই, 'চুপি চুপি আসা'র গানটা গাঁক-গাঁক করে বেজে উঠল।

অন্য কোনো আওয়াজ আর বিশেষ শোনা গেল না।

খুনী আনাড়ি নয়।

নিচের হল-ঘরে একটা দুঃসহ থমথমে আবহাওয়া। বৃদ্ধ বেণীবাবুও তাঁর বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছেন।

কণিকার মুখ এখনো একেবারে ছাই-এর মত সাদা। প্রবীর তাকে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খেতে দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত শরীর তার যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

মিস্ ধরকে চা দিতে গিয়ে সে-ই প্রথম তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

"আচ্ছা, আপনি ভালো করে আর একবার ভেবে দেখুন, মিস্ ধরের ঘরে যাবার সময় আপনি কাউকে দেখতে বা কোনো কিছু শুনতে পান নি?"—ঘোষাল যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, একটা শিসের শব্দ! না—না, সেটা অনেক আগে। আমি যেন একটা দরজা-বন্ধ-করার শব্দ শুনলাম।"

"কোথায়?"

কণিকা একটু ভেবে বললে,—"আশ্চর্য, আওয়াজটা যেন নিচে বাড়ির পেছনে মনে হয়েছিল।"

"ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করুন মিসেস লাহিড়ী, আপনার মনে করার ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে।"

"না, না—আমি কিছু মনে করতে পারছি না!"—কণিকা কাতর ভাবে মাথা নাড়লে।

"কেন ওকে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন?"—প্রবীর তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

ঘোষাল একটু হেসে বললেন,—"কষ্ট আমি ইচ্ছে করে দিচ্ছি না, মিঃ লাহিড়ী। কিন্তু খুনের তদন্ত খুব মধুর কি হয়?"

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল আবার বললেন,—"মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখনও কত গুরুতর, আপনারা সবাই বুঝতে পারেননি। মিস্ ধর আমার কাছে সত্য কথা বলেননি। তার ফল কি হয়েছে আপনারা জানেন। এখনও সব কথা যদি জানা না যায়, তাহলে আর কাউকে হয়ত জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

"আরো একজনকে? কেন?"—বৃদ্ধ বেণীবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন। বাঁধানো দাঁত প'রে তাঁর কথাগুলো এখন অন্ততঃ স্পষ্ট।

"কেন? তা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় তিন ভাইবোনের নামে তিনজনের প্রাণ নেওয়াই খুনীর উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সেই হ্যাণ্ডবিলের পেছনে যে কথাটা পেন্সিলে লেখা ছিল সেটাও মনে রাখা দরকার।—'গিরি মাঝি লেনে শুরু, স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ!' সে শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আমরা খুশিই হ'ব, কিন্তু তবু সাবধান হওয়াই উচিত।"

"কিন্তু সাবধান কি ভাবে হবেন? বাইরে থেকে কারুর আসবার উপায় নেই। সুতরাং আমাদের একজন যে খুনী এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই একজন যে কে তা বোঝবার কোনো উপায় আছে কি?"—বীরস্বামীর গলার স্বরে পুলিশের ক্ষমতায় একটু অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেল।

ঘোষাল একটু রুক্ষস্বরে বললেন,—"সেই উপায়ই বার করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে যে বিবরণ আমায় দিয়েছেন, আমি আর একবার তা পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোট-বইটা বার করে ঘোষাল এক-এক করে পড়ে শোনালেন।

"মধুসূদনবাবু! আপনি বলছেন যে ঘর থেকে বার হননি?"

"না!"—মধুসূদন যেন কেমন বদলে গিয়েছে। তার সে স্ফূর্তির উচ্ছ্বাস কোথায় গিয়েছে উবে।

"বেণীবাবু!—না, আপনি ত বিছানা থেকে ওঠেননি জানি। আপনি প্রবীরবাবু! টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"—বললে প্রবীর।

"বীরস্বামী ওপরের হল-ঘরে অর্গ্যান বাজাচ্ছিলেন ?"

"তাকে বাজানো বলে না!" বীরস্বামীই শুধু যেন এই ঘটনার পরও সমান তাজা আছেন।—"এক আঙুলে একটা গান বাজাবার চেষ্টা করছিলাম।"

"কি গান ?"

"আপনাদের বাংলাদেশের এখনকার সবচেয়ে চালু গান। বিড়িওয়ালা থেকে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরাও যে গান গায়।"

"কি সে গান ?"—ঘোষাল একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনি জানেন না বুঝি ? সেই—সে যে 'চুপি চুপি আসে'! পাশের ঘরে মধুসূদনবাবুও ত এই গানের সুরই শিস দিচ্ছিলেন।"

ঘোষাল ভুরু কুঁচকে মধুসূদনের দিকে তাকাতে সে যেন একটু বিব্রত হয়ে বললে,—"ঠিক জেনেশুনে ও সুর ভাঁজিনি। নিজের অজান্তেই এসে গেছল।"

ডাঃ বাজপেয়ী এর মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, টেলিফোনের লাইন কি আপনা থেকেই খারাপ হয়ে গেছে, না কেউ কেটে দিয়েছে ? কিছু জানতে পারলেন ?"

"পেরেছি। নিচের খাবার ঘরের বাইরের দেয়ালেই তারটা কাটা। আমি সেই কাটা জায়গাটা তখন সবে খুঁজে বার করেছি, এমন সময় চীৎকার শুনলাম। কিন্তু চীৎকারটা যেন মাঝপথেই থেমে গেল মনে হ'ল। কিন্তু আপনি ডাঃ বাজপেয়ী! আপনি বলছেন বেণীবাবুর ঘরে গেছলেন ?"

"হ্যাঁ—মানে—তাঁর ঘরেই থাকিনি।"—ডাঃ বাজপেয়ী বেণীবাবুর দিকে চেয়েই যেন একটু বেশী বিব্রত হয়ে প'ড়ে বললেন,—"আমি আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম।"

"তা হলে মিস্ ধরের চীৎকার ত আপনার শোনবার কথা। চীৎকারটা হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছল কি ?"—ঘোষাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে তাকালেন।

"হ্যাঁ—মানে—সেই রকমই যেন মনে পড়ছে।"

"এ ত যেন-যদির কথা নয় ডাঃ বাজপেয়ী!"—ঘোষালের স্বর বেশ কঠিন,—"স্মৃতিশক্তি ত আপনার ভালোই বলে শুনেছি।"

"আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন মিঃ ঘোষাল!"—শুধু ঘোষাল নয় আর সকলেও প্রবীরের আচমকা এই কথায় একেবারে চম্‌কে উঠল।

ঘোষালের মুখ-চোখ আত্মসংযমের চেষ্টাসত্ত্বেও লাল হয়ে উঠেছে তখন।

"কোন্‌টা মিছিমিছি করছি বলুন ?"—ভদ্রভাবে বলার চেষ্টাসত্ত্বেও ঘোষালের গলার স্বর একটু অস্বাভাবিকই শোনাল।

"আসল কাজ না করে আর যাই করুন, তাতে মিছিমিছি সময় নষ্ট।"—প্রবীর দৃঢ় ভাবে জানাল।

"আসল কাজটা কি ?"—এতক্ষণে ঘোষালের মুখে হাসি ফুটল।

"আসল কাজ, সবকিছু প্রমাণ যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তাকে এখুনি গ্রেপ্তার ক'রে সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা।"

"সে কে ?"—ঘোষালের মুখ আবার কঠিন হয়ে গেল।

নাটকীয় ভাবে আঙুল দিয়ে দেখাতেই মধুসূদন কাতর ভাবে চীৎকার করে উঠল,—"না, না—আমি না, আমি কিছু জানি না—এ সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! সবাই আমার বিরুদ্ধে আমি জানি···"

"শান্ত হোন মধুসূদনবাবু!"—বৃদ্ধ বেণীবাবুই বলে উঠলেন।

"কিছু ভয় নেই মধু!"—কণিকা তার কাছে এসে তার হাতটা ধরে দাঁড়াল।—"কেউ তোমার বিরুদ্ধে নয়, তোমার কোনো ভয় নেই।"

ঘোষালের দিকে ফিরে কণিকা ব্যাকুল ভাবে বললে,—"বলুন মিঃ ঘোষাল, বলুন ওকে গ্রেপ্তার করবেন না!"

ঘোষাল নিজেই যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন হঠাৎ এই নাটকীয় ব্যাপারে। তিনি হেসে বললেন,—"আমি কাউকেই গ্রেপ্তার করছি না। গ্রেপ্তার করার জন্যে আমার প্রমাণ দরকার—এমন কোনো প্রমাণ আমি এখনো পাই নি।"

"যথেষ্ট পেয়েছেন!"—প্রবীর তীব্র স্বরে বললে,—"কণিকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর আপনাদেরও বোধহয় সকলের। সেই তিন ভাই-বোনের একজন যদি এখানে সত্যিই আছে মনে করেন, তাহলে সে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওর বয়স দেখুন, ওর ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করুন···"

"তুমি একটু থামবে!"—কণিকার চোখে এমন একটা দীপ্তি যে প্রবীরকে থামতে হ'ল।

কণিকা ঘোষালের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বললে,—"আপনার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা আলোচনা করবার আছে।"

"বেশ ত।"—ব'লে ঘোষাল সকলের দিকে চাইলেন।

"আমরা যাচ্ছি!"—ব'লে আর সবাই বেরিয়ে গেলেও প্রবীর দাঁড়িয়ে রইল।

"তোমাকেও যেতে হবে!"—কণিকা দৃঢ় স্বরে বললে।

কণিকার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে প্রবীর এবার বেরিয়ে গেল।

"কি বলতে চান, বলুন।"—ঘোষাল উৎসুক দৃষ্টিতে কণিকার দিকে চাইলেন।

"শুনুন মিঃ ঘোষাল, আপনারা সবাই ধরে নিয়েছেন যে সেই তিন ভাই-বোনের যে বড়, সে-ই এসব ব্যাপারের মূলে আছে।"

"সেই রকম অনেকগুলো প্রমাণ যে পাওয়া গেছে।"

"কি পাওয়া গেছে!"—কণিকা উত্তেজিত ভাবে বললে,—"গিরি মাঝি লেনের খুনীর মুখ কেউ দেখেনি। ওয়াটার-প্রুফের তলায় কে কম-বয়সী, কে বুড়ো কিছু বোঝা যায় না, নেহাত বেণীবাবুর মত অথর্ব যদি না হয়। এখানেও মিস্ ধরকে যে খুন করেছে—সে যুবক না প্রৌঢ় কে বলতে পারে!"

"কিন্তু প্রৌঢ় হ'লে তার এসব খুন করার একটা কারণ ত চাই।"—ঘোষাল বললে।

"কারণ কি কিছু থাকতে পারে না? আপনারা সেই তিনটি ছেলেমেয়ের কথাই জানেন। তাদের কোনো কাকা কি মামা কি থাকতে পারে না, যে হয়ত সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়? সেই অনাথাশ্রমের অত্যাচারের যে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করছে?"

"কাকা মামা কেউ ছিল কি-না ঠিক জানি না। কিন্তু এরকম সন্দেহ আপনার হ'ল কেন?"

"হ'ল ডাঃ বাজপেয়ীকে দেখে। তাঁর অনেকগুলো চাল-চলন কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া পুলিশ আসছে শুনে তাঁর মুখের ভাব কিরকম বদলে গিয়েছিল, আমি স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করেছি।"

ঘোষাল এতক্ষণে সত্যি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন,—"পুলিশ আসছে শুনে মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল,—সত্যি!"

"হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওই মুখোশের মত মুখ ত দেখছেন। সেই মুখের চেহারাও অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল।"
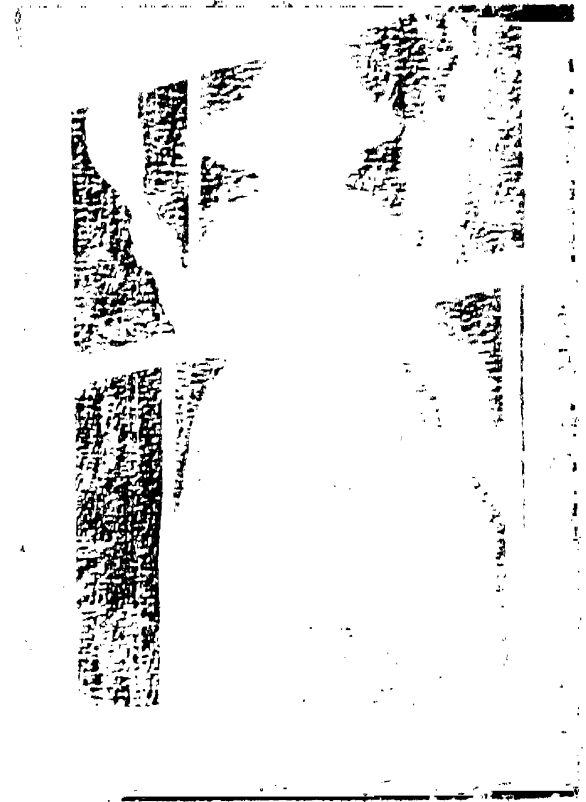
"হুঁ!"—ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বললেন,—"এটা ভাববার কথা। ব্যাপার কি জানেন মিসেস লাহিড়ী, এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে অনেক দিক বিচার করে আমাদের কাজ করতে হয়। কার ভেতর যে কি আছে আমরা কিছুই বাইরে থেকে জানি না। অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না।"

কথাটা বলে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেই ঘোষাল চলে গেলেন। কণিকার মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। যে কথাটা মনের ভেতর সে চেপে রাখতে চাইছে, ঘোষাল সেই কথাটাই তাকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছেন বলেই কি তার এই অসহ্য অস্বস্তি?

'অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না!'—গানের ধুয়ার মত কথাটা কেবলই যেন তার কানে বাজছে।

*

বন্যা, ভূমিকম্প, মৃত্যু, হত্যা—যা-ই কেন ঘটুক না, মানুষকে আহারের চিন্তা তবু করতে হয়। আর তার দায়িত্ব শুধু মেয়েদের।

চাকর-বাকরেরাও এই সব ব্যাপারে কেমন যেন

ড্যাবাচাকা হয়ে গেছে। কণিকাকেই তাই রান্নাঘরের কাজ নিজেকেই দেখতে হয়।

রান্নাঘরে উহুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে সে একাই তখন তরকারির মশলা বাটছিল, এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে মধুস্থদন সেখানে ঢুকল।

"শুনেছেন কণিকা দেবী, শুনেছেন!"

কণিকা চমকে উঠে দাঁড়াল,—"আবার কি হয়েছে!"

"ইন্স্পেক্টর সাহেবের রবারের ভেলাটা চুরি গেছে। ইন্স্পেক্টরের কি রাগ, যদি দেখতেন!"

"কিন্তু সে রবারের ভেলা চুরি যাবে কেন? তাতে কার কি লাভ?"—কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"আমিও ত তাই ভাবছি। ইন্স্পেক্টর যদি হার মেনে রবারের ভেলা করে চলেই যান, তাহলে ত খুনীরই সুবিধে। ইন্স্পেক্টর যাতে যেতে না পারেন সে ব্যবস্থা সে করবে কেন? সত্যি যেন মানে হয় না কোনোকিছুর!"

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুস্থদন আবার জিজ্ঞাসা করলে,—"কি ভাবছেন বলুন ত?"

"ভাবছি, মানে হয়।"

"কি মানে?"

"খুনী ঐ রবারের ভেলা লুকিয়েছে নিজে পালাবার জন্যে। আজ রাত্রের মধ্যেই যদি সে ধরা না পড়ে, তাহলে তাকে আর পাওয়া যাবে না।"

"বাহবা রে, বাহবা! শেষ পর্যন্ত খুনী ধরাই পড়বে না!" —মধুস্থদন হতাশার মুখভঙ্গি করে বললে,—"কিন্তু তাহলে ত ডিটেকটিভ গল্প হ'ল না?"

"জীবনটা ডিটেকটিভ গল্প নয় মধু!"—কণিকা গম্ভীরভাবে বললে,—"এখানে অনেক গল্পই মাঝপথে ছিঁড়ে যায়!"

কণিকার দিকে খানিক একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে মধুস্থদন বললে,—"না, আপনি বড় গম্ভীর হয়ে উঠছেন, আমি পালাই!"

"না, যেয়ো না।"—কণিকা বাধা দিলে।

মধুস্থদন সত্যিই যেন বিমূঢ়,—"আপনি চান না যে আমি যাই! সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ, একা থাকতে আমার ভালো লাগছে না।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় করছে না? আমি যদি—আমি যদি সেই খুনে হই?"—মধুস্থদন স্থির দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

"তাহলে আমার ভুল বিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করব প্রাণ দিয়েই!"—ব'লে কণিকা হাসল। তারপর অকারণেই চোখ-দুটো মুছে বলল,—"না, শোন, তোমায় অত্যন্ত জরুরী কথা আমার বলবার আছে।"

"কি?"—মধুস্থদন একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে চোখটা ফিরিয়ে নিলে।

"তোমার নাম সত্যি মধুস্থদন দত্ত নয়।"

অনেকক্ষণ মধুস্থদনের মুখে কথা নেই। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে সে বললে,—"না, কিন্তু তুমি কি করে জানলে!"

"জানিনি, কিন্তু সন্দেহ হয়েছে। কি তোমার আসল নাম?"

"কি হবে ব'লে?"—ব'লে মধুস্থদন কাতরভাবে কণিকার দিকে তাকাল।

"তবু একজনকে বিশ্বাস করে তুমি শান্তি পাবে! বলো!"—কণিকার স্বরে কোমল অনুনয়।

"না, আমার নাম মধুস্থদন সত্যি নয়।"—ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে মধুস্থদন,—"আমার আসল নাম পবিত্র রায়। আমি—আমি পাটনা থেকেও আসিনি, এসেছি কলকাতা থেকেই পালিয়ে। আমার চিঠির খামটা তোমরা লক্ষ্য করোনি নিশ্চয়, তার পোস্টাপিসের ছাপ দেখলেই বুঝতে পারতে। ভেতরে আমি মিথ্যে করে পাটনার ঠিকানা চিঠির ওপর দিয়েছিলাম।"

"কিন্তু কেন এসব করেছিলে?"

"এখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে বিদেশে কোথাও পালাব বলে। ভেবেছিলাম এই নির্জন স্বাস্থ্যনিবাসে কেউ আমার খোঁজ পাবে না, খোঁজ করবার কথা ভাববেও না। গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমি নিঃশব্দে সরে পড়তে পারব।"

"কিসের গোলমাল সেইটেই ত বুঝতে পারছি না!"—কণিকা বললে।

"এখুনি বুঝতে পারবে। আমি শুধু একটা সুটকেস নিয়েই এসেছি, কিন্তু ওই সুটকেস নোটের তাড়ায় ভর্তি।"

"তুমি! তুমি চুরি করেছ!"—কণিকা স্তম্ভিত।

"হ্যাঁ, চুরিই বলতে পারো। আমার বাবার টাকা-ই চুরি করেছি। আমাদের বড়লোক বোধহয় বলা যায়। বাবার অনেক রকম ব্যবসা আছে। তিনি আমাকে সেই ব্যবসাতে বসাতে চান, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস করো, আমার কাছে সে-সব বিষ। আমি পড়তে চাই, বৈজ্ঞানিক হ'তে চাই, ক্ষমতা আমার কতদূর আমি জানি না, কিন্তু সে-ই আমার স্বপ্ন। বাবা অত্যন্ত রাশভারী জেদী লোক, শুধু নিজের মতেই চলেন। আর কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে প্রায়ই
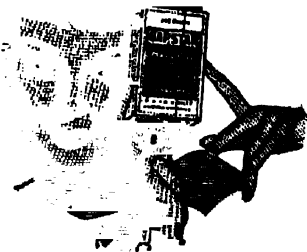
করেন না। একবার দুবার বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে আমি ভয়ে চুপ করে গেছি। কিন্তু অসহ্য লেগেছে আমার ওই ব্যবসাদারীর কাজ। তাই শেষ পর্যন্ত অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পরিকল্পনা করে আগে থাকতে এখানে চিঠি দিয়ে একদিন একটি ব্যবসার সিন্দুকের সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এই বন্যায় সব বন্ধ না হলে হয়ত খবরের কাগজে আমার ছবিসুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখতে পেতে। বাবা নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন, তাঁর কাছে এরকম অপরাধের মার্জনা নেই।"—মধুসূদন একনিশ্বাসে এত কথা ব'লে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। একটা চৌকির ওপর বসে পড়ে দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আবার বললে,—"এখন তোমার ঘৃণা হচ্ছে? বলো, সত্যি করে বলো!"

"না মধু! এতটুকু ঘৃণা হচ্ছে না।"—কণিকার স্বর অত্যন্ত স্নিগ্ধ,—"কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতে হবে। পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কাপুরুষতা কিছু নেই। তুমি তোমার বাবাকে শেষবার গিয়ে বলো, তাঁর ব্যবসার কাজ তোমার দ্বারা হবে না। তাতে তোমার নিজের ইচ্ছেমত কাজ যদি তিনি না করতে দেন, সব ছেড়ে তুমি চলে এসো। জীবনে যদি তারপর বিফলও হও, তবু মাথা তোমার উঁচু থাকবে। বলো, যাবে?"

"যাবো কণিকা দেবী!"

"কণিকা দেবী ভারী বিশ্রী শোনায়।"—কণিকা হাসল,—"ওটা বোলো না।"

"কি বলব তা হলে?"—সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে মধুসূদন।

"কি বলবে জান না?"—কণিকা কপট রাগ দেখালে।

একটু বিমূঢ় হয়ে থেকে মধুসূদন হেসে ফেললে,—"না, এখন হঠাৎ লজ্জা করছে!"

"একটু রসভঙ্গ করছি বোধহয়!"

দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। প্রবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের চেহারা তার গলার স্বরের মতই কঠিন।

পরমুহূর্তেই সে রাগে ফেটে পড়ল,—"এ ঘরে কি জন্যে তুমি এসেছ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে কি এত তোমার দরকার?"

মধুসূদন প্রথমটায় সত্যিই হকচকিয়ে গেছল। এবার নিজেকে সামলে হেসে বললে,—"আমি রান্না শিখছিলাম।"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে!"—প্রবীর গর্জন করে উঠল,—"এখুনি, এই মুহূর্তে!"

কণিকা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার শান্ত দৃঢ় স্বরে বলল,—'যাও, মধু।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি তাহলে!"—একটু হেসে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মধুসূদন আবার ফিরল,—"আমি কিন্তু কাছাকাছিই থাকব।"

"বেরিয়ে যাও বলছি!"—প্রবীরের এ মূর্তি কণিকা কখনো দেখেনি।

"যাচ্ছি! যাচ্ছি!"—ব'লে মধুসূদন চলে যাবার পরই প্রবীর ঘৃণাভরে কণিকার দিকে ফিরল,—" 'মধু!' লজ্জা না থাক, তোমার ভয়ও করেনা ওই উন্মাদ খুনেটার সঙ্গে একঘরে থাকতে! ওকে তুমি এখনো চিনতে পারোনি।"

কণিকা অদ্ভুতভাবে প্রবীরের দিকে চেয়ে থেকে বললে,—"না পারিনি। কাকে কতটুকু আমরা চিনি! চিনি মনে করাই ভুল।"

"কি তুমি বলতে চাচ্ছ!"

"কিছু না।"—ব'লে কণিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হঠাৎ বেশ একটু সবলেই তাকে হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে প্রবীর বললে,—"আমি তোমার দু-চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছি হঠাৎ, না? এই মধুসূদনের সঙ্গে দেখা হবার পরেই, কেমন!"

কণিকা কোনো উত্তর দিলে না। তার চোখদুটো তখন

প্রবীর আবার বললে,—"কিন্তু মধুসূদনের সঙ্গে নতুন আলাপ ত মনে হচ্ছে না! মনে হচ্ছে, পুরোনো প্রেম আবার হঠাৎ দেখা হয়ে উথলে উঠেছে। কোথায় প্রথম দেখা হ'ল? কলকাতায়?"

কণিকার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ বদলে গেল। জ্বালার বদলে সেখানে কেমন যেন একটা ভয় আর বিমূঢ়তা।

অস্পষ্টস্বরে সে বললে,—"কলকাতায়!"

"হ্যাঁ, কলকাতায় তুমি যাওনি গত শুক্রবারে, সারাদিন আমি যখন বাড়ি ছিলাম না সেই সুযোগে? কি, চুপ করে আছ কেন? গেছলে কি-না বলো!"—পকেট থেকে হঠাৎ দোকানের রসিদটা বার করে প্রবীর তার সামনে ধরলে,—"মনে যদি না থাকে ত তারিখটা প'ড়ে দেখো রসিদের!"

কণিকার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বললে,—"হ্যাঁ গেছলাম। হয়ত তোমার সঙ্গেও সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারত!"

"আমার সঙ্গে!"—প্রবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে!"—কণিকা চৌকির ওপর থেকে

খবরের কাগজটা তুলে এনে প্রবীরের সামনে ধ'রে বললে,—"অতিবড় চালাক সাবধানীরও একটু ভুল হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। এই কাগজটা যে কলকাতা থেকে কিনেছিলে সেটা ভুলে গিয়েই সঙ্গে করে এনেছিলে। কাগজটা যে তুমি এনেছ সেটাই আগে আমি মনে করতে পারছিলাম না। মিঃ ঘোষাল কাগজটা দেখিয়ে না দিলে জানতেও পারতাম না বা মনে করবার চেষ্টাও করতাম না!"

মিঃ ঘোষালের সঙ্গে এই নিয়ে তুমি আলোচনা করেছ?"—প্রবীর উত্তেজিতভাবে কণিকার দিকে এগিয়ে এল।

"দাম্পত্য আলাপ বড় মধুর!"—চাপা গলার একটু হাসির সঙ্গে কথাগুলো শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল। বীরস্বামী যে কখন নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছেন, তারা টেরই পায়নি।

"কিন্তু গরজ বড় বালাই!"—বীরস্বামী আবার বললেন,—"ইন্‌স্পেক্টর সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের সকলকে এক্ষুনি তাঁর কাছে দোতলায় যেতে হবে।"

"কেন?"—প্রবীর অপ্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

"কেন, সেইটেই ত মজা! পুলিশ যে আজকাল আবার নাটুকে হয়ে উঠেছে তা জানতাম না। মিস্ ধর খুন হবার সময় আমরা যে যেখানে যেভাবে ছিলাম তিনি তারই আবার, কি বলে, পুনরভিনয় চান। তাই থেকেই নাকি খুনীকে তিনি ধরে ফেলবেন।"

"এসব পাগলামির কোনো মানে হয় না!"—প্রবীর তিক্ত স্বরে বলে উঠল,—"আসল খুনীকে ছেড়ে রেখে দিয়ে উনি
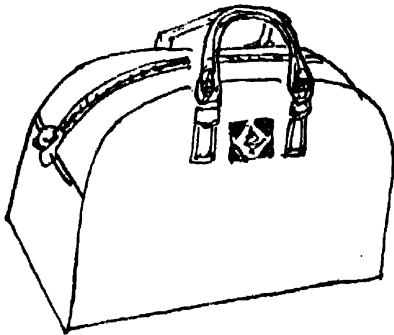
অভিনয়ের ছেলেখেলা করেছেন! এই অভিনয় করতে গিয়েই দেখবেন সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।"

"সেটা আমারও ধারণা।"—বীরস্বামী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন,—"কিন্তু আসল খুনীটা কে? ওই মধুসূদন!"

"তা ছাড়া কে? চলুন।"—ব'লে প্রবীর এগিয়ে গেল।

কণিকা কিন্তু আপত্তি জানিয়ে বললে,—"আমি কিন্তু যাচ্ছি না। আমার রান্নাবান্না আছে। আমি না গেলেও মিঃ ঘোষাল কিছু মনে করবেন না।"

"আমিও তাহলে থাকি আপনাকে সাহায্য করতে?"—ব'লে বীরস্বামী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"না না, চলুন, সবাইকেই যেতে হবে।"—প্রবীর ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে।

বীরস্বামী আবার সেই অদ্ভুত ভাবে খুক খুক করে হেসে বললেন,—"দেখেছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী আমায় একা থাকতে দিতে চান না। আমাকেও ওঁর ঠিক বিশ্বাস নেই।"

নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি শুধু হাসলেন।

ওপরে যাবার পর আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে ঘোষাল বললেন,—"আগে যেখানে যে রকম যা হয়েছিল তাই আবার সকলকে করতে হবে বটে, কিন্তু একটু অন্য ভাবে। প্রত্যেকের জায়গা এবার বদল হয়ে যাবে। যেমন—নিচের ঘরে টেলিফোনের কাছে থাকবেন এবার ডাঃ বাজপেয়ী, আর তাঁর ঘরে আসবেন মিঃ লাহিড়ী। বীরস্বামী যাবেন রান্নাঘরে, আর তাঁর জায়গায় অর্গ্যান বাজাবেন মিসেস লাহিড়ী!"

"এ অদল-বদল কেন?"—ডাঃ বাজপেয়ী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কারণ, তাহলে আমাদের মধ্যে যিনি সত্য কথা বলেননি তাঁর ফাঁকি ধরা পড়বে।"

"কেমন করে আমি ত বুঝতে পারি না!"—বৃদ্ধ বেণীবাবু বললেন।

ঘোষাল হেসে বললেন,—"বোঝার ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন-না, আর তা ছাড়া আপনাকে বদলি কোথাও যেতে হবে না। আপনি নিজের ঘরে যেমন শুয়ে ছিলেন তাই থাকবেন।"

"তাহলে আর দেরী কেন? শুভস্য শীঘ্রম্।"—বলে বীরস্বামী উঠে পড়লেন।

"দাঁড়ান বীরস্বামী!"—ঘোষাল তাঁকে থামালেন,—"আপনি শুধু মিসেস লাহিড়ীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যান, কি ভাবে ব'সে আপনি কি বাজিয়েছিলেন।"

"তাও দেখাতে হবে! বেশ!"—বীরস্বামী কোণের অর্গ্যানটার কাছে গিয়ে টুলের ওপর বসলেন, তারপর বড় বাজিয়ের মত সকলকে একবার মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে

গম্ভীর ভাবে ঘোষণার স্বরে বললেন,—"এইবার—এইবার আপনারা সুবিখ্যাত অর্গ্যান-বাদক শ্রীরামানুজ বীরস্বামীর আশ্চর্য অর্গ্যান-বাদন শুনতে পাবেন।"

প্রবীর চাপা-গলায় ঘোষালকে বললে,—"অসহ্য ভাঁড়ামি!"

"ওই ভাঁড়ামিটাও একটা মুখোস, মিঃ লাহিড়ী!"—বলে ঘোষাল হাসলেন,—"ওই মুখোসগুলোই ভেদ করতে হবে।"

বীরস্বামী তখন এক-আঙুলে তাঁর বাজনা শুরু করেছেন। সে বাজনার সুরে কণিকার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেমন শিউরে উঠলো।

ঘোষাল তার দিকেই চেয়ে ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন,—"পারবেন মিসেস লাহিড়ী এই ভাবে বাজাতে?"

দাঁতে দাঁতে চেপে কণিকা বললেন,—"পারব!"—অদ্ভুত একটা অনুভূতি তার মধ্যে জাগছে। জাঁতাকলের মত একটা ফাঁদ যেন ধীরে ধীরে তাকে চেপে ধরছে। মুক্তি নেই, কিছুতেই মুক্তি নেই!

"তাহলে আপনি গিয়ে যথাস্থানে বসুন। আপনারাও চলুন যে যার নতুন জায়গায়।"—ব'লে ঘোষাল আর সকলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দরজায় একটু থেমে আবার নির্দেশ দিলেন,—"ঠিক এক মিনিট বাদে আপনি বাজনা শুরু করবেন। ঠিক এক মিনিট। মনে মনে ষাট গুণতেও পারেন।"

ঘোষাল চলে গেলেন।

এক—দুই—তিন—চার…

খানিকটা গুণেই কণিকা থেমে গেল। কিরকম হঠাৎ যেন তার ভয়-ভয় করছে। এ-বাড়িতে সে ত একলাও থেকেছে কত দিন! এরকম ত কখনো মনে হয়নি।

হঠাৎ দূর থেকে শিসের শব্দ সে শুনতে পেল। কে শিস দিচ্ছে মধুসূদনের জায়গায়? ডাঃ বাজপেয়ী নাকি? ডাঃ বাজপেয়ী শিস দিয়ে গানের সুর তুলতেও পারেন তাহলে!

না—সময় ত হয়ে গিয়েছে। সে এক-আঙুলে সুরটা বাজাতে লাগল। চাবিতে আঙুল লেগে সুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরের ভেতরটায় যেন একটা ভয়ের শিহরণ উঠছে।

ওই ত মিস্ ধরের ঘরে রেডিওটাও বেজে উঠল! মিঃ ঘোষালই নিশ্চয় চালিয়ে দিয়েছেন।

ঘাড়ে যেন জোলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে কণিকা চমকে ফিরে তাকাল। ওদিকে কেউ দরজা খুলেছে নিশ্চয়। ঘরের পর্দার দরুন ওদিকটা ভালো দেখা যায় না। সন্ধ্যেও হয়ে এসেছে। কিন্তু কই না, কেউ ত ঘরে আসে নি!

হঠাৎ বুকটা কণিকার কিরকম কেঁপে উঠল! যদি—যদি বীরস্বামীই নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান! চুপি চুপি বলেন,—"কি বাজাচ্ছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার—কি বলে—অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত?"

জোর করে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কণিকা এই বিশ্রী মনের ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু—কিন্তু—একটা কথা হঠাৎ তার মনে হ'ল। বীরস্বামী যে অর্গ্যান বাজিয়েছেন তা ত কেউ শুনেছে বলেনি। বীরস্বামীর অর্গ্যান বাজাবার গল্পটাই কি বানানো? তিনি কি অর্গ্যান না বাজিয়ে মিস্ ধরের ঘরেই গেছলেন! ঘোষাল কি এই ভাবেই তাঁর ফাঁকিটা ধরতে চেয়েছেন! অর্গ্যান অবশ্য খুব আস্তে আস্তে বাজাতে বলা হয়েছে। কিন্তু তবু এবারে যদি বাইরে সে আওয়াজ শোনা যায় তাহলেই বোঝা যাবে বীরস্বামীর কথা মিথ্যে।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বীরস্বামীই এসেছেন ভেবে কণিকা চীৎকার করতে যাচ্ছিল। কি ভাগ্যি, সময়মত সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে। ঘোষাল কি ভাবতেন তাহলে!

ঘোষালই ঘরে ঢুকেছেন। কাছে এসে বললেন,—"ধন্যবাদ মিসেস লাহিড়ী!"

ঘোষালকে এত খুশি কণিকা এপর্যন্ত দেখেনি।

"যা চাইছিলেন তা পেয়েছেন তাহলে?"—কণিকা হেসে জিজ্ঞাসা করলে বাজনা থামিয়ে।

"হ্যাঁ!"—ঘোষালের মুখে বেশ একটু গর্বের আনন্দ,—"ঠিক যা আশা করেছিলাম তাই।"

"কে মিঃ ঘোষাল?"—কণিকা আগ্রহে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"বাঃ—কে আপনি জানেন না! এখনো বুঝতে পারেন নি?"—ঘোষাল হাসলেন,—"আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের এতক্ষণে বোঝা উচিত ছিল।"

"কিন্তু আমি ত ঠিক…" কণিকা মনে মনে ভেবে নিলে যে বীরস্বামীর কথাটা নিজে থেকে বলাটা ঠিক হবে না।

"না, যত বুদ্ধিমতী আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি তা নন! হ্যাঁ, তা বলতে গেলে আপনি বেশ বোকামির পরিচয় দিয়েছেন আগেই।"

"কিসে?"—কণিকা ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

"খুনীর তৃতীয় শিকার কে হতে পারে তা আমায় বুঝতে দেননি। সেই জন্যে আপনার বিপদও বেড়েছে।"

"কিন্তু আমি ত আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"—কণিকা সত্যিই বিমূঢ়।

"বুঝতে পারছেন না? তবে শুনুন। আপনি আমার কাছে কথা লুকিয়েছিলেন মিস্ ধরের মত।"

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন।"

"খুব পারছেন!"—ঘোষাল একটু যেন রূঢ় হলেন,—'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনার সংস্রব যে ছিল তা আপনি প্রথমে আমার কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। মিস্ ধরকে আপনি চিনতেন, 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমও আপনার জানা। তবে কেন আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলেন?"

ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণিকা বললে,—"তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি মন থেকে ও জায়গার স্মৃতি সত্যি মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, জানি কেন? আপনার নাম তখন কণিকা ছিলনা, কেমন?"

"হ্যাঁ, আমার নাম ছিল তপতী।"

"জানি, আপনার বয়স যা বলেছেন তাও সত্য নয়। তখনই আপনার বয়স উনিশ-কুড়ি, আপনি ওই অনাথাশ্রমে মিসেস এম.ডি.-র তাঁবেদারিতে হেঁসেলের কাজ করতেন।"

"না।"

"আমি বলছি হ্যাঁ।"

"না, না—বিশ্বাস করুন আমায়।"

"বিশ্বাসের যোগ্য আপনি নন। যে ভাই-বোন-তিনটি আনাথাশ্রম থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারা শুধু আপনাকেই বিশ্বাস ক'রে তাদের পালাবার কথা জানিয়েছিল, আর আপনি ম্যানেজার ও মিসেস এম. ডি.-কে তা জানিয়ে দেন।"

"এসব মিথ্যে! সব মিথ্যে!"—কণিকা কাতর ভাবে বলে উঠল,—"হেঁসেলে কাজ করতাম আমি নয়, আমার দিদি। আমরাও দাঙ্গায় নিরাশ্রয় হয়ে ওখানে জায়গা পেয়েছিলাম। ম্যানেজার মিঃ দাস আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন পিশাচের মত নির্মম। তাঁরা ছেলেমেয়েদের খেতে পর্যন্ত দিতেননা। দিদি তখন বড় বলে তাকে হেঁসেলে কাজ করতে হ'ত, আমাকেও সাহায্য করতে হ'ত সেখানে। ছেলেমেয়েদের দুঃখ দেখতে না পেরে দিদি ও আমি চুরি করে মাঝে মাঝে তাদের খাবার এনে দিতাম। তার জন্যে ধরা পড়ে মার খেয়ে পিঠের চামড়াও উঠে গেছে। ছেলেমেয়ে তিনটি পালাবার সময় দিদি তাদের বুঝিয়ে প্রথমে বারণ করবার চেষ্টা করেছিল, তারা কিছুতেই না শোনায় তাদের সাহায্যও করেছিল খাবার আর পয়সা দিয়ে। কিন্তু দিদি নয়, হেঁসেলের আরেকজন চাকরানী তাদের পালাবার কথা কেমন করে জেনে ফেলে মিসেস এম. ডি.-কে খুশি করবার আশায় বলে দেয়। সেই ছেলেমেয়ে তিনটি ত ধরা পড়েই, দিদিরও শাস্তির শেষ থাকে না। শুধু সেই ছেলেটির মারা যাওয়ার কথাই সকলে জানে, আমার দিদিও যে সেই নির্যাতনের পর ধীরে ধীরে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে মারা যায়…"

কণিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর মুখ তুলে বললে,—"সে-সব দিনের কথা আমি সত্যি ভুলে যেতে চাই। আমি এই ক'বছরের জীবনে অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, অনেক পেয়েছিও। আমি তাই আগেকার সে-সব দুঃস্বপ্নের দিন একেবারে মুছে ফেলে একটু শান্তি চাই।"

"শান্তিই এবার পাবেন!"—ঘোষাল কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন,—"আপনি নন, আপনার দিদিই হেঁসেলে কাজ করতেন তাহলে। ঠিক আপনার মতই অনেকটা চেহারা। আপনি কিছু হয়ত করেননি, কিন্তু সেই অনাথাশ্রমের সঙ্গে আপনিও জড়িত। সে অনাথাশ্রমের সবকিছু নোংরা কুৎসিৎ অপবিত্র। পৃথিবী থেকে সেই অনাথাশ্রমের সবকিছু শেষ করে দেওয়া দরকার।"

"ওকি! ওকি করছেন মিঃ ঘোষাল?"—কণিকা কাৎরে উঠল।

পকেট থেকে পাকানো দড়িটা বার করে সামনে দোলাতে-দোলাতে ঘোষাল বললেন,—"আমি ঘোষাল নই, ইন্‌স্পেক্টর নই, কিছুই নই—আমি সেই পানু, 'চাঁপাখোলা' অনাথাশ্রমের সেই পানু, আজকে বড় হয়ে সমস্ত অত্যাচার অবিচার নির্যাতনের যে শোধ নিতে এসেছে। পুলিশ আমায় ধরবার জন্যে জাল পেতেছে, আমি পুলিশ হয়েই তাদের ওপর কী টেক্কা দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন। সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর ঘোষাল আসছে বলে নিজে ফোন করেছি। নিজে তারপর রবারের ভেলায় এসে আগে টেলিফোনের লাইন কেটেছি। মিসেস এম. ডি.-কে যেমন, মিস্ ধরকে তেমনি এই ফাঁস দিয়ে শেষ করেছি। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, করতে পারেনি। আমার ভেলাটা কে চুরি করেছে। আপনাকে শেষ করেই এখুনি নইলে পালাতাম। তবু আমি পালাবই, আর যদি ধরাও পড়ি দুঃখ নেই, ভারী মজা পেয়েছি। আমায়

পাগল ব'লে পাগলা-গারদে ধরে রেখেছিল। সেইখানে বসে-বসে আমি সব ফন্দি করেছি, তারপর একদিন পালিয়েছি। পাগলা-গারদের ডাক্তাররা এখন দেখুক, পাগলের বুদ্ধি কত!" —ঘোষাল একটু থেমে বললে,—"ভয় পাবেন না, এই ফাঁস লাগাবার আগে শুধু ভয়, নইলে টেরও পাবেন না।"—ঘোষাল ফাঁসটা তুলল।

হঠাৎ পেছন দিকে কি শব্দ শুনে একটু চমকে ফিরতেই একটি সোফার পেছন থেকে ডাঃ বাজপেয়ী ঘোষালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কখন নিঃশব্দে তিনি সোফার পেছনে এসে লুকিয়েছেন কণিকা টেরও পায়নি।

ঘোষাল-বেশী পাগু জোয়ান ছোকরা, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ী যেন লোহা দিয়ে তৈরী। একটু ধ্বস্তাধ্বস্তির পরই দেখা গেল তাকে পিছমোড়া করে ডাঃ বাজপেয়ী তারই ফাঁসের দড়িতে বেঁধে ফেলেছেন। চারিদিক থেকে অন্য সবাইও তখন ঘরে ছুটে এসেছে। তার মধ্যে বৃদ্ধ বেণীবাবুও। কিন্তু এ কি-রকম তাঁর চেহারা! কোথায় সেই অথর্ব পঙ্গু বৃদ্ধ, তার জায়গায় সোজা শক্ত-সমর্থ পুরুষ।

বেণীবাবু ঘরে ঢুকতেই ডাঃ বাজপেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললেন,—"ঠিক সময়েই ধরা গেছে স্যার! আমি গোড়া থেকেই নজর রেখেছিলাম, পুলিশ আসছে বলে ফোন আসার কথা শোনার পর থেকেই আমি সজাগ আছি। ওর রবারের ভেলাটা চুরি করে পালাবার পথ আগেই বন্ধ করেছি তাই। তবে আপনি নিজেও আসবেন, আশা করিনি।"

"কিন্তু এসেও ত মিস্ ধরের মৃত্যুটা ঠেকাতে পারলাম না! আচ্ছা, আজকেই বোধহয় আমাদের খোঁজে দুটো নৌকো আসবে। না আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বেঁধে রাখো।"

বীরস্বামী দুজনের দিকে চেয়ে সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন,—"তাহলে আপনারাই আসল পুলিশের লোক! কেয়া তাজ্জব! কেয়া তাজ্জব! কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ী আপনার নাম নিশ্চয় নয়?"

ডাঃ বাজপেয়ী বলে পরিচিত পুলিশের লোকটি হেসে বললেন,—"না, আমি দাশরথি ঘোষ। ইন্স্পেক্টর ঘোষ বলতে পারেন।"

"আর উনি?"

"উনি ইসমাইল সাহেব, এখানকার ডি-সি।"

ডাঃ বীরস্বামী খুক খুক করে হেসে উঠলেন,—"এখানে সবাই তাহলে একরকম নাম ভাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে, আমি। বাদে।"

"আমিও নয়। আমার নাম প্রবীর লাহিড়ী। আগ্রায় মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গিয়ে বার্থ-রেজিস্টারে নাম আছে দেখে আসতে পারেন।"

"আমি একটা অনুরোধ করতে পারি?"—এতক্ষণে মধুসূদনের গলা শোনা গেল,—"আমার এই স্যুটকেসটার সঙ্গে আপনাদের নৌকোয় আমায় একটু জায়গা দেবেন? আমার কলকাতায় যাওয়া অত্যন্ত জরুরী দরকার।"

ইসমাইল সাহেব ঠাট্টা করে বললেন,—"শুধু স্যুটকেস-টাকে জায়গা দিলে হবে না?"

"না, বিশ্বাস করে আপনাদের পুলিশের হাতেও এটা ছাড়তে পারব না।"—মধুসূদনরূপী পবিত্র হেসে বললে,—"স্যুটকেস-ভর্তি নোটের তাড়া কি-না?"

ঠাট্টা ভেবে সবাই হেসে উঠল।

পবিত্র তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বললে,—"হোটেলের মালিকরা গেলেন কোথায়?"

"বোঝাপড়া করতে নিশ্চয়! বন্যার জলে সব ঘুলিয়ে দিয়েছে কিনা!"—ব'লে বীরস্বামী হেসে উঠলেন।

মধুসূদন-রূপী পবিত্র আর তখন সেখানে নেই।

নিচে নিজের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সত্যিই তখন বোঝাপড়া চলছিল। কণিকা অত্যন্ত অপরাধীর মত বললে,—"আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমাকে পর্যন্ত সন্দেহ করেছিলাম। সত্যি, সেদিন তুমি যে কলকাতায় গেছলে আমায় জানাওনি কেন?"

"জানাইনি তোমায় একটু অবাক করে দেব বলে। তোমার জন্মদিনে একটা উপহার কিনতে গেছলাম লুকিয়ে। কিন্তু তুমিও ত আমায় কলকাতা যাওয়ার কথা লুকিয়েছ!"

কণিকা হেসে বললে,—"তুমি অত রেগে না থাকলে রসিদটা পড়লেই আমার যাওয়ার কারণ বুঝতে পারতে। রসিদটা একটা ফাউন্টেনপেনের, বুঝেছ? তোমারই জন্যে কেনা।"

হঠাৎ দরজাটা খুলেই মধুসূদন ওরফে পবিত্র বললে,—"স্যরি, আমার ঠিকানা আপনাকে দিতে এলাম কণিকা-দি! বাবার সঙ্গে যদি বনিবনাও হয়, তাহলে আমি চিঠি দিলে যেন উত্তর পাই।"

"তা ত বুঝলাম! কিন্তু হঠাৎ কণিকা-দি এল কোথা থেকে?"—প্রবীর এখনও মধুসূদনের ওপর খুব প্রসন্ন হতে পেরেছে মনে হ'ল না।

কিন্তু মধুসূদন-রূপী পবিত্রর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, একটু হেসে সে বললে,—"আগেই উনি বলবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করছিল।"

কিছুদিন বাদেই লাহিড়ীদের নামে স্বাস্থ্যনিবাসে একসঙ্গে একটি চিঠি ও একটি পার্শেল এল।

চিঠিটা মধুসূদন ওরফে পবিত্রর। লিখেছে: বাবা মত পাল্টেছেন, পাল্টেছেন বোধহয় সুটকেস-ভর্তি নোটের তাড়া ফেরত পাওয়ার বিস্ময়ে। সে ইউরোপ যাচ্ছে শীগ্‌গিরই পড়তে। যাবার আগে দেখা করবে নিশ্চয়।

আর প্যাকেটটি পাঠিয়েছেন বীরস্বামী। ভেতরে একটা অত্যন্ত দামী ও দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ফাউন্টেনপেন ও পেন্সিলের ডেস্ক-সেট আর তার চেয়েও দুর্লভ ও দামী মেয়েদের একটা হাতঘড়ি। তার-ই সঙ্গে ছোটো একটি কার্ডে লেখা—'বীরস্বামীর ঋণশোধ'।

জিনিসগুলো দেখে প্রবীর ও কণিকা হতভম্ব। এসব জিনিস ত আজকাল পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।

"বীরস্বামী কি চোরাই মালের কারবারী নাকি?"—প্রবীর বলে ওঠে বিমূঢ় ভাবে।

কণিকা আঙুল তুলে তাকে শাসিয়ে বলে,—"ছাখো, যা শিক্ষা আমাদের হয়েছে, তার পর কাউকে সন্দেহ করবে না, বিশ্বাসও না।" *

* বিদেশী ছায়ায়

'বসুধারা'র নিয়মাবলী

॥ গ্রাহকদের সম্পর্কে ॥

বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫শে তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইয়া ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদের জানাইতে হইবে। নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে যথাসময়ে জানাইতে হইবে। চিঠিপত্রে এবং মনি-অর্ডার-কুপনে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (সডাক) ১২৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক (সডাক) ৬৲ টাকা। ভিঃ-পিঃ-যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে, গ্রাহকদেরই ভিঃ-পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার-যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে হয় না। বৎসরের যে-কোনো মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। শারদ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ভারতের বাইরে পত্রিকার চাঁদার হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

চলচ্চিত্র

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
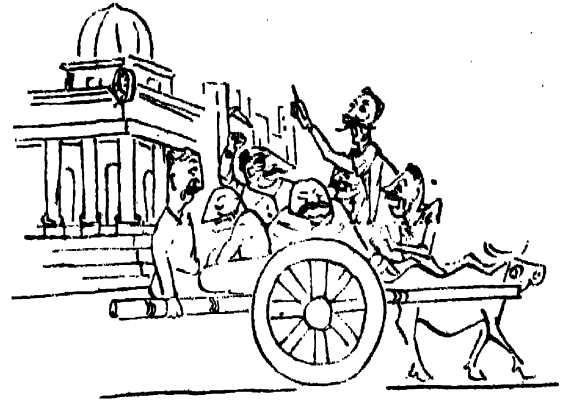
১৯৪৭ সাল। ওই বছরের ১৪ আগস্ট তারিখটা ধরব না, ওটা বড়ো গোলমেলে দিন; ওদিন পাকিস্তান ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হল, কিন্তু ভারত হল না; ভারত স্বাধীন হল তার পরের দিন, ১৫ আগস্ট। ১৩ আগস্ট ধরা যাক। মনে করা যাক, সেদিন পাশ্চাত্যের কোনো এক দেশের রণতরী চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করল। সেদিন চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত; ভারত আমার স্বদেশ; দেশ আক্রান্ত, স্বর্গাদপি গরীয়সী আমার দেশজননী। রণসজ্জা প'রে, 'বন্দে মাতরম্' বলতে বলতে ছুটলুম চট্টগ্রামের দিকে, বিপন্না জন্মভূমিকে শত্রুর কবল হতে রক্ষা করবার জন্যে। গোয়ালন্দে সকাল হল; শুনলুম, চট্টগ্রাম মায় গোয়ালন্দ অবধি জায়গা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফিরে চল্, ফিরে চল্; চট্টগ্রাম আর আমার জননী জন্মভূমি নয়; জাহান্নমে যাক চট্টগ্রাম; এখন দৌড় দে, হয়ত পাসপোর্ট চাইবে, সঙ্গের টাকাকড়ি কেড়ে নেবে। উপর থেকে কর্তারা জন্মভূমির চৌহদ্দি বদলে দিলেন, আমিও টকাস্ করে আমার মনোভাব বদলে ফেললুম।

আচ্ছা, ১৫, ১৬, ১৭ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানের মধ্যে ছিল, তিন দিন পরে ভারতে ফিরে এল। ওই তিন দিন যারা মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মাল তারা কার বন্দনাগীত গাইবে—পাকিস্তানের, না, ভারতের?

ভারত না বাংলা, কাকে আমার স্বদেশ বলে ধরব?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গানে বলেছেন—

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে—

এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীত জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে। সপ্তকোটি কণ্ঠ বাংলার, ভারতের হতে পারে না। সুতরাং বাংলাই আমার স্বদেশ, ভারত নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালও বলেছেন—

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার—আমার দেশ।

বলেছেন—

সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

কিন্তু বাংলাকে যে আমার দেশ বলছি, এ কোন্ বাংলা? বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার উপর যোগ-বিয়োগ হয়েছে অনেকবার, আর এখনও তার বিরাম নেই। প্রথম ১৯০৫ সাল। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় বলতেন—বঙ্গমাতা দ্বিখণ্ডিতা হইয়াছেন, আমাদের অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। —অশৌচ গ্রহণ করলুম; ৩০ আশ্বিন দুপুরে পান্তাভাত খেলুম; বিকেলে গাইলুম—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান!

কয়েক বছর চলে গেল। ১৯১১ সাল এল, ভাঙা বাংলা জোড়া লাগল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর *A Nation in Making*-এ লিখছেন—

I was summoned back to the telephone and heard the news that the partition had been modified. There was quite a crowd at the *Bengalee* office at the time. The news spread like wild fire. People came in throngs to the office. A huge gathering had assembled in College Square, and I was seized by my friends, put in a carriage and literally carried by force to College Square. There I witnessed a wild scene of excitement. It was quite dark, there were no lights. We could not see one another, but we could hear voices shouting with joy and occasionally interjecting questions. A voice

from the crowd cried out,—What do you think of the transfer of the capital to Delhi? I said at once,—We are not likely to lose very much by it. Subsequent events have demonstrated that I was substantially right in my impromptu answer.

রাজনীতি আলোচনা করব না। ধরে নেব, রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী চলে যাওয়ায় বাংলার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশমাতৃকার কথা ভাবছি। আগেকার বাংলা কি আমরা ফিরে পেলুম? যে বাংলা পেলুম তাতে কি উপ্ত রইল না ভবিষ্যতের ভারত-বিভাগের বীজ?

১৯৪৭ সালে যে রদ-বদল হল তাতে আমাদের দেশ-জননীকে আর চেনা গেল না, কর্তারা লজ্জায় তাকে বাংলা না ব'লে পশ্চিমবঙ্গ আখ্যা দিলেন। কোথায় সপ্তকোটি! তা আড়াই কোটিতে এসে দাঁড়াল। কিছু কিছু যোগও হচ্ছে; পুরুলিয়ার পুর্নিয়ার ছিটে-ফোঁটা এসে গিয়েছে; আর আমাদের দুঃখ কি? সম্প্রতি নেহেরু-নুন এক বৈঠকখানায় বসে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তরেখা স্থানে স্থানে বদলে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের বলেছেন—তোমরা যেমন আছ তেমনি থাক। এ উপদেশটা বড়ই মূল্যবান। কারণ বাস্তুহারাদের নিয়ে বহু ঝামেলা; পক্ষান্তরে সহজেই মা বদল করা চলে। পয়সা-চারেকের রঙে ত্রি-বর্ণা পতাকাকে সবুজ-বর্ণা করা যায়। যা হোক, আমাদের দেশভক্তিকে তরল অবস্থায় রেখে দিতে হবে, কর্তারা যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব, দেশভক্তির চতুঃসীমা কখনো বাড়াবো, কখনো কমাবো। হয়ত নিকট-ভবিষ্যতে কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত হবে, ভারতের মানচিত্রকে আবার নতুন ক'রে রং লাগাতে হবে।

এই সব ভেবেচিন্তে ঠিক করেছিলুম, আমার চব্বিশ পরগনাকে দেশমাতা বলব। কিন্তু তাও হল না। শুনছি, আবার অশৌচ গ্রহণ করতে হবে, চব্বিশ-পরগনা-মাতাও দ্বিখণ্ডিতা হবেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চব্বিশ-পরগনার এক ইতিহাস লেখবার আয়োজন করছে। সেদিন তাকে বললুম, বাপু হে, দুদিন সবুর কর, চেরা চব্বিশ-পরগনার যে ভাগে তুমি পড়বে সেই ভাগের ইতিহাস লিখো, কাজটা অর্ধেক হয়ে যাবে।

দৃষ্টিকে আরো সংকুচিত করি। যে আঁতুড়ঘরে জন্মেছিলুম সেই আমার জন্মভূমি। তাও হল না। পঁচাত্তর বছর আগেকার আঁতুড়ঘর তো বহুদিন আগে ধূলিসাৎ হয়েছে, সে জায়গাটা এখন বাড়ির আঁস্তাকুড়। তাকে সকল দেশের রানী বলতে ইচ্ছে হল না।

দিশেহারা হয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা হাতড়াতে লাগলুম, যদি তার থেকে কোনো হদিশ মেলে। এক জায়গায় আছে দেখলুম—দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। তিনি আরো বলেছেন—দেশ যার মধ্যে আপন ভাবাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজন সমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে স্বীকার করে, সেই দিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

সব কথা বুঝলুম না। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। সকলে যা করে তাই ক'রে যাব। সভা-সমিতিতে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান যখন হবে উঠে দাঁড়াব; ১৫ আগস্ট বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়াব, গ্রামোফোনে গান দেব—'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'। ব্যস্, এই অবধি। মনে মনে কিন্তু 'দেশমাতৃকা' 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' এইসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দেব; তার বদলে ভাবব—

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী—

সেই মানবযাত্রীকে আমার প্রণতি জানাব।

বাঙালির গড় আয়ু এখন কিছু বেড়েছে। ঠিক কততে দাঁড়িয়েছে জানিনে। ধরা যাক, পঁচিশ। আমি পার ক'রে দিলুম তিন পঁচিশম্ পঁচাত্তর। বরানগর বলবে, আমার পঁচাত্তরের জন্যে অনেক শিশুমৃত্যু ঘটছে, নচেৎ গড় মান পঁচিশ বজায় থাকে কি ক'রে। বুঝলুম; আর সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু এতে আমার কি হাত আছে বলুন।

সে যাক। এই পঁচাত্তর বছর ধরে আমার চোখের উপর কত মানবযাত্রীকে আসতে যেতে দেখলুম। এই চলচ্চিত্র অস্পষ্ট হয়ে আসছে, বহু স্থান একেবারে মুছে গেছে। যা আছে তার কিছু কিছু পর্দায় ফেলি।

আমার শেষজীবনের বর্তমান আমার প্রথমজীবনের বর্তমানকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে। পুরানো যা দেখেছি, আর নতুন যা সব দেখছি, তাদের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। এত তফাত আগে আর কোনো যুগে ঘটেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; নতুন এসেছে বটে, কিন্তু পুরানোকে একেবারে অবলুপ্ত করতে পারেনি। খুদে চাঁদ স্পুট্‌নিক্‌কেও দেখছি, গোরুর গাড়িও দেখছি; বঙ্গনারী সন্ধ্যাবেলায় ককটেল-পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, আবার বঙ্গনারী সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ ধরছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে।—

উচ্ছাসে সকৌতুকে চিরপ্রাচীন গিরির বুকে
ঝ'রে পড়ে চির-নূতন ঝরণা,
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরানো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এলো নেমে
দক্ষসুতা ধরি' উমার অঙ্গ,
এমনি ক'রে সারাবেলা চলচে লুকোচুরি খেলা
নূতন-পুরাতনের চিররঙ্গ।

বড়ো রমণীয় এই রঙ্গ !

[১]

আমার পিতামহ যৌবনে প্রতি সোমবার বাড়ি থেকে কলকাতায় আসতেন, আবার শনিবার ফিরে যেতেন, যাওয়া-আসা হেঁটেই চলত, ওদিকে তখন রেল খোলেনি ; দূরত্ব হল বারো মাইল। তাঁর কাছে শুনেছি আমাদের পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ভবানীপুরে এক জমিদারের বাড়ি নিত্য নারায়ণ-পূজা করতেন। তিনি সকালবেলা আসতেন, পূজা সেরে ওখানে আহারাদি করে বিশ্রাম করতেন, সন্ধ্যারতি ক'রে দেশে ফিরতেন। কিন্তু একটা অসুবিধা হতে লাগল। দেশে দুপুর থেকে জোর পাশা-খেলা চলত, সেটা বাদ দেন কি ক'রে! শেষে তিনি ভবানীপুরে দুপুরবেলা আহারাদি করেই দেশে ফিরতেন, পাশা খেলে আবার ভবানীপুর যেতেন, সন্ধ্যারতি দিয়ে পুনশ্চ নিজ গ্রামে ফিরতেন। অর্থাৎ প্রতিদিন পথ চলতেন ৪ × ৮ = ৩২ মাইল ; পাশা-খেলার জন্যে ১৬ মাইল।

রবীন ভট্টাচার্য আমার আত্মীয়, তার প্রপিতামহের কথা বলছি। তাঁকে আমি দেখেছি। আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বারুইপুর স্কুলে তিনি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। একদিন স্কুলের পর দেশে ফিরবেন এমন সময় জমিদার চৌধুরী-বাড়ির একজন ঘোড়ার গাড়ি থেকে বললেন—পণ্ডিতমশায়, গাড়িতে আসুন, আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি। পণ্ডিতমশায় বললেন—না বাবা, আজ থাক, আজ আমার একটু তাড়া আছে।

অবশ্য এতে তখনকার দিনে মানুষের হাঁটার দ্রুততা বা ঘোড়ার চলার শ্লথতা কোন্‌টা প্রমাণিত হয় বলতে পারিনে।

আমি বাল্যকাল থেকেই কলকাতা আসবার ট্রেন পেয়েছি। তবে পাঁচ-ছ' বছর বয়সে যখন বাঁকুড়ায় মামার বাড়ি যাই তখন রানীগঞ্জে নেমে নদী পার হয়ে সমস্ত রাত গোরুর গাড়ি চড়ে বাঁকুড়ায় পৌছই। প্রথমবার যখন দার্জিলিং যাই, দামুদিয়ায় নেমে স্টিমারে পদ্মা পার হয়ে সারা-তে আবার ট্রেন ধ'রে শিলিগুড়ি পৌছই। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর যাবার সময় ভারতের স্থলভাগের শেষপ্রান্ত মাণ্ডাপামে এসে নৌকায় পার হয়ে রামেশ্বর দ্বীপের পাম্বামে পৌছই ; ওখানকার পোল তখনও হয়নি।

আট দিনে পাঠশালা-জীবন শেষ ক'রে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এ-এস স্কুলে ভর্তি হলুম। এই সময় ওই স্কুল নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হওয়ায় স্থানীয় জমিদার ওই স্কুলের খুবই কাছে আর এক স্কুল স্থাপন করলেন। আমি নতুন স্কুলে চলে এলুম।

নতুন স্কুলের উপর-ক্লাসের ছাত্রদের একটা দল ছিল যাদের দুষ্টামির কথা আজও মনে আছে। এই দলের নেতা ছিল আমার পিসতুতো ভাই—কোচো-দাদা। ছাত্রজীবনে অনেক ছেলের সংস্পর্শে এসেছি, শিক্ষকতার কালে অনেক ছাত্র নাড়াচাড়া করেছি, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের কথাও পড়েছি, কিন্তু দুষ্টামিতে আমার কোচো-দাদাকে কেউ পরাস্ত করতে পারেনি। পূর্ণবাবু ব'লে একজন শিক্ষক এই স্কুলে এলেন, কি এক অপরাধের জন্যে ধমক দেওয়ায় কোচো-দাদা গিয়ে তাঁর পা দুটো জাপটে ধরল, তারপর 'আর করব না' ব'লে আর কপাল ঠুকে পূর্ণবাবুর পা-এর আঙুলগুলো থ্যাঁতলাতে থাকে। পূর্ণবাবু হাঁক দেন,—ছাড়্ ছাড়্, হয়েছে হয়েছে। কোচো-দাদা বলে,—না স্যার, আপনার পায়ে পড়েছি স্যার ; বলে, আর আঙুলের উপর মাথা ঠোকে। একদিন হেড-পণ্ডিত ক্লাসে হাই তুললেন, কোচো-দাদার ইঙ্গিতে ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে দু'হাতে তুড়ি দিতে আরম্ভ
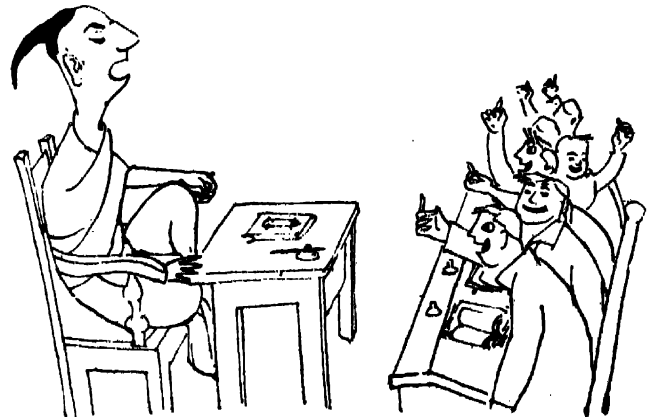
করল। পণ্ডিত বলেন,—থাম্, থাম্; কোচো-দাদা বলে, —সে হয় না স্যার, আপনার যে আয়ুক্ষয় হবে, চালাও ভাই-সব। ছাত্ররা যাই করুক, শিক্ষকদের কিছু বলবার জো ছিল না, বললেই ছেলেরা চোখ রাঙিয়ে বলত,—ও স্কুলে চলে যাব।

প্রায় সত্তর বছর চলে গিয়েছে, ভাবি, ব্যাপারটা কি আজও সেইভাবে চলছে না? কিছুদিন আগে কলকাতার এক বড়ো কলেজের একজন অধ্যাপক কলেজের অধ্যক্ষকে জানালেন,—অমুক ছেলেটি ক্লাসে সিগারেট খাচ্ছিল, নিষেধ করলুম, শুনল না। অধ্যক্ষমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, —দেখুন, ও যেতে দিন, এখুনি ছেলেরা স্ট্রাইক করবে, ওদের আবার সব ইউনিয়ন আছে, অন্য কলেজের ছেলেরাও দলে দলে এসে হাজির হবে, দরকার কি ওসব ফ্যাসাদে; আর সিগারেট খাওয়াটাকে তো আজকাল দোষ ব'লে ধরা হয় না। অধ্যাপকমশায় মুখটি নিচু করে চলে গেলেন। আর সেকালের একটা ঘটনা এইরকম ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিন শুনলেন তাঁর কলেজের ছাত্ররা একজন অধ্যাপকের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছে; যেমন শোনা অমনি তিনি কয়েকটা তালা নিয়ে ছুটতে ছুটতে কলেজে হাজির হলেন; বললেন,—বেরো ব্যাটারা, এখুনি বেরো, আমি আজই কলেজ তুলে দেব। ছাত্ররা নতজানু হয়ে অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পেল।

পল্লীগ্রামে একটা স্কুলের খুব কাছে আর একটা স্কুল অ্যাফিলিয়েশন পেল না, জন্মের তিন বছর পরে নতুন স্কুল উঠে গেল। আমরা পুরানো স্কুলে ফিরে গেলুম না, কলকাতায় চলে এলুম। সেটা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সাল, আর এখানেই আমার কলকাতা-জীবন আরম্ভ হল। কলকাতায় আমাদের বাসা হল চাঁপাতলায়—শত্রুঘ্ন ঘোষের লেনে। পাশে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনে মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশন বউবাজার ব্রাঞ্চ, সেই স্কুলে ভর্তি হলুম। আমাদের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ছিল; অবশ্য তা আমাদের হাতে পৌছত না, আর তা পড়বার বয়সও হয়নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কথা কর্তাদের কাছে শুনেছি। কলকাতায় এসে জানলুম বঙ্কিমচন্দ্র বাস করেন আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে নয়। কলকাতার পথ-ঘাট ভালো ক'রে চেনা হোক, একদিন তাঁকে দূর থেকে দেখে আসব। কিন্তু তা আর হল না। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিক, স্কুলে গিয়েছি, হঠাৎ স্কুল বন্ধ হল, বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেছেন। কি মনস্তাপ যে পেলুম!

চাঁপাতলায় আমাদের বাসার কাছে ছিল ছোটো গোলদীঘি। বিকালে দীঘির ধারে যে বেড়াব তার উপায় ছিল না; দীঘির ধারে পথ বলে কিছু ছিল না, আর পুকুরের জলটা ছিল নোংরা। ছোটো গোলদীঘি চিনতে পারলেন কি? পারলেন না! আচ্ছা, বলছি। সেই দীঘি বোজানো হল, জায়গাটার নাম হল চাঁপাতলার মাঠ; পরে তার নামকরণ হল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। এই ছোটো গোলদীঘি কিন্তু একদিন আমাদের বিশেষ উপকার করেছিল। সেটা বোধহয় ১৯০০ সাল। পুজার কিছু আগে; ছ'সাত দিন ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হল; কলকাতায় এত বৃষ্টি এই আটান্ন বছরের মধ্যে আর কোনো সময় হয়নি; রাস্তাঘাট সব জলে ডুবে গেল; শেষ ক'দিন বাজার বসল না; দুপুরে খিচুড়ি আলুসেদ্ধ, রাত্তিরে খিচুড়ি আলুসেদ্ধ। কোচো-দাদা বললে, আয় আমার সঙ্গে। গেলুম। ছোটো গোলদীঘির পাশে আমহার্স্ট স্ট্রীটে এক-কোমর জলের মধ্যে আমরা ঘুরছি। কোচো-দাদা বললে, হয়েছে। এক রুই মাছ যেমন পায়ে ধাক্কা-দেওয়া—কোচো-দাদা খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল। সেদিন আর আলুসেদ্ধ নয়, খিচুড়ি আর মাছভাজা।

কলকাতায় এসে বসবাস করবার পর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ট্রাম দেখলুম। শ্যামবাজার থেকে ছাড়ল, দুটো ঘোড়া টানতে লাগল, ওয়েলার ঘোড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা, গাড়ি একখানা। গুরুদাস চাটুয্যের দোকান এখন যেখানে, সেখানে একটা বড়ো আস্তাবল ছিল, সেখানে ঘোড়া বদল হল। মেডিক্যাল কলেজের পুবে, রাস্তার ওপারে, আর একটা আস্তাবল ছিল, সেখানে আর একবার বদল হল, এবার এস্প্ল্যানেডে পৌছল। এস্প্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর অবধি একটা লাইন পাতা ছিল, তার উপর দিয়ে এঞ্জিন ট্রামগাড়ি টানত; এখন রাস্তায় রোলার টানবার জন্যে যে ধরনের এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় অনেকটা সেই রকমের এঞ্জিন, বেগ অল্প একটু বেশি।

আমাদের মাছ তরকারি কেনা হত মাধববাবুর বাজার থেকে। মাধববাবুর বাজার হল এখন যেখানে আশুতোষ বিল্‌ডিংস। বড়ো ইমারত হলে কি হয়, কেনাবেচা ঠিক চলেছে; একতলায় জামা কাপড় ও দোতলায় তেতলায় জ্ঞান বিক্রি হচ্ছে।

খাবারের দোকানে একপয়সায় দুখানা কচুরি পাওয়া যেত, একটু হালুয়া ফাউ। পাঁচ আনায় এক সের পুরি ও আট আনায় একসের লেডিকেনি মিলত। তিন আনা সের দই ও আট আনা সের রাবড়ি তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবধি কিনেছি। তখন একজোড়া দশহাতী ভালো ধুতি একটাকা দশ আনা এগার আনায় বিকত, তের আনা চৌদ্দ আনায় একটা শার্ট পাওয়া যেত। ধুতির উপর শার্ট পরা রেওয়াজ

PELICAN
A SWISS QUALITY WATCH
WATER PROOF
SHOCK PROOF
ANTIMAGNETIC
DAMP-DUST PROOF
PELICAN
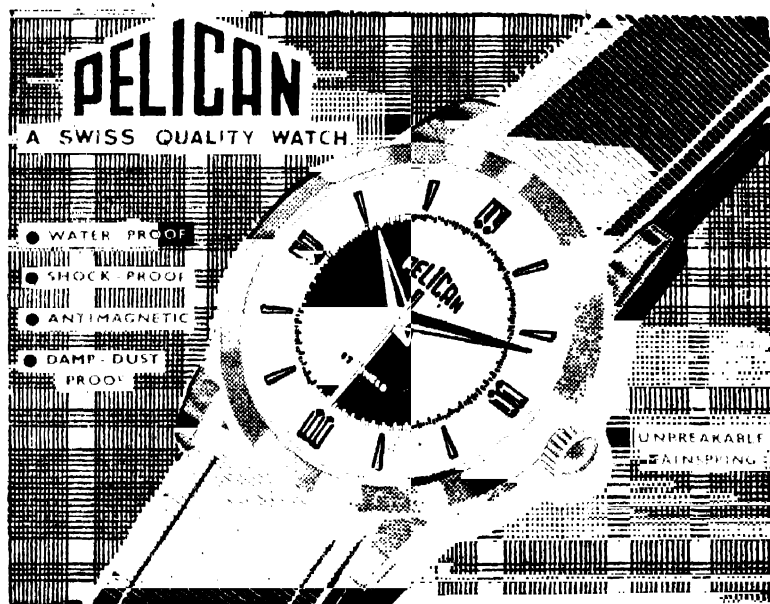
তখন লোকের বাড়িতেই পূজা হত, প্রতিমা স্থাপিত হত ঠাকুর-দালানে চণ্ডীমণ্ডপে; পুরোহিত-ই ঠাকুরের উদ্বোধন করতেন; পুরাণোক্ত স্তব অনুসারে দেবীর মূর্তি গড়া হত; ঢাক ঢোল বাজত। অতিথিদের প্রধান ও অপ্রধান রূপে ভাগ করা হত না; বিসর্জনের দিন-ই বিসর্জন হত; প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে যে বিষাদ দেখা দিত তা মাইকেল প্রকাশ করে গিয়েছেন মেঘনাদবধ-কাব্যে : বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।

এখন পূজা প্রায় সবই সর্বজনীন; বায়না দেবার সময় বলা হয় দেবীর মুখ যেন সুচিত্রা নার্গিস প্যাটার্নের হয়; দেবীকে বসানো হয় ফুটপাথে ড্রেনের ধারে; পূজামণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ডি-কস্টা, আবুল কাশেম বা রঙ্গিণী দেবী; পূজার সময় মাইকের উদ্দামতায় ও শোভাযাত্রায় নৃত্যের বীভৎসতায় দেবীর মুখ কিরকম রক্তিম হয়ে ওঠে তা দেখা না গেলেও অনুমান করা যায়।

তখন জীবনযাত্রা খুব জটিল ছিল, এখন তা সহজ সরল হয়ে এসেছে। এখন হোটেলে গিয়ে ছ'আনা পয়সা দিন, একটা চিংড়িমাছের কাটলেট পাবেন; দশকর্মের দোকানে গিয়ে শুধু বলুন—'অন্নপ্রাশন', যা যা দরকার তারা সব দিয়ে দেবে; শুনছি, এবার থেকে প্রতি বোশেখে তারা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' বিভাগ খুলবে। ৩৮৫০ আনা দিন,—পিতলের কলসি, একখানা আসন, একটা চৌকি, চৌকির উপরকার টেবিল-ক্লথ, আলপনা-দেওয়া পিঁড়ি, রজনীগন্ধার ঝাড় দিয়ে দেবে; আর ১২৲ টাকা দিলে সেদিন ছজন সন্ধ্যায় আপনাদের প্যাণ্ডেলে গিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে আসবে, আরও ৬৲ টাকা দিলে দু'জন গিয়ে নাচবে; এর উপর যদি ৫৷০ আনা দেন, তারা আপনাদের সভাপতি ও প্রধান অতিথি জোগাড় ক'রে দেবে।

তখন কলকাতায় নেমন্তন্ন-বাড়িতে খাবারের ডাকে ছাতে উঠতে গিয়ে শুনতুম,—এ ছাতে বামুন। এখন ছেলেরা হোটেলে মুর্গি খেয়ে মুখ মুছে বাড়ি ফেরে, বাপ-মা পয়সা দেন।

তখন বক্তারা চেঁচিয়ে বক্তৃতা করত, গাইয়েরা গলা ছেড়ে গাইত; মাইক ওঠেনি।

তখন বিবাহের আগে পূর্বরাগ ছিল না; দিনমানে যুবকদের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চলত না; তখন ভূমিষ্ঠই হত শিশু, হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে টেঁথিলস্থ হত না। তখন মেয়েদের পায়ে জুতো ও পেটে বিদ্যে ছিল না; তারা রাস্তায় বেরতনা, যে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে যেত তার জানলা বন্ধ থাকত। সেদিন অবধি সখের দলের থিয়েটারে গোম্‌দা পায়ের ছেলে গোঁফ কামিয়ে 'প্রাণেশ্বর' ব'লে গর্জন করত; হালে ভাড়াটে মেয়েরা আসছে।

আমি সেকাল ও একাল তুলনা করছি, এই মাত্র; কোনো কালের উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলছিনে। সেকালও ভালো, একালও ভালো, তবে সুকুমার রায় যা বলে গিয়েছেন—সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলা-গুড়।

প্রথম কলকাতায় এসে প্রদীপের আলোতে পড়লুম, তারপর কেরোসিন-তেল-দেওয়া জুয়েল-ল্যাম্পের আলোয়, হিন্দু-হস্টেলে থাকাকালীন গ্যাসের আলোয়। এর পর ইলেকট্রিক আলো আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করল। আমাদের স্কুল যখন বউবাজার স্ট্রীটে উঠে এল, তখন শিক্ষক পড়াতেন, আর ছেলেরা জানলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলা দেখত।

১৮৯৯ সালে আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই; সেবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার হাজার। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান কালের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, বর্মা, উড়িষ্যা ও বিহার। এ-বছর এক পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে একলাখ একহাজার ছাত্র-ছাত্রী।

কলকাতায় আসার পর আমাদের সংবাদপত্র রাখা হত দু'খানি; দু'খানিই সাপ্তাহিক—হিতবাদী ও বঙ্গবাসী। দৈনিক কাগজ নেওয়া হতে লাগল স্বদেশী আন্দোলনের সময় হতে। এখন আপনি রাত্রি ন'টা অবধি কোনো সভা থেকে বাড়ি ফিরলেন, পরদিন ভোর পাঁচটায় খবরের কাগজে দেখবেন আপনার ছবি বেরিয়েছে। সেকালের সাপ্তাহিকেও মাঝে মাঝে ছবি থাকত। এ-সম্বন্ধে একটা গল্প যা শুনেছি বলি। কোনো এক কাগজের স্বত্বাধিকারী আপিসে নিজের ঘরে বসে আছেন, একজন কর্মী এসে জিজ্ঞেস করল,—লালমোহন ঘোষ মারা গেছেন, তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে, ছবি দেওয়া হবে কি? স্বত্বাধিকারী একটু চিন্তা করে বললেন,—দাও, fourth side। Fourth side-এর অর্থ ছিল এই। ব্লক ছিল একটি মাত্র—কাঠের; তিন দিকে তিনটি ছবি খোদাই-করা; ছবি তিনটি হল—মহারানী ভিক্টোরিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুশ-জাপান যুদ্ধ; চতুর্থ দিকটা একদম কাঠ, তাতে কোনো কিছু খোদাই ছিল না। ওই তিন দিকের বাইরে কোনো ছবি দিতে হলে, তা মানুষের মূর্তি হোক বা বড়ো ইমারত হোক, ওই fourth side কালি মাখিয়ে ছাপা হত। কিন্তু ছবি যাই হোক, কি জোরালো ছিল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা। ষাট বছর চলে গিয়েছে, একটা প্রবন্ধের কথা আজও ভুলিনি। প্রবন্ধটার নাম,—জয় জগদীশ। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর আবিষ্ক্রিয়ায় পাশ্চাত্য দেশে কিরকম যশস্বী হয়েছেন তারই কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্র বসুকে কোনো সম্মান দেয়নি বলে কী শ্লেষ!

বাংলাভাষায় রচিত প্রথম নাটকের প্রথম অভিনয় হয় আমাদের হরিনাভির বাড়িতে। নাটকটি হল 'কুলীন-কুলসর্বস্ব', রচনা করেন আমার পিতামহের খুল্লতাত রামনারায়ণ তর্করত্ন। এ আমার জন্মের আটাশ বছর আগে। আমি জীবনে প্রথম অভিনয় দেখলুম কলকাতায় এসে এগারো বছর বয়সে। স্টার থিয়েটার; অভিনয়ের আগে একজন লোক এসে কয়েকটি ফুটলাইট জ্বেলে দিয়ে গেল; দু'বার কনসার্ট বাজল; তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। রোলারে জড়ানো অরণ্য, রাজপ্রাসাদ, নদী এইসব সিন একটু একটু ক'রে খুলে খুলে নামছে। তা হোক, চন্দ্রশেখরে অমৃতলাল মিত্রের যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলুম তা আজও কানে ঝংকার দিচ্ছে। এই সময়কার স্টারের হিসেব-পত্রের খাতা এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে একদিন আমার হাতে এসেছিল। দেখি, সে সময় দানীবাবুর মাসিক বেতন ছিল ২৫্ টাকা, তারাসুন্দরীর ৩০্ টাকা, নরীর ৩২্ টাকা, আর সবচেয়ে বেশি পেতেন কাশীবাবু—মাসে ৬০্ টাকা হিসেবে। মোট মাসিক ব্যয় ছিল ৭৫০্ টাকা। আর্ট থিয়েটারের পরিচালনায় মাসিক ব্যয় দাঁড়ায়—১২,০০০্ টাকায়, ওই দানীবাবু ও তারাসুন্দরী আসেন যথাক্রমে মাসিক ১,১০০্ টাকা ও ১,০০০্ টাকা বেতনে। কিন্তু ২৫্ টাকা মাইনের দানীবাবু আমাকে বেশি মুগ্ধ করেছেন।

আচ্ছা, কত বছর বয়সে আপনারা শ্বশুরবাড়ির প্রথম তত্ত্ব খেয়েছেন? ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ এইরকম বলবেন তো? আমি খেয়েছি ছ'বছর বয়সে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে ব্যাপারটা খুলে বলি। পুজোর পঞ্চমী—চণ্ডীমণ্ডপে কুমোর প্রতিমা রং করছে, আমি একাগ্রমনে দেখছি, বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে তামাক এনে দিচ্ছি। দেখলুম, একজন অপরিচিত লোক একটা হাঁড়ি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব এসেছে—ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি ও ছ'হাতী কাপড়। অবশ্য ছ'বছর বয়সে আমার বিবাহ হয়নি, তবে বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, তাই এই তত্ত্ব। বিবাহের সম্বন্ধটা ঘটল এই রকমে। আমার ঠাকুরদাদা মজিলপুর গ্রামে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। একবার কন্যাকে দেখতে গেছেন, পাড়ার মুরুব্বিরা এসে ধরল, আপনার একটি পাঁচবছরের নাতি আছে, অমুকের একটি একবছরের কন্যা, বিবাহ স্থির ক'রে ফেলুন। দু'পক্ষেরই কুল যখন টনটনে তখন ঠাকুরদাদার 'তথাস্তু' বলতে বিলম্ব হল না। ঘট পেতে, মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল; আর বাঁধনটা আরো শক্ত করবার জন্যে ভাবী শ্বশুরমশায় তখন থেকেই তত্ত্ব পাঠাতে আরম্ভ করলেন। সে-সময় ফ্রক ওঠেনি, আমাদের তরফ থেকে যেতে লাগল পাঁচ-হাতী ডুরে-শাড়ী।

বিয়ে হল ১৮৯৮ সালে, আর এই ১৯৫৮ সালে আমাদের বিয়ের, রজত নয়, সুবর্ণ নয়, হীরক-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল। আচ্ছা, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কাদের বিবাহের হীরক-জয়ন্তী দেখেছেন? একজনও পাবেন না। আমি বরাবর শিক্ষকতা করে এসেছি, ব্রাহ্মণীকে সোনাদানা বিশেষ কিছু দিতে পারিনি; কিন্তু একটা মহা সুযোগ তাঁকে দিয়েছি; ৭২ বছর বয়সেও সমানে দু'বেলা মাছ-ভাত খেয়ে চলেছেন।

ইস্, করছি কি! কাগজের দাম বেজায় চড়েছে; এদিকে চৌত্রিশ ফর্মা হ'য়ে গেল, গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম নেওয়া চলবে না, স্বত্বাধিকারী মশায় ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন।—থেমে গেলুম।

পরের কিস্তি পরবর্তী পূজার সংখ্যায় দেবো। দশ বছরে দশ কিস্তি দিয়ে শেষ করব।

কি বলছেন—আমার এখন বয়স কত?

কেন, ছিয়াত্তর চলেছে। আপনার কথার ভাবার্থ আমি বুঝে নিয়েছি। আরো দশ বছর কি টিকব, এই তো?

আলবৎ টিকব। আমার বড়ো-মামা বেয়াল্লিশ বছর পেনশন ভোগ করেছিলেন, আমার তো সবে উনিশ চলেছে। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বলুন তো, আমাদেরও কি তিরিশ টাকায় চালের মণ, পনরো টাকায় একজোড়া ধুতি কিনতে হয় না? আপনারা তো দিব্বি মাগ্‌গি-ভাতা পাচ্ছেন, আমাদের পেনশনে D.A. নেই কেন? আমরা ইউনিয়ন গড়ব, মিছিল বের করব, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও সমবেতভাবে বলব,—আমাদের দাবি মানতে হবে,—ডালহৌসি স্কোয়ার অবধি হাঁটতে পারব না, গোরুর গাড়ি ক'রে যাব! সহজে ছাড়ব না। কিন্তু সরকার যদি না শোনে, আমাদের তো স্ট্রাইক করবার কিছু নেই! তাও ঠিক করে রেখেছি। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করব,—একশ'র আগে আমরা কেউ মরব না। দেখি সরকার জব্দ হয় কিনা।

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত
এবং তৎকর্তৃক ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

একটুও লাগবেনা !

এই ক্ষুদে 'ডাক্তার'টি পর্যন্ত জানে 'রোগী'-কে আরাম দেবার প্রয়োজন কতখানি! হয়ত, একদিন অদূর-ভবিষ্যতেই তার অসংখ্য আর্ত দেশবাসীকে নিরাময় করার গুরু দায়িত্ব নিয়ে সে এগিয়ে আসবে। তার বাবার দূরদর্শিতাই এর কারণ—একটি শিক্ষা সংক্রান্ত পলিসি নিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থাকেই তিনি পাকা করে রেখেছেন। জীবন-বীমায় টাকা বিনিয়োগ করে আপনিও আপনার সন্তানদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করতে পারেন।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

LIC-5C BEN

"পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই ভবিতব্যের প্রাক্ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাসী—আর এই বিশ্বাস-মিশ্রিত অনুসন্ধানের উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইমারত। এই শাস্ত্রের মাধ্যমে যুগে যুগে মানুষ যে-ভবিষ্যৎ তাহার দৃষ্টি চিন্তা ও মননশীলতার বাহিরে রহিয়াছে, তাহাকে জানার চেষ্টা করিয়াছে এবং তদনুসারে জীবনপথে চলারও প্রয়াস করিয়াছেন……নরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রীর সদ্য প্রকাশিত **'ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠি বিচারের সূত্রাবলী'** নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষের এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রকৃত যুক্তি-তর্ক এবং বিচার-বিবেচনা সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে।…… আমাদের দেশে শ্রমসাধ্য কাজ করার লোক বেশী নাই তাই চলনসই গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা লেখার দিকেই বেশীর ভাগ লেখকের ঝোঁক। এমন দিনে 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' 'দর্শনের ইতিবৃত্ত' 'মানব-সভ্যতার ধারা' 'বৈজ্ঞানিক অভিধান' 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা' 'মনঃ সমীক্ষণ' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের মনন ও চিন্তনের মেরুদণ্ড দৃঢ় করিতে অগ্রণী হইয়াছেন জ্যোতিঃশাস্ত্রী বাগলও তাঁহাদের অন্যতমরূপেই বিদ্বৎ-সমাজের স্বীকৃতি এবং সাধুবাদ লাভ করিবেন, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার বই সর্বজন সম্মাননা লাভ করুক।" **"যুগান্তর"** সম্পাদকীয় মন্তব্য—৩০-৭-৫৬ ॥

১—১০ টাকা। শোভন সংস্করণ—১২ টাকা ॥

ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭

পূজার প্রীতি উপহার

হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের রেডিও, গ্রামোফোন ও রেকর্ড, মারফি রেডিও, জাইস-আইকন্ ও আগফা ক্যামেরা ও ফিলিম্স এবং টেপ রেকর্ডার।

বিবরণীর জন্য পত্র লিখুন ঃ

নান এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

১এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ঃঃ কলিকাতা ১

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/বি ১৬৭ সি/১. বহবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/বি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
দোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

প্রতি ফোঁটায়
আপনার রক্ত পরিষ্কার
করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে ; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরি

সাধনা

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য।
৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্ব্বত্র

শারদ

বসুধারা

দ্বিতীয় বর্ষ • প্রথম খণ্ড • ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬৫

পরশুরাম ॥ প্রাচীন কথা ॥ ১ ॥ ॥ স্মৃতিকথা
যাযাবর ॥ লঘুকরণ ॥ ৭ ॥ ॥ রম্য-রচনা
অজিত দত্ত ॥ পাথরপুরী ॥ ১২ ॥ ॥ কবিতা
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এমন দিনে ॥ ১৩ ॥ ॥ গল্প
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ যেন না দেখি ॥ ১৮ ॥ ॥ কবিতা
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 'কালি-কলম' বার করলাম ॥ ১৯ ॥ স্মৃতিকথা
মণীন্দ্র রায় ॥ ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি ॥ ২৭ ॥ ॥ কবিতা
নির্মলকুমার বসু ॥ আমেরিকার চিঠি ॥ ২৮ ॥ ॥ পত্রাবলী
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ॥ দাক্ষিণাত্যে শারদোৎসব ॥ ৩১ ॥ ॥ প্রবন্ধ
লীলা মজুমদার ॥ ঝাঁপতাল ॥ ৩৩ ॥ ॥ উপন্যাস
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ আবহমান ॥ ৭৪ ॥ ॥ কবিতা
পরিমল গোস্বামী ॥ 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' ॥ ৭৫ ॥ ॥ রস-রচনা
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ প্রিয়তম ॥ ৭৮ ॥ ॥ গল্প
শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ অ্যামিবা ও আমরা ॥ ৮৫ ॥ ॥ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ
সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ শোক ॥ ৮৯ ॥ ॥ গল্প
উমা দেবী ॥ সূর্যাস্তের পথ ॥ ৯৪ ॥ ॥ কবিতা
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ চোর ॥ ৯৫ ॥ ॥ গল্প
শংকর ॥ রবার্ট সাহেবের গৃহত্যাগ ॥ ১০৫ ॥ ॥ বড় গল্প
রূপদর্শী ॥ কলকাতা : নানান চোখে ॥ ১১৭ ॥ ॥ সাক্ষাৎ-বিবরণী

বিমল মিত্র ॥ নফর সংকীর্তন ॥ ১২৩ ॥ ॥ উপন্যাস
বনফুল ॥ বিবর্তন ॥ ১৭২ ॥ ॥ রস-রচনা
শিবরাম চক্রবর্তী ॥ ভেল্কী ॥ ১৭৩ ॥ ॥ রস-রচনা
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সীমান্ত ॥ ১৭৭ ॥ ॥ বড় গল্প
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ বক্তব্য ॥ ১৯৬ ॥ ॥ কবিতা
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ রঙ্গওয়ালী ॥ ১৯৭ ॥ ॥ গল্প
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ আস্তিক ॥ ২০৭ ॥ ॥ কবিতা
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ অভিগমন ॥ ২০৭ ॥ ॥ কবিতা
আনন্দ বাগচী ॥ কুরূপা ॥ ২০৭ ॥ ॥ কবিতা
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ॥ কল্পনা ॥ ২০৭ ॥ ॥ কবিতা
বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ॥ একটি হৃদয়ের প্রেমে ॥ ২০৮ ॥ কবিতা
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ॥ মেঘের স্তব ॥ ২০৮ ॥ ॥ কবিতা
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ আজ এলে পরে ॥ ২০৮ ॥ কবিতা
অসিতকুমার ॥ বৃষ্টির দিন ॥ ২০৮ ॥ ॥ কবিতা
প্রভাংশু গুপ্ত ॥ বাংলা ছবির নায়িকা ॥ ২০৯ ॥ ॥ চলচ্চিত্র-বিবরণী
মতি নন্দী ॥ মেয়েটি ও একটি সকাল ॥ ২১৩ ॥ ॥ গল্প
অজিতকৃষ্ণ বসু ॥ মহাদ্বীপের কাহিনী ॥ ২২১ ॥ ॥ রস-রচনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ চুপি চুপি আসে ॥ ২২৫ ॥ ॥ উপন্যাস
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ চলচ্চিত্র ॥ ২৫১ ॥ ॥ স্মৃতিকথা

শারদ

বসুধারা
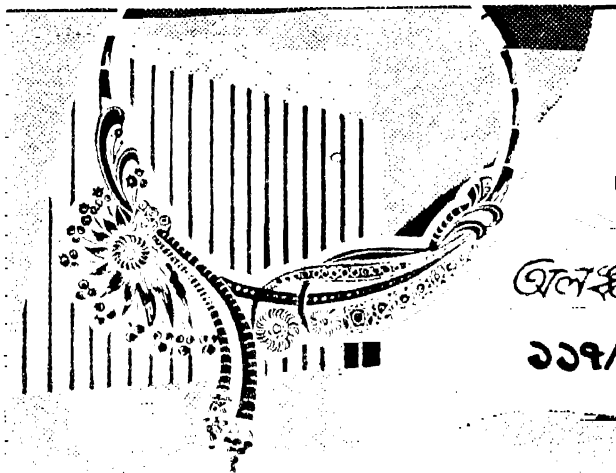
বাঙলার প্রাণ প্রবাহ

সম্পাদক

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থনায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সংযোগ

বিমল মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

অজিত গুপ্ত

২য় বর্ষ, প্রথম খণ্ড। আশ্বিন, ১৩৬৫ ষষ্ঠ সংখ্যা।

ভারতীয় প্রমাণ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) সময়ানুযায়ী

শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজার সময় নির্ঘণ্ট*

৩১শে আশ্বিন শুক্রবার (নি ২৫), ১৭ অক্টোবর, পঞ্চমী দিবা ঘ ১০।২৫।

সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন।

১লা কার্ত্তিক শনিবার (নি ২৬), ১৮ অক্টোবর, ষষ্ঠী দিবা ঘ ৮।৪৪।

দিবা ঘ ৮।৪৪ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ।

সায়ংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

২রা কার্ত্তিক রবিবার (নি ২৭), ১৯ অক্টোবর, সপ্তমী দিবা ঘ ৭।৪৮।

দিবা ঘ ৭।৪৮ মধ্যে

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর নবপত্রিকাপ্রবেশ, স্থাপন, সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ

ও সপ্তমীবিহিত পূজা সমাপন।

রাত্রি ঘ ১০।৫৮ গতে ১১।৪৬ মধ্যে অৰ্দ্ধরাত্রিবিহিত পূজা।

৩রা কার্ত্তিক সোমবার (নি ২৮), ২০ অক্টোবর, অষ্টমী দিবা ঘ ৭।৩৭।

দিবা ঘ ৭।৩৭ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা সমাপন।

দিবা ঘ ৭।১৩ গতে সন্ধিপূজারম্ভ,

দিবা ঘ ৭।৩৭ গতে ৮।১ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপন।

৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার (নি ২৯), ২১ অক্টোবর, নবমী দিবা ঘ ৮।১০।

দিবা ঘ ৮।১০ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমীবিহিত পূজা সমাপন।

৫ই কার্ত্তিক বুধবার (নি ৩০), ২২ অক্টোবর, দশমী দিবা ঘ ৯।২৩।

দিবা ঘ ৯।২৩ মধ্যে।

শ্রীশ্রীদেবীর দশমীবিহিতপূজা সমাপন ও বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জনান্তে অপরাজিতাপূজা। বিজয়াদশমীকৃত্য।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। নিম্নে ২রা কার্ত্তিক সপ্তমী পূজার দিনে কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থানের সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত ও পূর্ব্বাহ্ণকাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ানুসারে প্রদর্শিত হইল।

স্থান	কলিকাতা	পুরী	কাশীধাম	পাটনা	দিল্লী	গৌহাটী	বোম্বাই	ঢাকা
সূর্য্যোদয়	৫।৩৮	৫।৪৬	৬।১	৫।৫৪	৬।২৮	৫।২৭	৬।৩৭	৫।৩১
সূর্য্যাস্ত	৫।৫	৫।১৭	৫।২৪	৫।১৫	৫।৪৪	৪।৪৮	৬।১০	৪।৫৬
পূর্ব্বাহ্ণ	৯।২৭	৯।৩৬	৯।৫০	৯।৪১	১০।১৩	৯।১৪	১০।২৮	৯।১৯

* **বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা** মতে।

† নি = ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তারিখ।

ফটো : তপন দাশ]

কাঠমল্লিকা

শারদ
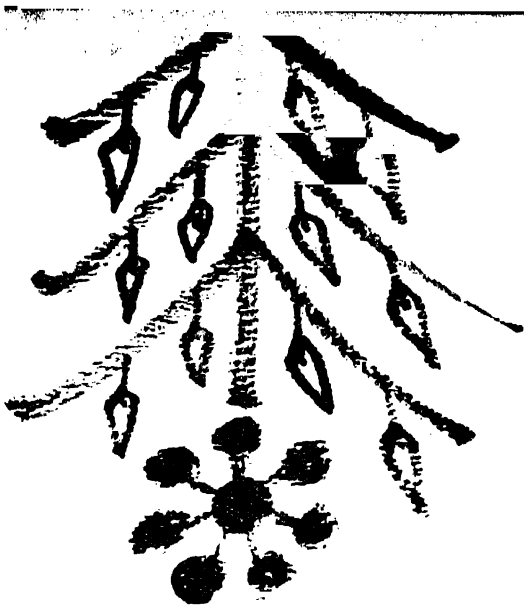
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা ★ আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রাচীন কথা

পরশুরাম

[এই সব ঘটনার ৭০-৮০% সত্য, ২০-৩০% মিথ্যা, অর্থাৎ স্মৃতিকথায় যতটা ভেজাল দেওয়া দস্তুর তার চাইতে বেশী নেই। নাম সবই কাল্পনিক]

১। বনোয়ারী বাবুর দাড়ি

প্রায় সত্তর বৎসর আগেকার কথা। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌ল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাসে পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাষ্টার বললেন, কি হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে সার বলা রীতি ছিল না, মাষ্টার মশাই বলা হত। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, সবাই চাদরাবাগ যাব।

—সেখানে কিজন্যে যাবি?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তাঁর দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেঁই মাষ্টার মশাই ছুটি দিন।

—চারটের সময় ছুটি হলে তার পরে তো যেতে পারিস।

—অনেক দূর যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি রায়-সাহেবদের বাড়ি দাবা খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাষ্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবুর কথা শুনেছি বটে।

চাদরাবাগ অনেক দূর, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিভূতিবাবুর বাড়ি পৌঁছুলুম, দাড়িবাবু সেখানেই উঠেছেন। বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে তিনি হুঁকো টানছিলেন। আমাদের দলটিকে দেখে তাঁর বোধ হয় একটু আমোদ হল, নিবিড় কালো দাড়ি-গোঁফের তিমির ভেদ করে

সাদা দাঁতে একটু হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। সেকালে ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই দাড়ি রাখতেন, অব্রাহ্মদেরও অনেকের বড় বড় দাড়ি ছিল। কিন্তু সেসব দাড়ি এই নবাগত ভদ্রলোকের দাড়ির কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

বিধু মাষ্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই ছেলেরা আপনাকে দেখতে এসেছে মশাই, কিছুতেই ছাড়বে না, তাই আধ ঘণ্টা আগেই ক্লাস বন্ধ করতে হল।

দাড়িধারী ভদ্রলোকের নাম বনোয়ারী বাবু। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, বেশ বেশ, দেখবে বইকি, দেখাবার জন্যেই তো রেখেছি। যত ইচ্ছে হয় দেখ বাবারা, পয়সা দিতে হবে না।

দাড়িটি বনোয়ারী বাবুর গলায় কম্ফর্টরের মতন জড়ানো ছিল, এখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আলুলায়িত করলেন। হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুলে পড়ল।

সবিস্ময় আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা একযোগে বলে উঠলুম, উ রে বাবা!

বনোয়ারী বাবু বললেন, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? টেনে দেখতে পার, আমার দাড়ি যাত্রার দলের মুনি-ঋষিদের মতন টেরিটিবাজারের নকল দাড়ি নয়। এই বলে তিনি দাড়ি ধরে বারকতক হেঁচকা টান দিলেন।
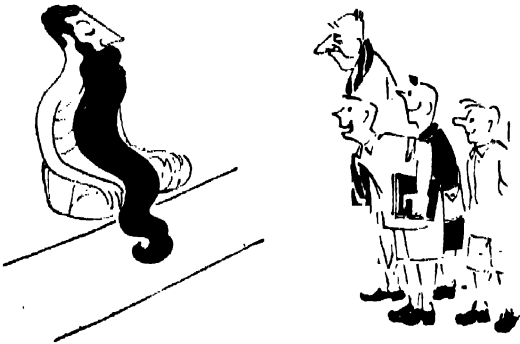
বিধু মাষ্টার বললেন, আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, আপনার দাড়ির বর্তমান ঝুল কত? সাড়ে তিন ফুট হবে কি?

—থুতনি থেকে পাক্কা বিশ গিরে, মানে পৌনে চার ফুট। পরশু আবদুল দরজী ফিতে দিয়ে মেপেছে।

—এতখানি গজাতে কত দিন লেগেছে?

—তা প্রায় দশ বছর। চব্বিশ বছর বয়সে কামানো বন্ধ করেছিলুম, এখন বয়স হল চৌত্রিশ।

বিধু মাষ্টার তাঁর ক্লাসের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এই ছেলেরা, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে দাড়ি যদি পৌনে চার ফুট হয় তবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কত হবে?

ছেলেদের ঠোঁট নড়তে লাগল, বিড়বিড় শব্দ করে তারা মানসাঙ্ক কষছে। অঙ্কে আমার খুব মাথা ছিল, সকলের আগেই বললুম, সাড়ে সাত ফুট মাষ্টার মশাই।

বিধু মাষ্টার বললেন, করেক্ট। আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, দশ বছর পরে সাড়ে সাত ফুট দাড়ি হলে আপনি সামলাবেন কি করে?

বনোয়ারী বাবু সহাস্যে বললেন, তা তো ভাবি নি, তখন যা হয় করা যাবে, না হয় কিছু ছেঁটে ফেলব।

আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে সপ্রতিভ ছেলে কেষ্ট। সে বলল, না না ছাঁটাবেন না, কানের পাশ দিয়ে তুলে মাথায় পাগড়ির মতন জড়ালে বেশ হবে।

বনোয়ারী বাবু বললেন, ঠিক বলেছ হে ছোকরা, পাগড়িই বাঁধব, পশমী শালের চাইতে গরম হবে।

একটু আমতা আমতা করে বিধু মাষ্টার বললেন, কিছু মনে করবেন না বনোয়ারী বাবু, ইয়ে, একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কি বিবাহিত?

—অফ কোর্স।

—তা হলে, তা হলে—

—আমার স্ত্রী এই দাড়ি বরদাস্ত করেন কি করে—এই তো আপনার প্রবলেম? চিন্তার কারণ নেই মাষ্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশন, বুঝলেন কিনা। তাঁরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাষ্টার আঁতকে উঠে বললেন, কি সর্বনাশ!

—তাঁরটা দাড়ি নয় মশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুন্তলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তার পর বনোয়ারী বাবু বাঙালী ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশী হয়ে বিদায় নিলুম।

২। সত্যবতী ভৈরবী

তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ, পলিটিক্স নিয়ে বেশী লোক মাথা ঘামাত না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের চাইতে মাদাম ব্লাভাৎস্কি শশধর তর্কচূড়ামণি আর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে হরনাথ মুখুজ্যের আশ্রম। বিস্তর জমি, অনেক আম কাঁঠাল লিচুর গাছ, একতলা পাকা বাড়ি, তা থেকে কিছু দূরে একটি কালীমন্দির। হরনাথ বাবু কলকাতা থেকে কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং আনিয়ে খুব ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভেটকু তেওয়ারী নামক এক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ সেই চিত্রমূর্তির নিত্য সেবা করত। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে হরনাথ বাবু নিজেই পূজা করতেন।

শাস্ত্রে পটপূজার বিধান থাকলেও সাধারণ লোকে মাটি-পাথরের বিগ্রহেই অভ্যস্ত। হরনাথ বাবুর এই টু-ডাইমেনশন-ধারিণী পটরূপা দেবীর উপর প্রথম প্রথম লোকের তেমন শ্রদ্ধা হয় নি। একদিন শোনা গেল, তেওয়ারীর হাত থেকে মা-কালী খাঁড়া কেড়ে নিয়েছেন, হরনাথ বাবু স্বচক্ষে তা দেখেছেন। এর পরে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দেবী পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত।

হরনাথ বাবুর আশ্রমে সদাব্রত লেগেই আছে, সব রকম সাধুবাবাই এখানে দিন কতক বাস করতে পারেন। মন্দিরের গায়ে দুটি ছোট ছোট কুঠুরি আছে, সেখানে শুধু গৈরিকধারী কানঢাকা-টুপি-পরা এক নম্বর সন্ন্যাসী মহারাজদের থাকবার অধিকার আছে। মন্দিরের পিছনে কিছু দূরে একটা চালা ঘর
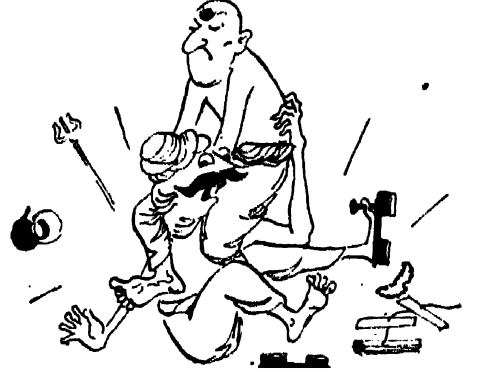
আছে, সেখানে জটা-কৌপীন-লোটা-চিমটা-ধারী দু নম্বর সাধুবাবারা আশ্রয় পান। দুই শ্রেণীর সাধুদের মধ্যে সদ্‌ভাব নেই। জটাধারীরা সন্ন্যাসী মহারাজদের বলেন, বিলকুল ভ্রষ্ট্‌, ভণ্ড্‌। অপর পক্ষ বলেন, গঁজেড়ী ভাংখোর মূর্খ্‌।

আশ্রমে কোনও নামজাদা বা নূতন ধরনের সাধু এলে অনেকে দেখতে যেত। আমি, কেষ্ট, আর তার ভাগনে জিতুও মাঝে মাঝে যেতুম, অনেক রকম মজাও দেখতুম। একবার তর্ক করতে করতে এক বাঙালী তান্ত্রিক একজন হিন্দুস্থানী বেদান্তীর কাঁধে চড়ে বসলেন, কিছুতেই নামবেন না। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। অবশেষে হরনাথ বাবু অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করলেন। আর একবার কামরূপ থেকে এক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল দেখালেন। সামনে একটা আঙটি রেখে তার কিছু দূরে একটা টাকা রাখলেন, তার পর মন্ত্রপাঠ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। আঙটিটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল এবং টাকাকে গ্রেপতার করে নিয়ে ফিরে এল। ওভারসিয়র নীরদবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি ম্যাজিক জানতেন, তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। খপ করে সিদ্ধবাবার কান ধরে তিনি একটা সূক্ষ্ম

কালো সুতো টেনে বার করলেন। সুতোটা কানে আটকানো ছিল, আঙটি আর টাকার সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

একদিন খবর এল, কাশী থেকে এক বাঙালিনী ভৈরবী এসেছেন, বয়স হলেও তাঁর রূপ নাকি ফেটে পড়ছে। হিন্দুস্থানীরা তাঁকে বলে মাতাজী সত্যবতী, বাঙালীরা বলে তপস্বিনী ভৈরবী। কেষ্ট জিতু আর আমি দেখতে গেলুম। মন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা বাঘছালের উপর ভৈরবী বসে আছেন আর দু হাতের মুঠোয় একটা কলকে ধরে হুশ হুশ করে তামাক টানছেন। রঙ ফরসা, মাথায় এক রাশ কালো রুক্ষ ফাঁপানো চুল, অল্প পাক ধরেছে, কপালে ভস্মের তিলক। সামনে একটা চকচকে ত্রিশূল পড়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে অনেক দর্শক এল, কেউ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, কেউ খাড়া হয়েই নমস্কার করল। নানা লোক ভৈরবীকে প্রার্থনা জানাল, তিনিও সকলকে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় মুনশী রামভকত এসে করজোড়ে বললেন, মাতাজী, আজ মেরা কোঠিমে জানে কি বাত থি, এক্কা লায়া।

ভৈরবী বললেন, হাঁ বাবা, আমার ইয়াদ আছে, একটু পরেই উঠছি। মুনশীজী, এই দেখ তোমার জন্যে আমি জয়রাম ধূপ বানিয়েছি, হপ্তা খানিক এর ধোঁয়া দিলে তোমার বাড়ির সব আলাই বালাই ভূত প্রেত দূর হবে, তোমার জরুর উপর যে চুড়ৈল (পেতনী) ভর করেছে সেও ভেগে যাবে।

রামভকত কৃতার্থ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রাণকান্ত বাবু এলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বড় অফিসার, শহরের সকলেই এঁকে খাতির করে। প্রাণকান্ত বাবু এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে বললেন, ভৈরবী মাতাজী, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টিতে তাকান, বড়ই সংকটে পড়েছি, আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে?

ভৈরবী কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ একটু কুঁচকে গেল, মুখে সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, আরে প্রাণকান্ত যে! হরে রাম, হরে রাম! চিনতে পেরেছ তো? ওকি, অমন হতভম্ব হয়ে গেলে কেন, ভূত দেখলে নাকি?

প্রাণকান্ত বাবু নির্বাক বিমূঢ় হয়ে মিটমিট করে চাইতে লাগলেন। ভৈরবী বললেন, সেকি প্রাণকান্ত, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? লজ্জা কেন, এখন তুমিও সাধু আমিও সাধ্বী, দুজনেই পোড়-খাওয়া খাঁটী সোনা। ওকি, পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

প্রাণকান্ত বাবু দাঁড়ালেন না, ভিড় ঠেলে সবেগে প্রস্থান করলেন। ভৈরবী স্মিতমুখে বললেন, একটা ভূত ভেগে গেল। চল মুনশী রামভকত, এইবার তোমার কুঠিতে যাব।

ভৈরবী চলে গেলে দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠল। এক দল বলল, ভৈরবী না আরও কিছু। ছিছি, এত লোকের সামনে কেলেঙ্কারি ফাঁস করতে মাগীর লজ্জাও হল না। সেই যে বলে, অঙ্গারঃ শতধৌতেন। আর এক দল বলল, অমন কথা মুখে আনতে নেই, উনি এখন পূর্ণমাত্রায় তপঃসিদ্ধা, গৌতমপত্নী অহল্যার মতন পাপশূন্যা, লজ্জা ভয় নিন্দা প্রশংসার বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, আগের কথাও লুকুতে চান না। সেই জন্যেই তো সত্যবতী নাম।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে ভাই, প্রাণকান্ত বাবু পালিয়ে গেল কেন?

কেষ্ট বলল, বুঝতে পারলি না বোকা, এই ভৈরবীর সঙ্গে প্রাণকান্ত বাবুর লভ হয়েছিল।

৩। মধু-কুঞ্জ-সংবাদ

সেকালেও বদমাশ ছেলে ছিল, কিন্তু এখনকার মতন তারা কলেকটিভ অ্যাকশন নিতে জানত না। মাষ্টাররা তখন বেপরোয়া ভাবে বেত লাগাতেন,

ছেলেরা তা শিক্ষারই অঙ্গ মনে করত, মা-বাপরাও আপত্তি করতেন না।

বেত মারায় আমাদের মধুসূদন মাষ্টারের জুড়ি ছিল না। দোষ করলে তো মারতেনই, বিনা দোষেও শুধু হাতের সুখের জন্যে মারতেন। তিনি একটি নতুন শাস্তি আবিষ্কার করেছিলেন—রসমোড়া, অর্থাৎ পেটের চামড়া খামচে ধরে মোচড় দেওয়া।

মধু মাষ্টার বাঙলা পড়াতেন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, কালো রঙ, একমুখ দাড়িগোঁফ, তাতে চেহারাটি বেশ ভীষণ দেখাত। তখনও তাঁর বিবাহ হয় নি, বাড়িতে শুধু বিধবা বিমাতা আর দশ-এগারো বছরের একটি আইবড় বৈমাত্র ভগ্নী। শুনতুম দেশে তাঁর যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে, শুধু ছেলে ঠেঙাবার লোভেই নানা জায়গায় মাষ্টারি করেছেন।

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম কুঞ্জ। বয়স চোদ্দ-পনরো, আমাদের চাইতে ঢের বড়। একটু পাগলাটে, লেখাপড়ায় অত্যন্ত কাঁচা, তিন বৎসর প্রমোশন পায় নি।

মধু মাষ্টার চারুপাঠ পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ বলল, মাষ্টার মশাই, একবার বাইরে যাব, পেচ্ছাব পেয়েছে।

ধমক দিয়ে মধু মাষ্টার বললেন, মিথ্যে কথা। রোজ এই সময় তোর বাইরে যাবার দরকার হয়। নিশ্চয় তামাক কি বাডসাই খাস।

একটু পরে কুঞ্জ আবার বলল, উঃ, আর থাকতে পারছি না, ছুটি দিন মাষ্টার মশাই। ফিরে এলে বরং আমার মুখ শুঁখে দেখবেন তামাক খেয়েছি কিনা।

—খবরদার, চুপ করে বসে থাক। ছুটি পাবি না।

মুখ কাঁচুমাচু করে কাতর কণ্ঠে কুঞ্জ বলল, উহুহুহু। তারপর উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মধু মাষ্টার তাকে ধরে ফেলে একটা রসমোড়া দিলেন তার পর সপাসপ বেত মারতে লাগলেন।

কুঞ্জ চিৎকার করে বলল, আমার দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু। বেত এড়াবার জন্যে সে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, মধু মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে বেত চালাতে লাগলেন্।

আমরা তারস্বরে বললুম, মাষ্টার মশাই, সমস্ত ঘর ভিজে নোংরা হয়ে গেল, আপনার কাপড়েও ছিটে লেগেছে। মেথর ডাকতে হবে।

মধু মাষ্টার তখনও উন্মত্ত হয়ে বেত চালাচ্ছেন। হঠাৎ কুঞ্জ মাটিতে শুয়ে পড়ে গোঁগোঁ করতে লাগল। আমরা বললুম, কুঞ্জ মরে গেছে, নিশ্চয় মরে গেছে।

কেষ্ট তাড়াতাড়ি এক ফালি কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে কুঞ্জর নাকের কাছে ধরে বলল, এখনও মরে নি, দেখুন না কাগজটা ফরফর করছে। মারের চোটে কুঞ্জ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আর একটু পরেই মরে যাবে। ছুটি দিন মাষ্টার মশাই, আমরা চ্যাংদোলা করে কুঞ্জকে তার বাড়ি নিয়ে যাব, সেখানে মরাই তো ভাল। আপনি মেথর ডাকান আর চান করে কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন।

অগত্যা মধু মাষ্টার ক্লাস বন্ধ করলেন।

পরদিন কুঞ্জ স্কুলে এল না। মধু মাষ্টার বললেন, আজ বিকেলে ওর বাড়িতে খোঁজ নিস তো, কেমন আছে ছোঁড়া।

ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমরা একসঙ্গে আবৃত্তি করছি—সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্বময়। হঠাৎ কুঞ্জ তার মাকে নিয়ে উপস্থিত হল। মা খুব লম্বা চওড়া মহিলা, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়ে

পরেছেন, মাথায় কাপড় না থাকারই মধ্যে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে নাক সিঁটকে একবার চারদিকে উঁকি মারলেন, যেন আরসোলা কি নেংটি ইঁদুর খুঁজছেন। তার পর আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, মোধো মাষ্টার কোন্‌টে রে?

একালের চাইতে তখন ছেলেদের মধ্যে শিভালরি ঢের বেশী ছিল। আমরা সকলেই সসম্ভ্রমে আঙুল বাড়িয়ে মধু মাষ্টারকে শনাক্ত করলুম।

কুঞ্জর মা সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কান ধরে বললেন, ইষ্টুপিট মুখপোড়া বাঁদর! তোর বেতগাছটা কোথা রে?

আমরা বললুম, ওই যে, চেয়ারে ওঁর পাশেই রয়েছে। কুঞ্জর মা কিন্তু আমাদের নিরাশ করলেন। বেতটা বাঁ হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লাগালেন না, শুধু ডান হাত দিয়ে মধু মাষ্টারের দাড়ি-ভরা গালে গোটা চারেক থাবড়া লাগালেন। তার পর বেতটা নিয়ে কুঞ্জর হাত ধরে গটগট করে চলে গেলেন।

গোলমাল শুনে মাষ্টাররা সবাই আমাদের ক্লাসে এলেন। হেডমাষ্টার মশাই বললেন, বাড়ি যা তোরা।

পরদিন থেকে মধু মাষ্টার গোবেচারার মতন বিনা বেতেই পড়াতে লাগলেন।

ছ মাস পরেই কুঞ্জর সঙ্গে মধু মাষ্টারের একটা পাকা রকম মিটমাট হয়ে গেল। রেল স্টেশনের মালবাবু যামিনী ঘোষাল ছিলেন কুঞ্জর দূর সম্পর্কের ভাই, তাঁর সঙ্গে মধু মাষ্টারের বৈমাত্র বোন ভুতির বিয়ে স্থির হল। মধু মাষ্টার যথাসাধ্য আয়োজন করলেন, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিবাহ-সভায় সবাই বরের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় বরপক্ষের একজন খবর আনল—যামিনী বলেছে, মধু চামারের বোনকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেষ্ট আমাদের চুপিচুপি বলল, কুঞ্জই ভাংচি দিয়েছে।

বিয়েবাড়িতে প্রচণ্ড হইচই উঠল। মধু মাষ্টারের বিমাতা কুঞ্জর মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রক্ষা কর দিদি, এখন বর কোথায় পাব, তোমার ছেলে কুঞ্জকে আদেশ কর।

কুঞ্জর মা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, বামুনের জাতধর্ম বাঁচাতে হবে বইকি। এই কুঞ্জ, তোর ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এই চেলিটা পর।

কুঞ্জ বলল, ভুতি যে বিচ্ছিরি!

তার মা বললেন, আহা, কি আমার কাত্তিক ছেলে রে! ওঠ বলছি, নয়তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

কুঞ্জর বাবা বললেন, ছেলেটার যখন আপত্তি তখন জোর করে বিয়ে দেবার দরকার কি?

কুঞ্জর মা বললেন, যাও যাও, তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন?

কুঞ্জ তবু ইতস্তত করছে দেখে কেষ্ট তাকে চুপিচুপি বলল, বিয়েটা করে ফেল কুঞ্জ, অনেক সুবিধে। সোনার আঙটি পাবি, রূপোর ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পাবি, ক্লাসে প্রমোশনও পেয়ে যাবি। আর, মধু মাষ্টার মশাই তোর কে হবেন জানিস তো? শালা।

কুঞ্জ আর আপত্তি করে নি।

লঘূকরণ

যাযাবর

দুই বর্ণের সংযোগে সন্ধি। দুই নদীর সমাবেশে সংগম। দুই নরনারীর মিলনে পরিণয়। সংগীতে যেমন ডুয়েট, রসায়নে যেমন কম্পাউণ্ড, রাজনীতিতে যেমন পি-এস-পি।

মানব-ইতিহাসে বিবাহের প্রবর্তন কবে তা জানিনে। তার প্রচলন কেন তা অনুমান করতে পারি।

সৃষ্টির গোড়ায় স্বর্গোদ্যানে মানুষ ছিল মাত্র দুটি। কোনো শুভদিন-নির্ঘণ্টের সুতহিবুক যোগে শ্রীমতী ইভের কুশণ্ডিকা হয়েছিল এমন জনশ্রুতি নেই। পুরাণে জেট-প্লেন ও বেদে এ-আর-পি'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পেয়ে থাকেন, তাঁরাও এখন পর্যন্ত আদমের বাসর-ঘর আবিষ্কার করতে পারেননি।

ক্যাফেটারিয়ায় স্বহস্ত-পরিবেশনের মতো ফলমূল আহরণ করে আদি জনক-জননী মোটামুটি অনন্যনির্ভর জীবন যাপন করেছেন। শীত, আতপ এবং বর্ষা-বাদলের অকস্মাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হয়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহকে হয়তো বিকল করেছে। কিন্তু হাতের কাছেই বত্রিশটাকা ফিজ-এর বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার না থাকায় সামান্য সর্দি-কাশি বা অগ্নিমান্দ্য প্যারাটাইফয়েড বা গ্যাসট্রো-এনট্রাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক নাম নিয়ে প্রাণঘাতিকা হয়ে ওঠেনি।

প্রথম মানব-মানবীর সন্তান-সন্ততির সঠিক সংখ্যা অপরিজ্ঞাত। গার্ডেন অব ইডেনে আর যাই থাক, সেন্সস কমিশনার ছিলনা। তবুও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবেনা যে, জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ জীবনযাত্রা হয়েছে জটিলতর। মানুষ মৃগয়া ছেড়ে ধরেছে ভূমিকর্ষণ। শরায়ুধ থেকে হয়েছে হলায়ুধ। গুহাবাস পরিত্যাগ করে শুরু করেছে গৃহবাস।

চুলের সঙ্গে যেমন টেড়ি এবং কানের সঙ্গে যেমন দুল, গৃহের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দেখা দিয়েছেন গৃহিণী। প্রশ্ন উঠতে পারে গৃহের তরে গৃহিণী, না

গৃহিণীর জন্য গৃহ। এ-তর্ক শুধু অর্থহীন নয়, অন্তহীনও বটে। ধপাস করে পড়ে, না, পড়ে ধপাস করে? নেতা হয়ে জেলে যায়, না, জেলে গিয়ে নেতা হয়?

অবশ্য নৈয়ায়িককে লজ্জা দিতে পারেন এমন সুচতুর ভাষ্যকারও আছেন। পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষার মতো শ্যাম এবং কুল বজায় রাখার কৌশল তার আয়ত্তে। তিনি বলেছেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে,—গৃহ বলতেই বোঝায় গৃহিণী। অনুমান করি, লোকটা অকৃতদার।

আসল কথা, আদিযুগে সংসারযাত্রাটা নারী বা পুরুষ কারুর পক্ষেই এককসাধ্য ছিল না। নেহাত প্রয়োজনের তাগিদেই দু'পক্ষকে হাত মিলাতে হয়েছে। ব্যবসা চালাতে যেমন পার্টনারশিপ। গভর্নমেণ্ট দখল করতে যেমন কোয়ালিশন। কলকাতায় যেমন স্যাণ্ডারসনস অ্যাণ্ড মরগ্যানস; ঢাকায় যেমন আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানী কংগ্রেস।

বিবাহকে কল্পনাবিলাসী কবিরা বলেন,—ফুলডোর। যুক্তিবাদী আইনজ্ঞেরা বলেন, সামাজিক চুক্তি। কোষ্ঠী বা হস্তরেখা বিচারক জ্যোতিষ-শাস্ত্রীরা বলেন দৈবের নির্বন্ধ। এ-ছাড়াও পরিণয়ের একাধিক পরিচিতি আছে। তার সবগুলিই কিছু শ্রুতিসুখকর নয়।

সকলেই জানি, জগতে একজাতীয় অতিসন্দিগ্ধ লোক আছে কোনো কিছুতেই যাদের আস্থা নেই। ইংরেজীতে এদের বলে, সীনিক। এরা নিন্দুকের অধিক। সভাপতিত্বের অনুরোধের পিছনে এরা দেখতে পায় চাঁদার খাতা, সামনে নিজের সুখ্যাতি শুনে আশঙ্কা করে টাকা-ধারের ভূমিকা। ন্যাশন্যালাইজেশনের অর্থ জানে,—ইনেফিসিয়েন্সি; প্ল্যানকে বলে,—চাকরি-সৃষ্টি এবং জনগণের নামে অশ্রু-বরিষণ দেখলে ভাবে আসন্ন ইলেকশন। অর্ধপূর্ণ কুম্ভ এদের চোখেই দেখায় অর্ধশূন্য। এই সভাব-সংশয়ীরা বিবাহের আখ্যা দেয়—বেড়ি। এরা বণ্ডকে বলে বণ্ডেজ; উদ্বাহ-বন্ধনকে উদ্বন্ধন।

সংসারের বৈশিষ্ট্যহীন বাকী শতকরা নিরানব্বই-জন, বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাদের বলা হয় আপামর সাধারণ, এসব সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ধার ধারেনা। সেক্সপীয়র তারা পড়েনি। গোলাপের সন্ধানও বিশেষ রাখেনা। কিন্তু জানে, পৃথিবীতে নামে কিছুই যায় আসেনা। যে ট্রেনের নাম এক্সপ্রেস সেও টাইমটেবলের তিন ঘণ্টা পরে পৌছায়। যে-দোকানী শিশিতে চিরতার আরক বেচে, সেও দোকানের সাইনবোর্ডে লেখে,—দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সুতরাং কোনো কিছুরই সংজ্ঞা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তাদের দিব্যজ্ঞান নেই, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আছে।
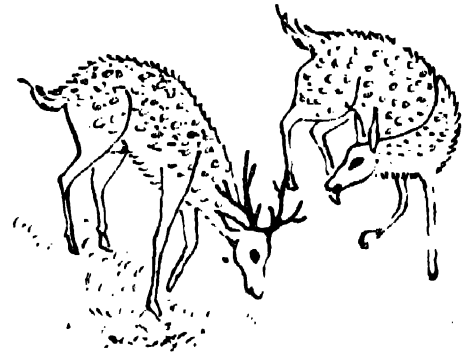
বিবাহকে তারা মনে করে একটা লটারী। পৃথিবীতে ভীরু ব্যক্তিদের আদি, অকৃত্রিম ও একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। তবে ডার্বি বা রেঞ্জার্সের সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, হেরে গিয়ে টিকিটখানা ছিঁড়ে

ফেলা চলেনা। চক্রব্যূহের মতো উদ্বাহেরও আগমন-পথ সহজ, নির্গমন-পথ দুরূহ। আধুনিক অভিমন্যুদের জানা থাকা ভালো যে, দাম্পত্য-নগরীর সবগুলি রাস্তাই ওয়ান-ওয়ে।

মানুষের জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিয়ন্ত্রিত উপক্রমণিকা ও উপসংহারের মধ্যপথে বিবাহ জীবনের স্বরচিত অধ্যায়। কোর্টশিপের তো কথাই নেই, চাক্ষুষ পরিচয় বিবর্জিত বর-কনের গুরুজন নির্ধারিত সনাতন হিন্দু-বিবাহও স্বয়ম্ভু নয়; তার পিছনে দীর্ঘদিনব্যাপী সজ্ঞান আয়োজনের প্রাচুর্য আছে। বিবাহ স্থির যদি-বা হয় স্বর্গে, রেজেস্ট্রী হয় মর্তে। সেটা যথেষ্ট চেষ্টাসাপেক্ষ। মাসিকপত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশের মতো নরনারীর বিবাহিত পর্ব যুগ্ম সম্পাদনায় জীবনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র।

বিবাহ পুরুষকে দেয় স্থৈর্য, নারীকে দেয় প্রতিষ্ঠা। স্বামীর বাড়ায় দায়, স্ত্রীর বাড়ায় দাম। সে-দাম নারীর নিজস্ব নয়। গালের উপরে পাউডার এবং নখের উপরে রঙের মতো সেটা প্রক্ষিপ্ত।

গণিতশাস্ত্রে শূন্যের নিজের কোনো সত্তা নেই। তার মূল্য নির্ধারিত হয় পার্শ্বস্থ সংখ্যাটির গুরুত্বে। দশের চাইতে কুড়ির কদর বেশী। ষাটের চাইতে আশীর ওজন অধিক। সমাজে নারীর মর্যাদা নিরূপিত হয় পিতা অথবা পতির গৌরবে। নায়েব-কন্যা অপেক্ষা জমিদার-নন্দিনীর প্রতাপ প্রবল। থার্ড-মাস্টার অক্ষয়বাবুর মেয়ের তুলনায় ব্যারিস্টার নন্দী সাহেবের তনয়ার নাসিকা উত্তুঙ্গ। পিতৃ-পরিচয়ের চাইতেও ভর্তৃপরিচয় গুরুতর। সেকশন-অফিসর বসু-গিন্নীর চেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি সেন-মহিষী অধিকতর দুর্ধর্ষ। কবিরা যে নারীকে আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন সেটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। কে না জানে যে, চাঁদের আলো তার নিজের নয়,—সমস্তটাই পরস্ব।

মালাবদলের দ্বারা নারী বদল করে পদবী। সেটা প্রকাশ্যে। পুরুষ পরিহার করে পদ। সেটা অলক্ষ্যে। সপ্তপদীর পর পরিবারের কর্তৃপদ থেকে স্বামীর ত্বরিত অপসৃতি লেবার-য়ুনিয়নে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের মতোই নিঃশব্দ কিন্তু নিশ্চিত।

বিলাতী প্রবাদে বলে,—কামানের চাইতে সোনার জোর বেশী। কিন্তু সোনার চাইতেও শক্তিশালী অস্ত্র আছে জগতে। তার নাম সোহাগ। অকারণ হাস্য এবং অকারণ অশ্রু—এই সাঁড়াশি-আক্রমণ, সামরিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'পিন্সার মুভমেণ্ট', দ্বারা স্ত্রীরা অবলীলাক্রমে স্বামী এবং সিন্দুকের চাবি আঁচলে বাঁধেন; মাল ও মালিক দুই-ই দখলে আনেন বিস্ময়কর তৎপরতায়।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নারীর জীবনের আরম্ভ। আইনসভায় ডিবেটের আগে কোশ্চেন-আওয়ারের ন্যায় তার প্রাগ্‌বৈবাহিক অংশটুকু বিবাহিত পরিচ্ছেদটিরই মুখবন্ধ। পালার আগে প্রস্তাবনা। কবির ভাষায় বলতে গেলে, সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে দুপুরবেলায় সল্‌তে পাকানো। অতি আধুনিক অভিজাতমণ্ডলীর ভাষায় ব্যাখ্যা করলে, ডিনারের আগে যেমন ড্রিঙ্কস্। পার্টিতে যাওয়ার আগে যেমন মেক-আপ। বস্তুতঃ, গোত্রান্তরের দ্বারা প্রত্যেক নারীরই ঘটে জন্মান্তর। কাকে বিয়ে করব সে-ভাবনায় একালের যুবকেরা যে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয় সেটা একান্তই নিরর্থক। কারণ যাকেই বিয়ে করা যাক না কেন, দু'দিন পরেই দেখা যায়, সে অন্য আর কেউ।

পরিণয় পুরুষের জীবনে আনে সমাপ্তি। তার বিবাহোত্তর অস্তিত্ব শুধু পূর্বজীবনের ভগ্নাবশেষ। নাটকের এপিলোগ বা বক্তৃতার পেরোরেশানের মতো সেটা মূল কর্মকাণ্ডের অকিঞ্চিৎকর অনুবর্তন।

শুধু করুণ নয়,—কৌতুকাবহ। আশ্চর্য নয় যে, পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সাহিত্যেই বিবাহিত পুরুষকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সর্বাধিক প্রহসন।

দাম্পত্যে স্বামীর প্রয়োজন প্রকট, প্রভাব নাস্তি। ইংরেজী ব্যাকরণে অ্যাপস্ট্রপি চিহ্নের ন্যায় তার অবস্থিতি আছে, উচ্চারণ নেই। কাঁঠালের বোঁটার মতো রস বা রসদ সংগ্রহের দিক থেকে তার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হলেও, ভোজের থালায় সে মনোযোগের বাইরে। রাষ্ট্রনেতার পক্ষে বিদেশে রাষ্ট্রদূত হওয়া মানেই যেমন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায়, তরুণের জীবনে পত্নীযোগের অর্থ তেমনি দুঃসাহস ও দুঃসাধ্যের পথ থেকে পশ্চাদপসরণ। সোলার টোপরটি আকারে ক্ষুদ্র এবং ওজনে লঘুভার। সেটি শিরোধার্য করামাত্রই মস্তিষ্ক থেকে নিশ্চিহ্ন হয় ছাত্রজীবনে উদ্‌গত যত বৃহৎ কল্পনার অঙ্কুর। প্রতিবাদ-সভা, ইন্‌কেলাব, ট্রামে অগ্নিসংযোগ, পরীক্ষার গার্ডকে প্রহার ইত্যাদি প্রগতিমূলক কার্যের সে সমাধিস্তম্ভ। সেকালের সেজের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার ঠোঙা আর একালের ফায়ার-এক্সটিং-গুইশারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য একান্ত অহেতুক নয়।

পাণিগ্রহণের ফলে পুরুষ ঘরে আনে স্ত্রী, ডাক্তারের বিল ও সেকরার ক্যাটালগ। কুইনিনের বড়ির উপরে চিনির প্রলেপের মতো তার সঙ্গে আসে কিছুটা যৌতুক। সেটা পাত্র-সংগ্রহের জন্য পাত্রীপক্ষের দেওয়া ঘুষ। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য সিগারেট বা চা-এর প্যাকেটের সঙ্গে যেমন গিফ্‌ট-কুপন।
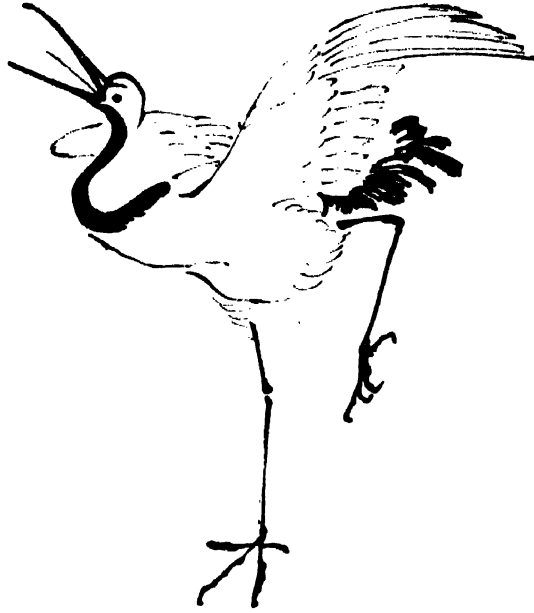
পরিণয়ের দ্বারা নারীর ঘটে বিস্তার। জায়া থেকে জননী তো প্রাণিতত্ত্বের সিঁড়িতে একটি মাত্র ধাপ। এমন কি একা গৃহিণীও একক নন। পুরাকালে তিনি ছিলেন একাধারে সচিব, সখী এবং প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। এ-যুগের মেয়েরা সচিব হলে সেক্রেট্যারিয়েটে বসে, অন্দরে নয়। সখীরা মিলে কলেজের করিডর বা রেস্তোঁরায় এবং ললিতকলার দৌড় সিনেমা বা বড়জোর সঙ্গীত-সম্মেলন। কালিদাসের তালিকার সঙ্গে একালিনীদের ঠিকুজি মেলেনা। কিন্তু গিলবার্ট-সলিভ্যানের গীতিনাট্য-বিশেষের মতো আধুনিক পারিবারিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সবক'টি মুখ্যপদেরই একটি মাত্র অধিকারিণী। পত্নী-মাত্রেরই ধমনীতে বয় একনায়কত্বের রক্ত। অন্ততঃ একজিকিউটিভ ও জুডিশিয়ারির পৃথক অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই।

মোট কথা, স্ত্রী হচ্ছেন সেই বস্তু যার অভাবে সংসার চলেনা এবং উপস্থিতিতে সংসার অভাবে অচল হয়। যাকে পাওয়ার পূর্বে পুরুষেরা কবিতা পড়ে এবং পাওয়ার পরে গীতা। যাকে না পেয়ে খোঁজে পটাশিয়াম সায়ানাইড বা লেক এবং পেয়ে সন্ধান করে গেরুয়া বা রুদ্রাক্ষ। বোধহয় তার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে,—যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাইনা। সম্ভবতঃ কবিগুরুরও এটি বিবাহিত জীবনেরই রচনা।

বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেই প্রেমের কথা আসে। য়ুনিয়নের নাম নিলেই যেমন ধর্মঘট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেমের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। প্রেম ও পরিণয়কে যাঁরা শাড়ির

সঙ্গে সায়া অথবা ভোটের সঙ্গে ক্যানভাসিং-এর মতো অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেন তাঁরা পণ্ডিত হলেও সংসার-অনভিজ্ঞ।

সাগরের ওপারে বিদেশী সমাজের রীতি,—আগে প্রেম, পরে বিবাহ। আগে সুর-সাধা, পরে গান। সাগরের এপারে স্বদেশী শাস্ত্রের বিধান,—আগে বিবাহ পরে প্রেম। আগে অস্ত্রোপচার পরে ব্যাণ্ডেজ। প্রথম পক্ষের ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাদ দুই সমতুল্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মেশাতে গেলে ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট হয়। বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণের চেষ্টাও সুকুমার রায়ের ছড়া-বিশেষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে বিয়ে করা, টাকা বাড়ানোর জন্য রেস খেলার মতোই সর্বনাশা হঠকারিতা।

[শিল্পী : নন্দলাল বসু

পাথরপুরী

অজিত দত্ত

কোন্ দূর রাজ্য থেকে এসে
রাক্ষসেরা হানা দিলো মানুষের দেশে।
সোনা-রূপো দুই কাঠি দিয়ে
সকল মানুষ তারা রেখে গেছে পাথর বানিয়ে।

রাজসিংহাসনে রাজা নিশ্চল পাথর।
সভাসদ কৃতাঞ্জলিকর
শিলীভূত হয়ে মিছে অনুগ্রহ যাচে।
সাজানো দোকান নিয়ে নিশ্চল দোকানী বসে আছে
চিরকাল খদ্দেরের লোভে।
দাম দিয়ে কে বা তার পণ্য নেবে? সব মূল্য কবে
মরণ-ঠাণ্ডায় জমে' হয়ে গেছে বরফ-কঠিন!
রাজকন্যা—মেঘবর্ণকেশ—সারাদিন
মিথ্যাই দাঁড়িয়ে আছে গবাক্ষে উদাস দৃষ্টি মেলে।
সে-দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র নেই পুরাকেলে
প্রতীক্ষা অথবা আশা। রাজপুত্র আসে কি না আসে
দেখে না সে;—দৃষ্টি তার হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের পাশে
আরেক মাণিক হয়ে জুড়ায়েছে জ্বালা।
এত ভিড়! তবু রাজ্য খাঁ-খাঁ করে—নিঃশব্দ নিরালা।

এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙিতে জেলেরা
তারা দেখে অস্ত্রে মোড়া পরিখায় ঘেরা
রাজধানী প্রাসাদের উঁচু চূড়াগুলি।
ভয়ে ভয়ে দূর থেকে বাড়ায়ে অঙ্গুলি
পরস্পর বলাবলি করে,—
জীবন্ত মানুষ ছিল একদিন ওখানে শহরে।
সেই যে রাক্ষস এসে কি মন্ত্র পড়েছে,
রাজা-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা কেউ নেই বেঁচে॥

এমন দিনে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনের পর দিন মাঠ-ফাটা গরম ভোগ করিয়া মানুষ যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তখন বৃষ্টি নামিল। শুধু বৃষ্টি নয়, বজ্র বিদ্যুৎ ঝোড়ো-হাওয়া। শহরের তাপদগ্ধ মানুষগুলাকে শীতলতার সুধাসমুদ্রে চুবাইয়া দিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বেলা আন্দাজ তিনটার সময়। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ দরবিগলিত ধারায় ভিজিতে ভিজিতে বাতাসের ঝাপ্‌টা খাইতে খাইতে সমীর গৃহে ফিরিল। শহরের প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ী; নীচে দুটি ঘর, উপরে একটি। এইখানে সমীর তাহার বৌ ইরাকে লইয়া থাকে। দুটি প্রাণী। মাত্র বছর দেড়েক বিবাহ হইয়াছে। এখনও কপোতকূজন শেষ হয় নাই।

বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। সমীর দ্বারের পাশে ঘন্টি টিপিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ইরা দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। চকিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—'খুব ভিজেছ তো?'

সমীর ভিতরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তারপর ভিজা জামাকাপড় সুদ্ধ ইরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। তাহার কোট-প্যাণ্টলুন হইতে নির্গলিত জল ইরার দেহের সম্মুখ-ভাগ ভিজাইয়া দিল। সমীর বলিল,—'কী মজা! আজ খিচুড়ি খাব।'

ইরার মাথাটা সমীরের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছায়। সে সর্বাঙ্গ দিয়া সমীরের দেহের সরসতা যেন নিজ দেহে টানিয়া লইল, তারপর ডিঙি মারিয়া তাহার চিবুকে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল,—নিজে ভিজেছ, আবার আমাকেও ভিজিয়ে দিলে। ছাড়ো এবার। শীগ্‌গির জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলো, বাথরুমে সব রেখেছি। যা তোমার ধাত, এখুনি গলায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

সমীর বলিল,—'কী, আমার গলার নিন্দে! শোন তবে—' বলিয়া গান ধরিল,—'এমন দিনে তারে বলা যায়—'

সমীরের গলা সুরের ধার দিয়া যায় না। ইরা তাহার বুকে হাত দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল; বলিল,—'বাথরুমে গিয়ে গান গেও। কি খাবে—চা না কফি?'

সমীর তান ছাড়িল,—'চা—চা—চা! যে চা মান্য অতিথিদের জন্যে সঞ্চয় করা আছে, যার দাম সাড়ে সাত টাকা পাউণ্ড, আজ সেই চা খাব। সখি রে-এ-এ-এ'—সমীর গিয়া বাথরুমে দ্বার বন্ধ করিল।

ইরা একটু দাঁড়াইয়া ভাবিল। সেও শাড়ী ব্লাউজ ছাড়িয়া ফেলিবে? না থাক, এ জল গায়েই শুকাইয়া যাক।...

বসিবার ঘরে আলো জ্বলিয়াছে। সমীর ও ইরা সামনাসামনি বসিয়া চা খাইতেছে। চায়ের সঙ্গে ডিম-ভাজা।

বাহিরে বর্ষণ চলিয়াছে। কখনও হাওয়ার দাপট বাড়িতেছে, বৃষ্টির বেগ কমিতেছে; কখনও তাহার বিপরীত। মেঘের গর্জন প্রশমিত হইয়া এখন কেবল গলার মধ্যে গুরু গুরু রব। ক্বচিৎ বিদ্যুতের একটু তৃপ্ত-হাসি।

এবেলা ঝি আসে নাই। বাঁচা গেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমীরের এক বন্ধু তাহার বাসায় আসিয়া আড্ডা জমায়, সে আজ বৃষ্টিতে বাহির হয় নাই। ভালই । আজ বাড়ীতে শুধু তাহারা দু'জন। এই

জনাকীর্ণ নগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক; বৃষ্টি তাহাদের নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে। পরস্পরের সঙ্গ-সরস নিবিড় নিঃসঙ্গতা।

আজ সকালে অফিস যাইবার সময় সমীরের সঙ্গে ইরার একটু মনান্তর হইয়াছিল। সমীর মুখ ভার করিয়াছিল, ইরার অধর একটু স্ফুরিত হইয়াছিল। তখন দুঃসহ গরম। তারপর—পৃথিবীর বাতাবরণ বদলাইয়া গেল। কী লইয়া মনান্তর হইয়াছিল? ইরা অলসভাবে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না।

চা শেষ হইলে ইরা ট্রে সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া বসিল, সমীর সিগারেট ধরাইল। দু'জনে পরিতৃপ্ত মনে কোনও কথা না বলিয়া মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

পৃথিবীর সকল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয়না। যেখানে মিল হইয়াছে সেখানেও ষোলোআনা মিল না হইতে পারে। দেহের স্তরে, হৃদয়ের স্তরে এবং বুদ্ধির স্তরে মিল কোটিকে গুটিক মিলে। সমীর ও ইরার ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে দেহ-মন ও বুদ্ধির মিল অনেকখানিই হইয়াছিল; তাহাদের দেহ-মন পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির স্বাদ পাইয়াছিল; বুদ্ধির দিক দিয়াও তাহারা পরস্পরকে সাগ্রহে বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং অনেকটা বুঝিয়াছিলও। তবু মাঝে মাঝে কোন্ অসমতার ছিদ্রপথে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইত, দু'জনকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বোধকরি দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত একটা স্তর আছে, হয়তো তাহা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের স্তর; সেখানে কেহ উঠিতে পারে না। তাই নিভৃত মনের গোপন কন্দরে একটু শূন্যতা থাকিয়া যায়।

কিন্তু আজ, বর্ষণ-পরিপ্লুত রাত্রে, সমীর ও ইরার মনে কোনও শূন্যতাবোধ ছিল না। বন্যায় জলে যখন দশদিক ভাসিয়া গিয়াছে তখন কূপে কতখানি জল আছে কে তাহা মাপিয়া দেখিতে যায়।

দুইজনে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সমীর বলিল,—'অত দূরে কেন, কাছে এসে বোসো।'

ইরা বলিল,—'তুমি এস।' বলিয়া সোফা দেখাইল।

দু'জনে উঠিয়া গিয়া বেতের সোফায় পাশাপাশি বসিল। জানালার কাচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ মুচকি হাসিল, মেঘ চাপা স্বরে গুরুগুরু করিল। সমীর বলিল—'কেমন লাগছে?'

সমীরের সিল্কের কিমোনোর কাঁধে গাল রাখিয়া ইরা অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া রহিল, শেষে অস্ফুটস্বরে বলিল,—'বলা যায় না।'

সমীর বলিল,—'কিন্তু কবি লিখেছেন বলা যায়।'

'কবি বলতে পারেন, তাই বলে কি আমরা পারি?'

'পারি।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সমীর ইরাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল,—'আজ বলব তোমাকে। তুমি বলবে?'

অনেকক্ষণ সমীরের বাহুবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া ইরা চুপিচুপি কহিল, 'বলব।'

সে-রাত্রে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া তাহারা দ্বিতলের ঘরে শুইতে গেল।...

রাত্রি এগারোটা। বৃষ্টি মাঝে থামিয়া গিয়াছিল, আবার সুরু হইয়াছে। শিথিল বৃষ্টি, অবসন্ন মেঘের শ্লথ মুষ্টি হইতে অবশে ঝড়িয়া পড়িতেছে।

সমীর ও ইরা বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছে। নীলাভ নৈশ দীপের মৃদু প্রভায় ঘরটি স্বপ্নাবিষ্ট। দু'জনে চোখ বুজিয়া জাগিয়া আছে।

ইরার একটা হাত অলস তৃপ্তিতে সমীরের গায়ে পড়িল; সে কহিল,—'এবার বল।'

সমীর হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, নৈশ দীপ নিভিয়া গেল। অন্ধকারে ইরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সমীরের সাড়া না পাইয়া ইরা আঙুল নাড়িয়া তাহার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিল। সমীর তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

হিসেব করছিলাম কতদিন আগেকার কথা। মাত্র সাত বছর, আমার বয়স তখন কুড়ি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কবেকার কথা। তখন আমি কলকাতায় থেকে থার্ড ইয়ারে পড়ি আর কলেজের হোস্টেলে থাকি।

লম্বা ছুটিতে বাড়ী যেতাম, কিন্তু ছোটখাটো দু'এক দিনের ছুটিতে বাড়ী যাওয়া হত না। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে আমার এক পিসেমশাই থাকতেন, তাঁর কাছে যেতাম। বেশী দূর নয়, শিয়ালদা থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা; আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ জায়গাটা। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতে বেশ লাগত। গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, পিসিমার হাতের রান্না—

পিসেমশায়ের সংসারে ওঁরা দু'জন ছাড়া আর একটি মানুষ ছিল, পিসেমশায়ের ভাগনী সরলা। পিসিমাদের একমাত্র ছেলে অজয়দা নদীয়ার কলেজে প্রফেসারি করতেন, বাড়ীতে বড় একটা আসতেন না। এঁদের সংসার ছিল এই তিনজনকে নিয়ে।

সরলা বাপ-মা-মরা মেয়ে, মামার কাছে মানুষ হয়েছিল।

বয়সে আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট ; বিয়ে হয়নি। রোগা লম্বা চেহারা, ফ্যাল্‌ফেলে দু'টো চোখ, মেটে-মেটে রঙ। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে মন্দ নয়। একটু যেন ভীরু প্রকৃতি, সহজভাবে কারুর সঙ্গে মিশতে পারত না। প্রথম প্রথম আমাকে দেখে পালিয়ে বেড়াত। তারপর 'সমীরদা' বলে ডাকত, কিন্তু চোখে চোখ মিলিয়ে চাইতে পারত না।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সে সব মেয়েকেই ভাল লাগে। সরলাকেও আমার ভাল লাগত। কিন্তু মনে পাপ ছিল না। তাছাড়া আমি কি রকম আনাড়ি ছিলাম তা তো তুমি জানো। মেয়েদের যতই ভাল লাগুক, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার কায়দা-কানুন জানতাম না।

যাহোক, একদিন পিসিমার বাড়ীতে গিয়েছি। সেটা ফাগুন কি চৈত্র মাস ঠিক মনে নেই। বিকেলবেলা পৌঁছে দেখি বাড়ীতে হৈ-হৈ কাণ্ড। নবদ্বীপ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে অজয়দার ভারি অসুখ ; পিসেমশাই আর পিসিমা এখনি নবদ্বীপ যাচ্ছেন। আমাকে দেখে পিসিমা বললেন— তুই এসেছিস বাবা, ভালই হল। অজুর অসুখ, আমরা এখুনি নবদ্বীপ যাচ্ছি। ঠাকুরের দয়ায় যদি অজু ভাল থাকে, তোর পিসেমশাই কালই ফিরে আসবেন। তুই ততক্ষণ বাড়ী আগ্‌লাস্‌। সরলাও রইল।

পিসিমা আর পিসেমশাই প্রায় একবস্ত্রে ইস্টিশানে চলে গেলেন। বাড়ীতে রয়ে গেলাম আমি আর সরলা।

ক্রমে সন্ধ্যে হল, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি। আমার মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সরলা রান্না করতে গেল। খাবার তৈরি হলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সরলার সঙ্গে আমার তিনটে কথা হল কিনা সন্দেহ। সে আমার পানে কেমন একরকমভাবে তাকাচ্ছে, আবার তখনি চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তার চাউনির মানে ধরতে পারছি না, কিন্তু মনটা অশান্ত হয়ে উঠছে। এক বাড়ীতে আমি আর একটি যুবতী, আর কেউ নেই। আগুন আর ঘি—

রাত বাড়তে লাগল। আমি বাড়ীর দোড়তাড়া বন্ধ করে শুতে গেলাম। আমার শোবার ঘর নীচে, বৈঠকখানার পাশে ; সরলা শোয় ওপরে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। খাটটা বেশ বড় ; হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায়। জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। আমার মনটা বেশ শান্ত হয়ে এল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একজনের গায়ে হাত ঠেকে। চোখ চেয়ে দেখি সরলা আমার পাশে বিছানায় শুয়ে আছে।

...তারপর—তারপর সে-রাত্রির বর্ণনা দিতে পারব না। সারারাত্রি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কাঠ হয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। সরলাও বোধহয় সারারাত জেগে ছিল ; ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিনটা কাটল দুঃস্বপ্নের মতো। একসঙ্গে ওঠা-বসা, সে রাঁধছে আমি খাচ্ছি, অথচ কেউ কারুর মুখের পানে তাকাতে পারছি না। আজ যদি পিসেমশাই ফিরে না আসেন, যদি রাত্রে আবার কালকের মতো ব্যাপার ঘটে, তাহলে—

সরলার মনে কি ছিল জানি না। হয়তো সে ভূতের ভয়েই আমার কাছে এসে শুয়েছিল। কিন্তু আমি নিজের কথা বলতে পারি, ভূতের চেয়েও বড় ভূত আমার কাঁধে ভর করেছিল। সেদিন যদি পিসেমশাই না আসতেন—

ভাগ্যক্রমে পিসেমশাই বিকেলবেলা ফিরে এলেন। অজয়দা'র পান-বসন্ত হয়েছে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি সেই রাত্রেই কলকাতায় চলে এলাম। তারপর সরলাকে আর দেখিনি ; ওদিকেই আর পা বাড়াইনি। তবে শুনেছি সরলার বিয়ে হয়ে গেছে।

সমীর নীরব হইল। ইরাও কথা কহিল না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সমীর জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন শুনলে ?'

ইরা সমীরের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল,—

'আনাড়ি ছিলে বলেই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ভারি রোমান্টিক আর রহস্যময়।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটু তরলতার আভাষ পাওয়া গেল।

সমীর প্রশ্ন করিল,—'আর তোমার?'

'আমার ভারি সীরিয়স ব্যাপার হয়েছিল।'

ইরা ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমার তখন সতরো বছর বয়স, বছর চারেক আগেকার কথা। সবে স্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছি।

আমার প্রাণের বন্ধু সাধনা একবছর আগে কলেজে ঢুকেছে। একদিন চুপিচুপি আমায় বলল, সে প্রেমে পড়েছে। এক গল্প-লেখকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলছে। আমাকে চিঠি দেখাল।

দেখেশুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আমি যেন সব-তাতেই পেছিয়ে আছি। কী উপায়? আমার বাপের বাড়ীতে মেয়েদের ওপর ভারি কড়া নজর। মেয়ে-কলেজে পড়ি, গাড়ি চড়ে গুড়গুড় করে কলেজে যাই, গুড়গুড় করে ফিরে আসি। ছোঁড়াদের সঙ্গে হুল্লোড় করার সুবিধে নেই। বাবা জানতে পারলে কেটে ফেলবেন।

সাধনার কথাবার্তা থেকে মনে হয় প্রেমে না পড়লে জীবনই বৃথা। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে প্রেমে পড়ে গেলুম। আমাদের কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর দিগম্বরবাবুর সঙ্গে।

তুমি যা ভারছ তা নয়; দিগম্বরবাবুর নামটাই বুড়ো, তিনি মানুষটা বুড়ো নয়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, পাতলা ধারালো মুখ, খাঁড়ার মতো নাকের ওপর রিম্‌লেস চশমা। তাঁর কথা-বলার ভঙ্গীতে এমন একটা চাপা বিদ্রূপ থাকত যে মেয়েরা মনে মনে তাঁকে ভয় করত, তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সাহস কারুর ছিল না। আমিই বোধহয় প্রথম।

প্রফেসারদের মধ্যে দিগম্বরবাবুই ছিলেন অবিবাহিত। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমার বাবার বয়সী; কারুর তিনটে ছেলে, কারুর পাঁচটা মেয়ে।

দিগম্বরবাবু যখন ক্লাসে আসতেন আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতুম। তাঁর নাকের ফুটো ছিল ভীষণ বড় বড়, কানে খাড়া খাড়া লোম, মাথার ঠিক মাঝখানে ঘষা পয়সার মতো খানিকটা জায়গায় চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল, মাথা হেঁট করলেই চকচক্ করে উঠত। বোধহয় টাকের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু তিনি পড়াতেন ভারি চমৎকার, শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে যেতুম।

কিছুদিন এইভাবে দূর থেকে প্রেম-নিবেদন চলল। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? সাধনা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে—প্রেম কতদূর? আমি কিছুই বলতে পারি না। সাধনার প্রেম অনেকদূর এগিয়েছে; তারা এখন লুকিয়ে লুকিয়ে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়, পার্কে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রেমালাপ করে। এদিকে আমার প্রেম যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, এক পা এগুচ্ছে না। এগুবে কোত্থেকে? দিগম্বরবাবুর কাছে গিয়ে কথা কইবার নামেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

শেষে এক চিঠি লিখলুম। হৃদয়ের আবেগ-ভরা লম্বা চিঠি। তারপর কলেজের ঠিকানায় প্রফেসর দিগম্বর ঘোষালের নামে পাঠিয়ে দিলুম। চিঠিতে সবই ছিল, কেবল একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। নিজের নাম দস্তখৎ করিনি।

পরদিন বিকেলবেলা হিস্ট্রির ক্লাস। দিগম্বরবাবু ক্লাসে এলেন। লেক্‌চার আরম্ভ করবার আগে পকেট থেকে আমার চিঠিখানা বার করে বললেন,—'আমি আজ একটা প্রেমপত্র পেয়েছি, তোমাদের পড়ে শোনাতে চাই।'

দিগম্বরবাবু চিঠি পড়তে লাগলেন। মেয়েরা প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারপর মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল। দিগম্বরবাবুও চিঠি পড়তে পড়তে চোখ তুলে আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। মনে হল আমার বুকের দুম্‌দুম্ শব্দ সবাই শুনতে পাচ্ছে। কেন যে তখনই ধরা পড়ে যাইনি তা জানি না। দিগম্বরবাবু কিন্তু চিঠির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলেন না, চিঠি শেষ করে একটু মুচকি হেসে লেক্‌চার আরম্ভ করলেন।

কলেজে এই নিয়ে বেশ একটু হৈ-চৈ হল। দিগম্বরবাবু অন্য ক্লাসের মেয়েদেরও চিঠি পড়ে শুনিয়েছেন। সব মেয়েরা উত্তেজিত, কে চিঠি লিখেছে? ভাগ্যিস, চিঠিতে সই করতে ভুলে গিয়েছিলুম, নইলে বিষ খেতে হত।

আমার প্রেম তখন মুমূর্ষু, পুরুষ জাতটা যে কী ভীষণ হৃদয়হীন তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সাধনা আমাকে বোঝাচ্ছেন যে, প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ওতে ভয় পেলে চলবে না। আমি কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। বাবা যদি জানতে পারেন—

দশ-বারো দিন কেটে গেল, তারপর এক নতুন খবর কলেজে ছড়িয়ে পড়ল—দিগম্বরবাবু স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। আমার খুবই দুঃখ হবার কথা, কিন্তু দুঃখ মোটেই হল না। ভাবলুম এবার বুঝি প্রেমের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কিন্তু নিষ্কৃতি অত সহজ নয়। বিলেত যাবার আগের

দিন দিগম্বরবাবু আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠালেন। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর অফিস-ঘরে গেলুম। তিনি টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র সই করছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না। আমাকে দেখে ঘাড় নেড়ে বললেন,—'বোসো।'

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসলুম। তিনি কাগজে সই করতে করতে বললেন,—'চিঠিখানা তুমি লিখেছিলে?'

আমি কেঁদে ফেললুম।

তিনি উঠে এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন; নরম সুরে বললেন,—'তুমি সত্যি আমায় ভালবাস?'

অত বড় উচ্ছ্বাসময় চিঠির পর আর অস্বীকার করা চলে না। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম,—'হ্যাঁ, ভালবাসি।'

তিনি তখন বললেন,—'কিন্তু আমি যে কালই বিলেত চলে যাচ্ছি, বছরখানেক সেখানে থাকতে হবে। তুমি একবছর অপেক্ষা করতে পারবে?'

আমি ঘাড় নাড়লুম—'হ্যাঁ, পারব।'

তিনি হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন; বললেন,—'বেশ বেশ। এখন যাও, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

দিগম্বরবাবু বিলেত চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল। তারপর ক্রমে দুর্ভাবনা। যতই দিন ফুরিয়ে আসছে ততই ভয় বাড়ছে। এইভাবে একবছর যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন দিগম্বরবাবুর এক চিঠি পেলুম। বোধহয় কলেজ থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। এই তাঁর প্রথম এবং শেষ চিঠি। তিনি লিখেছেন—'কল্যাণীয়াসু, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব। তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এখানে এসে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছি। তার নাম নেলি। মিষ্টি নাম নয়? আশা করি, তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করছ। ইতি—'

কি আনন্দ যে হয়েছিল তা আর বলতে পারি না। তারপর আর কি? আর প্রেমে পড়িনি। দু'বছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হল।

সমীর হাত বাড়াইয়া নৈশ দীপ জ্বালিল। দুইজনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি শুইয়া রহিল। তারপর অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমীর বলিল,—'দিগম্বরবাবু ভদ্রলোক ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ইরা, সত্যি যদি একটা নোংরা ব্যাপার হত? তুমি আমাকে বলতে পারতে?'

ইরা কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। আজ মনকে চোখ ঠারিবার দিন নয়; সে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল। না, আজিকার রাত্রে সে সমীরের কাছে কোনও কথাই লুকাইতে পারিত না। সে চোখ খুলিয়া বলিল,—'পারতাম।'

আবার বৃষ্টির জোর বাড়িয়াছে। জানালার বাহিরে একটানা ঝরঝর শব্দ। দুইজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে শুইয়া ভাবিতেছে। আজ তাহারা যেমন পরিপূর্ণভাবে পরস্পরকে পাইয়াছে এমন আর পূর্বে কখনও পায় নাই; তাহাদের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা নিবিড়ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

সেকালের সাহেবেরা সকলেই নবাবি আদব কায়দা, আহার বিহার শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই প্রায় তখন তামাক খাইত, সেইজন্য হেস্টিংস সাহেবের নিমন্ত্রণের পত্রে অন্যান্য ভৃত্য আনিবার বিশেষ উল্লেখ করা হইত; কিন্তু হুঁকা-বরদার সম্বন্ধে সেরূপ করা হইত না। কলিকাতায় তখন দশ মাইলের মধ্যে মদের ভাঁটি করিবার আদেশ দেওয়া হইত না। তখন কলিকাতায় ইংরাজেরা বিধবা পত্নী লাভ করিয়া বড়মানুষ হইবার জন্য যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। এমন কি, পাদরী কায়ারনাণ্ডার সাহেবও উইলির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

—কলিকাতার কথা

যেন না দেখি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যেখানে আকাশের ছানি-পড়া চোখের নিচে
তিন মাথা এক ক'রে আছে
লাঠি হাতে
খুনখুনে অন্ধকার

যেখানে সারাটা রাত
সারাটা দিন
শুধু টুপ-টাপ
টুপ-টাপ
মাটিতে পাতা পড়ার শব্দ

যেখানে স্টীমারের খালাসীর মত

জলে রশি ফেলে ফেলে
জীবনের মাপ নেয়

আমি জানি,
শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া
একদিন আমাকেও সেইদিকে ঠেলবে।

হে পৃথিবী, আমি যেন সেই
দিনের মুখ
না দেখি—

তার আগে
তুমি আমার দুটো চোখ
দুটো পায়ে
ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও।

'কালি-কলম' বার করলাম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আগে কল্লোল, তার পর কালি-কলম।

সবে তখন বিয়ে করেছি। নতুন বৌ। শ্বশুরবাড়িটা ভাল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর প্রকাণ্ড বাড়ি। মস্ত বড়লোক। একখানা মোটর, একটা জুড়িগাড়ি সব সময় দোরে দাঁড়িয়ে, যেটায় খুশী চড়ে বোসো, যেখানে খুশী চলে যাও, নতুন জামাই, কেউ কিছু বলবে না।

বাড়িতে বিস্তর লোক, ঢালাও ব্যবস্থা, যখন খুশী এসো, যখন খুশী যাও, বড় বড় বসবার ঘর, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারো, চা জলখাবার, পান সিগারেট—হুকুম করেছো কি এসে হাজির। কারও কাছে কৈফিয়ত দেবার কিছু নেই।

কলকাতা থেকে পালিয়েছিলাম। চলে গিয়েছিলাম কুমারডুবি লোহার কারখানায়। কয়েকটা মাস সেখানে চাকরি করে আবার চলে এলাম কলকাতায়। সোজা এসে উঠেছি এই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে।

নজরুল তখন কলেজ স্ট্রীটে মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার আপিসে—মজফ্‌ফর আহ্‌মদ-সাহেবের কাছে। সেইখানেই যাব বলে বেরিয়েছি, হঠাৎ পবিত্রর (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে দেখা। পবিত্র গিয়েছিল নজরুলের কাছে, সেখান থেকে শুনেছে আমি এসেছি কলকাতায়, ঠিকানাটা ও সেইখান থেকেই পেয়েছে। কিন্তু নজরুলের দেওয়া ঠিকানা, একশো পনেরো বলতে বলেছে একশো পঁচিশ। বাড়ির নম্বর দেখতে-দেখতে পবিত্র পথ হাঁটছিল, আমিই দেখতে পেয়ে তাকে ডাকলাম।

যাচ্ছিলাম প্রবাসী আপিসে। ভালই হলো, সঙ্গী জুটে গেল। প্রবাসীতে তখন আমার তিনটি গল্প ছাপা হয়েছে। চারুবাবুর একটি চিঠি পেয়েছি।—এবারে যে গল্পটি আপনি পাঠিয়েছেন তার নাম আমি বদলে দিয়েছি। আপনার সম্মতি আছে কিনা দয়া করে জানাবেন। নাম দিয়েছি 'বলিদান'। আপনার গল্পের প্রশংসা না করে পারছি না। এত ভাল গল্প অনেকদিন পড়িনি।

সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেই চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিঠি! সেদিন সে চিঠিখানি ছিল আমার কাছে এক অমূল্য সম্পদ। কুমারডুবি থেকে সে চিঠিখানি আমার পকেটে পকেটে ফিরছে। যাকে-তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।

সেইদিনই সকালে এই চিঠির ব্যাপারে বেশ একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেছি, তাই ভেবেছিলাম চিঠিখানা আর কাউকে দেখাবো না। আমার শ্বশুরবাড়ি মানে সাত ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার। আমার সমবয়সী কয়েকজন শালা এই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে। চা খেতে খেতে কথায় কথায় বাংলা সাহিত্যের কথা উঠলো। আমি যে গল্প লিখি আর তা কাগজে ছাপা হয়—এই কথাটা তাদের জানাতে চাইলাম। চারুবাবুর চিঠিখানি বের করে একজনের হাতে দিয়ে বললাম, পড়। ছোট চিঠি। পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। একজনের হাত থেকে নিলে আর-একজন। তারপর তার হাত থেকে আর-একজন। এমনি করে চার-পাঁচজন পড়ে ফেললে। একজন পোস্টাপিসের ছাপটা ভাল করে দেখলে। দেখেই বললে, তা বুদ্ধি মন্দ নয়। এইটে নিয়ে গিয়ে আর-একটা কাগজের আপিসে দেখালে কাজ হবে। নাম-ছাপা এমনি একটা পোস্টকার্ড হাতাতে পারলেই হলো! একজন তো পোস্টকার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, ওরকম ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প লিখতে সবাই পারে! যাত্রার পালা একটা লিখে লাগাতে পারো তো জানি বাহাদুর! তাদের ভেতর একজন তখন বি-এ পাস করে আইন পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রবাসী নামে যে একটি মাসিকপত্র আছে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন খ্যাতনামা লেখক সে-খবরটি পর্যন্ত কেউ রাখে না।

এতদিন পরে একজন মানুষ পেলাম চিঠিখানি দেখাবার। চারুবাবুর চিঠিখানি পবিত্রর হাতে দিলাম। চিঠিখানি পড়ে সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিস?

বললাম, না। সেইখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।

পবিত্র বললে, চল। পরিচয় করিয়ে দিই।

দোরে গাড়ি থাকলে চড়ে বসতাম। দেখলাম, গাড়ি নেই। হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি। পবিত্র ওদিকের ফুটপাথের ওপর কাকে যেন দেখে ডেকে উঠলো, গোকুল! গোকুল!

ভদ্রলোক থামলেন। পবিত্র বললে, আয়, আর-একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিই।

রাস্তা পেরিয়ে গেলাম দু'জনে।—গোকুল নাগ, আর্টিস্ট।

আমার আর পরিচয় কি ? সামান্য দু'চারটে গল্প ছাপা হয়েছে মাত্র। বলতে হয় তাই পবিত্র বললে, ইনি নজরুল ইসলামের সহপাঠী বন্ধু।

নজরুলও তথনও খুব বেশি কিছু লেখেনি। সর্বপ্রথম যে-সব গল্প নিয়ে সে তার সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করেছিল, সে-সব গল্প বিশেষ কেউ পড়েনি। তারপর 'বন্দীবীর' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা লিখবার পরেই তার খ্যাতি তখন ধীরে ধীরে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। ভাবলাম গল্প-লেখক বলে আমার পরিচয় না দিয়ে পবিত্র খুব ভালই করেছে। কারণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ যেমন ছিল আমার যথেষ্ট, গল্প-লেখক বলে সাহিত্যিক মহলে নিজের পরিচয় দেবার সঙ্কোচ ছিল তেমনি অপরিসীম। সে-সঙ্কোচ আমার বহুদিন কাটেনি।

পবিত্র কিন্তু চুপ করে থাকবার ছেলেই নয়। বললে, যাচ্ছি একবার প্রবাসী-আপিসে। দেখা না, চারুবাবুর চিঠিখানা বের কর্।

চারুবাবুর চিঠিখানি বের করলাম পকেট থেকে।

চিঠিখানি পবিত্র গোকুলের হাতে দিয়ে বললে, চারুবাবু ওকে কি লিখেছে ছাখ্!

চিঠি পড়েই গোকুল পোস্টকার্ডখানি উল্‌টে আমার নামটা দেখে নিলে, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, কয়লাকুঠি ?

সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোকুল দুহাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

মুহূর্তের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। গোকুল বললে, প্রবাসী-আপিস পরে হবে। আগে আসুন আমাদের আস্তানায়।

প্রবাসী-আপিস যাওয়া হলো না। হাঁটতে হাঁটতে সোজা একবারে দশ-নম্বর পটুয়াটোলা। এইটুকু সময়ের ভেতরেই 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয়ে গেছি।

রাস্তার ধারেই ছোট্ট ঘরখানি। একা বসে আছে দীনেশ। দীনেশরঞ্জন দাশ।

দীনেশ আমার লেখা-টেখা তখনও পড়েনি। তার মাথায় তখন 'কল্লোল'-এর পরিকল্পনা। এক মাসের ভেতর কাগজ বের করতে হবে। মাসিক সাহিত্যপত্র—কল্লোল। পয়সাকড়ি কিছু নেই। দশটি মাত্র টাকা ছিল পুঁজি। তাই দিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছেপে দীনেশ আর গোকুল—দুই বন্ধুতে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে এসেছে। হ্যাণ্ডবিলটা দেখলাম।

দীনেশ বললে, আমাদের ছিল 'ফোর আর্টস্ ক্লাব'। আমি, গোকুল, মণীন্দ্রলাল বসু—

মণীন্দ্রলাল বসুর নাম শুনে চেয়ারের ওপর (কল্লোলের প্রসিদ্ধ তক্তাপোশ তখনও পড়েনি) টান-টান হয়ে বসলাম। সেই 'অরুণ' 'সোনার হরিণ' 'রমলা'র মণীন্দ্রলাল ?

গোকুল বললে, হ্যাঁ। ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে বিলেত থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, দেখতে পাবো ?

দীনেশ বললে, নিশ্চয়ই পাবে।

দেখেছিলাম। ওই কল্লোল-আপিসেই মণীন্দ্রলালের দেখা পেয়েছিলাম। দিব্যকান্তি সৌম্যদর্শন যুবক মণীন্দ্রলাল। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমি আমার অন্তরের অভিনন্দন জানিয়েছিলাম তাঁকে—শরতোত্তর যুগের এই একক এবং অপরূপ রসস্রষ্টা শিল্পীকে। নরনারীর প্রণয়লীলার সুনিপুণ ভাষ্যকার মণীন্দ্রলাল যুবজনচিত্ত জয় করেছিলেন তখনকার দিনে। তাঁর রচিত সাহিত্যে ছিল ভিন্ন আস্বাদ, ভিন্ন পরিমণ্ডল। তিনি শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা, বিরহী-বিরহিণীর কানের কাছে আনন্দের বার্তা বহন করে আনেননি, তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল সুরটিকে সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করে কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে ছিল সুন্দর ধ্বনি, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর সুর, সুন্দর বর্ণ! চিরসুন্দরের পূজারী তিনি তাঁর অন্তরের আনন্দকে অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

আমাদের তখন ছিল যৌবনকাল। বিহারের শুষ্ক রুক্ষ প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তরের এক প্রান্তে বসে পড়েছিলাম তাঁর বহুবিচিত্র প্রেমের কাহিনী। তাঁর রচিত সাহিত্যের যাদুমন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম বৈশাখের দুপুরে ব্লাস্ট্-ফারনেসের সুমুখে বসে। শক্ত লোহা আর ইস্পাতের রাজত্বে নেমেছিল সুরের মূর্ছনা। পদতলের ধূলি থেকে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল আনন্দের অমৃতরূপ।

দীনেশ, গোকুল, মণীন্দ্রলাল—সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'তে দেরি হলো না। 'কল্লোল' বেরুবে। গল্প চাই! প্রবাসীর জন্য একটি গল্প লিখেছিলাম। চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গল্পটি দিয়ে আসবো ভেবেছিলাম। দেখা করতে গেলাম, দেখাও হলো, কিন্তু গল্প দিতে পারলাম না। সে গল্প তখন চলে গেছে কল্লোলে।

কল্লোলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে দেখলাম আমার 'মা'।

সাহিত্যের নেশা তখন পেয়ে বসেছে আমাদের। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা

জেগেছে মনে। ইংরেজি বই কিনতে গেছি 'বুক কোম্পানী'র দোকানে। সেখানে দেখি ইংরেজি বইয়ের অরণ্যের ভেতর দাঁড়িয়ে কে একজন ক্রমাগত বইয়ের পর বইয়ের পাতা উল্‌টে চলেছে। উঁচু উঁচু কাঠের র‍্যাকের ওপর থাকে থাকে বই সাজানো। মাঝে শুধু একটা মানুষের চলবার পথ। সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেটি বই পড়ছে। চোখে মুখে একাগ্র তন্ময়তা। গৌরবর্ণ প্রিয়দর্শন পাতলা ছিপছিপে ছেলেটিকে দেখে মনে হলো কলেজের ছাত্র।

আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে বই দেখছি। ছেলেটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার হাতের কাছে সব দর্শনের বই। নাটক, নভেল, গল্পের বই দেখতে হ'লে তাকে পেরিয়ে যেতে হবে। অথচ তার ধ্যান ভঙ্গ করতে ইচ্ছে করছে না। বই দেখতে এসে তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মন্দ লাগছে না।

হঠাৎ একসময় সে আমার দিকে তাকালে। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি টানা-টানা চোখ, অযত্নবিন্যস্ত মাথার বড় বড় চুল কপালে এসে পড়েছে। মুখখানি সুন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, বই দেখবেন?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, গল্পের বই।

—এখানে নয়। আসুন এইদিকে।

ছেলেটি দেখলাম, দোকানে কোথায় কি বই আছে সব জানে।

আমাকে নিয়ে গেল সে কন্টিনেণ্টের বইয়ের রাজত্বে। ঠিক যেখানে যেতে চেয়েছিলাম সেইখানে। লেখকের নাম, বইয়ের নাম, সব তার কণ্ঠস্থ।

—এইটে রাশিয়া। টলস্টয়, গোর্কি, গোগোল, ডস্টয়ভস্কি, শেখব, টুর্গনিভ—কি চাই বলুন!

চাই তো সব। ক'খানা বই-ই বা পড়েছি!

এটা দেখছি, ওটা দেখছি, তন্ময় হয়ে গেছি বই দেখতে-দেখতে, মনে হচ্ছে সবই কিনি। কিন্তু অত টাকা কোথায়?

ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠলো, পেয়েছি।

বলেই সে মোটা মোটা চারখানা বই নামিয়ে বললে, এই বইটে নিন আপনি। ইনি বোধহয় এবার নোবেল প্রাইজ পাবেন। পোলেণ্ডের লেখক। এল্‌. রেমণ্ট।

সেই ভাল। কত দাম?

ভাবলাম একখানা বইয়ের আর কত দাম হবে? বলুন।

কিন্তু দাম শুনে চক্ষু স্থির! তিরিশ টাকা।

একখানা বই কিন্তু চার ভলুমে লেখা। সামার, অটাম, স্প্রিং আর উইন্‌টার।

বললাম, আজ অত টাকা নেই আমার কাছে। দুটো নেওয়া যাক্, পরে দুটো নিয়ে যাব।

সেদিন দুখানাই নিলাম। পরে আর দুখানা নিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য ছেলেটির দূরদৃষ্টি। সে-বছর এল্‌. রেমণ্ট নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

ছেলেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। ঘণ্টাখনেক কাটিয়েছি একসঙ্গে। মন্দ লাগছে না ছেলেটিকে।

দুজনে চায়ের দোকানে এসে বসলাম। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম?

ছেলেটি বললে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

আমার নাম শুনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বললে, আপনার 'কয়লাকুঠি' পড়েছি। সেদিন নতুন একটা কাগজ বেরিয়েছে—কল্লোল, তাতেও পড়লাম আপনার একটি গল্প।

গল্প-দুটো কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিল। সে নিজেই বললে, মন্দ নয়। কিন্তু আরও ভাল গল্প লিখতে হবে। আরও অনেক অনেক ভাল।

বলতে বলতে সে তার স্বপ্নমদির চোখদুটি বন্ধ করে কি যেন ভাবলে, তারপর চোখ খুলে বললে, কন্টিনেণ্টের গল্পগুলো পড়ে ফেলুন। পথ খুঁজে পাবেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে নিয়ে এলাম কল্লোল-আপিসে।

কল্লোলের দলে আর-একজন বাড়লো।

আমাহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে পরমানন্দে থাকা চলে, কিন্তু ওই হট্টগোলের মাঝখানে বসে লেখা চলে না।

তার ওপর হলো আর-এক বিপদ। আমার শ্বশুর-মশাইয়ের দাদা সারাদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে এসে বসেন তাঁর নীচের তলার একখানি ঘরে। চাকর তামাক দিয়ে যায়। পরমানন্দে বসে বসে গড়গড়ায় তামাক টানেন আর সুমুখ দিয়ে কেউ পার হয়ে গেলেই বলেন, কে যায়?

চোখে তিনি একটু কম দেখেন।

সেদিন দেখলাম, আমার এক শালা তাঁর ঘরের সুমুখ দিয়ে পেরিয়ে গেল, তিনি ডাকলেন, তবু সে সাড়াও দিলে না, থামলোও না।

এ-বাড়ির ছেলেগুলো এমনি বে-আদবই বটে। গুরুজন মানুষ, ডাকলে অন্তত সাড়া দেওয়া উচিত। এমন অগ্রাহ্য করে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

বাড়ির বাইরে যেতে হ'লে ওই পথ দিয়ে যেতেই হবে। বোধহয় তার পরের দিন। কল্লোল-আপিসে যাব বলে বেরিয়েছি। পেছনে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালাম।

চ্যাটার্জি-সাহেব বললেন, শোনো। ভেতরে এসো।

ঘরের ভেতরে যেতেই বললেন, বোসো।

ঘর-জোড়া নীচু তক্তাপোশ পাতা। তার ওপর ঢালা বিছানা। বললেন, ভাল করে চেপে বোসো।

বসতেই একখানা মোটা বই আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, দেখি কেমন পড়তে পারো। বের কর তৃতীয় সর্গ।

বইখানা খুলেই দেখলাম—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

গুরুজনের আদেশ। অবহেলা না করে পড়তে বসলাম।

দশ পাতা পড়ে যেই থেমেছি, বললেন, বেশ পড় তুমি! নাও, এবার চতুর্থ সর্গ আরম্ভ কর।

বললাম, আমার একটু কাজ ছিল।

—কাজ পরে হবে। রামায়ণ ছেড়ে উঠতে নেই। গোবিন্দ, চা দিয়ে যা।

সর্বনাশ! চতুর্থের পর পঞ্চম, পঞ্চমের পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

রাত্রি ন'টা!

এতক্ষণ পরে তিনি দয়া করে বললেন, এবার থাক্। তুমি বেশ পড়তে পার। রোজ এমনি একটু করে আমাকে শুনিয়ো।

পরের দিন সকালেই আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে সোজা ভবানীপুর।

কাছেই মামার বাড়ি—সুকিয়া স্ট্রীট। ইচ্ছে করলেই যেতে পারতাম। সেখানেও অবশ্য গুরুজনের ভয়। তবে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নয়। সেখানে রোজ একবার করে বলবে, কাজকর্ম কিছু করবে? না এমনি টো-টো করে ঘুরে বেড়ালেই চলবে?

গল্প লিখছি শুনলেই তো হয়েছে! পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবে।—বল—জীবনে আর কখনও এ-অপকর্ম করবো না!

তার চেয়ে অনেক ভাল আমার সেই ভাঙা নড়বড়ে শাঁখারীপাড়ার মেস্!

আমার এক জ্যেঠতুতো ভাই থাকতো সেখানে। অ্যাটর্নী-আপিসের কেরানী। সাহিত্যের ধারও ধারে না। কাজেই কি করছি না করছি খবরও নেবে না কোনোদিন। মাসের শেষে মেসের টাকাটা কোনোরকমে চুকিয়ে দিতে পারলেই বাস্, পরমানন্দে খাও দাও, লেখো আর ঘুমোও!

কিন্তু ঘুম আর হচ্ছে কই!

কেরানীদের মেস্। ন'টার ভেতর খাওয়া-দাওয়া খতম। দশটায় সব ভোঁ-ভাঁ।

ভাবলাম একটু গড়িয়ে নিই, তারপর লিখতে বসবো। এমনি নিরিবিলি জায়গাই চেয়েছিলাম মনে-মনে।

মেঝের ওপর শতরঞ্চি পাতাই ছিল। বালিশ একটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুতে না শুতেই এ কি যন্ত্রণা? অজস্র ছারপোকা এসে আক্রমণ করলে। উঠে বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে তারা কোন্‌দিক দিয়ে পালালো বুঝতে পারলাম না।

চোখ বুজে শুয়ে আছি, ঘুম আর আসছে না! হঠাৎ অপরিচিত নারীকণ্ঠ!

—ও মা! এ আবার কোত্থেকে এলো! শুনছেন? উঠুন। ঘর ঝাঁট দেবো।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মেসের ঝি। তাকালাম তার দিকে। কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না—এমন চেহারা! গায়ের রং ফরসা নয়, বরং কালোই বলা চলে। কিন্তু যৌবন যেন ফুটে বেরুচ্ছে তার সর্ব অঙ্গ দিয়ে। যেমন যৌবন তার তেমনি স্বাস্থ্য। মাথায় একমাথা মিশমিশে কালো চুল এলো খোঁপা করে বাঁধা, রঙিন শাড়ী আঁটসাঁট করে কোমরে জড়ানো। নিটোল দুটি হাতে মাত্র দু'গাছা কাঁচের রেশমী চুড়ি, কানে দুটো সস্তা লাল পাথর চিক্‌চিক্ করছে। সুন্দর মুখে সবচেয়ে আশ্চর্য দুটি ঢলঢলে চোখ। দেখে মনে হলো খুব গরীব, গায়ে জামা পর্যন্ত নেই।

সুমুখের খাটখানা খালি পড়ে ছিল, সেইখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

ঘরের মেঝেয় সে তখন জল ছিটোচ্ছে। আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, বাসিনী।

—কতদিন কাজ করছো এখানে?

—তিন মাস।

বললাম, বেশ আনন্দেই আছ তাহ'লে!

বাসিনী আপন মনেই কাজ করতে লাগলো। জবাব দিলে না। আমি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবার আর ছারপোকার জ্বালায় নয়, বাসিনীর জ্বালায় চোখে ঘুম এলো না। মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখছিলাম সে কি করছে। ঝাঁট দেওয়া শেষ ক'রে বালতির জলে ঘর মুছছে ন্যাতা দিয়ে। মুছতে মুছতে আমার খাটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, ও-কথা কেন বললেন বাবু?

—কি কথা?

—ওই যে আনন্দে থাকার কথা।

বললাম, ও কিছু না। এম্‌নি।

বাসিনী বললে, বুঝেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি বুঝেছো? আমি খারাপ কিছু বলিনি।

এতক্ষণ পরে বাসিনী সোজা আমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, ব্যাটাছেলের মেস্…

বললাম, হ্যাঁ। এখানে মরতে কি জন্যে এসেছ?

বাসিনী মুখ টিপে হাসলে। হেসে আবার আপনমনেই কাজ করতে লাগলো। খানিক পরে কাজ করতে করতে বললে, আপনি নতুন এসেছেন তাই জানেন না। বাসিনীকে সবাই চেনে।

বাসিনীর কাজ তখনও শেষ হয়নি। মোটা লাঠিটি হাতে নিয়ে দোরে এসে দাঁড়ালো গোকুল।

জানি সে আসবে। কিন্তু এত সকাল-সকাল ঠিক এই সময়টিতে এসে হাজির হবে তা ভাবিনি।

গোকুল থাকে চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার ভেতর চমৎকার বাংলো। জু-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট গোকুলের মামা।

খাটের ওপর ভাল করে চেপে বসলো গোকুল। ঘরের এদিক-ওদিক ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর পকেট থেকে তার সিগারেট-কেসটি বের করে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, নাও, সিগ্রেট খাও, খেয়ে ওঠো। দুপুরে ঘুমুতে নেই।

বললাম, ঘুমোইনি।

—তা তো বুঝতেই পারছি। সাবিত্রী নাকি?

উঠে বসতে হলো। বললাম, না ভাই, সতীশের মতো ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি। তবে সাবিত্রী না-হোক্, সতী নিশ্চয়ই।

গোকুল বললে, অনেকগুলি শিব এখানে তপস্যা করছে। সতী বেচারা আগেই না দেহত্যাগ করে!

এম্‌নি আরও কি যেন সব কথা হয়েছিল এখন আর মনে নেই।

বাসিনীর কথা এখানে অবান্তর মনে হ'তে পারে, কিন্তু অবান্তর সে নয়। বাসিনীর মতো মেয়ে জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। শাঁখারীপাড়ার মেসে আমি অনেকদিন ছিলাম। পরে তার কথা আবার বলবো।

ঘরে তালা বন্ধ করে গোকুলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘরের চাবি থাকে বুড়ো নিবারণ-চাকরের কাছে। পাশেই ধোবি-মহল্লা। টেনিয়া ধোপানীর ঘরে দুপুরে কাপড় ইস্ত্রি করে নিবারণ। নিবারণকে ডেকে চাবিটা দিয়ে এলাম।

ভবানীপুর থেকে যাব পটুয়াটোলায়, অথচ প্রেমেন সঙ্গে থাকবে না, হ'তেই পারে না।

অচিন্ত্য না-হয় কলেজ থেকে সোজা চলে যাবে কল্লোল-আপিসে, কিন্তু প্রেমেন আমাকে খুঁজতে এসে দেখা পাবে না, তার চেয়ে গোকুলকে বললাম, চল, প্রেমেনকে ডেকে নেওয়া যাক্।

গোকুল বললে, তাহ'লে এসো তোমরা নিউ-মার্কেটের ফুলের দোকানে। আমি সেইখানেই থাকবো।

নিউ মার্কেটে গোকুলের মামার ফুলের স্টল। সেখানে তাকে রোজ একবার করে যেতে হয়। গোকুলকে ট্রামে চড়িয়ে দিয়ে আমি চললাম মিত্র ইন্সটিট্যুশনের দিকে।

মুরলীদা (মুরলীধর বসু) তখন মিত্র ইন্সটিট্যুশনের টিচার। মুরলীদাকে খবরটা দিয়ে আমি যাব হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। প্রেমেনের বাড়ি।

প্রেমেনকে প্রথম যেদিন খুঁজে বের করি, সেদিনও ঠিক এমনি করে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। সেও এক ভারি মজার ঘটনা।

মুরলীদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টাও ভারি মজার। আমি তখন বীরভূমের রূপসীপুর গ্রামে। মনের আনন্দে লিখবো বলে চলে গেছি বীরভূমের এই অখ্যাত গ্রামটিতে। বীরভূমের একেবারে পশ্চিম-প্রান্ত-সীমায়, সাঁওতাল পরগনার গায়ে। ছোট্ট গ্রাম, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো মাটি, দক্ষিণে শাল তাল তমাল মহুয়া আর হরীতকীর জঙ্গল, দেখতেও ভাল, নামটিও ভাল। রূপসীপুর। কিন্তু রূপসীর দেখা কদাচিৎ মেলে।

সেখান থেকে গল্প পাঠাই, কলকাতার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, কেউ-বা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন, কেউ-বা দেন না। গ্রামে পোস্টাপিস নেই। জঙ্গল পার হয়ে ক্রোশ-দুই দূরে পোস্টাপিস। সেখান থেকে পিওন আসে সপ্তাহে দু'দিন। কাজেই লেখা পাঠাবার জন্যে মাঝে মাঝে নিজেকেই যেতে হয় পোস্টাপিসে। না গেলে মনিঅর্ডার পেতে পেতে দু'তিন হপ্তা দেরি হয়ে যায়। ভাল ভাল পত্রিকাগুলি তো পাওয়াই যায় না। আবার সেখানেও এক বিপদ। বুড়ো এক ভদ্রলোক তখন পোস্ট-মাস্টার। সব সময়েই দেখি দরজা বন্ধ। ঘরে খিল বন্ধ করে কাজ করেন। সরকারী কাজ। ভুল হবার জো নেই। জানলার পথে কিছু বললেই খেঁকিয়ে ওঠেন। বলেন, কাজের সময় বিরক্ত কোরো না। দাঁড়াও।

আধঘণ্টার আগে কোনোদিন তিনি দরজা খুলেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

দুপুরে এই, বিকেলে আর-এক ঝঞ্ঝাট! প্রায়ই দেখি দোরে তালা বন্ধ করে তিনি কোনোদিন যান ছাগল খুঁজতে, আবার কোনোদিন-বা দেখি থানার দারোগার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। দয়া করে একবার আসুন, বলবার উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ জবাব দেবেন—আমি কারও বাবার চাকর নই!

প্রায়ই যাই, মুখ-চেনা হয়ে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আসেন শেষ পর্যন্ত। দোর খুলে দিয়ে বলেন, খাটের তলায় আছে, নিগে যা। দেখিস যেন আর-কারও চিঠি মেরে দিস্ না।

দেরি করবার উপায় নেই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। বাঘের ভয় না থাকলেও, বুনো শুয়োরের ভয় আছে।

এই পোস্টাপিসের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে পালাই পালাই করছি, এমন দিনে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের একখানি খামের চিঠি পেলাম।—আমার লেখা সব গল্পই তিনি পড়েছেন। তাঁর খুব ভাল লাগছে। 'সংহতি' নামে ছোট একটি মাসিকপত্রিকার সম্পাদক তিনি। একটি গল্প চেয়েছেন 'সংহতি'র জন্য। ইনিই মুরলীধর বসু।

নির্বান্ধব অবস্থায় বাস করছি পল্লীগ্রামে। এ-হেন সময়ে এইরকম চিঠির মূল্য যে কতখানি তা আমি ভুক্তভোগী, আমি জানি। চিঠির জবাব দিলাম। গল্প পাঠালাম।

চিঠির পর চিঠি। চিঠিতেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মুরলীবাবু 'মুরলীদা' হলেন। এ রকম সাহিত্য-রসিক, এরকম হৃদয়বান মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

কলকাতায় আসবার জন্য মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এমন দিনে মুরলীদার একখানি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, গত মাসের 'প্রবাসী'তে 'শুধু কেরানী' নামে ছোট একটি গল্প ছাপা হয়েছে, গল্পটি পড়ে দেখবেন।

গল্পটি পড়লাম। একবার নয়, দু'বার।

পড়েই সুটকেসটি গুছিয়ে ফেললাম। মুরলীদাকে চিঠি লিখলাম, কলকাতায় যাচ্ছি।

মুরলীদা তখন 'শুধু কেরানী'র লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঠিকানা পর্যন্ত সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

হরিশ মুখার্জি রোড ধরে যাচ্ছি মুরলীদা আর আমি—প্রেমেন্দ্র মিত্রের সন্ধানে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে।

হরিশ মুখার্জি আর হরিশ চ্যাটার্জিকে আমরা গোলমাল করে ফেলেছিলাম। হরিশ মুখার্জি রোডের ওইরকম একটা নম্বরের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন এক অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ, গলায় ঠিক মালার মতো একগোছা পৈতে, আর সেই পৈতের মাঝখানে সোনার একটি আংটি ঝুলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, প্রেমেন্দ্রকে ডেকে দিন তো?

খিঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।—কি বললে? প্রেম? ফাজিল ছোকরা! ইয়ারকি হচ্ছে?

বললাম, আজ্ঞে না, প্রেম নয়, প্রেমেন্দ্র।

কিন্তু কে শুনবে সে-কথা? দরজা তখন তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

মুরলীদা বললে, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট একটা আছে কিন্তু গঙ্গার ধারে। চল একবার সেইখানে চেষ্টা করি।

সেইখানেই যাচ্ছি, দেখলাম বলরাম বোস ঘাট রোডের ওপর দিয়ে দু'জন আসছে গল্প করতে করতে।

আমি বলে উঠলাম, ওই প্রেমেন্দ্র মিত্র! জিজ্ঞাসা করবো?

মুরলীদা এ-সব পছন্দ করে না। বললে, আবার খিঁচুনি খাবে।

আমার কিন্তু বেশ লাগে। 'খাই তো খাবো' ব'লে এগিয়ে গেলাম।

—হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোন্‌টা বলতে পারেন?

দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—কত নম্বর খুঁজছেন?

বললাম, ফিফ্‌টি-সেভেন।

—আপনার নাম?

বললাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

—ফিরুন্, আর যেতে হবে না। আমি-ই প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মার-টার খাবার ভয়ে মুরলীদা তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

বললাম, ভয় নেই মুরলীদা, এগিয়ে এসো। ইনিই প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্র বললে, ইনি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

মুরলীদা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। বললাম, ইনি মুরলীধর বসু। 'সংহতি' পত্রিকার সম্পাদক। পরিচয় হোক, পরে বুঝতে পারবেন ইনি কে।

প্রেমেন্দ্র বললে, উঁহু, 'আপনি' নয়, 'তুমি'।

বাস্, সঙ্গে-সঙ্গে 'তুমি'। একদিনেই অন্তরঙ্গ।

সবাই মিলে বসলাম গিয়ে হরিশ-পার্কে।

উঠলাম রাত্রে।

তারপর দিনের পর দিন।

এমনি করে হয়েছিল প্রেমেন আর অচিন্ত্যর সঙ্গে পরিচয়।

কল্লোলের দলে আর-এক জোড়া লেখক বাড়লো।

কল্লোলে লেখকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন হ'লো যে দশ-নম্বর বাড়ির বাইরের ঘরে আর ঠাঁই হলো না। পাশেই আর একখানা ঘর নেওয়া হলো। এঁদের সকলের কথা আমি বলবো না। বলা সম্ভবও নয়। অচিন্ত্যকুমার সে অভাব আমাদের পূরণ করে দিয়েছে 'কল্লোল যুগ' লিখে।

আমি লিখবো আমার কথা।

আমার সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদের কথা।

এক এক সময় মনে হয় জড়িয়ে নাই কে? আধুনিক কালে যারা শীর্ষস্থানীয়, যারা আপনাদের প্রিয় লেখক, সবার সঙ্গেই তো আমার যোগাযোগ। সেদিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান। কি ভালবাসাই না তাদের আমি পেয়েছি! সেইটুকুই আমার ইহজীবনের সম্বল।

তাদের সবার কথাই বলবো। বলবো তারাশঙ্করের কথা, বলবো প্রেমেনের কথা, বলবো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কথা, বলবো অচিন্ত্যকুমারের কথা। যখন যার কথা মনে পড়বে, তখন তার কথা বলবো।

ধরুন না এই অচিন্ত্যকুমারকে।

বই খাতা হাতে নিয়ে রোজ আসে কল্লোল-আপিসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারে। গল্প লেখে, কবিতা লেখে। ভাবতাম, ছোঁড়াটা কলেজ পালিয়ে এইখানে এসে, গেল মাটি হয়ে! বলতাম, তুমি ডাহা ফেল্ করবে অচিন্ত্য, কেন মিছেমিছি কলেজের মাইনেটা দিচ্ছ, নামটা কাটিয়ে দিয়ে এইখানে নাম লেখাও।

এই নিয়ে কতদিন কত কথা বলেছি তাকে। অচিন্ত্য জবাব দেয় না, শুধু হাসে।

তারপর একদিন দেখলাম ওই বয়ে-যাওয়া ছেলে অচিন্ত্য-কুমার সবাইকে অতিক্রম করে একেবারে সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এম-এ আর ল' দুই-ই একসঙ্গে।

সেই অচিন্ত্যকুমার আজ সেসন্-জজ। ফাঁসির হুকুম দিতে পারে সে।

আজকাল কিছু বললে বলে, সবই হয়েছে ঠাকুরের দয়ায়।

রামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত অচিন্ত্যকুমার। আমাদের সাহিত্য-সাথী প্রিয়তম বন্ধু। এই আমাদের গর্ব।

'কল্লোল'-এর চলছে তখন তৃতীয় বর্ষ। গোকুলের টি-বি হয়েছিল। দার্জিলিং-এ গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল পবিত্র। সেইখানেই মারা গেছে। দীনেশ একা।

কল্লোল-আপিস তেমনি সরগরম। হিতৈষীর সংখ্যা অগণিত। লেখক-বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়। তেমনি আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া, হৈচৈ—সবই চলছে। অথচ এত বন্ধু-পরিবৃত হয়েও হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম দীনেশ তার প্রিয়তম বন্ধু গোকুলকে হারিয়ে কেমন যেন নিঃসঙ্গ—কেমন যেন একা হয়ে গেছে।

শিল্পী চিরকালই একা। তার ওপর দীনেশ ছিল চিরকুমার। বিয়ে-থা করেনি, আগে ছবি আঁকতো আর আপনমনেই গান গাইতো। কল্লোল বের করে মনের একটা আশ্রয় পেয়েছিল।

গোকুল চলে যেতেই সে আশ্রয়ের ওপর দীনেশের তেমন আস্থা রইল না।

আজকাল দেখছি তবু লোকজন কিছু কিছু পড়ছে। আর তখনকার দিনে? তিন বছর কাগজ চালাবার পরেও দীনেশকে সেদিন বলতে শুনলাম, আর ভাল লাগছে না শৈলজা, ঘরে-বাইরে গালাগালি আর সইতে পারছি না।

চুপ করে শুনে গেলাম। সেইদিনই প্রথম শুনলাম, কল্লোল তখনও নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। অর্থাৎ মাসে পঞ্চাশটি টাকার বেশি কল্লোল দিতে পারে না। অথচ কল্লোলের আপিসের খরচ চালিয়ে লেখকদের কিছু কিছু দিতে না পারলে দীনেশ যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

দীনেশ বললে, কল্লোলকে আঁকড়ে ধরে আছো তোমরা, তাই কল্লোল চলছে। কিন্তু কল্লোল তোমাদের কি দিলে? খেতে দিলে না পরতে দিলে না, দিলে শুধু নিন্দা।

'ভারতবর্ষে' আমার লেখা প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। হরিদাস-বাবু ভাল টাকা দিচ্ছেন। এত ভাল যে, এক এক সময় সন্দেহ হয়েছে—এটা ঠিক লেখার দাম নয়। আমাকে তিনি ভালবাসেন বলেই বাজার-ছাড়া দাম দিচ্ছেন।

দীনেশ একদিন ভারতবর্ষে-ছাপা আমার একটি গল্প পড়ে বললে, এ-গল্প কল্লোল কোনদিন পাবে না তা জানি। আর সেইজন্যেই মনে হয় কাগজটা তুলে দিই।

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি—কল্লোলে এমন-সব গল্প ছাপা হচ্ছে—গল্প হিসাবে যাদের মর্যাদা দেওয়া চলে না। আর সে-সব গল্প মেয়েদের লেখা।

প্রেমেনও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখলাম। প্রেমেন বললে, কল্লোল এবার গেল!

দীনেশকে বললাম। দীনেশের কেমন যেন উড়ু-উড়ু ভাব। আপিসে প্রায়ই থাকে না। অজিত (৺জলধর সেনের ছেলে) আর পবিত্রর ওপর দেখাশোনার ভার দিয়ে সরে পড়ে।

প্রশ্নটাকে দীনেশ এড়িয়ে যেতে চাইলে। তারপর বললে, বিনা পয়সায় ওর চেয়ে ভাল লেখা পাওয়া যায় না।

বলেই সে পালিয়ে গেল আপিস থেকে।

মাসের পর মাস কল্লোলে সেইরকম লেখাই ছাপা হতে লাগলো।

অচিন্ত্যকে বললাম। অচিন্ত্য বললে, এ-বছরটা যেমন চলছে চলুক, আসছে বছর থেকে আমি ভার নেবো কল্লোলের। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

প্রেমেন আর আমি অন্য স্বপ্ন দেখছি। আমার পড়াশোনা ছিল খুব কম। আর প্রেমেন ছিল ঠিক তার বিপরীত। বিদেশী সাহিত্য তখন সে অনেক কিছু পড়ে ফেলেছে।

দু'জনেই থাকি ভবানীপুরে। খুব কাছাকাছি। দিনরাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় একসঙ্গে কাটাই। কত কথা হয়। সব সাহিত্যের কথা। সাহিত্যই ধ্যান-জ্ঞান। সাহিত্যের আলোচনায় আর চিন্তায় আমরা তখন তন্ময় হয়ে গেছি। শুধুই মনে হয়, দূর ছাই! এতদিন কি-সব লিখেছি ছাইভস্ম। আবার নতুন করে লিখি। নতুন করে জীবন আরম্ভ করি।

তখন কতই-বা আমাদের বয়স, আর কতটুকুই-বা দেখেছি জীবনকে!

আমি লিখলাম 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (গ্রামকে গ্রাম), প্রেমেন লিখলে 'পাঁক'।

'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' দিয়ে এলাম প্রবাসীতে। প্রবাসী ফেরত দিলে। জীবনে এই প্রথম আমি লেখা ফেরত পেলাম। এর আগে আমার কোনও লেখাই কোনও পত্রিকা থেকে অমনোনীত হয়ে আসেনি। তাই বলে অমনোনীত হবার মতো মন্দ লেখা যে লিখিনি তা নয়। মন্দই ছাপা হয়েছে।

মুরলীদা বললে, চিরাচরিত সাহিত্যের পথ থেকে তোমরা একটু সরে এসেছ। তোমরা স্বতন্ত্র। তোমাদের এ বিদ্রোহ মানুষ সহজে স্বীকার করে নেবে না।

মুরলীদাই প্রস্তাবটা প্রথম করলে, আমরা একখানা কাগজ বের করি এসো।

কল্লোল থাকতে সেটা কি সম্ভব?

মুরলীদা বললে, কেন নয়? কল্লোলের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। তোমাদের একটু বেশি খাটতে হবে। কল্লোলেও লিখতে হবে।

নিশ্চয় লিখবো।

সাহিত্যের দিন-মজুরি করতে তখন আমরা নারাজ নই।

কিন্তু টাকা? কাগজ বের করতে টাকার দরকার।

বরদা এজেন্সীর শিশির নিয়োগী তখন আমার একখানি গল্পের বই বের করেছেন—'অতসী'। ভদ্রলোক শিক্ষিত। এম-এ বি-এল। আমাদের লেখার বিশেষ অনুরাগী। মুরলীদা তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার পরের দিনই আমাদের জানিয়ে দিলে, কাগজ বেরুবে। সম্পাদক হবে তোমরা দু'জন।

মুরলীদা নিজেকে প্রথমে বাদ দিতে চেয়েছিল। আমরাই রাজী হলাম না। সম্পাদক থাকবে তিনজন: প্রেমেন, আমি আর মুরলীধর বসু।

এইবার চাই কাগজের নাম।

প্রেমেনের মাথা এ-সব ব্যাপারে সব সময়েই পরিষ্কার। তৎক্ষণাৎ বলে বসলো: কালি-কলম।

'কালি-কলম' বেরুলো।

একহাজার কপি, তিন দিন পরে দেখলাম, একখানিও নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি

মণীন্দ্র রায়

শুনেছি সহজে কিছু মেলে না সংসারে,
দৃপ্ত কামনার ধ্যানে সবি নাকি তার
জয় ক'রে নিতে হয়। তাই চাষে ফসল, খনিতে
ধাতু জাগে স্বেদ রক্তে। মানুষের মন
আদিম অরণ্য থেকে জ্ঞানের প্রেমের
যতো স্তম্ভ গড়ে তাতে বেজে ওঠে তাই
কঠিনেরি বন্দনার ভেরি।

কিন্তু কী অবিশ্বাস্য যুদ্ধ যে তখন,
একা যদি কেউ তার মাটিডোবা রথে চাকা ধ'রে
স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে চায়!
ক্যানিঙের সিন্ধু মাঝি নদীর উপরে
সময়ের সব অস্ত্র বুকে নিয়ে তবু
বাঁচে সেই মত্ত অভীপ্সায়।

মাছধরা পেশা তার। জাল আর জলের জগতে
যৌবনে সে যুবরাজ। কতো-না মোড়ল
সেধে নিয়ে গেছে তাকে সমুদ্রের নীল মোহানায়।
অন্ধকারে কান পেতে ত্রস্ত বোবা মাছের চিৎকার
শুনেছে সে, জেনেছে কোথায়
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলে মানুষের রুপোলি আহার।

কিন্তু বাড়ী ফিরে তবু বছর বছর
একা তার শীত কাটে মলিন কাঁথায়।
ফাল্গুনের ভরা চাঁদ বাঁশের বাগানে হীরা জেলে
জেগে থাকে অপলক। ঝিঁঝিঁ ডাকে স্নায়ুর ভিতর।
মনে হয় কিছু নেই, কেউ নেই, শূন্য তার ঘর।

অথচ নারী যে রত্ন, দুর্লভ, বিশেষ
তাদের সমাজে, তাই সম্ভাবিত যতো শ্বশুরেরা
বছরে দুবার তার দক্ষিণা বাড়ায়।
কতো কন্যা দিনে দিনে বালিকা, কিশোরী,
কিন্তু সে যখনি চোখ তুলেছে, সবাই
মাথায় ঘোমটা তুলে চলে গেছে অন্যের ভিটায়।

বয়স পশ্চিমে আজ। নিভে আসে দাহ
শরীরে, অথচ তৃষ্ণা মনে, একী জ্বালা!
এল না, এল না তার রক্তের গভীর প্রতিধ্বনি
আর কারো বুকে বেজে। সারারাত তাই
ভ্রষ্ট নায়কের মতো সিন্ধু মাঝি ঘোরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
জাল ফেলে'। চোখে ভাসে স্বপ্নের আঁচল।
এ জীবনে কঠিনের দারুণ মন্থনে
কী পাবে সে, সুধা না গরল!

আমেরিকার চিঠি*

নির্মলকুমার বসু

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
বার্কলে, ১২ই অক্টোবর ১৯৫৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমেরিকায় এসে প্রথমেই যেটি চোখে পড়ছে সেটি হ'ল, শহরে বা মাঠে পাখীর সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে কম। শত শত মোটরকার ঘণ্টায় পঞ্চাশ ষাট মাইল বেগে জলের ধারার মতো পথ দিয়ে চলেছে। অবশ্য এদেশে মোটরের হর্ন বাজানোর রীতি নাই; নিতান্ত আকস্মিক কারণে দরকার না হ'লে কেউই হর্ন বাজায় না। তা সত্ত্বেও হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ির পর গাড়ি এমনভাবে চলে যে, প্রথম কয়েকদিন অনবরত এই শব্দটাই কানে শুনতে পেতাম। একজন বৃদ্ধ নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'খরস্রোত নদীর ধারে যারা থাকে তারা যেমন নদীর শব্দ ভুলে যায়, অকস্মাৎ কোন কারণে শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন তাদের মনে হয়, কিসের যেন অভাব ঘটেছে, আমাদেরও হয়তো মোটরের শব্দ সম্বন্ধে সেইরকম ঘটেছে। আপনি নতুন এসেছেন বলে, প্রথমে ঐ শব্দটাই কানে লাগছে।'

ছাত্র, মিস্ত্রী, শিক্ষক, সবাই গাড়িতে কাজে যাতায়াত করেন, রাস্তার দুধারে সর্বদাই কারুর না কারুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গ্যারেজ বলে পদার্থ নেই। সম্ভবও নয়। আমেরিকার সতেরো কোটি লোকের সাত কোটি গাড়ি। ক্যালিফর্নিয়াতে আরও বেশি। যত লোক, গাড়ির সংখ্যা তার অর্ধেকেরও বেশি। এক মহিলা বললেন, 'আমাদের "জাতীয় সমস্যা" হ'ল গাড়ি কোথায় পার্ক করা যায়'!

রাজসিক ধর্মের চূড়ান্ত। অপরিমিত সুখের সন্ধানে মানুষ ছুটে চলেছে। এদেশে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'We do not know where we are going, but we are on the way.'—'আমরা কোন্ দিকে চলেছি জানিনা, কিন্তু আমরা চলেছি।' নিজের দিকে আত্ম-জিজ্ঞাসার জন্য তাকিয়ে দেখতে যেন এদের ভয় হয়, কি জানি চলা যদি বন্ধ হয়ে যায়!

যাঁদের মন চকচকে গাড়ি ও বাড়ির ভারে ক্লান্ত, তাঁরা অন্য একটি রাস্তা ধরেছেন। কুটির নির্মাণ করার জন্য জঙ্গলের কাঠ ব্যবহার করে তাতে রং না দিয়ে কাঠের স্বাভাবিক রং বজায় রেখেছেন। রেড-উড নামে একটি কাঠের ব্যবহার অনেক জায়গায় দেখলাম। আবার অনেকে মানুষের হাতে গড়া জিনিসের বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্রোহ ক'রে গাছপালা, মাটি, পাখী, ফুলফল প্রভৃতির প্রতি যেন একটি পূজার ভাব (cult) গড়ে তুলেছেন। আবার অন্যান্য মরমী লোকেরা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতার মধ্যে আরও অনাবিল প্রকৃতির সন্ধান করছেন—যেখানে তাঁদের ধারণা মানুষ নিজের গড়া ঐশ্বর্যের ভারে চাপা পড়েনি।

বার্কলেতে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াশিংটনে সরকারী গ্রন্থাগারের বাইরে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এত বড় বইয়ের সংগ্রহ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ভারত থেকে খান কুড়ি দৈনিক সংবাদপত্র প্রত্যহ আসে, এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রত্যহ সংগ্রহ ক'রে, কয়েকমাস অন্তর এঁরা পুস্তিকা বা'র করেন।

বার্কলে, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্প্রতি একটি ফ্ল্যাট নিয়েছি, মাসে ষাট ডলার ভাড়া। খাট বিছানা, রান্নার জন্য গ্যাসের উনুন, রেফ্রিজারেটর, স্নানের ব্যবস্থা, জামা কাপড় ইস্তিরি করার টেবিল—সমস্ত ব্যবস্থা এরই মধ্যে। দেশটি স্কাইস্ক্রেপারের দেশ হ'লেও অধিকাংশ গৃহস্থ দুই বা তিনতলা বাড়িতে থাকে। বাড়ির যত্ন, পাশে একটু বাগান করা—স্ত্রী-পুরুষে মিলে করে; এবং বাড়িকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে সকলে যথেষ্ট

* 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

পরিশ্রম করে। কুলী খাটানো গৃহস্থের পক্ষে প্রায় সম্ভব নয়; কারণ ঘণ্টায় সাড়ে তিন ডলারের কম মজুরি দেওয়া আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। এক ডলার মানে চার টাকা বারো আনা।

রান্নাবান্নার ব্যবস্থা এরা একেবারে সহজ করে ফেলেছে। তরিতরকারি থেকে মাংস পর্যন্ত কাঁচা, আধসিদ্ধ বা পুরা রান্না করা অবস্থায় পাওয়া যায়। যার যেমন দরকার, সেইভাবে কিনে নেয়।

...

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদি আরম্ভ করেছি, কাজের চাপ কিছু নাই, নিজের সুবিধা বা রুচিমতো বক্তৃতা দেওয়া। সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যের সম্বন্ধে বলতে হ'ল। বক্তৃতা ও পরবর্তী চর্চায় প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগলো। তীর্থ-দর্শন, সন্ন্যাস ও বর্ণ-ব্যবস্থার দ্বারা সারা ভারতকে একই ধর্ম ও সমাজ-বন্ধনে কি করে বাঁধা হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

আজ যে ভাষাগত রাজ্য ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ ও সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে হ'ল, এটা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের চাকুরিগত সমস্যার সঙ্গে জড়িত। রাজ্য-সরকার আজ বেশির ভাগ কাজের ভার নিজের হাতে নিচ্ছেন। স্থানীয় চাকুরিজীবীরা রাজ্য-সরকারের কাছে কাজের জন্য 'গণতান্ত্রিক' দাবিও জানাচ্ছেন। সেই সূত্র অবলম্বন করে সারা ভারতে আজ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে অন্য ভাষা-ভাষীদের 'প্রবেশ নিষেধে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অথচ কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলে এক জাতি, এক প্রাণ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

গিরীন্দ্রবাবুর 'পুরাণ-প্রবেশ' ও ব্রজেনদার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দু'খণ্ড তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারেন? উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে পরিষৎ যে কাজ করেছেন, তার বিষয়ে প্রায়ই বলতে হচ্ছে। হয়তো এখানকার গ্রন্থাগার থেকে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ফরমাস যাবে।

সজনী, তারাশঙ্কর প্রভৃতি সকলকে নমস্কার দেবেন।

*

বার্কলে, ২৮শে অক্টোবর ১৯৫৭

পাটুদা,

সাধারণ মানুষ এখানে শরীরের প্রয়োজনের দিক থেকে নিতান্ত সুখে আছে। খাওয়াদাওয়া, যথেষ্ট পরিশ্রম করা ও অবসর বিনোদনের জন্য রেডিও, টেলিভিসনে যত বাজে নাচ গান বা ফুটবল খেলার ছবি দেখে, সংবাদপত্রে লোমহর্ষক সংবাদ পড়ায় সময় বেশ কেটে যায়। তা ছাড়া আরও একটু সাত্ত্বিক গোছের কাজ হ'ল বাগান করা, দূরে পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে বেড়ানো, ইত্যাদি। এই সব নিয়ে মানুষ মোটের উপরে সুখে বা সন্তোষে আছে।

তরুণদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা একটু সহজ ও শিথিল। জীবনে তাই ক্লান্তির ভাব কম। একজন সমাজতাত্ত্বিক বললেন, আজকাল কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সের কমেও ছেলেমেয়েদের বিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। আর সন্তান-সম্ভাবনা-নিরোধের চেষ্টাও কমে গেছে। এঁর মতে, যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় এটি বিশেষভাবে চোখে পড়ছে। আর এক সমাজ-দার্শনিকের লেখায় পড়লাম, তাঁর মত হ'ল, যন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ এইভাবে প্রকৃতি ও প্রেমের রাজ্যে নূতন সার্থকতার সন্ধান করছে। হয়ত হবেও তাই।

কিন্তু এ ছাড়াও যে মানুষের মনে অন্যান্য ভাব বা ভয় বর্তমান তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের উচ্চমানের জীবনযাত্রা এবং সুখসমৃদ্ধি পাছে খোয়া যায়, এ বিষয়ে যথেষ্ট ভয় আছে। কমিউনিজমের সম্পর্কে দেশব্যাপী বিরুদ্ধতার মূলে হয়ত এই ভাব অনেকাংশে বর্তমান। এশিয়াবাসীরা সংখ্যায় সংসারকে প্লাবিত করবে, এবং তখন তাদের দারিদ্র্যের বন্যার মধ্যে আমেরিকার সমৃদ্ধির উচ্চ মান বজায় রাখা সম্ভব হবে না, এ ভাব যেন তলে তলে অনেকের মনে আছে। আমাদের দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা যেমন সংখ্যাগুরুর আওতায় সত্য বা মিথ্যা ভয়ে শক্ত দানাবাঁধা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল, আমেরিকানেরা চারিদিকের পৃথিবীর দারিদ্র্যের দিকে চেয়ে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি যেন আরও গভীর অনুরাগবশে একটি সংকীর্ণ অহমিকাকে আশ্রয় করছে।

অবশ্য একটা দেশের সকলে এরকম হতে পারে না। নানারকম মানুষের সন্ধান পাচ্ছি। এমন ছোট ছোট দলের পরিচয়লাভ ঘটেছে, যাঁরা অ্যাটম-বোমার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন; আমেরিকার সম্পদ সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার পক্ষপাতী। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর সম্বন্ধে, বিশেষ করে সত্যাগ্রহের নীতি ও কৌশলের বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বলবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পাটুদা, আপনার পাঠানো বইগুলি সাহিত্য পরিষৎ থেকে পৌঁছেছে। এবার বাংলাদেশের বিষয়ে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছি সেগুলি লিখে ফেলবো।

নানা দেশের সম্বন্ধে আমেরিকায় যেমন কৌতূহল আছে, নানা ভাষা শেখারও তেমনি বিচিত্র ব্যবস্থা আছে। ভাষা শেখার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ডের এখানে ছড়াছড়ি। ফরাসী ভাষা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যতটুকু দরকার, অথবা শুধু যাত্রীদের জন্য যতটুকু দরকার, বা সাহিত্যামোদীদের জন্য যেভাবে দরকার, তার জন্য আলাদা রেকর্ড, আলাদা পুস্তিকা পাওয়া যায়। পরিষদের জন্য এই ধরনের দু-তিনটি ভাষা শেখার কিছু বই পাঠাবো। যদি কারুর খেয়াল হয়, তাহলে বাংলা বা হিন্দী শেখবার জন্যে এইরকম বই লিখেও ফেলতে পারেন।

বার্কলে, ১২ই জানুয়ারি ১৯৫৮
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

বাংলাদেশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে যে-সব বক্তৃতা দিলাম, তাতে অনুসন্ধিৎসার পরিমাণ দেখে ভাল লেগেছে।

সমস্ত জীবনটা এদের বাহ্যস্তরে—অত্যন্ত ঝক্‌ঝকে জিনিস দিয়ে মোড়া থাকলেও, ভিতরে অতৃপ্তির আভাস নানা ভাবে দেখতে পাচ্ছি। রাজসিকের বিকার তামসিক মধ্যেও হয়, আবার সাত্ত্বিকতার পথেও তার কিছু প্রকাশলাভ ঘটে। একদিকে অপরাধপ্রবণতা, যৌন শৈথিল্য অল্প অল্প দেখা দিচ্ছে (সমগ্র জীবনস্রোতের তুলনায় কদাচ পরিমাণে বেশি নয়); আবার অপর দিকে বেদান্ত, বৌদ্ধ ধর্ম, জেন, এসব দিকেও যেন মানুষের মন আশ্রয়ের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

গাছ যেন মাটির মধ্যে আরও গভীর রস পাবার জন্য শিকড় আরও নীচে প্রসারিত ক'রে দেখছে, কোথায় রস পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

পাটুদা, এইবার একজন সত্যিকারের মনের মতন মানুষের সন্ধান পেয়েছি। বেশির ভাগ লোকের মনে একটা অহংভাব আছে—'আমেরিকার চেয়ে সভ্য বা উন্নত দেশ আর নেই'। কিন্তু জর্জ স্ট্রাউস নামে এক জার্মান শিল্পী ও তাঁর স্ত্রী রুথের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁরা অন্য ধরনের মানুষ। জর্জ কুড়ি বৎসর আমেরিকায় রয়েছেন, রুথ জন্মাবধি আমেরিকান। এরকম মরমী লোকের পরিচয় পেয়ে মনটা খুশি হয়ে গেছে।

রুথ নিজে ডাক্তার—এম-ডি। একটি বিখ্যাত ডাক্তারী পত্রিকার পরিচালিকা। খুব ভাল লেখেন, সাহিত্যিক হিসাবে সুনাম হয়েছিল এবং 20th Century Fox সিনেমা কোম্পানি মোটা মাহিয়ানার লোভ দেখিয়েছিল, প্রত্যাহার করেছিলেন।

রুথ যা বললেন তা এই : 'আমেরিকার অন্তরে পাটোয়ারি বুদ্ধি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, আমি বেদনায় মর্মাহত হয়ে রয়েছি। ডাক্তারি শিখলাম। যতদূর এ পথে চলা যায়, এগিয়ে দেখলাম, আদর্শবাদ বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে ডাক্তারদের মধ্যেও পাটোয়ারি বুদ্ধি বেশি। যে রোগীর মৃত্যু অল্পদিনের মধ্যে অবধারিত, তাকে বহু যন্ত্রণা দিয়ে আরও দু'সপ্তাহ অধিক বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে নিজের বিদ্যার অহঙ্কার ছাড়া কি আছে বলুন তো ? মানুষের শরীরটাকে জড় মাংসপিণ্ডের মতো মনে করায় মানুষের যে চরম অবমাননা করা হয়, এই সূক্ষ্ম বোধটুকু ডাক্তারেরা বিদ্যার অহঙ্কারের বশে হারিয়ে ফেলেছে।'

বার্কলে, ২৯শে জানুয়ারি ১৯৫৮

তাঁকে নিবেদিতার *Kali : the Mother* পড়তে দিলাম। কাল রোলাঁর পরমহংসদেবের জীবনী ও কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ উপহার দিয়েছি। নিবেদিতার বই পড়ে জানালেন, সমস্ত রাত ঘুমোতে পারেননি, জেগে বসে ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা নূতন জগতের সন্ধান আবছায় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। মৃত্যুকে এমনভাবে কোনও জাত সত্য ব'লে স্বীকার করেছে, তাতে তিনি পরম বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেছেন। পরমহংসদেব কালীমূর্তিকে আশ্রয় করে সবিকল্প-সমাধি লাভ করেছিলেন। পরে সেই মূর্তিকে হাতের খাঁড়া তুলে দ্বিধা-বিভক্ত করতে গিয়ে নির্বিকল্প-লোকে ডুবে গেলেন, এটি এঁর কাছে পরম বিস্ময়ের মতো মনে হয়েছে।

হিমালয়ের শৃঙ্গ কাছে থেকে দেখলে যেমন শীতের অনুভূতিলাভ হয়, ভয়ও হয়, বেদনার আভাসও থাকে, এঁর মনেও এই অভিনব সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে সেই ধরনের অনুভূতি হয়েছে।

...

শীত এখানে কমে আসছে। কিন্তু শিকাগোতে ক'দিন আগে গেছলাম, খবরও পাচ্ছি। সেখানে এখন বরফের রাজ্য চলেছে।

সবাইকে নমস্কার দেবেন।

নির্মল

দাক্ষিণাত্যে শারদোৎসব

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

দাক্ষিণাত্যে জননী শ্রীশ্রীদুর্গা ললিতাম্বিকা নামে বেশীর ভাগ স্থানেই পূজা গ্রহণ করেন। নবরাত্রে ভারতের অন্যান্য সর্বত্র যেমন দেবীর পূজা হয়, তেম্‌নি দাক্ষিণাত্যেও পূজা হয়—কিন্তু এখানকার পূজায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে—সেগুলিই এখানে উল্লেখ করবো।

নবরাত্র বা দুর্গাপূজা বা মাতৃপূজার ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতারই ইতিহাস। এ ইতিহাস এত ব্যাপক এবং রহস্য ও সূক্ষ্মানুভূতি পরিপূর্ণ যে তার কিছুমাত্র আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তথাপি বঙ্গদেশের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। বঙ্গদেশের হৃদয়মণি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দুইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যেই পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৫১০ সালে দাসকূট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাসতীর্থের সঙ্গে কর্ণাটকে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ের মিলনে উভয়েই পরম পরিতৃপ্ত হন, কারণ, ভবভূতি যা বলেছেন—

"সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি পুণ্যেন ভবতি" ॥

কন্নড়-ভাষায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ সালের প্রারম্ভে লিখিত "ব্যাস-যোগি-চরিতে" প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশের সঙ্গে কর্ণাটকের যে নিকট সম্পর্ক ছিল, তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে। ফলতঃ—মহাপ্রভুর নিত্য রসাস্বাদন-সঙ্গী রায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যেরই লোক। তাঁর ধর্ম ও দর্শনেব মূল ভিত্তি যাঁদের রচনার উপরে সুপ্রতিষ্ঠ, সে চারজনই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী—রূপ, সনাতন, শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট। অন্যদিকে বঙ্গদেশে আমরা যেভাবে মঠাধিষ্ঠিত দেবতাদের সঙ্গে জননীর পূজা করি, গবেষণার বলে এটি প্রমাণিত হয় যে, সে পূজা-পদ্ধতি ও মঠাধিষ্ঠান মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ের ঘটনা। এসব দিক থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দুর্গাপূজার ধারার সঙ্গে আমাদের এখানকার দুর্গাপূজার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তুলনামুখে আলোচনা করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু স্থান এত কম যে, তা এখানে সম্ভব নয়। আমি এখানে কেবল দাক্ষিণাত্যের দুর্গাপূজার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মাত্র উল্লেখ করছি।

দাক্ষিণাত্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছে বলে সেখানে অগস্ত্য-প্রচারিত[১] বৈদিক সভ্যতা অনেকটা মাথা উচু করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বীর-শৈব, দাসকূট সম্প্রদায় প্রভৃতি জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির বন্ধন কিছু শিথিল করে দিয়ে ব্যাপকভাবে ধর্ম-প্রচারণার সহায়তা করেছেন সত্যই—কিন্তু হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শকে তাঁরা কোথাও ক্ষুণ্ন করেননি। সকলকে নিজের বক্ষঃস্থলে, ধর্ম ও দর্শনের বিরাট পক্ষপুটের মধ্যে আনয়নের প্রচেষ্টা এঁদের আছে, কিন্তু মূল বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শনকে এঁরা কখনও ত্যাগ করেননি। দেবীপূজার ইতিহাসের মধ্যেও এটি বিশেষ করে চোখে পড়ে।

এখানে নবরাত্র উপলক্ষ্যে সাতজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রতী হন। (১) পুরোহিত; (২) তন্ত্রধারক; (৩) ললিতা-পারায়ণের নিমিত্ত স্তোত্রপাঠক[২]; (৪) ঋগ্বেদোক্ত মণ্যসূক্ত ১০৮ বার পাঠ করেন চতুর্থ ব্রাহ্মণ; (৫) পঞ্চম ব্রাহ্মণ করেন শ্রীসূক্ত ১০৮ বার পাঠ; (৬) ষষ্ঠ ব্যক্তি মহিম্নস্তোত্র পাঠ করেন; এবং (৭) সপ্তম ব্রাহ্মণ পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র "ওঁ নমঃ শিবায়" চারদিনে বারো হাজার বার পাঠ করেন ॥

ললিতাম্বিকা দেবী ষোড়শ উপচারে পূজা গ্রহণ করেন। রাত্রিকালে পূজাবসানের পর ১২ জন বেদগায়ক করেন স্তুতিপাঠ।

দশমীর দিন ৫০ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ এসে নিরঞ্জনকার্য সমাধা করেন।

আরো দুটি পার্থক্য এখানকার রীতিনীতির মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে—একটি চণ্ডীপাঠের অভাব, অন্যটি বলিদানের অভাব। মহারাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ ভারতের

---

[১] দ্রাবিড় ভাষার প্রতিও তাঁর সাদর দৃষ্টি ছিল। নিশ্চয় ধর্ম-প্রচারের সহায়তার নিমিত্তই তিনি দ্রাবিড়-ব্যাকরণ ও রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

[২] "ললিতাসহস্রনাম" ও "ললিতা-ত্রিশতী" অপূর্ব গ্রন্থ, এ সময়ে পাঠ করা হয়, শ্রীশ্রীচণ্ডী নয়।

কোথাও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বলিদানের প্রথা নেই। উৎকল দেশ ও পূর্ব-ভারতে এই প্রথার প্রচলন আছে। বিজয়নগরের রাজবাটীতে বলি প্রসঙ্গে এটি উল্লেখযোগ্য উৎকলীয় ব্রাহ্মণ বলিদান করেন, তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বলিদানে যোগদান করেন না।

বাইরের দিক থেকে এইসব ভেদবৈষম্য প্রতীত হলেও মূলতঃ আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্থক্য ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকবে। সকলেই বিভিন্ন মন্ত্রপ্রসঙ্গে জননীকে জানাচ্ছেন—শরণাগতি, হে দেবি! মা তুমি, আমাদের কৃপা কর। স্নেহ দান কর—এই হচ্ছে মূল কথা। ভাষা যাই হোক, ভাব তো সে একই॥

আমরা ১৩৬৫ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার শুভদিনগুলিতে জননীকে প্রার্থনা জানাই :—

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্॥
ঈশানমাতরং দেবীম্ ঈশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণব-তারিণীম্॥

ওঁ যন্মঙ্গলং প্রবর শঙ্খগদাধরস্য
রামস্য রাবণজয়ায় সমুদ্যতস্য।
জিত্বা নিশাচরপুরীং পুনরাগতস্য
তন্মঙ্গলং ভবতু তে বিজয়ায় নিত্যম্॥

শিল্পী : নন্দলাল বসু

ঝাঁপতাল

লীলা মজুমদার

টুলের ওপর চড়ে সেই অল্প আলোতেই অলিমাসিমা বড় আলমারিটার কারিকুরি করা মাথার পেছনে হাতড়াতে লাগলেন। তেল ঘি লেগে-লেগে এমনধারা চেহারা হলে কি হবে, সত্যিকারের মেহগেনি কাঠের আলমারি। নেপুর বাবা জন্মে অবধি কখনো কোনো খেলো জিনিস কেনেননি।

দিয়েছিলও ভগবান মচ্ছি ভেঙে ; বাড়ি-ঘর, পাবনার জমিদারি, জুড়িগাড়ি, বংশ, রূপগুণ, ব্যাঙ্কে টাকা। অঢেল দিয়েছিল। তা সে প্রাণ ভরে ভোগও করে গেছে। মরবার আগে শেষ ইচ্ছে হল একটু গড়গড়াটা টানবে। সে-সময় এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা, হাতের কাছে রুপোর গড়গড়া, তাই এনে দেওয়া হল। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। একতলা থেকে নবাবী আমলের হাতীর দাঁতের গড়গড়া আনতে-আনতে প্রাণটা বেরিয়ে গেছিল।

টুলের ওপর থেকে অলিমাসিমা নিচু ঘরটার চারিদিক একবার চেয়ে দেখলেন।

এ-রকম টিমটিমে একটা বিজলিবাতি তখন জ্বলত না। ঐ আংটা থেকেই প্রকাণ্ড পেতলের ঝাড়বাতি ঝুলত। আগে গ্যাসে জ্বলত, পরে পালটে কুড়িটা বিজলি আলো বসানো হয়েছিল। এক সুইচে কুড়িটাই জ্বলে উঠত। এইরকম আলো তখন এ-বাড়ীতে ঠাঁই পেত না। ভালো করে দেখাই যায় না। ঘরের কোণে কোণে আঁধার জমে থাকে, কুকুরদের খাবার থালাগুলো পায়ে লেগে উল্টে যায়, তখন আবার তোল-রে মোছ-রে।

এই যে বাক্সটা হাতে ঠেকেছে! অলিমাসিমা সাবধানে একটা রঙ-ওঠা মর্চে-ধরা হান্টলি-পামারের বিস্কুটের টিন নামালেন। এ-রকম টিন তখন ডজন-ডজন আসত। নেপুর বাবা কিন্তু এ-বিস্কুট খেতেন না। তাঁর জন্য আসত গ্রেনোব্‌ল্ বিস্কুট, প্রত্যেকটা বিস্কুটের চারদিকে ফুলকাটা কাগজের লেস জড়ানো থাকত।

আচমকা দরজা খুলে কেয়া এসে ঘরে ঢুকল।

ওকি মাসি, টুং-এ চড়ে ও আবার কি হচ্ছে?

অলিমাসিমা সাবধানে নামতে গিয়ে টিনটা মাটিতে পড়ে খুলে যায়, ভেতরকার বহু যত্ন করে সংগ্রহ করা সামগ্রী ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। কেয়া হেসে আকুল হয়।

আমি তুলে দিচ্ছি, মাসি, তোমার পায়ে না গুপো বলেছিলে? পাড়া-বেড়ানো ছাড়া অন্য কিছু করতে গেলেই না তোমার হাঁপ ধরে?

কেয়ার কথা শুনলে গা-জ্বালা করে। কিন্তু সত্যিই আজকাল নিচু হতে গেলে হাঁটুর পেছনটা টনটন করে।

মাসি!

কেয়ার হাতে ছাই রঙের পশমের গুলি। অলিমাসিমা সেটি ছিনিয়ে নিয়ে টিনের মধ্যে আবার ভরে ফেলেন, হাতটা একটু কাঁপতে থাকে। আজকাল এও আরেকটা উপসর্গ জুটেছে, হাত কাঁপে, পা কাঁপে।

কেয়া বলে, ও, এইজন্যই বুঝি নেপুদির পশম কম পড়েছিল?

অলিমাসিমার গলা দিয়ে কর্কশ স্বর বেরোয়: সে

সাত লাচ্ছি কিনতে দিয়েছিল, তাকে সাতটা গুলি পাকিয়ে গুণে দিয়েছি, জিগেস করে দেখতে পারো।

কেয়া হাসে।

চটো কেন, মাসি? যা কৃপণের জাসু এরা! চল্লিশ বচ্ছর আছ, এক পয়সা মাইনে বাড়ায় না! বেশ করেছ, নিয়েছ।

অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান।

মাইনে আবার কি গা? আপনার মাসি হই ওর, হলই বা একটু দূর সম্পর্কের, ঘরের লোকের মতো থাকি, রাঁধি-বাড়ি, খাই-দাই, এর মধ্যে আবার মাইনের কথা কোত্থেকে ওঠে শুনি? মাস-কাবারে বুড়ি মাসিকে দশটা টাকা হাতখরচ দেয়, সেদিকে তোমার অত নজর কেন?

কেয়াও উঠে দাঁড়ায়, ছোট একটা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাই তোলে, মাথার ওপর পাতলা হাত-দু'খানি তুলে, নীলাম্বরী-জড়ানো হাল্কা শরীরটাকে টান করে গা মোড়ামুড়ি দেয়। আলগোছে বাঁধা খোঁপা থেকে একটিমাত্র প্রকাণ্ড রুপোর কাঁটা খসে যায়, পিঠময় কালো এলো চুল ছড়িয়ে পড়ে। কাঁটাটা কেয়া তুলে নেয়।

কেয়া বলে, লক্ষ্মী মাসি, রেগো না, জানো, আজ আমার মাইনে বেড়েছে? তোমায় একটু ভাগ দিতে ইচ্ছে করে।

কেয়া একটা গোটা পাঁচটাকার নোট অলিমাসিমার হাতে গুঁজে দেয়।

টাকা হল গিয়ে লক্ষ্মী, ওর অমর্যাদা করতে হয় না। নোটটা কপালে ঠেকিয়ে অলিমাসিমা আঁচলে বাঁধেন।

গির্জের ঘড়িতে এগারোটা বাজে। কি করে কেয়া এত রাত অবধি? সেই কোঁকড়াচুল ছেলেটা আবার হয়তো পৌঁছে দিয়ে গেল। কোথায় থাকে এতক্ষণ, ওদের আপিস তো ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটায়।

জিজ্ঞেস না করেও পারেন না।

কোথায় ছিলুম না, তাই বল মাসি। আমাদের কেরানীদের ইউনিয়ন হচ্ছে যে, তার মিটিং ছিল। আবার নিজেদের মধ্যেই মহা খেঁচাখেঁচি। তা কমিউনিস্টরা দলে ভারি, তাদের সঙ্গে অন্যরা পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত একটা রফা করতে হল। যাই মাসি, ঘুম পাচ্ছে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচেটা নক্সা-কাটা কাঠ দিয়ে ঘেরা, সেইখানে ছোট একটি নেওয়ারের খাটে কেয়া ঘুমোয়, দরজাটা আলগা থাকে, ও-মেয়ের প্রাণে ভয়ডর নেই।

কি আছে আমার, মাসি, যে নিতে আসবে? আমাকে নেবে? আমার স্বামীই নিল না, আবার চোরে নেবে!

অদ্ভুত মেয়ে কেয়া। স্বামীর কথা নিয়ে হেসে বেড়ায়। সে নাকি বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করে সুখে আছে। কেয়ার মুখে একটা রাগের কথাও শোনা যায় না। হাসে আর বলে,

বুঝলে মাসি, কি লোক! ভুলিয়ে আমার অমন ভালো-ভালো গয়নাগুলো হাতিয়ে, বাপ-মাকে লুকিয়ে বিলেত পালাল। আর সেখানে কিনা বিয়ে-থা করে মহা আনন্দে আছে। রবিবার-রবিবার নাকি লোক খাওয়ায়; মেমকে বাংলা রান্না শিখিয়ে নিয়েছে। ওর জন্য কেন সিঁদুর পরব, বল? তবে একটা ওয়েডিং রিং পাই তো পরে দেখতে পারি!

অলিমাসিমার মনে হয় কেয়ার এখানে পড়ে থাকাটা ভালো দেখায় না। নেপুর বাবা না-হয় মানুষই করেছিলেন, অমন তো কত ছেলেমেয়েই মানুষ করে দিয়েছিলেন, কই, আর কেউ তো এখানে এসে পড়ে থাকে না।

কি করি, মাসি, স্বামীই ভেগে পড়ল, এখন কি শ্বশুর-বাড়িতে থাকাটাই খুব ভালো দেখায়? ওঁরা দিনরাত আমাকেই দোষ দেন। তাছাড়া কি সেকেলে গোঁড়া বাড়ি রে বাবা! ওখানে আমি টিকব কেমন করে? তার ওপর অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গেছে। ও-কথা বোলো না, মাসি।

কেয়া শুতে চলে গেলে পর টিনটাকে আবার আলমারির মাথায় তুলে রাখতে হয়। কিন্তু লম্বা রেশমী মোজাটাকে আর ওখানে রাখা নয়। কেয়ার মতো অহঙ্কারী মেয়েরা কখনো অবিশ্যি পরের জিনিসে হাত দেয় না, তবু কি দরকার! কোনদিন হয়তো নেপুদের সামনেই কি বলে বসবে।

ভারি দেমাক মেয়ের। থাকে এখানে কিন্তু খায় না, কোত্থেকে খেয়ে আসে ভগবান জানেন। তবে প্রায়ই কিছু কিনে বাড়িতে আনে, অলিমাসিমাকে খাওয়ায়। কম গুমোর নাকি! অথচ এই অলিমাসিমাই একদিন, কিছু মনে না করে, কি দুটো কথা বলেছিলেন, ভালো করে এখন মনেও পড়ে না কি কথা, আর অমনি মেয়ে এ-বাড়ির খাওয়াই বন্ধ করে দিলে! রাগও করল না, চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুই নয়। শুধু জল ছাড়া আর এ-বাড়ির কিছু খায় না। কাউকে বলেও না কিছু, নেপু পর্যন্ত এ-বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানে না।

বসে থেকে-থেকে পায়ে খিল ধরে যায়। অলিমাসিমা

উঠে গিয়ে মস্ত মস্ত দরজাগুলোর লোহার হুড়কো পরীক্ষা করেন। বাইরে থেকে কুকুরগুলোকে ঘরে তুলে, নেপু কখন দোতলায় নিয়ে গেছে। আর কোনো কাজ নেই। অলিমাসিমা ছোট দরজাটাও বন্ধ করে দেন।

তবু শুধু বারোটা বাজে। একটা দেড়টার আগে চোখে ঘুম আসবে না, ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ছুটে যাবে। এ নিয়মের আর অন্যথা হয় না। জেগে শুয়ে থাকা বড় কষ্ট।

নিচু হয়ে বড় তক্তাপোশ দুটোর তলা দেখতে হয়। বলা যায় না, কে কখন ঘরে সেঁদিয়ে যদি লুকিয়ে বসে থাকে। নিচু হলেই কোমরে খিচ ধরে, কষ্ট করে সোজা হতে হয়। আগে এরকম হত না।

তক্তাপোশগুলি নেপুর ঠাকুরদার আমলের। ভারি কাঁঠালকাঠের, পায়াগুলি কুমীরের আকারের, চোরা খুপরি দেওয়া, তার মধ্যে অলিমাসিমা কুকুরদের সকালের খাবার জন্য লেডুয়া বিস্কুট রাখেন। অন্য কোনো রকম বিস্কুট এ বাড়িতে আর আসে না।

তক্তাপোশের ওপর রাশি রাশি টিন, বাক্স, কৌটো, হাঁড়ির মুখে হাঁড়ি বসানো। তক্তাপোশের নিচে সারি সারি বোয়েম, ঝুড়ি, বারকোস। তার ধুলো ঝাড়া হয়নি কতকাল। কেয়ার মাঝে মাঝে খেয়াল হয়, এক ঘণ্টার মধ্যে ঝেড়েমুছে সব ঝকঝকে করে দেয়। কিন্তু সে শুধু যেদিন খেয়াল হবে।

নেপু সব জিনিস চোখের সামনে দেখতে চায়; কিছু তুলে রাখবারও জো নেই। বড় বড় কাঠের আলমারি দুটোতেও আর চাবি পড়ে না। দরজা ধরে টানলেই ভেতরটার সবখানি দেখা যায়। চুরি করার লোকই নেই।

নেপু বলে, আমাকে যে ঠকাবে সে এখনো জন্মায়নি।

মনে করে অলিমাসিমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগে থাকে। মোজাটা নিয়ে উঠে পড়েন, আলো নিভিয়ে, আস্তে আস্তে দরজার বাইরে চটিজোড়া খুলে রেখে, পাশের ঘরে যান। সেখানকার আলো জ্বেলে দরজাটি বন্ধ করে দেন।

অমনি সমস্ত ঘরখানি যেন দু'হাত বাড়িয়ে অলিমাসিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এ-ঘরের মেঝেও ও-ঘরের মতোই পুরোনো মার্বেল পাথরের তৈরী, সাদা কালো বড় বড় ছক কাটা, কিন্তু একে কে যেন যত্ন করে পালিশ করে রেখেছে।

এখানকার চওড়া তাকের ওপর নেপুর বাবার ডিক্যান্টার থাকত, খাওয়া-দাওয়া হলে তার মধ্যে থেকে বিলিতী মদ ঢালা হত। নীল নক্সা-কাটা কি সুন্দর সব

কাঁচের বাসন ছিল। সব নেপু ওপরে নিয়ে গেছে। আটটার সময় খাওয়া সেরে নেপু আর জামাই সেই যে দোতলায় ওঠে, আর নামে না। টেলিফোনটা খুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; কেউ এলে দেখা করে না। সিঁড়ির মাঝখানকার ভারি লোহার দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।

নেপুর বড় চোরের ভয়।

নিচেটা তখন অলিমাসিমার রাজ্য হয়ে যায়। তবে কেয়া থাকে। কিন্তু কেয়া না থাকলে একটু ভয়-ভয় করত হয়তো।

পাতলা, লম্বা, গোলাপী রেশমী মোজাটি যেন মাকড়সার জাল দিয়ে বোনা। নরম, মোলায়েম, শীতল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টানলে মনে হয় বুঝি জলের স্রোত হাতের মধ্যে দিয়ে গলে পড়ছে।

চৌত্রিশ বছর আগে নেপুর মা এ মোজাটা দিয়েছিল।

ধর্ অলি, এর মধ্যে টাকাটা সিকেটা জমিয়ে রাখিস। বিলেতে আমাদের ল্যাণ্ডলেডি রাখত।

এইরকম মোজা পায়ে দিত নেপুর মা, আর গোলাপী, সোনালী, রুপোলী, ছাই রঙের, সার্টিনের গোড়ালি-তোলা জুতো। চকোলেটের বাক্সের ঢাকনির বিবিদের মতো দেখতে। রোজ পার্টিতে যেত নেপুর বাবার সঙ্গে।

গাড়ি-বারান্দার নিচে সাড়ে সাতটা থেকে আগে জুড়ি-গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর মোটর কেনা হয়েছিল।

কি নামডাক ছিল নেপুর বাবার! সারা ভারতবর্ষ ঢুঁড়ে অমন আরেকটি ব্যারিস্টার পাওয়া দায় ছিল। বিলেত থেকে, বর্মা থেকে ডাক পড়ত। কি দামী-দামী সব উপহার নিয়ে ফিরত, দেখে সবার চোখ টাটাত।

দোতলার সামনের দিকের বড় ঘরটাতে নিচু আবলুস-কাঠের টেবিলে তিন ফুট একটা আগাগোড়া রুপোর তৈরী গোলাপদানি ছিল। সেবার যখন রুপোর দাম বাড়ল নেপু সেটা সের দরে বেচে দিল। অবিশ্যি কি-ই বা হত রেখে? কেউ আসেও না আর এ-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে। তাছাড়া ওসব ঘরে আজ দশ বছর ধরে নেপু ভাড়াটে বসিয়েছে। বড় বড় কামরাগুলোকে পার্টিশান দিয়ে খোপ-খোপ বানিয়েছে। বড় উঠোনের জল নিয়ে তারা কি খেঁচাখেঁচিটা করে রোজ, সে না-শুনলে বিশ্বাস হয় না।

ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা আলো নিভিয়ে দেন। অমনি পুবের ছোট জানলা দিয়ে রাশি রাশি চাঁদের আলো ঢুকে ঘর ভরে দেয়। একটু সোঁদা গন্ধ নাকে আসে, জানলার নিচের কাঠের তক্তাটার ওপর ব্যাঙের ছাতার মেলা বসেছে। ছোট ছোট, গোল, লম্বা, চ্যাপটা; ফিকে সব রং; হলদে, ছাই, গোলাপী, পাটকিলে। কি রূপ তাদের! অলিমাসিমা একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

হাতের মোজাটা যেন পাঁচ মণ ভারি হয়ে ওঠে। বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো সাদা, সরু বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অলিমাসিমা সেখানে পা ঝুলিয়ে বসেন, কোলের ওপর লম্বা গোলাপী রেশমী মোজাখানি পড়ে থাকে। পায়ের পাতাটা ঠাসা অলিমাসিমার সারা জীবনের সঞ্চয়।

পা টনটন করে। ধীরে ধীরে পা দুখানি তুলে খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে অলিমাসিমা বসে থাকেন। মনে মনে আপনা থেকেই হিসেব কষা হতে থাকে। পুরোনো হিসেব, অলিমাসিমার মুখস্থ হিসেব, তবু রোজ একবার না আওড়ালেই নয়।

মাসে দশ টাকা হলে বছরে একশ কুড়ি টাকা। দশ বছরে বারো শ। কুড়ি বছরে চব্বিশ শ। চল্লিশ বছরে আটচল্লিশ শ। অলিমাসিমার চল্লিশ বছরের রোজগার। প্রথম দু বছর অলিমাসিমাকে হাতখরচ দেবার কথা কারো মনে হয়নি।

কিন্তু মোজায় আছে সাত হাজার টাকা। সত্তরটা পরিষ্কার এক শ টাকার নোট, ছোট করে আলাদা আলাদা ভাঁজ করা। একটাও পুরোনো নয়, বারে বারে পোদ্দারের দোকান থেকে পালটিয়ে আনা। শেষটা কোনদিন না বলে বসে আজ থেকে বিলেতী আমলের নোট চলবে না।

কিন্তু সাত হাজারে তো হবে না। অবিশ্যি মাদুলির মধ্যে দিদিমার গজমতিটা আছে। তামার বড় একটা মাদুলি, কালো মোটা সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো। তার মধ্যে একটুকরো চাঁদের আলোর মতো গজমতি। শুক্তির ভেতরে যখন ছিল, তার চাইতেও অনেক বেশী নিরাপদ। ছোটবেলায় মার মুখে শোনা, ওর দাম কমপক্ষে তিন হাজার টাকা।

হল গিয়ে দশ হাজার।

অলিমাসিমার পিঠটা আপনা থেকেই সোজা হয়ে যায়। আর দুটি হাজার হলেই বর্ধমানের ফালি জমিতে অলিমাসিমার নিজের বাড়ি উঠবে। আমগাছের তলা বাঁধিয়ে পাতাবাহার বসানো হবে।

বটফলের দাদা করে দেবেন। নীল কাগজে নক্সা-টক্সা আঁকানো হয়ে গেছে, তার জন্যই পঁচিশ টাকা লেগে গেছে। বটফলের দাদা ভারি সাধু লোক, কেদার-বদ্রী ঘুরে এসেছেন। আর বটফল তো অলিমাসিমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে।

ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে? আর বটফলের ভালোবাসার মতো ভালোবাসা কোথায় পাওয়া যাবে? ছেলেমেয়েই বল, বাপ মা ভাই বোন কিম্বা স্বামীই বল, সকলের ভালোবাসার পেছনে একটা বাধ্যবাধকতা থাকে, না বাসলে লোকে নিন্দে করে। কিন্তু বটফলের ভালোবাসা গঙ্গাজলের মতো বয়ে চলেছে।

অলিমাসিমা উইল করে রাখবেন। বাড়িটা জমিটা যেন বটফল পায়। দাদা নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে। ওর বাড়ির লাগোয়া ঐ পোড়ো জমিটুকু কারো কোনো কাজে লাগছিল না। দিদিমা মরবার আগে ওটি অলিমাসিমাকে দিয়ে গেছেন শুনে দাদা রেগে চতুর্ভুজ। বলে কিনা,

কি দরকারটা ছিল? এ যেন পাঁচজনকে বলে বেড়ানো যে আমার বিধবা ছোট বোনকে আমি একমুঠো খেতে দিতেও পারব না। অমন বোনের মুখ দেখি তো আমার—

যা-তা বলতে লাগল দাদা, ওর কথার কোনো কালেই কোনো ছিরি ছিল না।

মা বাবা অনেকদিনই গত হয়েছিলেন, শেষটা অলিমাসি আর টিকতে না পেরে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠাকুরমশাইয়ের নিজেরই দিন চলে না। নেপুর বাবা ঠিক সেই সময় বর্ধমান এলেন, ঠাকুরমশাইকে কি যেন বাৎসরিক দিতে হয়, তাই নিয়ে। দারুণ সাহেব মানুষ, মেজাজটিও দিল-দরিয়া। যেই

শুনলেন অলিমাসিমা গ্রাম সম্পর্কে নেপুর মার বোন হন, অমনি তাঁকে ডানার তলায় আশ্রয় দিলেন।

অলিমাসিমার বয়স তখন পনেরো বছর। সেও আজ বেয়াল্লিশ বছর হয়ে গেছে। মনে করতেও কেমন লাগে।

গির্জের ঘড়িতে একটা বাজল। আর রাত করাটা ঠিক নয়, কাল সকালে ছ'টার মধ্যে নেপুর আর জামাইয়ের চা-টোস্ট দিতে হবে।

কিন্তু মোজাটাকে তাহলে কোথায় রাখা যায়?

আজ আর ভাবা যায় না। মোজাটাকে বালিশের ওয়াড়ের ভেতর পুরে, বালিশটা মাথায় দিয়ে অলিমাসিমা শুয়ে পড়লেন।

যেই শুলেন, অমনি কানে আবার ঝাঁপতাল বেজে উঠল। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কানের মধ্যেই বাজে, না বাইরে কোথাও বাজে অলিমাসিমা ঠাওর করতে পারেন না। ঝাঁপতাল কাকে বলে তাও জানেন না অলিমাসিমা, ভাবেন লুকিয়ে বাজে, গোপনে বাজে, এই তাহলে ঝাঁপতাল।

। ২ ।

পরদিন রাত্রে কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটার সময় নেপু আর জামাই রোজকার মতো এসে খেতে বসে। ঘরের মাঝখানকার তেপায়া বিশাল শ্বেতপাথরের টেবিলে অলিমাসিমা ওদের খাবার দেন।

অতি পুরোনো চীনেমাটির প্লেট ছ'খানির ধারে ধারে গায় সবুজ রঙের বাড়িঘর গাছপালা আঁকা। নেপুর কোনো ধারণা নেই এগুলির কতো দাম। এর বড় ডোঙাটা অনেকদিন আলমারির নিচে পড়ে ছিল, তার ঢাকনিটা তাক গুছোতে গিয়ে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। বটফল নিয়ে গিয়ে কোথায় কোন চীনের দোকানে পঁচিশ টাকা দিয়ে বিক্রি করে, আঁচলে বেঁধে টাকাগুলি অলিমাসিমাকে এনে দিয়েছিল। নেপু কিনা বলেছিল ঐ ডোঙা কুকুরদের সুরুয়া ঢালবার জন্য রাখতে!

খেতে বসেই নেপু বললে,

বড় গোরু কি তাহলে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিল, অলিমাসি? গয়লাকে একবার ডাকো তো।

গয়লা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ায়।

বন্ধ করেনি, মা, মোটে পাঁচ সের করে দিচ্ছে। ছোট গোরু দিচ্ছে সাড়ে তিন সের। ঘাসবিচুলি কিনে, আপনাদের দুধটুকু জুগিয়ে আর কিছুই থাকছে না।

জামাই মুখ তুলে নরম সুরে বলে, জজসাহেবের বাড়িতে আর দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে?

নেপু তীক্ষ্ণ গলায় বলে,

বেচে দাও ও গোরু। আগে তো দশ সের দিত। বরাবর দিত।

বাচ্চা বড় হয়ে যাচ্ছে, মা। তারপর তো একেবারে বন্ধই হয়ে যাবে। আবার নতুন বাছুর হলে পর—

জামাই বলে,

জজসাহেব খুশি থাকলে আমাদেরই সুবিধে, বুঝলে মঙ্গল? ঐ রোজ আড়াই সের দুধের জন্য, মাসে আমার কত আড়াই শ টাকা আসে। দেখো একটু দুধ বাড়াবার কি করতে পার।

নেপু বলে,

অলিমাসি, রোজ যে মাংস রাঁধছ, ফকরুল কত করে নেয়?

এক পো রাগি, এগারো আনা করে দিই। কিছুই খাও না, শরীর টিকবে কেন। জামাইকে খাটতে হয় কোর্টে।

নেপু তবু বলে, তাই বলে রোজ এগারো আনা! বেশী নিচ্ছে, অলিমাসি, ঘিও তুমি বেশী দিচ্ছ। স্টু-এর মতো রেঁধো, আমাদের বয়স হচ্ছে, হাল্কা খাওয়াই ভালো। আবার কলা কেন?

অলিমাসি বলেন, মার্কেটে মাংস তিনটাকা সের। আর কাঁদি থেকে ঐ এক ছড়াই তোমাদের জন্য কেটে রেখেছি, বাকিটা নকুড়বাবু নিয়ে গেছেন, কাল ভোরে বাজারে পাঠাবেন। কলা পুষ্টিকর, নেপু, খাও দুজনে দুটি। গাছের কলা, তোমার মা পুঁতেছিল প্রথম।

এমনিধারা রোজ হয়। মনে মনে নেপু আর জামাই যত্নটুকু পেয়ে খুশিই হয় বোধ করি। আর দুধ থেকে, কলা থেকে অলিমাসিমার আর গয়লারও কিছু কিছু ঘরে আসে। এই তো মোট সংসারটি। নেপু আর জামাই, অলিমাসিমা আর গয়লা। আর কেয়া। আগে সারি সারি গুদোমঘর

লোকজনে গমগম করত। বাবুর্চি, বেয়ারা, বামুনঠাকুর, কোচম্যান, সইস, সোফার, মেথর, গয়লা, ধোপা। যেন গোটা একটা শহর। দুটো মালী ছিল, সামনে ফুলের বাগান, পেছনে সব্জি-বাগান। সামনের জমিটা তো নেপু বেচেই দিয়েছে, এখন আর বড় ফটক দিয়ে ঢোকাই যায় না, সেখানে বিরাট বাড়ি হয়েছে অন্য লোকের। পাশ দিয়ে লম্বা গলি পার হয়ে ভেতরে আসতে হয়।

অবিশ্যি খাবার ঘরের পেছনেই ছোট উঠোন, কল, চৌবাচ্চা, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, গয়লার ঘর। উঠোনের উঁচু পাঁচিলে মজবুত খিড়কি দরজা। খিড়কি খুললেই অন্ধ গলি, অন্ধ গলির মুখে বটফলের বাড়ি। এ দিকের সবটা পাঁচিল ঘিরে আলাদা করা। বাকি গুদোমঘরে যত সব ভাড়াটে, রাশি রাশি ভাড়া গুণে দেয় তারা। শুধু ধোপারা ভাড়া দেয় না, তারা এ বাড়ির যাবতীয় কাপড় কেচে দেয়। নেপু কখনো কাপড়-কাচার সাবান কেনে না।

জামাই মার্কিনের ফতুয়া আর মোটা রঙিন লুঙ্গি পরেছে। নেপুর পরনে রং-জ্বলে-যাওয়া মান্ধাতার আমলের মাদ্রাজি শাড়ি, হয়তো বা নেপুর দিদিমার কেনা। এককালে বেগনি ছিল, এখন সেটা বোঝা যায় না। তবে নেপুরও তো বেগনি পরার বয়স গেছে।

নেপুকে কখনো কাপড় কিনতে হয় না। দোতলার বাক্সের ঘরে সারি সারি লোহার সিন্দুক ভরা চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছরের পুরোনো সব রেশমী শাড়ি, গয়না, বাসনপত্র। সেইসব পরে নেপুও মাঝে মাঝে জামাইয়ের সঙ্গে পার্টিতে যায়। পুরোনো বনেদী জিনিস দেখে সবাই খুব তারিফ করে। গাড়ি-বারান্দার নিচে পুরোনো মোটরগাড়িটা থাকে; জামাই নিজে চালায়; ফকরুলের ছেলে ধোয়া-মোছা করে, জল ভরে দেয়; তার জন্য ওদের গুদোম-ভাড়া কম করে দেওয়া হয়েছে।

নেপুরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

ও অলিমাসি, কি ভাবছ কি? শুনছ, কাল আর মাংস নিও না, মিস্টার সিনহার বাড়ি ডিনার। ওঁর ছেলেও ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এল যে। ও! একটা মজার কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। শুনলাম বিলেতে ও নাকি আমাদের কেয়ার স্বামীর বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হয়েছিল। —আচ্ছা, কেয়া থাকে কোথায়, কদ্দিন দেখিনি যেন?

অলিমাসিমা এতক্ষণে মুখ খোলবার সুযোগ পেলেন।

কি জানি, বাছা, ওদের কিছু বুঝি না। আপিশ-ছুটি সাড়ে পাঁচটায়। ফিরতে হয় তার কোনোদিন দশটা, কোনোদিন আরো দেরী।

নেপুর গায়ের রং ধবধবে ফর্সা, ভুরুর লেশমাত্র চোখে পড়ে না, যেন কখনো ভুল করে ধোপার বাড়ি গিয়ে ভাঁটি সেদ্ধ হয়ে এসেছে। চোখের পক্ষ্মগুলো অবধি ফিকে সোনালী, চোখে দেখা যায় না। অলিমাসিমা দেখলেন ওর গণ্ডদেশে ক্ষীণ একটু রক্তিমাভা দেখা দিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, করে কি এত রাত পর্যন্ত? ওকে বলে দিও, এ বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। খায় কখন? খাইখরচ দিচ্ছে আজকাল? মাইনে পান তো এক শ ত্রিশ টাকা। দেয় কিছু?

সত্যিকথাটা বলতে হয়। নেপু আরো রেগে যায়।

ওসব চাল দেখাতে মানা করে দাও। নয়তো অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুক গে। গরীবের ঘোড়ারোগ দেখছি।

অলিমাসিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিছু বললেই ও মেয়ে তৎক্ষণাৎ বাক্স গুছিয়ে চলে যাবে। একতলায় অলিমাসিমা একা থাকেন কি করে? কথাটা নেপুর কানে না তুললেই হত। বলেন,

না, নেপু, কেয়া মন্দ মেয়ে নয়, ওদের আপিসে কি সব কেরানীদের মিটিং-ফিটিং হয়, ও তার এক পাণ্ডা, তাই দেরী হয়। কেউ না কেউ পৌঁছে দিয়ে যায়।

নেপু বলে,

কেরানীদের মিটিং? কমিউনিস্ট ব্যাপার নয় তো? শেষে এ বাড়িতে পুলিশ এনে ঢোকাবে না তো? ওনার অর্ধেক কাজ হল সরকারি, শেষটা—

জামাই বাধা দিয়ে বলে, না, না, সেরকম কোনো ভয় নেই। আজকাল আইন অনেক পাল্টে গেছে, নেপু।

নেপু তবু বিরক্তভাবে বলে,

এইসব দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের জ্বালায় বাড়িতে দেখছি টেকা দায় হয়ে উঠল। নেপু কুকুরগুলোকে ডেকে নিয়ে, মাঝের ঘর থেকে টেলিফোনটা খুলে নিয়ে, ওপরে চলে যায়। সিঁড়ির মাঝেকার লোহার দরজাতে তালা পড়ার শব্দ কানে আসে।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনই বটে। কেয়ার বাবা নেপুর মার আপন মামাতো ভাই। মনে পড়ে বেয়াল্লিশ বছর আগে নেপুর বাবা পনেরো বছর বয়সের অলিমাসিমাকে নিয়ে এই ঘরেই ঢুকেছিলেন।

নেপুর মা লাট-মেমের মহিলাদের চা-পার্টি থেকে ফিরে, এইখানে বসে ছিলেন। তখন সব মখমলের গদী দেওয়া, পেছনে উঁচু ডানা লাগানো, ইটের মতো শক্ত, কালো কাঠের কারিকুরি করা দশটা বহুমূল্য চেয়ার দেয়ালের গায়ে সারি সারি ঠেস দেওয়া থাকত। খাবার সময় টেবিলের

কাছে তুলে আনা হত। এই টেবিলটাই ছিল। ঠিক এই জায়গাতেই ছিল। আর সব বদলে গেছে।

এখন যেখানে তক্তাপোশ ছুটি, সেখানে একটা প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারি ছিল, রুপোর বাসনে বোঝাই। রোজ সে-সব ব্যবহার হত। আর ওধারে বিশাল একটা সাইডবোর্ড ছিল, তার তাকে থাকে থাকে কাঁচের বাসন থাকত। আরেকটা ছোট কাঁচের আলমারিও ছিল, তার তাকগুলি অবধি কাঁচের। তাতে নানান আকারের ছোট বড় গেলাস থাকত।

নেপুর মার চেহারাটি মনে পড়ে। সুন্দরী বটে, তবে বড় বেশী ফর্সা, কেমন যেন বর্ণহীনা। অবাক হয়ে চেয়েছিলেন অলিমাসিমার দিকে। নেপুর বাবা পরিচয় দিলেন।

রোগা শামলা একটি মেয়ে, না জানে সাজগোজ করতে, না জানে কথা কইতে। তেলচিটে চুলগুলো বেণী বেঁধে আঁটো করে খোঁপা করা। সাদামাটা, নিরাপদ। তবু নেপুর মা চুপ করে থাকেন। নেপুর বাবা বলেন,

তোমার এমনি একটি মেয়েরই দরকার ছিল, সোমা। কাছে কাছে থাকবে, কাপড়-জামার যত্ন করবে, সেলাই-টেলাই করে দেবে, দেখাশুনো করবে।

নেপুর মা বললেন, চুল বাঁধতে জানো?

অলিমাসিমা তো অবাক। চুল বাঁধতে কে না জানে?

হাল-ফ্যাশানের খোঁপা করতে পারবে?

অলিমাসিমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। তবে কি এই সুন্দর বাড়িতে থাকা হবে না? আর কি ঐ সুন্দর মানুষটিকে দেখতে পাবে না?

সুন্দর মানুষটি হেসে বললেন,

থাকত বর্ধমানে, ফ্যাশানের ও কি জানবে, সোমা? কিন্তু সেজন্য ভেবো না। আমি বলে দেব, মিস গার্স্টিন নিজে এসে ওকে শিখিয়ে দিয়ে যাবে।

কর্কশকণ্ঠে সোমা বললে,

কিচ্ছু দরকার নেই। মিস গার্স্টিন এ বাড়িতে ঢুকলে আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব। আমিই ওকে শিখিয়ে নিতে পারব।

উত্তেজনায় নেপুর মার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তাঁর রূপ খুলে গেল।

নেপুর বাবা হেসে বললেন, তা হোলে তো আর কোনো ভাবনাই নেই।

নেপুর মা অলিমাসিমাকে কাছে ডাকলেন।

কি নাম তোমার? আমাদের গ্রামের হরিশকাকার মেয়ে তুমি? হরিশকাকা আছেন কেমন?

সব কথা বলা যায় না। অলিমাসিমা থেমে থেমে খানিকটা খানিকটা উত্তর দিলেন।

আহা, মুখ তুলে বল। তোমার নাম অলকানন্দা? বড্ড বড় নাম, তোমায় ডাকব অলি বলে, কেমন?

সেই অবধি অলিমাসিমা এ বাড়িতে থেকে গেলেন। শুধু থেকে গেলেন না, এ বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেলেন যে এখানকার দরজা-জানলার মতো বাড়িটার একটা অঙ্গই হয়ে গেলেন।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন বটে।

অলিমাসিমাকে নইলে নেপুর মার এক দণ্ড চলত না। দিনরাত অলি, অলি, অলি। এক মুহূর্ত বিশ্রাম ছিল না। অলিমাসিমা একেবারে নিষ্প্রয়োজনের অনাদর থেকে অতি-প্রয়োজনের সিংহাসনে চড়ে বসেছিলেন।

অলি, আমার ফুলকাটা গায়ের কাপড়টা দে। অলি, দেখ, এই লেসের এখানটায় একটু ছুঁচ চালিয়ে দিতে পারিস কিনা। অলি, আমার চন্দনকাঠের হাতপাখা পাচ্ছি না। অলি, স্নানের জলে গোলাপগন্ধ দিয়ে দে। অলি, চুল শুকিয়ে দে। অলি, এলো খোঁপা বেঁধে দে। অলি, আমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে চল। অলি, অলি, অলি, অলি।

কুড়ি বছর বাদে ঐ অলির কোলেই মাথা রেখে স্বর্গে গেলেন।

অলি, চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন। অলি, একটু আলো করে দে। অলি, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে কেন। আলো দে, অলি। অলি!

ঐ একটিবারই শুধু অলিমাসিমা নেপুর মার কথা রাখতে পারেননি। এই পঁচিশ বছরে ঐ প্রথম দুজনায় ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

তারপর সব চুকেবুকে গেলে, সাদা গোলাপ আর রজনীগন্ধার স্তূপগুলিকে গুছিয়ে রেখে, অলিমাসিমা ওপরে নেপুর মার শোবার ঘরে গেছিলেন। নেপু তখন মার খাটে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে ছিল। এই মিসেস সিনহার শাশুড়ি, বুড়ি মিসেস সিনহা, পাশে শুয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

পাশে ছোট কাপড় ছাড়বার ঘরখানিতে অলিমাসির ছোট খাটখানি পাতা ছিল। ঘরময় কাপড়চোপড় ছড়ানো, দেরাজ খোলা, আলমারিতে চাবি দেওয়া নেই। যত্ন করে প্রত্যেকটি জিনিস নিজের জায়গায় তুলে রেখে, ধোপার কাপড়ের ফর্দ করে গাঁটরি বেঁধে, চাবিগাছি অলিমাসিমা নেপুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। আলমারির দেরাজে হাজার হাজার টাকার গয়না এমনি পড়ে থাকত, তার একটিও খোয়া যায়নি। শুধু একান্ত নিজের প্রাপ্যটুকু ছাড়া, সব কিছু অলিমাসিমা পরিপাটি করে উঠিয়ে ফেলেছিলেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাড়িখানি নিকট আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে। বাইরে কিছু ফেলে রাখাটা ঠিক নয়।

বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ হচ্ছিল। তার ওপর সোনার হারগাছি করকর করছিল। এটি অলিমাসিমার একান্ত নিজস্ব জিনিস। কতবার নেপুর মা বলেছিলেন, ওটি তোর এত ভালো লাগে, অলি? আমি ম'লে ওটি তোকেই দিয়ে যাব, যাঃ! বার বার হেসে হেসে কথাগুলি বলতেন। না হয় হাতে করে তুলে দিয়েই যাননি। তার সময়ই বা পেলেন কোথায়? সকালে মাথা ঘুরে পড়লেন, দুপুরের মধ্যেই হয়ে গেল। মালাগাছি অলিমাসিমার নয়তো কার?

ও মালার কোনোদিনও খোঁজ হয়নি। বহু বছর বাদে, সাড়ে তিন শ টাকা দিয়ে বটফল বেচে দিয়েছিল। মোজার ভেতর সে-টাকাটাও আছে।

তোমার মার মালা, অলিমাসি? বেচতে মায়া করছে না? মায়া? অলিমাসি পরের ঘরে চল্লিশ বছর বাস করেছেন। তাঁর আবার মায়া কি?

হ্যাঁ, তবে একটু মায়া আছে বইকি। দাদার বাড়ির লাগোয়া ঐ একফালি জমি, তার একধারে একটি আম গাছ। এতো দিনে সেই কলমের গাছটি নিশ্চয় দোতলার সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। হিমসাগর আম। কালো মেঘের মতো ফল ধরে নিশ্চয়। দাদারা পেট ভরে খায়; তা খাক গে। দোরের কাছে অমন আম পেলে কে-ই বা ছেড়ে দেয়?

বেয়াল্লিশ বছর অলিমাসিমা ও-জমি চোখে দেখেননি, তবু যেন চোখের সামনে ভাসে। দাদার জমি থেকে এক সারি ফণিমনসা দিয়ে আলাদা করা। দাদার বাড়ির পেছন দিকে চার কাঠা মাত্র জমি। দাদার কোনো কাজে লাগে না। অথচ তাই নিয়ে দাদা, কি কাণ্ডটাই না করেছিল। ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী অবিশ্যি বলেছিলেন, সবই বৌয়ের মন্ত্রণায় করেছিল, কিন্তু অলিমাসিমা তো দাদাকে ভালো করেই চেনেন। চিরটা কাল ওর ঐ এক ভাবেই গেল। এখন কেমন আছে কে জানে? যদ্দিন ঠাকুরমশাই বেঁচে ছিলেন, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে খবর দিতেন। তিনিও মারা গেছেন আজ কুড়ি বছরের বেশী। দাদাই বা বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

অলিমাসিমা আঙুলে সময় গোনেন। দাদা হল গিয়ে দশ বছরের বড়। অলিমাসিমারই হল গিয়ে সাতান্ন বছর। দাদার তা হলে সাতষট্টি। সাতষট্টি কি আর এমন বয়স? দাদার ছেলেটার তখন দু'বছর বয়স ছিল, সেই তবে এখন চুয়াল্লিশ বছরের।

ভারি আশ্চর্য লাগে অলিমাসিমার। সেই ছোট্ট ছেলেটা—কি যেন বলে ডাকত মনে পড়ছে না—ওটারই এত বয়স! কে জানে, তার চুলেও হয়তো পাক ধরে গেছে।

দেয়ালে ঝোলানো দাগ-ধরা বড় আয়নাটার দিকে অলিমাসিমা চেয়ে দেখেন। সাদা কাপড় পরা আরেকটা অলিমাসিমা তাঁর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অলিমাসিমা অবাক হয়ে তাকে দেখেন। কেমন যেন অচেনা অচেনা মনে হয়। মোটাসোটা, বেঁটে, শামলা রং, কানের পাশের চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে, থুতনির তলাকার মাংসটা কি রকম ঢিলে দেখায়। অলিমাসিমার ভারি আশ্চর্য লাগে।

হাসিও পায়। জমির কিন্তু অদলবদল হয় না সহজে। যদি না তার ওপর ছোট একখানি বাড়ি তোলা যায়। দুপাশে দুটি শোবার ঘর, স্নানের ঘর, মাঝখানে ছোট

হলঘরখানি, পেছনে রান্নাঘর, তার পাশে আরেকটা খুপরি ঘর, সামনে বারান্দা। বটফলের দাদার নক্সাতে সব আঁকা আছে। আমগাছটি পড়বে বারান্দার সুমুখে। তার গোড়া ঘিরে পাতাবাহারের গাছ বসানো থাকবে। অলিমাসিমা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে বসে দেখবেন। এদিক থেকে দাদার বাড়ি দেখা যাবে না, পেছন দিক দিয়ে যাওয়া আসা হবে। ও ঘরটা, স্নানের ঘরটা, রান্নাঘরটা ভাড়া দিয়ে, অলিমাসিমা নিজের খরচটা চালাবেন। খুপরি ঘরে তোলা উনুনে রাঁধাবাড়া করবেন। কোনো কষ্ট হবে না, তোলা উনুনে অলিমাসিমা আজ পনেরো বছর রেঁধে আসছেন।

রান্নাঘরের বড় চুল্লীতে আঁচ দেওয়া হয় না। বড় কয়লা পোড়ে। তোলা উনুনে কাঠকয়লাতে অলিমাসিমা তিনটি প্রাণীর রাঁধাবাড়া করেন। ঝাড়াঝাপটা খাওয়া, একটা তরকারি, একটা মাছ, আতপচালের ভাত। নেপু ডাল বন্ধ করে দিয়েছে, চার আনা সেরের ডাল তেরো আনা হয়েছে। রাতে মাংস, হাত-রুটি, বেগুন-ভর্তা, ঘন দুধ, এই রকম। খাবার ঘরের কোনায় ইলেকট্রিক হিটার আছে, তাতেও কিছু কিছু হয়। কে এক মক্কেল ওটা দিয়েছিল, সস্তা করে লাইন বসিয়ে দিয়েছিল। অলি-মাসিমারই সুবিধে। নেপু তো আজকাল আর এদিকে ঐ খাবার সময়টুকু ছাড়া আসেও না। কুকুরদের জন্য হাড়, ছাঁট ফকরুল এমনি দেয়; সেও হলুদ দিয়ে হিটারে সেদ্ধ হয়।

সারাক্ষণ নেপু ওদের লেডিজ কমিটির অনাথাশ্রমের জন্য বোনে। ওরা জামা পিছু এক টাকা করে দেয় আর পশমের দাম দেয়, বলে পাড়ার মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নিতে। তবে নেপু নিজেই অনেকগুলি বুনে ফেলে, পয়সাটা কিছু ফেলে দেবার জিনিস নয়। আর অলিমাসিমা কিছু বুনে দেন, টাকাটা তাঁরো কাজে আসে। বটফলকে দিয়েও দু-চারটে বুনিয়ে নেন, সে আর ওঁর কাছ থেকে পয়সা নেবে না, বরং কিছু করে দিতে পারলেই কৃতার্থ হয়। টাকার কথা বলে অলিমাসিমা ওকে কখনো অপমান করেননি। কে বুনল নেপু জিগেসও করে না, জামা পিছু এক টাকা ধরে দেয়, পশমের হিসেব বুঝে নেয়। নইলে লেডিজ কমিটির কাছে লজ্জায় পড়তে হবে। নেপুর স্বভাবটি ভারি সৎ। মানুষ মন্দ নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, নিজের পয়সা সে নিজে খরচ করল কি তুলে রাখল, কার তাতে কি এসে যায়? কারো কাছে তো আর চেয়ে আনেনি।

দরজা খুলে কেয়া আসে। মুখখানি কেমন ম্লান দেখায়। অলিমাসিমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হেসে বলে,

এই দেখ, কেমন আমার স্বভাব শুধরে গেছে, রাত সাড়ে ন'টা না বাজতেই, বাড়ি এসে হাজির হয়েছি। বড় বড় হিঙের কচুরী আর আলুর দম এনেছি, মাসি, খাও আমার সঙ্গে।

শালপাতার ঠোঙা সুদ্ধ অলিমাসির হাতে তুলে দেয়, চোখের দিকে চেয়ে হাসে। অলিমাসিমা আর নেপুর কথাগুলি ওর কানে তোলেন না। যা মেয়ে, এখুনি হয়তো বাক্স গুছিয়ে অন্ধকার রাতেই বেরিয়ে যাবে। তখন অতগুলো টাকা নিয়ে অলিমাসিমা একতলায় একা থাকবেন কি করে?

। ৩ ।

লম্বা রেশমী মোজাটাকে হাতে ধরে থাকতে ভারি ভালো লাগে। রোজ নতুন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হয়। এ এক ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছে। কোথায় পাবেন অলিমাসিমা নিত্যি নিত্যি নতুন জায়গা? ফিরে ফিরে আবার পুরোনো জায়গাতেই রাখতে হয়। পোস্টাপিশে জমা দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়। কিম্বা ব্যাঙ্কে। ও বাবা, ব্যাঙ্ক যদি ফেল করে। নেপুর মা'র বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পাঁচ হাজার টাকা ঐভাবে জলে গেছিল। নেপুর মা হেসে হেসে সে কথা অলিমাসিমাকে জানিয়েছিল। তবে পোস্টাপিশ তো আর উঠে যাবে না। কিন্তু জানাজানি হবে। কেউ হয়তো জিগেস করে বসবে কোথায় পেল অলিমাসিমা অতগুলো টাকা। চল্লিশ বছরে আটচল্লিশ শ যার রোজগার, সে জমায় কি করে সাত হাজার? কাপড়টা, গামছাটাও তো নেপুর মা গিয়ে অবধি নিজেকে কিনতে হয়েছে; তা হলে টাকাটা না কমে বেড়ে গেল কি করে?

অলিমাসিমার মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। এমনি এমনি বাড়েনি। প্রাণপাত করে বাড়িয়েছেন, এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা করে বাড়িয়েছেন। শুধু একবার হাতে হাতে একেবারে এক শ টাকা পেয়ে গেছিলেন লটারি জিতে। সেও বটফল টিকিট কিনে দিয়েছিল। জোর করে অলিমাসিমার জন্মদিন উপলক্ষে একটাকার টিকিট-খানি কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা সবাই কিনেছিল, যে যেমন করে পারে পয়সা জোগাড় করে। কিন্তু টাকাটা উঠল অলিমাসিমার কপালে। বটফল সত্যি খুশি হয়েছিল। অবিশ্যি ওর কাছেও অলিমাসিমা কোনোরকম ভাবে ঋণী থাকতে চাননি, তাই টিকিটের দাম একটা টাকা জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বটফল

বোধ হয় একটু দুঃখিতই হয়েছিল। তাই দিয়ে সন্দেশ কিনে সবাইকে খাইয়েছিল। তখনকার দিনে এক আনায় বেশ বড় একটা চিনি-সন্দেশ পাওয়া যেত। এই নিয়ে বিজুর মাসি-টাসিরা নাকি নানান মন্তব্য করেছিল আড়ালে গিয়ে। তবে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারো ভালোটা তো লোকে সইতে পারে না।

মাদুলিটার মধ্যে থেকে গজমতিটা বের করা ভারি শক্ত। গালা দিয়ে মুখটা এঁটে নিয়েছেন অলিমাসিমা। মাঝে মাঝেই সুতোটা বদলাতে হয়, কি জানি কোনোদিন যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। মাদুলি খুলে ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন গালাটা আল্গা হয়ে এসেছে, মুখটা ঢিলঢিল করছে। ভাগ্যিস মনে হল, নইলে আরেকটু হলেই তো সর্বনাশ হয়ে যেত। রাঁধতে গিয়ে তো আগুনেই পড়ে যেতে পারত। এক নিমেষে তিন হাজার টাকা দামের গজমতি পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

আস্তে আস্তে মাদুলি খুলে মুক্তোটা হাতের চেটোয় ঢাললেন অলিমাসিমা। এটা মা'র ছিল। মা'র মুখটা ভালো মনে পড়ে না, বড়ই অকালে গেছিলেন। শুধু এইটুকু মনে পড়ে মা-ই মাদুলিতে ভরা গজমতিটা অলিমাসিমাকে দিয়েছিলেন। কাউকে কিছু বলতে মানা করেছিলেন। বাবার হাতে পড়লেই তো মদ খেয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অলিমাসিমাকে আর পেতে হত না। আর দাদা? অলিমাসিমার হাসি পায়।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন হাতের চেটোয় গজমতিটার দিকে। যেন একটুকরো চাঁদের আলো। তিন হাজার টাকা দিয়ে এটাকে যখন বেচে দিতে হবে, অলিমাসিমার দুটো পাঁজরা খসে যাবে। কিন্তু ঐ তিন হাজার না হলে তো বাড়িও হবে না।

ওকি মাসি!

দারুণ চমকে ওঠেন অলিমাসিমা। মুক্তোটা হাত থেকে পড়ে তক্তাপোশের তলায় গড়িয়ে যায়। অলিমাসিমার হাত-পা হিম হয়ে যায়, বুকের ধুকধুকিও বুঝি থেমে যায়।

কেয়া নিচু হয়ে তক্তাপোশের তলা থেকে মুক্তোটা বের করে। দু আঙুলে তুলে ধরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কেয়ার আঙুলগুলি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো, কেয়ার চোখের কোলে গভীর ক্লান্ত ছায়া। কেয়ার মুখে কথা সরে না।

অলিমাসিমাই কথা বলেন।

আমার মা'র ছিল, কেয়া। ঐ একটি জিনিসই রাখতে পেরেছিলেন, নইলে বাবা সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরদার জমিদারির কিছু রাখেননি। মা নিজের গয়নাগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন; খোসামুদি করে, ভয় দেখিয়েও যখন বাবা আদায় করতে পারতেন না, তখন আমাকে শূন্যে তুলে ধরে নাকি ঠাস ঠাস করে চড় মারতেন। আমার কিছু মনে নেই, কেয়া, ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রীর কাছে পরে শুনেছিলাম। আমার গায়ে নীল নীল দাগ পড়ে যেত, আর আমার মা'র চোখ দিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো জল পড়ত। গয়না না দিয়ে করেন কি! শুধু মাদুলিতে পোরা এই মুক্তোটার কথা বাবাও জানতেন না। এটা আমাদের বংশের লক্ষ্মীর মাদুলি। ঠাকুমা মাকে রাখতে দিয়েছিলেন, মা মরবার আগে আমাকে দিয়ে-ছিলেন। কাউকে কখনো বলিনি এর কথা।

কি জানি কেন অলিমাসিমার চোখের জল বাধা মানে না। কেয়া কাছে এসে বলে,

কই মাদুলী, মাসি, দাও আবার পুরে দিই।

কেয়ার হ্যাণ্ডব্যাগে গালা থাকে। মোমবাতির টুকরো থাকে। দেশলাই থাকে। কেয়াই মাদুলির মুখ বন্ধ করে, অলিমাসিমার হাতে দেয়। অলিমাসিমার হাত এত কাঁপে যে, কেয়াই মাদুলিটা গলায় গলিয়ে দেয়।

ওঠ মাসি, খিদে পেয়েছে, খাবার এনেছি, একটু গরম করে দাও।

কেয়া হাতমুখ ধুতে যায়। অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান। ঠুক করে মোজাটা কোল থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়। অলিমাসিমার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ভাগ্যিস কেয়ার চোখে পড়েনি। নাঃ, এখানে ওখানে না রেখে, নিজের ছোট ঘরখানির ওপরের তাকে, টিনের কৌটোয় ভরে রাখাই ভালো। ঐসব পেরেক আর তার আর আলপিনের কৌটোর মধ্যে কে খুঁজতে যাবে!

অলিমাসিমা নিজের ঘরে গিয়ে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, মোজাটা লুকিয়ে রাখেন। কেয়াকে অতগুলো কথা না বললেই হত। কি জানি কেয়ার হাতে মুক্তোটা দেখে মনের ভেতরটা হঠাৎ কেমন দুর্বল হয়ে গেছিল। তবে বাবা-মা'র কথাটা না বললেই হত। নেপুর মাকে পর্যন্ত কোনোদিন বলেননি। কি জানি। তবে কেয়া যে-রকম অহঙ্কারী মেয়ে, ও যে কাউকে বলবে না সেটা ঠিক।

কেয়া চীনে খাবার এনেছে। মোড়ের মাথার চীনে হোটেল থেকে। অলিমাসিমা বরাবর নিরামিষ খেয়ে

এসেছেন, কিন্তু এদানিং কিরকম হাত-পা ঝিমঝিম করে, বটফল বলে মাছ মাংস ডিম একটু একটু খান, নইলে কোন্‌দিন মাথা ঘুরে পড়বেন। ডিস্পেন্সারির ডাক্তারও সেই কথাই বলেছিল। বটফল আরো বলে, বালবিধবা আপনি, কোনোদিন স্বামীর ঘরই করলেন না, আপনি আবার বিধবা নাকি, আমরা আপনাকে কুমারী বলি।

বটফলরা খৃশ্চান। পাঁচপুরুষের খৃশ্চান, ভারি ভালো ওদের চালচলন। একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে প্রায় ভির্মি গেছিলেন অলিমাসিমা। বটফলের বৌদিদি, সে পাস-করা নার্স, সে-ই প্রথম বলেছিল ও কথা। তখন অলি-মাসিমার মাথাটা এমন ঝিমঝিম করছিল যে, ওরা কি বলছিল সবটা ঠিক ঠাওর হয়নি। এমনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তখন বটফল চামচে করে গরম গরম কিসের সুরুয়া খাইয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল শরীরে বুঝি প্রাণটা ফিরে এল। এই অলিমাসিমার প্রথম আমিষ খাওয়া। ছোটবেলাকার কথা অবিশ্যি আলাদা, সে স্বাদও মনে নেই।

তবু বাড়িতে নিরামিষই খেতেন, কেমন লজ্জা লজ্জা করত। নেপু কথাটা ঠিক বুঝবে না, এটা অলিমাসিমা জানতেন। তাছাড়া খরচ বাড়ানোর কথায় নেপু কখনই মত দেবে না। কি সব বাজে কথা ভাবছেন অলিমাসিমা, বটফলরা জোর করে খাওয়ায়, তাই। নইলে কবে আর উনি আমিষ খেয়েছেন? ওরাই মাঝে মাঝে এটা ওটা এনে খাইয়ে যায়। খুব গোপনে, কারণ হিন্দুদের গোঁড়ামির কথা ওদের অজানা নয়। এমন কি বটফলের বুড়ি মা ফোকলা মাড়ি বের করে বলেন, অত কি গা? তুই বরং খিশ্চান হয়ে যা। সবাই কেন যে খিশ্চান হয় না ভেবে পাইনে। কত সুবিধে।

বটফল ব্যস্ত হয়ে ওঠে। থাক, থাক মা, তোমাকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না।

এসব কথা অবিশ্যি কেয়ারও জানার নয়। কিন্তু বোধ হয় জানত। নইলে অত জোর করে চীনে খাবার খাওয়াবার সাহসটা পেল কোথায়? তবে কেয়ার সাহসের শেষ নেই।

উঠোনের কোনায় কলঘর থেকে অলিমাসিমা হাতে মুখে জল দিয়ে এলেন। দুজনায় চীনে খাবার খেলেন। খোলাখুলি খাবার ঘরে বসেই খাওয়া হল। রাতে কেউ আসে না এদিকটাতে। সব কাজ অলিমাসিমা একা করেন। শুধু শঙ্কর এসে দুবেলা ঘরদোর মুছে দিয়ে যায়। আগে অলিমাসিমা মেথরের ছেলেকে চৌকাঠ মাড়াতে দিতেন না। কিন্তু বছর দুই ধরে কি যে হয়েছে, নিচু হওয়া বড় কষ্ট। তবে নিজের ঘরখানিতে অলিমাসিমা ছাড়া কেউ যায় না। কেয়াও না। এমনি অহঙ্কারী মেয়ে যে যেতে চায়ও না।

খেতে বসে কেয়া বেশী কথা বলে না, কেমন যেন অন্যমনস্ক; অলিমাসিমা বেঁচে যান। তখন ও দুর্বলতাটুকু প্রকাশ না করলেই হত। মা তো কবে মরে গেছে। মুখটাও কেমন মনের মধ্যে আবছায়া হয়ে এসেছে। এত কথা বটফলও জানে না। কেয়াকে বলে ফেলে অলিমাসিমা লজ্জা বোধ করেন।

কিন্তু কেয়া শুধু তার আপিশের গল্পই করে। ছোট-সাহেব তাঁর পিওন দিয়ে বাড়ির কাজ করিয়ে নেন। পিওনরা কেয়াকে দিয়ে তাঁর নামে বড়সাহেবের কাছে লম্বা লম্বা চিঠি লেখায়। কেয়া সব কথা অবিশ্যি লেখে না, তা হলে আর ওদের কারো চাকরি থাকত না। ওদের গরম গরম কথার সঙ্গে কেয়া দুধ-চিনি মিশিয়ে দেয়। তাতে চিঠির কোনো ফল দেখা যায় না, কিন্তু চাকরিগুলো টিকে যায়। আপিশের গল্প শুনতে শুনতে মাঝখানে হঠাৎ অলিমাসিমা জিজ্ঞেস করে বসেন,

ঐ পিওনরা কত করে মাইনে পায়, কেয়া?

কেয়া যেন অবাক হয়। মাইনে? তা এদিক ওদিক নিয়ে আশী-টাশী হবে বোধ হয়। ওরাও ইউনিয়নের মেম্বার, মাসে মাসে সব আট-আনা চাঁদা দেয় ক্লাবে। বাবুদের চাঁদা বাকি পড়লেও, ওদের কখনও পড়ে না।

পিওনরাও আশী টাকা মাইনে পায়। আশীকে বারো দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

খাওয়া সারা হয়েছে অনেকক্ষণ, অলিমাসিমাকে চিন্তিত দেখে কেয়াই উঠে, ঘরের কোণে হাত ধোয়ার বেসিনে বাসনগুলি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে। ঝাড়ন দিয়ে মুছে তাকে তুলে রাখে।

অলিমাসিমার কাছে এসে বলে,

চলি মাসি, কাল সকালে ছ'টায় বেরুব, কাজ আছে, ও-পাড়া যেতে হবে। এত কি ভাব বল তো?

অন্যমনস্ক ভাবে অলিমাসিমা মাথা নাড়েন। অঙ্ক তেমন মাথায় আসে না আজকাল। কিন্তু বর্ধমানের প্রাইমারী স্কুলে অলকানন্দা সর্বদা অঙ্কে ফার্স্ট হত। চট করে নামতাও মনে পড়ে না আজকাল। আট-বারোং ছিয়ানব্বই। এক বছরে পিওনরা পায় ন শ ষাট টাকা। দু হাজার তুলতে দু বছরের একটু বেশী। অলিমাসিমার হলে লাগত দু বছরেরও কম।

মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কি জানে ঐ পিওনরা? কেয়াকে দিয়ে চিঠি লেখায়। দু হাজার টাকা তুলতে

অলিমাসিমার লাগে কতদিন? সাত হাজার জমাতে লেগেছে চল্লিশ বছর। তবে আগের চাইতে আজকাল তাড়াতাড়ি জমে। তবু দু হাজার জমাতে হয়তো দশ বছর লাগবে। দশ বছর। অলিমাসিমারও ততদিনে সাতষট্টি বছর বয়স হয়ে যাবে। হয়তো বাঁচবেন না অতদিন।

সমস্ত মনটা বিদ্রোহ করে। টাকা রোজগার করা এত সহজ, অথচ দু হাজার টাকা জমাতে অলিমাসিমার লাগবে দশ বছর? জামাই এক একটা কেসে এক এক বার নাকি পাঁচ সাত শ পায়। নেপুর বাবা—না, সে আর কি দিয়ে গেছে অলিমাসিমাকে!

অলিমাসিমার চোখ ফেটে জল আসে। বটফলের কথা মনে হয়। বটফলের বৌদি যে নার্স, সে নাকি মাসে দু শ টাকা পায়। তবে সে চার বছর ধরে পড়ে, পাস দিয়েছে, তবে না! কিন্তু বটফল নিজে? কি-ই বা তার বিদ্যে? অলিমাসিমার চাইতে হয়তো দু চার ক্লাস বেশী। কিন্তু সেও পাস-টাস করেনি। কাজকর্মও অলিমাসিমার কাছ থেকেই শিখে যায়। অথচ ক্যান্টিনে সেও পঁচাত্তর টাকা মাইনের কাজ করে। ছোট ছেলেটাকে স্বামীর কাছে রেখে, রোজ কাজে যায়। নিজের একটা রোজগার না থাকলে চলে কখনো? স্বামী নিয়ে, ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকবে, অথচ কিছু খরচ দেবে না, তা কি হয় কখনো?

বটফল বলে, আপনিও চলুন আমাদের ক্যান্টিনে কাজ করবেন। আপনাকে পেলে ওঁরা লুফে নেবেন। ভার নেবার জন্য লোক খুঁজছেন, এক শ টাকা কি তার চাইতে বেশী দেবেন।

বটফলের মা ফোকলা মাড়ি বের করে বলেন, ও কাজ করবে না, মাগো! হিঁদুরা বড়লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকতে লজ্জা পায় না, চাকরি করতে লজ্জা পায়। ও আমি ঢের দেখেছি। বটফল বলে,

মা, তুমি থামো তো। পরের ব্যাপারে নাক গলিও না।

কিন্তু ক্যান্টিনের ঐ কাজে যথেষ্ট সম্মান আছে, একেবারে মাথার কাজ। বছর দুই-এর বেশী করতেও হবে না।

শুধু দুটি বছর। কিন্তু তা হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে। বেয়াল্লিশ বছর পর এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। এ বর্ধমানের সেই ফালি জমিতে যাওয়া নয়। সেখানে তো অলিমাসিমার মন চল্লিশ বছর ধরে বাসা বেঁধে আছে। সে তো নতুন জায়গা নয়।

ক্যান্টিনে কাজ করলে আর নেপু এখানে থাকতে দেবে না, আর থাকবেনই বা কেন তিনি? কিন্তু কোথায় যাবেন অলিমাসিমা? কোথাও যাওয়া মানেই তো খরচ। দু-বছরের জায়গায় তিন বছর। তবে খরচ দিয়ে তো বটফলের বাড়িতেও থাকা যায়, ওরা একটা ঘর ভাড়া দেয়। হোক না তিন বছর। তিন বছর আর এমন কি। কালই যাবেন বটফলের বাড়ি—

কি একটা শব্দ কানে আসে, দুড়দাড় করে কে সিঁড়ি বেয়ে নামছে না? তালা খোলার শব্দ, ঝড়ের মতো নেপু এসে ঢোকে—

অলিমাসি, শিগ্‌গির এসো, উনি কেমন কচ্ছেন!

কেয়াও উঠে এসেছে। বহুদিন পরে অলিমাসিমা দোতলায় ওঠেন। গত তিন বছর ধরে দোতলায় কারো ওঠা নেপুর পছন্দ নয়। সেখানকার সব কাজ সে নিজের হাতেই করে। অবিশ্যি গুটিতিনেক ঘর রেখে আর সবটা সামনের অংশের মতো ভাড়া দেওয়া। সেদিকটার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই নেই। বড় শোবার ঘর, কাপড়-ছাড়ার ঘর, স্নানের ঘর আর বাক্সের ঘর। বড় শোবার ঘরের খাটে জামাই অচেতন হয়ে পড়ে।

অলিমাসিমার মাথা বড় ঠাণ্ডা। কেয়াও যেন একটু ঘাবড়ে গেছিল। তবু অলিমাসিমার নির্দেশে সে-ই ফোন করে ডাক্তার ডাকল। অলিমাসিমা জামাইয়ের মাথায় জলপটি দিতে থাকলেন। নেপু মুখ গুঁজড়ে কোনার সোফাটায় পড়ে থাকল।

রক্তচাপের পুরোনো রুগী, ডাক্তার এসে ওষুধ-পত্র, খাওয়া-দাওয়ার কথা বললেন। আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, যাই হোক, সে-রকম কিছু হয়নি এবার। পাঁচ-সাত দিনেই সম্ভবতঃ ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো হল প্রকৃতির ওয়ার্নিং। এখন থেকে খুব সাবধানে চলাফেরা।

নেপু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, ডাক্তার চলে গেলে অলিমাসিমার কোলে মাথা রেখে খুব খানিকটা কেঁদে নেয়। কেয়া ক'দিন ছুটি নেয়, রাঁধাবাড়া করে দেয়, হিটার জেলে। বলে, উনুন-টুনুন ঠেকাতে পারবে না। নেপু বলে, মিটারে বেশী উঠবে। কেয়া বলে, কি বেশী উঠবে, নেপুদি, কত বেশী উঠবে? সে দিয়ে দেওয়া যাবে। তোমার তো মেলা টাকা।

নেপুর এ-ধরনের কথা ভালো লাগে না। তাছাড়া কেয়ার কোনো আচরণই বিয়ে-হওয়া মেয়ের মতো নয়। সিঁদুর পরে না, মাথায় কাপড় দেয় না, ডাক্তারের সঙ্গে

হেসে-হেসে কথা বলে, দৌড়ে-দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নামে, যা মুখে আসে বকে। যেন সমানে সমানে।

জামাই একটু সুস্থ হয়ে, বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসলে, কেয়া একদিন ঘরদোর গুছিয়ে দিল। খাটের তলা থেকে রাশি-রাশি খালি বাক্স, টিন, ছেঁড়া জুতো বের করে, বিক্রিওয়ালা ডেকে সতেরো টাকার জিনিস বিক্রি করে, নেপুর হাতে টাকা দিল। নেপু বললে,

মোটে সতেরো টাকায় না দিলেও পারতে, কেয়া। অন্য লোকে হয়তো আরো বেশী দিত।

কেয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

খাট থেকে জামাই হেসে বলে,

কিচ্ছু বেশী দিত না, নেপু। আজ পর্যন্ত কোনোদিনও সতেরো টাকার রাবিশ বিক্রি করতে কাকেও দেখিনি। ওর অর্ধেকটা তো আমার মতে কেয়ারই প্রাপ্য। এ ঘরে কি দেখছ কেয়া, তোমার নেপুদির কাপড়-ছাড়ার ঘর যদি দেখ—

কর্কশ কণ্ঠে নেপু বলে,

ও-ঘরে তোমার যাবার কোনো দরকার নেই, কেয়া। তুমি সবটাতে বড্ড বাড়াবাড়ি কর—

কেয়া হেসে বলে, না নেপুদি, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমাকে না বলে আমি কিচ্ছু করব না।

কেয়া নিচে চলে যায়।

জামাই বলে, কিছুই হয়নি নেপু, মিছিমিছি রাগারাগি করলে।

নেপু আরো রেগে যায়।

না, কিছু হয়নি। তোমার কথার মধ্যে কেয়ার সামনে আমাকে ছোট করার ইচ্ছে ছিল না! ও-রকম করে ওকে মাথায় তুলো না বলছি।

জামাইও ছাড়ে না।

কি বাজে কথা বল, নেপু। অযোগ্য সব কথা।

নেপু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, অযোগ্য কথাই তো! আমি এখন অযোগ্য না তো কি!! সব পুরুষ মানুষরা এক রকম, বুড়ো হলেও বদলায় না! ঐ নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েটাকে আস্কারা দিচ্ছ কিসের আশায়?

জামাই হঠাৎ রেগে যায়—যা মুখে আসে তাই বল, নেপু? ও না আমাদের মেয়ের মতো, এইখানেতে মানুষ, এতটুকু মা-মরা মেয়ে এসেছিল, তোমার বাবার আশ্রয়ে মানুষ হল, এখান থেকে বিয়ে হল, আবার নিরাশ্রয় হয়ে এখানেই ফিরে এল। তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই, নেপু? তাই ভগবান তোমাকে ছেলে-মেয়ে দেননি।

উত্তেজনায় জামাইয়ের মাথা ঝিমঝিম করে, বুক ধড়ফড় করে। অলিমাসিমা ছোট্ট কালো শিশি থেকে পঁচিশ ফোঁটা ওষুধ গুণে খাইয়ে দেন। নেপুও ঘাবড়ে গিয়ে তখনকার মতো চুপ করে। পরে অলিমাসিমার কাছে কান্নাকাটি করে। অলিমাসিমা বলেন,

অমন কথা কি কেউ বলে, নেপু? জামাইয়ের দেবতার মতো চরিত্র, সে কি তুমি জানো না?

কাঁদলেই নেপুর চোখ ফুলে যায়, নাক লাল হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে বলে,

সব আমার এলোমেলো হয়ে আছে, অলিমাসি, কি বলতে কি বলি তার ঠিক নেই। কিন্তু ও-মেয়ের হাব-ভাব দেখলে গা জ্বলে যায়, অলিমাসি, সব সময় অমন ঢলে-ঢলে পড়ে, ও কি খুব ভালো মেয়ে বলতে চাও? স্বামী আরেকটা বিয়ে করে বিদেশে থেকে গেল, ওকে নিল না, তার জন্যে এতটুকু লজ্জা, এতটুকু দুঃখ নেই ওর? ভালোমানুষের মেয়েরা হয় ও-রকম? যখন-তখন আসে যায়, তুমিই তো বলেছ। এ-বাড়িতে থাকে কেন? ওকে চলে যেতে বল।

অলিমাসিমার বুক ঢিপঢিপ করে। এ আলোচনা ওর কানে গেলেই তো হয়েছে। হাসতে হাসতে তখুনি পাশের বাড়ি গিয়ে ঐ অলক বলে ছেলেটাকেই ফোন করবে হয়তো, সে-ই ঘর ঠিক করে দেবে, বাক্স নিয়ে চলে যাবে কেয়া। একতলায় অলিমাসিমা থাকবেন কি করে? নেপুকে বোঝাতে হয়,

দেখ নেপু, অত অধৈর্য হলে চলে কখনো? ঐ সিঁড়ির নিচে শুয়ে থাকে, ভারি সজাগ ঘুম ওর, ওকে না জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে সাধ্য কার! আমিও নিশ্চিন্তে থাকি নেপু, ও একটা পাহারাওয়ালার মতো। তারপর এখন সংসারটাকে ও-ই ঠেকিয়ে রেখেছে; ও গেলে আমাকে নিচে যেতে হয়।

পাংশুমুখে নেপু অলিমাসিমার হাত চেপে ধরে—না না, একা আমি ওঁর কাছে থাকতে পারব না। আমার ভারি ভয় করে।

মাঝে মাঝে ক্যান্টিনের কথা মনে পড়ে। বটফলরা এসে এসে ফিরে যায়, কেয়া বলেছে। খাবার রেখে যায় রোজ, অলিমাসিমা রুগীর সেবা করছেন, পুষ্টিকর খাবার না হলে পারবেন কেন? কেয়া হেসে হেসে অলিমাসিকে সব খবর দেয়। সব কাজও করে দেয় কেয়া, এত ভালো

করে কাজ করে দেয় যে, অলিমাসিমা তারিফ না করে পারেন না। কিন্তু আর ওপরে যায় না।

। ৪ ।

সিঁড়ির মাঝখানের দরজাতে রাত ন'টার সময় রোজ নেপু নিজের হাতে তালা দিয়ে আসে। আটটার সময় অলিমাসিমা নিচে গিয়ে ট্রেতে সাজিয়ে নেপুর আর জামাইয়ের খাবার নিয়ে, ওদের খেতে বসিয়ে দেন। পরে ওদের বাসন হাতে করে, নিজেও নিচে গিয়ে যা হয় খেয়ে আসেন। নেপু আর নামতে দেয় না। কিন্তু রোজই অলিমাসিমার মনে হয় ঐ অলক ছোকরা এসে কেয়ার সঙ্গে হয়তো অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে।

দিনে দিনে কেয়ার সাহস এমনি বাড়ে যে, একদিন রাত দশটার সময় নেপুর ফিক-ব্যথার জন্য গরম জলের ব্যাগ নিয়ে অলিমাসিমা নিচে নামেন, দেখেন খাবার ঘরের বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে বসে কেয়া আর অলক চা আর সিঙাড়া খাচ্ছে আর হেসে হেসে গল্প করছে।

অলিমাসিমাকে দেখে এতটুকু লজ্জা নেই, উঠে দাঁড়িয়ে অলক অলিমাসিমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে থাকে। অলিমাসিমার গা জ্বলে যায়।

বলিহারি সাহস, কেয়া। নেপু জানতে পারলে আর তোমাকে আস্ত রাখবে না। ওপরে মানুষটা অসুখ করে পড়ে রয়েছে, তোমাদের কি গালগল্পের সময়-অসময় নেই, কেয়া?

এমন করে বললেন যেন অলককে দেখতেই পাননি। তবু নরম গলায় অলক বললে,

অসুখ না হলে কি আর আমাকে ঢুকতে দিত, মাসিমা?

অলিমাসিমার পিত্তি জ্বলে যায়।

তোমারই বা কি রকম আক্কেল, বাছা? এত রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে কেউ গল্প করে?

কিন্তু কেয়া কিছুতেই রাগ করে না; হেসে বলে,

এর আগে যে ওর ছুটি হয় না, মাসি। নিচের তলায় কথা বলবার লোক না পেয়ে আমিও তো হাঁপিয়ে উঠি। রেগো না লক্ষ্মীটি, ও এখুনি চলে যাবে। বরং এই সিঙাড়াটা খেয়ে ফেল।

ততক্ষণে জল ফুটে গেছে।

অলক উঠে বলে, চলি কেয়া, কাল একবার খবর নেব।

কেয়াও উঠে গিয়ে খিড়কি দরজা বন্ধ করে দেয়।

ব্যাগে জল ভরতে ভরতে অলিমাসিমা বলেন,

ওর সামনে মাংসের সিঙাড়ার কথাটা কি না-বললেই হত না, কেয়া?

কেয়া অবাক হয়ে যায়।

কেন, মাসি, ও কিছু মনে করেনি, ওরা অন্য ধরনের মানুষ।

অলিমাসিমা চলে যেতে যেতে বলেন,

সে তো বুঝতেই পারছি, কেয়া, নইলে রাত দশটা অবধি একজন বিয়ে-হওয়া মেয়ের সঙ্গে গল্প করে!

কেয়া চুপ করে থাকে। অলিমাসিমা আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠোনের দিকে কেয়া চেয়ে আছে। মাথার ওপরকার ক্ষীণ আলোতে কেয়ার চোখের কোলে দীর্ঘ পল্লবের ছায়া পড়ে, বাইরের অন্ধকারের চেয়ে আরো গাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করে। যেন একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে অলিমাসিমাকে থামতে হয়।

তখুনি ওপরে যেতে হয়, নেপু অধৈর্য হয়ে পড়বে।

রাত আরো গভীর হলে, জামাইকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে, নেপুর কাপড়-ছাড়ার ঘরে অলিমাসিমা তাঁর পুরোনো খাটটির ওপরে পা উঠিয়ে বসেন। ঘুম আসে না এখানে। একতলার ঐ স্যাঁৎসেঁতে শীতল নীরব ঘরখানি নইলে অলিমাসিমার ঘুম হয় না।

রেশমী মোজাটাকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল। সেটাকে ওপরেও আনা যায় না, কেয়াকেও কিছু বলা যায় না। পেরেকের কৌটোর পেছনে, ঠিক সেইরকম আরেকটা কৌটোতে মোজাটা নিরাপদে লুকোনো আছে। বাইরের খুপরি জানলায় গ্রিল লাগানো, পাল্লা বন্ধ। এদিকের দরজায় গডরেজের তালা মারা। তবু মন খুঁতখুঁত করে। ইচ্ছে করে আর একবার গিয়ে দেখে আসি। বারে বারে ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারলে ভালো হত; কিন্তু সত্তরটা এক শ টাকার নোট এতখানি জায়গা জুড়ে থাকে।

ও-ঘরে আলো জ্বালা থাকলে নেপুর ঘুম হয় না। আবার সব আলো নিভিয়ে দিলে নেপুর ভয়-ভয় করে। এ-ঘরের আলো তাই জ্বেলে রাখতে হয়। কেমন করে ঘুম হবে অলিমাসিমার?

কেয়া কি ঘুমোয়? নিচে একা-একা সিঁড়ির তলার ঘরে কেয়া কেমন করে ঘুমোয়? ছোট্ট কেয়াকে মনে পড়ে অলিমাসিমার। পাঁচ-ছ বছরের কেয়া, শামলা, পাতলা, ডাগর-ডাগর-চোখ একটা কেয়া, রাতে মা'র জন্য

কাঁদত। নেপুর মা-বাবা তখন বেঁচে, নইলে কি আর এ-বাড়িতে ঠাঁই পেত? কোথায় গেল সেইসব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের দল, যারা বারোমাস এ-বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে, এখানে-ওখানে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

মনে হয় এইতো সেদিন রান্নাঘরের বারান্দায় সারি সারি পিঁড়ে পড়ত, কাঁসার-থালাতে ভাত খেয়ে, দুবেলা তারা আঁচাবার সময় থালা-গেলাস ধুয়ে, ঐ উঁচু জায়গাটাতে উপুড় করে রেখে যেত। বাসন-মাজার ঝি অবিশ্যি দুবেলাই আসত, রাশি রাশি বাসন মেজে দিত। কিন্তু ওরা সব নিজেদেরটা নিজেরা ধুয়ে দিয়ে যে-যার ইস্কুল-কলেজে চলে যেত।

মাস-কাবারে বুড়ো সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে ইস্কুলের মাইনেটুকু চেয়ে নিত। পুজোর সময় সব দু-জোড়া করে কাপড়-জামা পেত। গাঁটরি করে মিলের কোরা কাপড় আসত এই ঘরে। অলিমাসিমা কাঁচি দিয়ে জোড়া কেটে দিতেন। মোড়ার ওপর পা তুলে নেপুর মা বসতেন; বলতেন, চারখানি কাপড় চাররকম পাড়ের দিবি, অলি। নাম লিখে নেবে ওরা, ধোপায় দিলে গোলমাল হবে না।

কেয়ার জন্যও চার রঙের চারখানি ফ্রক আসত। রাত্রে কেয়া কাঁদে শুনে, নিজের ঘরে ওর বিছানা পাতালেন।

তাই নিয়ে নেপুর কি রাগ! ও-সব আদিখ্যেতা কোরো না বলছি, নাই দিলে কুকুরও মাথায় চড়ে।

তবে মা'র সামনে বলার সাহস ছিল না, যত রাগ ঝাড়ত অলিমাসিমার ওপর। পাঁচ বছরের কেয়া তখন, ত্রিশ বছরের নেপু, বত্রিশ বছরের অলিমাসিমা। মনে হয় যেন কাল। কোরা কাপড়ের গন্ধ যেন নাকে আসে।

তারপর নেপুর মা-ও চোখ বুজলেন, অলিমাসিরও স্থান হল একতলার ঐ ছোট ঘরখানিতে, আর কেয়াও একতলায় বুড়ো সরকার মশায়ের স্ত্রীর কাছে শুতে গেল। কাকেও বলতে হয়নি, নিজের ছোট বালিশখানা বগলে করে সুড়সুড় করে কখন গিয়ে সরকার মশায়ের ঘরে আশ্রয় নিল, সরকার মশাই নিজেই টের পেলেন না। ভারি ভালোবাসতেন ওকে।

কিন্তু অলিমাসিমার কাছে কেয়া কখনো আসেনি। এলে অলিমাসিমা নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন। আর পাঁচটা ছেলেও তো এ-বাড়ীতে মানুষ হয়ে গেছে, তবে মেয়ে শুধু ঐ কেয়া। পাড়ার স্কুল থেকে যেবার সে ম্যাট্রিক পাস
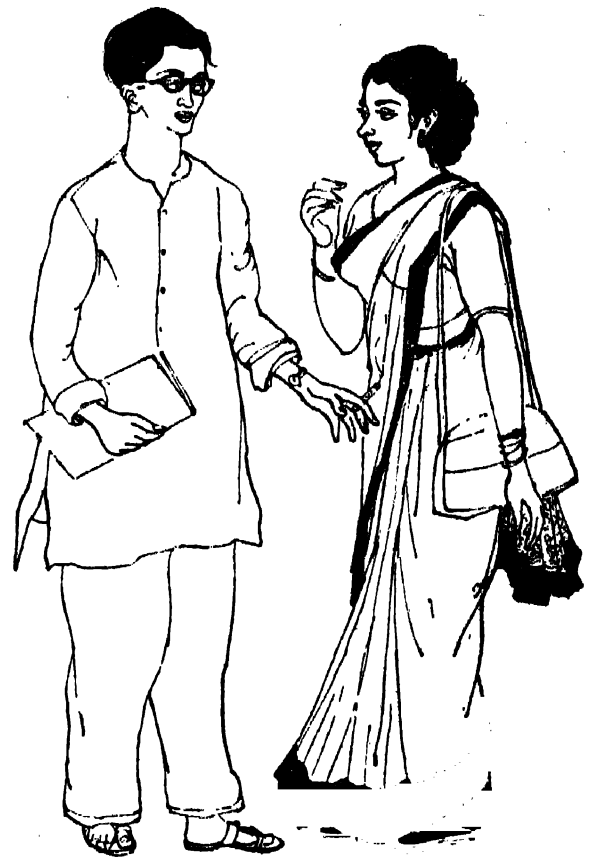
করল, নেপুর বাবা কোনো এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে খরচপত্র করে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

খরচের বহর দেখে নেপু তখনো রেগে টং, তবে বাপের ওপরও কথা বলার সাহস ছিল না। আর মা গিয়ে অবধি বাবা যেন আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন; কাছে এগুনোই দায়। তাছাড়া জামাই তখন পাটনায় প্র্যাকটিস করত, নেপুও অনেক সময় সেখানেই থাকত। বাবা গেলে পর ওরা এখানে এসে কায়েমী হয়ে বসল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা বড় চেনা ঘরখানিকে নতুন করে চেয়ে দেখেন। নেপুর মা যখন ছিলেন এ ঘরখানি আলো-জ্বালা মন্দিরের মতো ঝলমল করত। পদ্মবনের মতো সুগন্ধে ভুরভুর করত। আলমারির দরজা অর্ধেক সময় খোলা থাকত। ভেতরকার থাক থাক নানান রঙের রেশমী শাড়ি দেখা যেত। তিনতলা আলনাটাতে সারি সারি গোড়ালি-তোলা জুতো থাকত। আয়নার সামনেটাকে দেখে মনে হত গয়নার দোকান। সারাদিন কাটত অলিমাসিমার এই ঘরে, ছুঁচ-সুতো নিয়ে, আর পাশের স্নানের ঘরে এনামেল-করা ছোট গামলাতে

লাক্ষ-গোলা জল নিয়ে। সাজসজ্জার সম্বন্ধে এমন কিছু নেই যা অলিমাসিমার অজানা। কিছুই কোনো কাজে লাগে না এখন।

মাঝে মাঝে সব কিছুতে অরুচি হত নেপুর মা'র, দিনের পর দিন বাড়ি থেকে বেরুত না। এই ঘরে স্টোভে করে এটা ওটা রেঁধে অলিমাসিমা নেপুর মাকে ফুসলোতেন। নেপুর বাবা খুব বেশী বাইরে-বাইরে থাকতেন। তাঁকে নিয়েই যে এইসব অভিমান, এটুকু অলিমাসিমাও বুঝতেন। তার বেশী জানবার চেষ্টাও করতেন না।

নেপুর বাবা।

ঐ রকম মানুষ আর আজকাল তৈরী হয় না। সব তাঁর ছিল বিশাল; দোষ যদি থাকত সেও ছোট নয়। নেপুর বাবার শরীর মন বড় ছাঁচে ঢালাই করা ছিল।

কালে কালে অলিমাসিমার সঙ্গে তাঁর কেমন একটা অপ্রকাশিত ষড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন করে হোক নেপুর মাকে খুশি রাখতে হবে। নেপুর মাকে খুশি রাখা অলিমাসিমার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর ছিল এই মলিন ঘরখানি তখন! এ ঘরে পা দিলে মন আপনা থেকে ভালো হয়ে যেত। এ ঘরে সুন্দরের পুজো হত তখন, যেদিকে অলিমাসিমার চোখ পড়ত, মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

সারাদিন একভাবে কেটে যেত।

রাত্রে যেই আলো নিভিয়ে ছোট খাটটিতে এসে শুতেন, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠত বর্ধমানের একপাশে, বড় একটা বাড়ির লাগোয়া ছোট একফালি জমি। সেখানে অলিমাসিমা আসবার আগে হিমসাগর আমের একটি কলম পুঁতে দিয়েছিলেন। এখানে এই রূপের হাটে অলিমাসিমার নিজের বলতে এক তিল স্থান নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গাটা তাঁর একান্ত আপনার। সেই সময় থেকে অলিমাসিমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐখানে ছোট একখানি বাড়ি তুলবেন, যা হবে একান্ত তাঁর নিজস্ব, যেখানে তিনিই হবেন সম্রাজ্ঞী।

তখনো চোখের সামনে বাড়িখানি নির্দিষ্ট একটা রূপ ধরেনি, নীল কাগজে তার নক্সা হয়নি, ছোট ছাপা বই থেকে কেউ তার বাইরের চেহারা অলিমাসিমাকে দেখায়নি, তবু সে তাঁর সমস্ত হৃদয়খানি তখন থেকেই জুড়ে ছিল।

চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা জমল। মুক্তোর দাম তিন হাজার টাকা, মা'র কথা অবিশ্বাস করবার কথা অলিমাসিমার কখনো মনেও হয় না। আরো দু হাজার জমাতে হবে। বারো হাজার টাকা হলে, সেখানে সস্তায় একটি ঘর ভাড়া করে তিন মাস থাকতে হবে। বটফলের দাদা বলেছেন বাড়ি করতে তিনমাস লাগবে। তার জন্য অলিমাসিমা দশ বছর অপেক্ষা করতে পারবেন না।

মন ঠিক করে ফেলেন। কালই একবার বটফলের ওখানে গিয়ে কথা দিয়ে আসবেন। দু বছরে অলিমাসিমা দু হাজার টাকা তুলবেন। আর মাত্র দুটি বছর। শুধু দুটি বছর।

আলোর দিকে পিঠ ফিরে চোখ বোঁজেন অলিমাসিমা। অমনি কানে বেজে ওঠে ঝাঁপতাল, এত জোরে বাজে যে, অলিমাসিমার ভয় হয় বুঝি জামাইয়ের ঘুম ভেঙে যাবে।

নেপু এসে আস্তে আস্তে হাত ধরে নাড়া দেয়।

দেখবে চল, অলিমাসি, মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে। নিশ্বাস পড়ছে না আবার কি? কাছে গিয়ে কান পেতে শোনেন, কই না তো, নিশ্বাস তো পড়ছে, ওসব নেপুর মনের ভয়। নেপু হাতটা চেপে ধরে,

তুমি ও-ঘরে যেও না, অলিমাসি, পায়ের কাছের সোফাটায় শুয়ে থাক, আমার ভারি ভয় করে।

ঝাঁপতাল আর বাজে না। আস্তে আস্তে অলিমাসিমা ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন সকালে নেপু বলে, তুমি আর নিচে থেকো না, অলিমাসি, ঐ ঘরটাতে এখন থেকে শোও। গয়লাকে ডাকো তোমার জিনিসপত্র এইখানে এনে দিক। তুমি কাছে আছ, বারান্দায় কুকুরগুলো ছাড়া থাকে, নইলে কি আমার চোখে ঘুম আসত?

কিসের ভয় নেপুর? চোরে এসে যদি অর্ধেক নিয়েই যায়, টেরও পাবে না নেপু। পরে এই সমস্ত পাবে নেপুর ছোটকাকার ছেলে আনন্দ। নেপুর বাবা উইল করে দিয়েছিলেন। সমস্ত নেপুর; তারপরও জামাই বেঁচে থাকলে তার; কিন্তু তারপর আনন্দর। জামাই যা আয় করেছে, তার ওপর অবিশ্যি বাবার হাত ছিল না। কিন্তু সে তো আর আলাদা করে রাখাও নেই, লেখাও নেই।

কতবার নেপু জামাইকে সে বিষয় বলেছে। অলিমাসিমার নিজের কানে শোনা। এইতো কালই জামাইও হেসে বলেছে, কি হবে আলাদা করে, নেপু? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে তো শুনেছি পথ-ঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো, কি হবে নিয়ে গিয়ে?

শুনে নেপু রাগ করেছে। শেষে জামাই বলেছে, সত্যি বলব, নেপু? আমার আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট আছে,

জানো? আমার মা'র নামে এখানকার হাসপাতালে কয়েকটা বেড করে দিয়ে যাব মনে করেছি। সেইরকম লেখাপড়াও করে রেখেছি।

নেপু স্তম্ভিত হয়—কই, এতদিন তো কিছু বলনি।

কি বলব, বল। মা'র জন্যে তো কিছুই করতে পারিনি। বাবা অল্পবয়সে গেলেন, কি জানি কেন তোমার বাবার চোখে লেগে গেলাম, ভালো ছাত্র ছিলাম, উনিই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনলেন। কিন্তু মা তো অনেকদিন ছিলেন দেশের বাড়িতে, নিজেরটা তাঁর চলে যেত। কিছু করতে হয়নি তাঁর জন্য। সেই কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

নেপু হাঁড়িমুখ করে বলে, অসুখ করে তুমি কি রকম অন্যরকম হয়ে গেছ।

জামাই একটু হাসে। জীবনটা ভারি অদ্ভুত, না নেপু?

নেপু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, বাইরে কার পায়ের শব্দ না?

কে? কে ওখানে?

দরজার পর্দা সরিয়ে আনন্দ এসে ঢোকে। জামাইবাবুর এমন একটা ফাঁড়া গেল, একটা খবরও তো দিতে হয়, নেপুদি।

নেপু কর্কশ গলায় বলে,

কেন? এসে কি করতে শুনি? আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তোমার কোনো সুবিধে হবে না, আনন্দ, এই বলে রাখলাম।

জামাই ব্যস্ত হয়, আনন্দ কিন্তু হেসে বলে,

সে কি আর জানি না, নেপুদি? জন্মে অবধি তো শুনে আসছি। কিছুতেই কি তোমার স্বাস্থ্যে টোল খায় না? খাওয়াটা একটু কমাও না কেন?

জামাইও হেসে ফেলে।

নেপুর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—তবু শুনিই না কেন এসেছ?

কি মুশকিল! মানুষ কি মানুষকে অসুখের সময় দেখতে আসে না? তুমি যে মানুষই নও, নেপুদি, তাই এসব বোঝ না।

ভারি সুন্দর চেহারা আনন্দর, বছর ত্রিশ বয়স হবে, বিলেতী আপিশে চাকরি করে, বিয়ে-থা করেনি, ভাবনা-চিন্তা নেই।

জামাই ডেকে বলে, আয় আনন্দ, কাছে আয়, দুটো কথা বলি তোর সঙ্গে। অলিমাসি, ওকে একটু চা জলখাবার করে দাও না।

অলিমাসি নিচে যান, নেপুও সঙ্গে নামে। ওর সঙ্গে এক ঘরে আমি বসতে পারিনে, অলিমাসি। কেন আসে, জানি। এই সমস্ত যে একদিন ও পাবে, তাই আমাকে মনে করিয়ে দিতে আসে। আমার ইচ্ছে হয়, সব পুড়িয়ে দিই, কিচ্ছু না থাক। কিন্তু তবু জমিটা পাবে, ব্যাঙ্কের টাকাগুলো পাবে। এক যদি না সেগুলো খরচ করে দিই। তাও কি সব ধরে বেঁধে দেওয়া আছে শুনেছি।

অলিমাসি বলেন, আমরা যখন থাকব না, তখন পাক না যার খুশি, আমাদের তাতে কি বা এসে যাবে।

শোনে না নেপু। মরার কথা শুনতে তার ভারি আপত্তি। বলে,

কি বলে বেড়ায়, জানো, অলিমাসি? সেদিন মিসেস সিনহার ওখানে ও-ও ছিল, বলে কি না, খাবার টেবিলে বসে সবাইকে শুনিয়ে বলে কি না, দাঁড়াও না, একবার হাতে পেলেই হয়, সব বেচে দেব, বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি করব, তোমাদের সব গৃহ-প্রবেশে নেমন্তন্ন রইল।

কাঁদে নেপু। বলে, আমাদের অবর্তমানে সব উড়িয়ে দেবে, তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়। চায় যে আমরা শিগ্‌গির মরি, তাই দেখতে এসেছে, কই অন্য সময় তো আসে না।

যা-তা বলে যায় নেপু। কেয়া নিমকি বেলতে-বেলতে অবাক হয়ে শোনে। অবাক হয়ে বলে,

সে কি নেপুদি, আনন্দ ভারি ভালো ছেলে, ভালো মনে করেই দেখতে এসেছে—

নেপু জ্বলে ওঠে—তুমি বড়দের কথার মধ্যে কথা বল কেন, কেয়া? আনন্দ আবার কি, আনন্দবাবু বলবে।

অলিমাসিরও হাসি পায়। আনন্দ আর কেয়া ছোট-বেলায় এক ক্লাসে পড়ত পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে, সারাক্ষণ মারপিট করত। আনন্দও বহুদিন এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করেছে। রান্নাঘরের সামনে কেয়ার সঙ্গে ভাত খেয়েছে।

কেয়া একমনে নিমকি বেলে যায়, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগেই থাকে, সব সময় থাকে। নেপু আবার বলে,

তুমি এই বিকেলবেলায় বড় যে বাড়িতে বসে? আপিশ নেই?

কেয়া বলে, জামাইবাবুর অসুখের জন্য দশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম, যদি কিছু দরকার হয়।

দরকার? তোমাকে দিয়ে আবার কি দরকার হতে পারে? না, না, আপিশ কামাই করাটা ঠিক নয়, তুমি কাল থেকেই যেও।

কিন্তু, নেপুদি, রাঁধাবাড়াটা তাহলে—

নেপুর গলাটা একটু চড়ে যায়—আমাদের রাঁধাবাড়ার জন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না, কেয়া, কবেই বা আমাদের সুখ-সুবিধের কথা ভেবেছ?

অলিমাসিমার দিকে ফিরে বলে,

হিটারের প্লাগ খুলে ওপরে নিয়ে যেও। আগেও তো কাপড়-ছাড়ার ঘরে মা'র জন্য রেঁধেছ দেখেছি; আবার তাই হবে। অন্তত: উনি উঠে না দাঁড়ানো অবধি।

কেয়ার কিছুতেই কিছু হয় না। হেসে বলে, নিচের তলায় সারাদিন কেউ না থাকলে কি চলে, নেপুদি? গয়লা দিনরাত যাওয়া-আসা করে, ফকরুল আসে মাংস আর ডিম নিয়ে, ধোপা আসে, শঙ্কর আসে। একশ বার খিড়কি খুলতে হয়, আবার বন্ধ করতে হয়। একজন কাকেও থাকতেই হয়।

নেপু বিরক্ত হয়ে বলে,

যেই থাকুক, নিজের কাজের ক্ষতি করে তোমাকে থাকতে হবে না। সারাদিন, অলিমাসি, তুমি বরং নিচেই থেকো, রাত্রে কিন্তু ওপরে শোবে, তখন কেয়া থাকবে নিচে। তখন তো আর কেউ আসবে না।

অলিমাসিমা চোখ তুলে কেয়ার দিকে তাকান, কেয়াও তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগেই থাকে।

দেখে অলিমাসিমার গা জ্বলে যায়।

ওদিকে নেপু তাড়া দেয়।

হাত চালাও, অলিমাসি, ঐ আনন্দকে ওরকম ভাবে ওপরে ছেড়ে রাখাটা ঠিক নয়। বরং আমি যাই, তুমি একেবারে ও-ক'টা ভেজে নিয়ে এসো। ঐ ঘিতেই কিন্তু ওবেলার রান্নাটাও চালাবে, অলিমাসি। উনি তো জল-খাবার ফরমায়েশ করেই খালাস, তেল ঘি যে বিনা পয়সায় আসে না, সে খেয়াল নেই।

নেপু চলে গেলে, চাকি বেলুন তুলে রেখে, কেয়া বললে,

কিসের ওর এত ভয়, মাসি?

অলিমাসিমা এবার জ্বলে ওঠেন,

তোমার কি সত্যি কোনো লজ্জাসরম নেই, কেয়া? নিজের অবস্থাটা বোঝ না? বারে বারে ওর মুখের ওপর চোপা করতে একটুও বাধে না? আমি বুড়ো মানুষ, চুপ করে থাকি, আর তোমার অত মুখ খোলবার কি দরকারটা শুনি?

কেয়া শূন্যের দিকে চেয়ে, চুল থেকে মোটা রুপোর কাঁটাটা টেনে বের করে। অমনি একরাশি কালো চুল জলপ্রপাতের মতো পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে, কানের কাছে দুলতে থাকে, কোমল কপালের ওপর নেমে আসে। মনে পড়ে নেপুর মা'র মাথার কালো কোঁকড়া চুলগুলি। ইচ্ছে করে বাইশটা সরু কালো কাঁটা দিয়ে কেয়ার চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে, কুইন-অ্যান খোঁপা বেঁধে দিতে। কি যা-তা কথা সব মনে হয় আজকাল। কেয়ার চুল বাঁধতে যাবেন কেন অলিমাসিমা। এত বছর এক বাড়িতে বাস করেও কেয়ার জন্য কখনো কিছু করেছেন বলে মনে পড়ে না অলিমাসিমার। কেয়ার জন্য? কেয়ার জন্য আবার কে কবে কি করেছিল? নেপুর মা-বাবা ছাড়া। তাঁরা তো অমন বহুজনার জন্য বহু করেছিলেন, টেরও পাননি। অঢেল দিয়েছিল ভগবান।

খোলা চুল নিয়েই আশেপাশে ঘুরঘুর করে কেয়া, কি যেন বলি বলি করেও বলে না। ট্রের ওপর নিমকি, পেয়ালা পিরিচ, চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান।

সিঁড়ির ওপর পর্যন্ত পোঁছে দেব, মাসি?

অলিমাসিমা জিগেস করেন, কেন? আনন্দ এসেছে বলে?

কেয়া হাসে।

আরে, না না, তোমার পায়ে কিনা গুপো, তাই। আর আনন্দ কি এখন এসেছে ভেবেছ নাকি? আমার সঙ্গে আধঘণ্টা বাজে বকে, তবে ওপরে গেল। কি না বললে নেপুদির বিষয়! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। আহা, দাও না ট্রেটা, পৌঁছে দিই। নইলে কোন্‌দিন দেবে ফেলে! নিজেরও ঠ্যাং ভাঙবে, ওগুলোও যাবে।

এ কথাটা মন্দ বলেনি কেয়া। আজকাল হাত কাঁপে, পা কাঁপে। কিন্তু কেয়ার অন্য কথাগুলি অসহ্য।

তাই দাও, কেয়া। নিজের হাত-পা'র ওপর দিন দিন দখল হারাচ্ছি। অথচ কি-ই বা বয়স হল।

কেয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

কিছু না, কিছু না, ষাট বছর আবার একটা বয়স নাকি?

কেয়ার যেমন কথা। ষাট বছর কোথায় পেল, এইতো সবে সাতান্ন। ষাট বছর হবে যখন, তখন আর এখানে অলিমাসিমাকে দেখা যাবে না।

মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে যায়।

সিঁড়ির মাথা থেকে কেয়াকে বিদায় দিয়ে, ট্রে নিয়ে ঘরে ঢোকেন অলিমাসিমা।

অনেকক্ষণ ছিল আনন্দ, জামাই কিছুতেই তাকে

ছাড়তে চায় না। যাবার সময় বার বার বলে, আবার এসো আনন্দ, ঘোষকে নিশ্চয় নিয়ে এসো, একা একা পড়ে থাকি, কথা বলবার লোক নেই।

পরে নেপু অনুযোগ দেয়,

কথা বলবার লোক নেই মানে? আমরা কি মানুষ না?

আনন্দর কথাগুলি মনে পড়ে। কি অভদ্র বেয়াড়া ছেলে, বাবা! গুরুজন বলে একটুও সমীহ করে না! যা মুখে আসে বলে! হলই বা নিজের কাকার ছেলে, তাই বলে বাড়ি বয়ে অপমান করে যাবে, আর তুমি তাকে উল্টে চা জলখাবার দেবে!

জামাই হেসে বলে, মাঝে একবার মনে হয়েছিল তুমি বুঝি রেগে-মেগে ওর চা-জলখাবারটা ছিনিয়ে নেবে! বুঝলে, অলিমাসি, আনন্দ তো কেয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেয়ার বড়সাহেবের সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়েছে, সেও নাকি কেয়ার ভারি সুখ্যাতি করেছে। ওর স্বামীর কথা শুনে সে অবাক, কেয়ার যে বিয়ে হয়েছে, তাই জানত না!

নেপু বলে, জানবে কি করে? এ তো আর আমার কি অলিমাসিমার মতো ঘরের বৌ নয়, ওর কোন্ ব্যবহারটা বিবাহিত মেয়ের মতো তাই বল। ত্রিশ বছর বয়স হল, ঘুরে বেড়ায় যেন কলেজের মেয়েটি!

জামাই বলে,

মনটাকে আরেকটু উদার কর, নেপু, ঘরের বৌদের কোনো প্রাপ্যই ভগবান ওকে দেয়নি, ঘরের বৌয়ের মতো হবে কি করে?

জামাইয়ের পেছন থেকে অলিমাসিমা ঠোঁটে তর্জনী রেখে নেপুকে তর্ক থেকে নিবৃত্ত করেন। উত্তেজিত হলে জামাইয়ের সেরে উঠতে দেরি লাগবে, ডাক্তার বলে গেছে।

। ৫ ।

কি জানি, অসুখটা হয়ে অবধি মনে হয় জামাইয়ের বাইরে থেকে একটি বড় চেনা খোলস খসে পড়ছে, সম্পূর্ণ অচেনা একটি নতুন মানুষ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অলিমাসিমা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, একটা মানুষের সঙ্গে সারা জীবন বাস করেও তাকে চেনা যায় না।

বহু বছর ধরে মনে পড়ে জামাইকে। কবে যে প্রথম দেখেছিলেন মনে করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে নেপুর কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেই প্রথম যেদিন এসেছিলেন নেপুর মা'র সঙ্গে দোতলার এই বড় শোবার ঘরটিতে, সেদিন থেকে মনে পড়ে।

নেপুর মা অলিমাসিমার হাতে একটা নরম ছোট্ট রুপো দিয়ে বাঁধানো বুরুশ দিয়ে বলেছিলেন, দেখি, তোমার হাতখানি কেমন দেখি। এই বুরুশটা দিয়ে, একটিও চুল না ছিঁড়ে, আমার চুলের জট ছাড়িয়ে দাও তো দেখি।

অলিমাসিমা তার আগে চুলের বুরুশ চোখে দেখেননি। ভয়ে ভয়ে বুরুশ নিয়ে, আস্তে আস্তে নেপুর মা'র মাথার ওপর তিনতলা উঁচু মাদাম-পম্পাডুর খোঁপা থেকে আট-ত্রিশটা কাঁটা আর বাঁকা বাঁকা লম্বা দাঁতওয়ালা তিনটে শক্ত চিরুনি খুলেছিলেন। চুলগুলি তখুনি হুড়মুড় করে নেমে পড়েছিল। কালো ভোমরার মতো চুল, কোঁকড়া, যেন আঙুরের গোছা, জটে ভরা। সত্যিই বুরুশের কর্ম নয়। বুরুশ নামিয়ে রেখে, অলি-মাসিমা আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে চুল চিরে-চিরে জট ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন। নেপুর মা'র চোখ বুঁজে এল। এক-বার অলিমাসিমার হাত দুখানি ধরে টেনে সামনে এনে বলেছিলেন মিষ্টি-হাত সেবার হাত, বেঁচে থাকো, অলি।

শুনে অলিমাসিমার প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেছিল।

কোনো সময় মনে হয়েছিল কে যেন তাঁকে দেখছে। চোখ তুলে দেখেন, দরজার পর্দা হাত দিয়ে সরিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে একটি রোগা, অদ্ভুত ফরসা, কটা চোখের বারো-তেরো বছরের মেয়ে। দেখে হঠাৎ বাঙালী বলে চেনা যায় না। লম্বা লম্বা সাদা-লাল ডোরা-কাটা রেশমী ফ্রক পরনে, তার কোমরে চওড়া লাল ফিতে বাঁধা, পায়ে কালো জুতো-মোজা, খোলা লালচে রুক্ষ চুলের একপাশে লাল একটা রিবন ফুল করে বাঁধা। মুখটা একটু হাঁ করে অবাক হয়ে

মেয়েটি চেয়ে আছে, সামনের দাঁতগুলি উঁচু, অসমান। তার ওপর দিয়ে একটা সোনার বেড়ি আঁটো করে পরানো। দাঁত সোজা করবার জন্য সাহেব-ডাক্তার নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছে, নেপু পরে গর্ব করে অলিমাসিমাকে বলেছিল।

নেপুর মা চোখ না খুলেই বললেন, কে? নৃপবালা? এসো, তোমার অলিমাসিমার সঙ্গে আলাপ কর।

নেপু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। মাথায় অলিমাসিমার চাইতে খানিকটা উঁচু, বয়সে প্রায় সমান সমান। লোরেটোতে পড়ে; পিয়ানো বাজাতে শেখে, সন্ধ্যাবেলা হলঘরে মেমের পাশে বসে। তবে ঠাকুমা সেকেলে নাম রেখে দিয়েছেন নৃপবালা, এই যা দুঃখ।

মিসেস সমারভিলকেও অলিমাসিমার মনে পড়ে। এর আগে কখনো মেম দেখেননি। এখন মনে হয় হয়তো বছর পঞ্চাশেক বয়স ছিল, মোটাসোটা গড়নটি, কালো সিল্কের পোশাক, ওপরদিকটা আঁটো, পায়ের দিকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা, ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বুকে একটা মস্ত সোনা-বাঁধানো গোলাপী পাথরের ব্রুচ লাগানো থাকত, তার ওপর একজন উবেদা-খোঁপা বাঁধা মেমের মুখ উঁচু উঁচু করে আঁকা। নাকি মেমের মায়ের মুখ। মেমেদের আবার মা থাকে, অলিমাসিমা এই প্রথম শুনলেন। ব্রুচ ছাড়া একটি ঘড়িও বুকের ওপর ঝুলত, ছোট্ট সোনার একটা বো-বাঁধা পিন দিয়ে আটকানো। মেমের নাকের ওপর একটা চেন-বাঁধা চিমটি-কাটা চশমা বসানো থাকত। সেটা মাঝে মাঝে খুলে খুলে পড়ে যেত। আবার লাগিয়ে নিতে হত। মুগ্ধ বিস্ময়ে অলিমাসিমা মিসেস সমারভিলকে দেখতেন। নেপুর মা'র হুকুম ছিল, যতক্ষণ নেপু পিয়ানো শিখবে, অলিমাসিমা ওখান থেকে নড়বেন না। পরে নেপুর মাকে এসে জানাবেন কেমন পিয়ানো শেখা হল, কে কে ঘরে ঢুকল, নেপুর বাবা পিয়ানো শুনতে গেলেন কিনা, এই সব।

মস্ত পিয়ানো কেনা হয়েছিল, রাশি রাশি টাকা খরচ হয়েছিল। সেই পুরোনো পিয়ানো নেপু পরে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে বেচে দিয়েছিল। কিন্তু দু বছরের বেশী বাজানো হয়নি। নেপুর পনেরো পুরে গেলেই বিয়ে হয়ে গেল। জামাই বিলেত গেলে পর, নেপুর বাবা অনেক করে বলা সত্ত্বেও, নেপু আর পিয়ানো ছুঁল না। মেম আসাও বন্ধ হল, নেপুর মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

মনে পড়ে জামাই বিলেত থেকে ফিরে মাসখানেক এ বাড়িতে ছিল। ভারি ভালো চেহারখানি ছিল তখন, কিন্তু কথা খুব কম বলত। তবে কেউ প্রশ্ন করলে সুন্দর করে উত্তর দিত। অলিমাসিমা শুনেছিলেন জামাই ভারি পণ্ডিত মানুষ, বইটই নিয়ে থাকতে দেখেওছিলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলেননি কখনো।

যখন জামাই পাটনায় প্র্যাকটিস করতে গেল, তখন দেখাশুনোও একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নেপুর বাবা-মা স্বর্গে গেলে পর জামাইয়ের সঙ্গে অলিমাসিমার সত্যিকারের পরিচয় হয়েছিল, এক বাড়িতে প্রায় পঁচিশ বছর থাকার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু সেই কি সত্যিকারের পরিচয়? সেই নেপুর কথার পেছনে আড়াল-হয়ে-যাওয়া পরিচয়টাই কি জামাইয়ের যথার্থ পরিচয়? তবে এখন তাকে অন্যরকম মনে হয় কেন?

রাতে আর ওপরে মন বসে না, খাবার ঘরের পাশের ঐ খালি ঘরখানির জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। যথেষ্ট নিরাপদ তো ঘরটা? সকালে অলিমাসিমা স্নান করে এসে, জানলার গ্রিল ধরে টেনে দেখেন। মোটা লোহার গ্রিল, সেকালের জেলখানায় এরকম থাকত, দেয়ালের ইঁট ফুঁড়ে শক্ত করে বসানো, এতকাল পরেও একটুও নড়ে না।

জানলা দেখতে গিয়ে, জানলার নিচেকার তক্তাটার ওপর চোখ পড়ে। পুরোনো কাঠের পুরু তক্তা, আগে এর ওপর মেডেন-হেয়ার ফার্নের চ্যাপ্টা টব বসানো থাকত। কালো বোঁটার ওপর ছড়া ছড়া হাল্কা সবুজ পাতার সে কি বাহার! ভারি যত্ন করতে হত ওদের। নেপু মালী ছাড়িয়ে দেবার পর গাছগুলি সব মরে গেল, টবগুলি কোন্‌দিন ভেঙে পড়ে গেল, শুধু তক্তাটা রইল।

শ্যাওলা-ধরা ফাটা একটা কালো তক্তা, তার ফাটলে ফাটলে, খাঁজে খাঁজে সে কি রঙের রূপের মেলা! অলিমাসিমা যতবার দেখেন অবাক হয়ে ভাবেন ব্যাঙের ছাতা আবার এত সুন্দর হয়।

আগে কিন্তু ওদের রূপটা অত চোখে পড়ত না। কি একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ লাগত, সাপ-খোপের গায়ের গন্ধের কথা মনে হত। দু-একবার কেটলি করে ফুটন্ত জল এনে ঢাললেন ব্যাঙের ছাতার ওপর। অমনি তারা কালো হয়ে, কুঁকড়ে, মরে গেল। কিন্তু তারপরেই আবার দু-এক পশলা বৃষ্টি পড়লে, ছোট ছোট শত শত ব্যাঙের ছাতায় তক্তাখানি ঢেকে গেল। মোমের মতো কচি মোলায়েম বোঁটাগুলি, মনে হয় ছুঁলেই ভেঙে যাবে। তার মাথায় কতো রকম ফিকে রঙের ফুলের মতো, টোপরের মতো, পাতার মতো ছাতা ধরা। দেখে দেখে মন ভরে না

অলিমাসিমার। ভাবেন এত রূপে দেখবার চোখ কোথায় পাই?

বাইরে থেকে গয়লা ডাকে, মাছ নিয়ে এসে মংরুর বৌ ডাকে, মাংস ডিম নিয়ে ফকরুল ডাকে, নকুড়বাবুর বাড়ি থেকে ছোট ঝোড়ায় করে শরবতি লেবু, আপেল, ডালিম আসে। এ বাড়ি থেকে কেউ বাজারে যায় না, সব জিনিস আপনা থেকেই দোরগোড়ায় এসে পৌঁছয়। ভারি একটা গর্ব বোধ করেন অলিমাসিমা।

আজকাল আর উঠোনের ওপারে রান্নাঘরে যান না অলিমাসিমা, নেপু ডাকলে সেখান থেকে শোনা যাবে না। গয়লা তোলা উনুনটা ধরিয়ে এনে দেয়, অলিমাসিমা খাবার ঘরের কোনাতে, মোড়ায় বসে, রান্নাটা সেরে নেন। কিছু কিছু হিটারেও বসান।

আপিশ যাবার আগে পর্যন্ত কেয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে। রোজ অলিমাসিমা ওকে সাবধান করে দেন,

ও কেয়া, সাড়ে আটটার মধ্যে নিশ্চয় নিশ্চয় ফিরো কিন্তু। জানো তো, ন'টার মধ্যে দরজায় তালা দিতে চাইবে।

কেয়া কেমন একটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, লুকিয়ে রাখো না কেন, এক এক দিন, তালাটাকে?

এরকম কথা অলিমাসিমা সইতে পারেন না। যে নিয়মের কাঠামোতে অলিমাসিমার মনটা গড়ে উঠেছে, সেখানে এ ধরনের কথা একেবারে অচল। কিন্তু কেয়াকে চটাতে ভয় করে। অবিশ্যি চটে না কখনো কেয়া, ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত চটতে দেখেনি কেউ কেয়াকে। চটে না, মিছে কথা বলে না, নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করে না, কিন্তু সম্মানও করে না কাকেও। যা ইচ্ছে হয় করে। চটবে না, তবে না চটেই বাক্স নিয়ে চলে যাবে এটা ঠিক। একতলাটা তা হলে খালি পড়ে থাকবে। নেপু হয়তো বলবে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও, সিঁড়ির দরজাতে তালা দিয়ে দিই, থাক একতলাটা। তখন কি হবে?

ভাবলেও অলিমাসিমার গা শিউরে ওঠে। যাবেন নাকি একদিন ঘণ্টা দুইএর জন্য বাইরে? বৃহস্পতিবার বটফলের ডিউটি থাকে না, ওকে সঙ্গে করে পোস্টাপিশে গিয়ে, টাকাগুলো একেবারে জমা দিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। এভাবে আর ক'দিন চলবে!

কিন্তু পোস্টাপিশে যাওয়া মানেই পোস্টমাস্টার জানবেন; যা স্ত্রৈণ ভদ্রলোক, ওঁর বৌ-ও জানবে; সে তো পাড়ার সমিতির একটি পাণ্ডা, অমন গপ্পে মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে আর দুটি নেই, তাকে জানানো মানেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া। তারপর বটফলের দাদা বলেছিলেন পোস্টাপিশে টাকা জমা দেওয়া সহজ, কিন্তু তোলা প্রায় অসম্ভব। নাকি পাঁচশ রকমের ফ্যাঁকড়া বেরোয়, সই মেলে না, নোটিশ চায়। তা করলে তো হবে না। হাতে হাতে খরচ মিটিয়ে দিতে না পারলে, তিনমাসে কখনও বাড়ি হয় না।

অলিমাসিমা ভেবে কূল পান না। রোজই কেয়া আটটা বাজার আগেই এসে উপস্থিত হয়। হেসে বলে,

রোজ রোজ আগে আসা ধরেছি, মাসি, তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছি। ওদিকে আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের ক্লাব উঠে যাবার জোগাড়! দুটো-তিনটে আপিশ মিলে মস্তবড় ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের, সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে, তা জানো? আমরা সাড়ে তিন হাজার তুলে দিতে পারলে, সরকারের কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার পাওয়া যাবে।

অলিমাসিমা অবাক হন।

সে কি! তোমরা মাসকাবারে মাইনে পাও; চাঁদা করে ক্লাব করেছ, ইউনিয়ন করেছ; নিজেই বলছ ইউনিয়ন হলে মাইনে বাড়ানর সুবিধে হবে; তার ওপর আবার সরকার কেন টাকা দেবে?

কেয়া হাসে।

জানো, মাসি, আমি হলাম গিয়ে ট্রেজারার আর অলক সেক্রেটারি। খুব ভালো হল না?

কিন্তু অলিমাসিমার ভালো লাগে না।

তুমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, ঐ একটা বাইরের বাজে ছেলে, ওর সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি খুব ভালো?

কেয়া বলে,

বাজে ছেলে হবে কেন, মাসি? খুব ভালো পরিবার ওদের, ও এম-এ পাস জানো? টাইপের আপিশে তিন শ টাকা মাইনে পায়, বাড়িতে বুড়ি মাকে রেখেছে, মোটেই বাজে ছেলে নয়, মাসি।

অলিমাসিমা ছাড়েন না,

তা না-হয় না হল। কিন্তু তুমি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সঙ্গে অত মেলামেশা আবার কেন!

কেয়া বলে,

কাকে বেশী মেলামেশা বল তুমি, মাসি? কোথাও যাও না কিনা, বাইরের লোক দেখলেই ভয় পাও। আর বিবাহিতা স্ত্রী? কার বিবাহিতা স্ত্রী? বরং হ্যাঁ, এটা বলতে পারো যে আমার একটা বিবাহিত স্বামী আছে।

মেম বিয়ে করে বিলেতে থাকে। কে জানে হয়তো কলেজে পড়া দু-তিনটে ছেলে-মেয়েও আছে এতদিনে, দো-রঙা দু-তিনটে ছেলেমেয়ে।

কেয়া খুব হাসে। ওকে বুঝে ওঠা দায়। অলিমাসিমা কথা পালটিয়ে বলেন,

যাই হোক সকাল সকাল যে আসো, আমি তাতেই খুশি। তুমি না আসা পর্যন্ত আমার বুক টিপটিপ করে।

কেয়া বলে,

ঠিক এসে যাব, তোমার কোনো ভয় নেই, রোজ আসব, যদ্দিন বলবে। তবে এই শনিবারের পরের শনিবার নয়। সেই শনিবার আমরা দল বেঁধে বর্ধমান যাচ্ছি। মস্ত মিটিং সেখানে, ওখানকার এক-আধটা আপিশও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তা হলে আরো বেশী সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

কেয়া বর্ধমান যাবে।

অলিমাসিমার রক্তস্রোত দ্রুততালে বইতে থাকে।

বর্ধমানে যাবে? সত্যি তোমরা বর্ধমানে যাবে, কেয়া?

কেয়া বলে, তাই তো ইচ্ছে।

তারপর অলিমাসিমার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলে,

কি হয়েছে, মাসি? ওরকম করে চেয়ে আছো কেন?

অলিমাসিমা কেয়ার হাত চেপে ধরেন—যদি যাও বর্ধমানে, আমার একটা কাজ করে দেবে, কেয়া? কিছু কষ্ট হবে না তোমার, ভারি সহজ কাজ।

কেয়া বলে,

নিশ্চয় দেব, মাসি, কি কাজ বল, সম্ভব হলে নিশ্চয় করে দেব।

অলিমাসিমার কণ্ঠরোধ হয়, অস্ফুটস্বরে বলেন,

পরে বলব, কেয়া। যদি সত্যি যাও, তখন বলব।

কেয়া হাসে।

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না মাসি, সত্যিই যাব। তবে সে শনিবার না হলে, তার পরের শনিবার। সেই অবধি অপেক্ষা করতে পারবে তো?

তার পরের শনিবার অবধি? অলিমাসিমা চল্লিশ বছরের ওপরে অপেক্ষা করে আছেন। এই আজকালই কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আজকালই মনে হয় কি জানি, শেষ পর্যন্ত যদি না-ই হয়। হাতের বড় কাছাকাছি এসেছে কিনা, অলিমাসিমার আজকাল তাই ভয় করে।

কেয়া ছাড়া কার না ভয় করে। নেপুর মা'র মেম দেখলেই ভয় হত। নেপুর তো মানুষ দেখলেই ভয়। কারা সব আত্মীয়স্বজন চন্দননগর থেকে এসেছিল, গুড়ের নাগরি-টাগরি নিয়ে। ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এল, তা নেপু রেগেই চতুর্ভুজ! কিন্তু সে সত্যিকার রাগ নয়, সে হল ভয়। আত্মীয়স্বজন কেউ এলেই নেপুর ভয়। বলে,

কেন আসে? কি চায় ওরা, অলিমাসি? কই, আমি তো যাইনে কখনো কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। ওরা কি মনে করে আসে, সে আমার অজানা নেই, মাসি। ভাবে এত সম্পত্তি ভোগ করবে কে? ভাবে আমাদের ছেলেপুলে নেই, নিজেদের নামে লিখিয়ে নেওয়া শক্ত হবে না। ছেলেপুলে নেই তো, ওদের কি মাসি? ওরা দিয়েছিল টাকা?

পুরোনো লোম-ওঠা লাল মখমলের চেয়ারখানাতে বসে পড়ে নেপু; যা মনে হয় বলে যায়,

কিন্তু ওরা কেউ জানে না কারো কিছু পাবার জো নেই। ওঁর টাকা সব যাবে হাসপাতালে, আর বাবার সম্পত্তি পাবে ঐ আনন্দ। আনন্দর কি স্বাস্থ্য দেখেছ, অলিমাসি! আবার আমাকে খোঁড়ে! ওর মামার বংশে ছেলে বাঁচে না, জানো? সবার ঘরে দুটো একটা জন্মায়, পঁচিশ বছর বয়স না হতেই খতম। কাকাও তো ত্রিশ পার হননি। আর আনন্দর শরীরটা একবার চেয়ে দেখ। লাল টকটক করছে স্বাস্থ্য। কখনো অসুখ হয় না ওর জানো অলিমাসি? অথচ এখানে তো ঐ রান্নাঘরের সামনে পাত পেড়ে মানুষ। কি জানি। আচ্ছা, অলিমাসি, আনন্দকে তোমার কেমন লাগে, সত্যি বল তো।

আনন্দকে কেমন লাগে? অলিমাসিমা অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন কাউকে কেমন লাগাটা তাঁর জীবন থেকে একেবারে বাদ পড়ে গেছে। কাউকে কেমন লাগে, মুখ ফুটে কখনো তো বলেনইনি, নিজের মনেও কখনো তলিয়ে দেখেননি।

কেমন লাগত নেপুর বাবাকে? নেপুর মাকে? নেপুর বাবা। কি রূপ, কি শক্তি, রাজার মতো চোখ ঝলসে দিতেন—ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার জায়গা রাখতেন না। তাঁকে আবার ভালোমন্দ লাগবে, অলিমাসিমার আস্পর্ধা কতখানি?

নেপুর মা। দু হাতে তাঁর সেবা করেছেন অলিমাসিমা, দু হাত পেতে তাঁর প্রসাদ নিয়েছেন। অকাতরে দিতেন। সে দান ওঁর গায়েও লাগত না। এ বিছানার চাদরটা কেমন চকচকে মতো, ওতে আমি শুতে পারব না, নে অলি।

আমার কালো চটিটা আর ভালো লাগে না, অলি, তুই পরিস। দেখ, মেজমা কি সুন্দর ফরাসী বোনা স্কার্ফ পাঠিয়েছেন, তুই আমার পুরোনো সাদাটা নিস, অলি, ঐ কোনাটা সেলাই করে নিস।

আরো কত কি দিতেন যা অলিমাসিমার কোনো কালেও কোনো কাজে লাগতে পারে না। রেশমী রুমাল, জাপানী হাতপাখা, জরির হ্যাণ্ড-ব্যাগ, স্যাটিনের জুতো। সব হাত পেতে নিয়েছেন অলিমাসিমা। প্রসাদ কি কখনো ফিরোতে আছে? সব নিয়েছেন, পরে বটফলের বাবার পুরোনো জিনিসের দোকানে বেচে দিয়েছেন। যা দাম তিনি ধরে দিয়েছেন তাতেই অলিমাসিমা ছেড়ে দিয়েছেন, কোনোদিনও দরদাম করেননি।

সেই থেকেই ওদের পরিবারের সঙ্গে অলিমাসিমার ঘনিষ্ঠতা। মনে আছে বটফলের বাবার মরার সময়—কি আজেবাজে কথাই যে মনে পড়ে অলিমাসিমার, নিজের চিন্তার কোনো খেই থাকে না। হ্যাঁ, নেপুর মাকে অলিমাসিমা সারাজীবন উপযুক্ত ভাবে সম্মান করে এসেছেন। ভালো-মন্দ-লাগার কথা মনেও আসেনি।

বোধ করি উত্তর চায়ওনি নেপু, এমনি কথাটা বলেছিল। অলিমাসিমা অন্যমনস্কভাবে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভাবেন, ভালো-লাগা-লাগির কথা ওঠে সমানে সমানে। যেমন হিংসেও হয় সমানে সমানে। সূর্যকে কি কেউ হিংসে করে? আনন্দ কি আর অলিমাসিমার সমান, যে ভালো লাগবে, বা মন্দ লাগবে।

তবে নেপুর পেছনে সে যে বড্ড লাগে, সে কথাও সত্যি। চোখ দুটি মিটিমিটি জ্বলে, মুখে নানারকম মজার কথা বলে। নিষ্ঠুর সব মজার কথা, এমন সব নির্মম কথা, যার আঘাতে নেপুর মনটার ওপর থেকে সব আবরণ ছিঁড়ে উড়ে যায়, ন্যাড়া মনটা সকলের চোখের সামনে ধরা পড়ে যায়। চোখ ঢাকতে ইচ্ছে করে।

তবু চোখের সামনে বারে বারে ভেসে ওঠে ছোট একজন আনন্দ; নেপুর বাবার ছোট ভাইএর ছেলে আনন্দ; ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, সুন্দর একজন আনন্দ; কিছুতেই একতলার ঘরে থাকবে না সে-আনন্দ, বারে বারে ঘুরে ঘুরে দোতলায় উঠে আসবে, বসবার ঘরে ঢুকবে, নেপুর বাবা-মা'র অতিথিদের সামনে গিয়ে বসে থাকবে, খাবারের ভাগ নেবে; সে আনন্দকে নেপুর বাবা মা কিছু না বললেও, সুবিধে পেলেই নেপু দূর করে তাড়িয়ে দিত; ছ্যাঁচোড় বলত, ছোটলোক বলত, মামার বাড়ির দৈন্যদশা নিয়ে টিটকিরি দিত, এমন এক আনন্দ; নেপুর সমানের বয়সী ছোট্ট এক সুন্দর আনন্দ। সে আনন্দকে তখন অলিমাসিমা যেন দেখেও দেখতেন না। এখন সে অলিমাসিমার দৃষ্টিতে বারে বারে ফিরে আসে, এখনকার এই আনন্দকে আর সাদা চোখে দেখতে দেয় না।

নেপু বসে থেকে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, অলিমাসিমা, নারকোল গাছে ক'টা নারকোল হল এবার?

অলিমাসিমা বলতে পারেন না, নারকোলের কথা আদৌ মনেই ছিল না তাঁর, জামাইয়ের এত অসুখ গেল।

সে কি, অলিমাসিমা, নিচের ঘরে তুমি যেখানে রাঁধো, তারই সামনে তো নারকোল গাছটা।

তাও সত্যি। উঠোনে তো ঐ একটিমাত্র গাছ, আর তো কোনো গাছের সঙ্গে অলিমাসিমার সম্পর্কই নেই। কথাটা মনে না পড়া ঠিক হয়নি। নেপু খুঁতখুঁত করে।

গাছপালার সঙ্গে ঐ ছাড়া তো আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। পেছনের বাগানে কি হয় না-হয় সে তো নকুড়বাবুই জানেন, তার সঙ্গে আমাদের শুধু টাকার সম্বন্ধ। কিন্তু এ গাছটা আমাদের নিজেদের, এটার কথাই ভুলে গেলে!

অলিমাসিমার নয়ন জুড়ে আছে আরেকটা গাছ, ডাল-পালা মেলে, দোতলার সমান উঁচু একটা হিমসাগর আমের গাছ, তাতে মেঘের মতো ফল ধরে নিশ্চয়। কে জানে, দাদারা খায়, না বেচে দেয়। এ বছর তো টাকায় মোটে চারটে গেল। হয়তো দু শ আম ধরেছিল, দাদা তাহলে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে। সে পঞ্চাশ টাকা দাদা নেয় কি করে, সে তো অলিমাসিমার টাকা।

ফলপাকড়ে অবিশ্যি অলিমাসিমার কোনোই লোভ নেই। কোনোদিনই ছিল না। কোনো খাবার জিনিসেই ছিল না। এখন না খেলে বটফলরা দুঃখিত হয়, হাতে করে তৈরী জিনিস নিয়ে আসে, এমন কিছু বড়লোকও নয় তারা, তাই নিতে হয়। নইলে কি খেলেন না-খেলেন সেদিকে অলিমাসিমার মনই নেই।

আর শুধু খাওয়া কেন? এইতো এককালে এ বাড়িতে এত বিলাসিতা ছিল, তার মাঝেও তো অলিমাসিমা বাস করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিলাসের জিনিস নাড়াচাড়া করেছেন, কই কখনো তো হাতে তুলে কিছু নিয়ে নিতে ইচ্ছে করেনি।

ফরাসী সেন্ট-ই আসত কত রকমের। ছোট্ট ছোট্ট শিশি, সোনালী রিবন দিয়ে মালার মতো করে গাঁথা, একেকটা শিশিতে এক এক রকম সুগন্ধ। প্রকাণ্ড পিপের মতো কাঁচের বোতল, তার মুখে একটা লাল রেশমী সুতোর

পাম্প লাগানো, সেটি একটু চেপে ধরলেই নল দিয়ে মিহি ধোঁয়ার মতো সুগন্ধ বেরোত। নেপুর মা বেরুবার আগে ছুলে দিতেন। কাপড়ের পাটে পাটে ছোট ছোট সবুজ রেশমী থলে করে ল্যাভেণ্ডার রাখা থাকত, চন্দনকাঠের ছিলে থাকত। নেপুর মা মিহি একটা সুগন্ধের ঢেউ তুলে চলাফেরা করতেন।

কড়া কিছু তাঁর মনে ধরত না। ভালো জিনিস না হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন না। স্নানের আগে তাঁর জন্য বাদাম বেটে দিতে হত। রবিবার রবিবার রিঠে দিয়ে মাথা ঘষে দিতে হত। পায়ের পাতায় রোজ রাত্রে দুধ ঘষে ঘষে শুকিয়ে দিতে হত।

তখন এক মুহূর্ত সময় হাতে থাকত না অলিমাসিমার। ভারি ভালো লাগত। সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যে করে যেতেন বটফলের বাড়ি। তখন বটফলের সঙ্গে এতটা দহরম মহরম ছিল না, তার বয়সটা নেহাত কাঁচা ছিল। ভাব ছিল বটফলের বড়দিদির সঙ্গে। সে বিয়ে করে বিদেশ চলে যাবার পর থেকে বটফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তার সঙ্গে বহুদিন হল চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ।

আগে মাঝে মাঝে অলিমাসিমার ভারি ইচ্ছে হত, বটফলদের এ-বাড়ির ঐশ্বর্য দেখিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে। কিন্তু ওরা আসতে চাইত না। বটফলের কাকা নাকি কিছুদিন এখানে বাজার-সরকারের কাজ করেছিলেন। কি সব হিসেবপত্র নিয়ে গোলমাল হয়, কাকার অবিশ্যি আসলে কোনই দোষ ছিল না, যাই হোক শেষ পর্যন্ত চাকরিটি গেল। তাই বটফলের ভারি লজ্জা করে।

কিন্তু বটফলরা কেন, ওর কাকাও স্বচ্ছন্দে আসতে পারতেন, এ-বাড়িতে কেউ কাকেও মনে রাখত না। অলিমাসিমা জানতেন, এই যে অলি নইলে নেপুর মা'র এক দণ্ড চলে না, আজ যদি অলি চলে যায়, অমনি আরেকটি অলি এসে জুটবে। পুরোনো অলি একটুখানি ফাঁকও রেখে যাবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন অলিমাসিমা। একটা গোটা মানুষ হতে হলে কি কি লাগে? তার কতটা জুটেছিল অলিমাসিমার কপালে?

দুনিয়াতে এমন জায়গা কোথায় আছে যেখানটা অলকানন্দা বলে একজন মানুষ নইলে অসম্পূর্ণ থাকবে, অলকানন্দা ছাড়া আর কিছু দিয়ে যেখানে চলবে না? অলকানন্দা বলতে কষ্ট হয় বলে কেউ সেখানে অলি বলে ডাকবে না?

। ৬ ।

আছে অমন জায়গা বর্ধমানে। বেয়াল্লিশ বছর না-দেখা জায়গাটির প্রতিটি ঘাসের ফলক যেন মনে পড়ে। তবে ওসব ঘাস তুলে ফেলতে হবে, তার জায়গায় দুব্বোঘাস লাগাতে হবে, ঘন সবুজ নরম দুব্বোঘাস। আর মনসাগুলোকেও রাখা চলবে না। তারের উঁচু বেড়া দিয়ে তার ওপর মোমলতা উঠিয়ে দিতে হবে। খানিক আব্রু থাকা ভালো।

দাদা হয়তো একটু চটবে; বলবে,

কেন, আমরা তাকালে কি ওর জাত যাবে নাকি?

কিন্তু ওদিকটা বন্ধ থাকাই ভালো, দাদার ছেলেমেয়েরা নইলে হয়তো ভারি উৎপাত করবে। হয়তো রাঁধাবাড়া করতে দেবে না। হাত পেতে খালি খালি বলবে, দে পিসি, দে। অমন কথা কেউ কখনো অলিমাসিমাকে বলেনি।

বুকের ভেতর কোথায় যেন ব্যথা করতে থাকে অলিমাসিমার। নারকোল গাছের গুঁড়ির দিকে অন্ধ চোখে চেয়ে থাকেন, কিছু দেখতে পান না, চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। কোনো খেয়াল থাকে না, ভাতের হাঁড়ি চড়চড় করে ওঠে। চমকে অলিমাসিমা হাঁড়ি নামান।

কোথায় দাদার ছেলেমেয়ে? তারাও নিশ্চয় আধবুড়ো হয়ে গেছে এতদিনে।

বেয়াল্লিশ বছর কি কম সময় গা? পাতলা শরীর ছিল অলিমাসিমার তখন। দাদা মোটা মোটা মিলের দশহাতী থান কিনে দিত, জামার জন্য মার্কিন আসত। একটা দাঁতভাঙা চিরুনিও বৌদি দিয়েছিল। ঠাকুর-মশায়ের বাড়ি যাবার সময় খবরের কাগজে জড়িয়ে ঐ একখানি কাপড় জামা ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতেও পারেননি।

গামছা ছিল না। তাই দেখে ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না, নিজের গামছা অপরকে দিতে কারই বা ইচ্ছে করে? অলিমাসিমা কাকেও কখনো নিজের গামছা দেননি। দিতে হয়নি কখনো, কেউ চায়ওনি। শুধু গামছা কেন, কোনো জিনিসই কেউ চায়নি। লোককে কিছু দেওয়া মানেই অযথা খরচ, দান করবার জন্য যদি ভগবান অলিমাসিমাকে পাঠাত, তা হলে তার ব্যবস্থাও করে পাঠাত। যেমন পাঠিয়েছিল নেপুর মাকে। রাতে বিজলি বাতির আলোতে যদি কাপড় পছন্দ হল, তো দিনের আলোয় সেই কাপড় দেখেই, আর মনে ধরে না। যদি পরা হয়ে গিয়ে থাকে সেই রাত্রেই, তো অমনি রইল পড়ে। পরে কোনো আত্মীয়ের মেয়ের ওপর খুশি হলেন, তাকেই দিয়ে দিলেন। আর নতুন থাকলে দোকানে ফেরত যেত। সেখান থেকে দিনের বেলাতেই গাঁটরি বোঝাই নতুন কাপড় আসত, ইচ্ছে-মতো পছন্দ করে নিতেন। একখানি ফেরত গেল, তার বদলে হয়তো তিনখানি রাখা হল।

তবে এসব থেকে অলিমাসিমার সব সময় লাভ হত না, তাঁর যে সাদা থান ছাড়া কিছু পরতে নেই। কিন্তু নেপুর মা শৌখীন মানুষ, মিহি থান আনিয়ে দিতেন; ঢাকাই থানও পরেছেন অলিমাসিমা। এখন নিজের কিনতে হয়, অতটা ভালো কেনেন না, তবে এগুলোও শান্তিপুরে থান। জামাগুলি আদ্দির। অলিমাসিমার বড় ভয়, কেউ যদি ঝি বলে ভুল করে। সে তিনি সইতে পারবেন না। এদের আত্মীয় তিনি, তাতে এদেরকেও ছোট করা হবে।

বটফলরাও তাই জানে, বড়বাড়ির নিকট আত্মীয়া উনি, বাড়ির মাথাই একরকম বলতে গেলে। সেজন্য যথেষ্ট সমীহও করে ওঁকে। যে মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগার করে খায় তারা মনে মনে পরমুখাপেক্ষীদের দারুণ শ্রদ্ধা করে, হিংসে করে। আশ্চর্য!

ক্যান্টিনের কাজটার কথা বটফলকে বললে, তারা ভারি অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। হয়তো তাদের চোখে অলিমাসিমাকে একটু খর্বও হয়ে যেতে হবে। এ পাড়ার মেয়েরা সবাই নিশ্চয় আশ্চর্য হবে; তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কতরকম আলোচনা করবে; ভাববে হয়তো বড়বাড়ির কর্তার ঐশ্বর্যে এতদিন বাদে ভাঁটা পড়েছে, তাই বিধবা গুরুজনদের দিয়েও কাজ করাচ্ছে!

এঁটো বাসনগুলো নারকোল ছোবড়া আর সোডার গুঁড়ো দিয়ে মাজতে মাজতে অলিমাসিমা ভাবেন। কি জানি, বাসন মাজার ঝি-টাকে নেপু ছাড়াল কেন কে জানে!

এত কথা বটফলরা কিছুই জানে না। আজকাল আর তাদের এ বাড়িতে আনাগোনা অলিমাসিমা মোটে পছন্দ করেন না। আর তারা তো আসতেও চায় না। কিন্তু সমিতির অন্য মেয়েদের ভারি কৌতূহল।

নেপুর বাবার আমলে, বড়দিনের সময় পোস্টাপিশের পিওনরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে, এ বাড়ি থেকে কত বখসিস নিয়ে গেছে, পেছনের উঠোনে দাঁড়িয়ে চা-জিলিপি খেয়ে গেছে। তাদের মুখে শোনা গল্প, এরা রুপোর বাসনে খাওয়া-দাওয়া করে; সে গল্প পোস্টমাস্টার মশায়ের গিন্নীর দৌলতে এখনো সকলে বলাবলি করে।

তাদের ঠেকানো ভারি শক্ত; জামাইয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হয়। নইলে তাদের আস্পর্ধার আর অন্ত নেই।

অলিমাসিমা অবাক হয়ে ভাবেন বেয়াল্লিশটা বছর এমনি-এমনি কেটে গেল, টেরও পেলেন না। তবে ফাঁকা মোজাটা মোটা হয়ে, ভারি হয়ে উঠেছে, সে তো কম কথা নয়। যা ছিল রাতের স্বপ্ন, সেও প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তাই আজকাল আর যেন ধৈর্য থাকে না।

কেয়ারা যাবে বলেছে বর্ধমান। অলিমাসিমা ঠিকানা দিয়ে দেবেন, পথ বলে দেবেন। একবার জায়গাটা দেখে আসা ভালো। অলিমাসিমার কাছে জায়গাটার ছোট্ট একটা পেনসিলে আঁকা নক্সাও আছে, ঠাকুরমশায় করে দিয়েছিলেন। ভারি ভালো আঁকার হাত ছিল তাঁর। ধার দিয়ে, ধার দিয়ে, মাপগুলোও লিখে দিয়েছিলেন। চার কাঠার চাইতেও কয়েক ছটাক বেশী, দিব্যি চারকোনা ছিমছাম জায়গাটি।

দেখে আসুক কেয়া। তবে খুঁজে পেতে হয়তো একটু অসুবিধে হতে পারে। ঠাকুরমশায় শেষবার লিখেছিলেন নাকি আশেপাশের পোড়ো জমিগুলোতে সব বাড়ি উঠে গেছে। লোকদের পছন্দও বলিহারি! আঁস্তাকুড়ের মতো সব জমি, তার ওপরেও বাড়ি তুলেছে।

কে জানে রাস্তাটির নামও বদলে গেছে কিনা, আজকাল তো হ্যারিসন রোডেরও কি যেন একটা নতুন নাম হয়েছে, অলিমাসিমা ঠিক মনে করতে পারছেন না।

তবে কেয়া চালাক মেয়ে, ও ঠিক খুঁজে বের করবে। অবিশ্যি সব কথা ওকে বলা চলে না, নিভৃত অন্তরের কথা অলিমাসিমা মুখ ফুটে কাকেও বলতে পারেন না। বড় একটা বাড়ি, তার পেছনে অলিমাসিমার জমি, এটুকু অবিশ্যি বলা চলে। নইলে কেয়া হয়তো নজর করে দেখে আসবে না। দাদার বাড়ি না-ই বললেন। শুধু নামটা বললেই হবে।

কেয়া আপিশ থেকে ফিরলে তোলেন কথাটা অলিমাসিমা।

যাচ্ছ তো ঠিক, কেয়া? এই শনিবারই যাবার কথা না? আমার কথাটা মনে আছে?

বড় বেশী আগ্রহটা চেপে রাখতে হয়, গলাটা কেমন ধরা-ধরা শোনায়।

কেয়া বলে,

সেইরকমই তো ঠিক আছে, মাসি, তবে জানোই তো আপিশের সব ব্যাপার। কর্তারা যেই টের পাবেন পুঁটি-মাছরা কিছুতে আনন্দ পাচ্ছে, অমনি সেটি বন্ধ না করা অবধি তাঁদের শান্তি থাকবে না।

অলিমাসিমা বলেন,

এ ভারি অন্যায়, শনিবারের বিকেলের দিকে তোমরা কি কর না-কর, ওঁদের তাতে কি?

নয় কিছুই; ঐ আর কি। দিল হয়তো অলককে এক্সট্রা ডিউটি চাপিয়ে। কিছুই বলা যায় না।

অলিমাসিমা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

যাচ্ছে অলোকও তোমাদের সঙ্গে?

কি মুশকিল, ও না গেলে চলবে কেন? ও-ই তো সেক্রেটারি। বলেছিলাম না তোমাকে মাসি, ও সেক্রেটারি আর আমি ট্রেজারার, হিসেবপত্র সব আমার হাতে। দুজনার সই দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাপত্র তুলতে হয়। আর দুদিন বাদেই সরকারী টাকাটাও এসে যাবে, তখন একেবারে হাজার হাজার টাকার কারবার হয়ে দাঁড়াবে। ইচ্ছে করলে দুজনে সই দিয়ে, টাকাটি তুলে, একদম ভেগে পড়তেও পারি। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কি বিশ্রী সব কথা কেয়ার। কোন একটা গাম্ভীর্য নেই। কিন্তু অলোক গেলে হয়তো সবসময় কেয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, টুক করে একবার গিয়ে জমিটা দেখে আসার সুবিধে হবে না।

কেয়াকে কথাটা না বললেই নয়।

আরে, না না। এতই যখন গোপন ব্যাপার, অলককে না জানিয়েই দেখে আসব। তবে খুঁজে বের করা মুশকিল হতে পারে। ও বর্ধমানে অনেকদিন ছিল। পথঘাট ওর সব চেনা।

বেশ, না হয় ওকে সঙ্গে নিয়েই যেয়ো, কিন্তু জমিটা যে আমার তা যেন আবার ওকে বোলো না। হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আছে, তার পেছনেই, একেবারে লাগোয়া চার কাঠা জমি।

কেয়া একটু অবাক হয়। বলে, কি এত গোপন কথা বুঝলাম না; তবে যখন বারণ করছ, ওকে আর তোমার নামটা বলব না। বলব আমার এক আত্মীয়ের জমি। কেমন, তা হলে হবে তো?

অলককে ভালো লাগে না অলিমাসিমার। কি রকম একটা রুক্ষ-রুক্ষ অগোছালো ভাব, খদ্দরের কাপড়-জামা পরে, চুলগুলো বড্ড লম্বা, কেমন একটা চালাক-চালাক ঢং; দেখলেই অলিমাসিমার গা জ্বালা করে।

ঠিক অভদ্র নয়, বরং বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলে। কিন্তু সব কথার মধ্যে এ-বাড়ির, আর শুধু এ-বাড়ির কেন, সব বনেদী বাড়ির প্রতি কেমন একটা খোঁচা দেওয়া থাকে। যেন এরা চেষ্টাচরিত্র করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে, ভারি একটা অন্যায় করেছে।

ও-ই নাকি বর্ধমানে ছিল! কোন্ দিকটায় থাকত কে জানে। বর্ধমান তো আর একটুখানি জায়গা নিয়ে নয়। তবু জায়গাটা হয়তো ওর দেখাও হতে পারে, হয়তো বা জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতে পারবে। কিন্তু ঐ রকম ছেলের কথাতেই বা বিশ্বাস কি। তারপর এখনি জমির কথা জানিয়ে দিলে, সেখানে যদি খবর-টবর দিয়ে বসে। দাদা হয়তো বলবে,

ওঃ! ভারি আমার জমিদারনী হয়েছেন! ওঁর ঐ চারকাঠার জমিদারী দেখে আসবার জন্য আবার চর লাগিয়েছেন!

ঐরকম কথাবার্তাই যে দাদার। অলিমাসিমা এখন আর ওসব সইতে পারবেন না। এককালে অনেক

সয়েছেন। উঠতে-বসতে খোঁটা। খাওয়া নিয়ে খোঁটা। বিধবা মানুষের রাত্রে কেন আবার খিদে পায়, তাই নিয়ে কি সব বিশ্রী খোঁটা। স্বামী খেয়ে পেট ভরেনি, এইরকম সব কথা। কেয়াকে বলেন,

কেয়া, কথা দাও, বর্ধমানে পৌঁছবার আগে অলককে তুমি এ-বিষয়ে কিছু বলবে না। নেহাত যদি খুঁজে না পাও, শুধু তখনি বলবে।

কেন এত ভাবো, মাসি? বলেছি তো, চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে দেখে আসব। একা খুঁজব, আবার না পেলে অলককে নিয়ে খুঁজব, অত কি আর সময় পাব, মাসি? মিটিংটা থাকবে তো। তবে সেটা সন্ধ্যেবেলায়, শেষ ট্রেনে ফিরব আমরা। অনেক রাত করে বাড়ি আসব। তুমি গয়লাকে বলে রেখো, আমি ডাকলে, ও যেন খিড়কি খুলে দেয়। ওকে সেজন্য আট আনা পয়সা দেব।

অলিমাসিমা ভাবেন, তা হলে শনিবার রাত্রে আর খবরটা পাব না, সেই রবিবার সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কি করে কাটবে রাতটা কে জানে।

নেপুদের খাবার সময় হয়ে যায়। অলিমাসিমাকে উঠতে হয়। ট্রেতে বাসন সাজান, কেয়া অনর্গল বকে যায়।

জানো মাসি, আমাদের আপিশে দুজন ছোটসায়েব আছেন? তাঁদের মধ্যে একজন আবার মহিলা।

তা হলে ছোট মেম বল।

না, মোটেই মেম নয়, একদম বাঙালী ছোটসায়েব। হিঁদুবাড়ির মেয়ে নাকি, কালো বলে স্বামী নেয়নি, সুন্দর দেখে আবার বিয়ে করেছে। তাই ছোটসায়েবের বাবা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এম-এ পাস করিয়ে, কোন্ মন্ত্রী না কাকে ধরে, দিয়েছেন আপিশে ঢুকিয়ে। এদ্দিনে সে ছোটসায়েব হয়েছে। কি তার প্রতিপত্তি জানো না, মাসি, পিওনরা থরহরি কম্পমান, বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ওর ভয়ে।

কেয়া খুব হাসে। কেয়া বলে,

আরো শোনো, মাসি। দিল্লী থেকে বদলি হয়ে এল মুকুন্দবাবু বলে এক কেরানী। ক্যাবলার একশেষ, আর এই বড়-বড় কথা, কাজ ফেলে দিনরাত তক্কাতক্কি। আর পড়বি তো পড় একেবারেই ছোটসায়েবের সামনে! সক্কলের সামনে ছোট সায়েব দিলে তাকে তুলো ধুনে। আর সে শুধু ভূত দেখার মতো চেয়ে রইল!—বিশ্বাস করবে, মাসি, ঐ নাকি ওর সেই স্বামী!

অলিমাসিমা এবার সত্যি আশ্চর্য হন।

তাই নাকি? এখন স্ত্রী বড় চাকরি করে, এতদিনে বোধ হয় মিটমাট হয়ে গেল।

মিটমাট? কি যে বল, মাসি, তিনটি মাস ছোটসায়েব তাকে নাকের জলে চোখের জলে করলে। শেষটা সে নিজে থেকে ট্র্যান্সফার চেয়ে চলে গেল সাহেবগঞ্জে! হয় কখনো মিটমাট? কি যে বল!

অলিমাসিমা বলেন,

কিন্তু সে তো জোর করতে পারত? স্বামীর তো আইনের জোর থাকে। ওঁর সব রোজগারটি যদি কেড়ে নিত, উনি একটু টুঁ শব্দও করতে পারতেন না। পোস্ট-মাস্টার মশায়ের শালীর বদমাইস স্বামী তাই করে, তার কিছু করবারো উপায় নেই!

কেয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

কে বলেছে উপায় নেই? তোমার ওসব আইন পালটে গেছে। ইচ্ছে করলেই উনি ওঁদের বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন। দিয়েছেনও হয়তো, কে জানে। আমারও তো তাই ইচ্ছে করে।

কেয়া হাসে, কিন্তু মুখটা একটু সাদা মনে হয়। না, কেয়াকে চটানো নয়। অলিমাসিমা যত্ন করে ট্রে সাজিয়ে ওপরে চলে যান। রোজকার মতো ভারি ট্রেখানি কেয়া সিঁড়ি দিয়ে তুলে দিয়ে আসে।

বাসন নিয়ে আধঘণ্টা বাদে নেমে এসে দেখেন কেয়া শুয়ে পড়েছে।

বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এই সময় কেয়ার অসুখ করলে কি হবে? শনিবার যদি যেতে না পারে?

অলিমাসিমার পায়ের শব্দ শুনে, বালিশ থেকে মাথা তুলে কেয়া বলে,

তুমি খেয়ে নাও, মাসি, আজ আমার খিদে নেই, ক্লাবের কমিটি মিটিং-এ জোর চা খাইয়েছে।

সত্যি-মিথ্যা ভগবান জানেন। যাক, তবু শরীর যে খারাপ করেনি সেই যথেষ্ট। কে জানে কি ভাবে ও, কাউকে তো কখনো কিছু বলে না। অলিমাসিমাই বা কাকে তাঁর মনের কথা বলেছেন?

নেপুরা খেয়ে-দেয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে। ন'টার পর আর নিচে নামবার উপায় থাকে না। সিঁড়ির মাঝ-খানকার দরজার তালার বড় চাবিটা এইখানে, অলিমাসিমার পায়ের কাছে, দেরাজের ওপর থাকে। নিচে যাবার জন্য প্রাণ আইঢাই করে, তবু অলিমাসিমা নিচে থেকে নিঃশব্দে একবার ঘুরে আসার কথা মনেও করতে পারেন না।

নেপুর মার কোনো কথারই অমর্যাদা করেননি কখনো।

কারণও জানতে চাননি। অদ্ভুত সব হুকুম দিতেন মাঝে মাঝে নেপুর মা। নিচের তলার সামনের দিক্‌কার বড় হলঘরের পাশে নেপুর বাবার পড়বার ঘর, অনেক রাত অবধি সেখানে তিনি পড়াশুনো করেন। হঠাৎ হঠাৎ অলিমাসিমার হাতে দিয়ে খাবার জল পাঠিয়ে দিতেন রাত-দুপুরে।

নেপুর বাবা হেসে জলটি নিয়ে, জানলা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। তার পর খালি গেলাস অলিমাসিমার হাতে দিয়ে বলতেন, যাও, এবার নিশ্চিন্ত করে দাও। অলিমাসিমা খালি গেলাস নিয়ে গুটি-গুটি ওপরে এসে সব কথা বলতেন। জল ফেলে দেওয়ার কথা শুনে,

নেপুর মা-ও একটু হাসতেন, কিন্তু দুদিন বাদে, আবার পাঠাতেন।

এই ঘরেই শুয়ে থাকতেন অলিমাসিমা, ও-ঘরে নেপুর মা-বাবা শুতেন, মাঝখানকার ভারি দরজাখানি বন্ধ থাকত, পাশের দরজা দিয়ে অলিমাসিমা যাওয়া-আসা করতেন।

ঘরখানি তখন অন্যরকম ছিল। মেঝেতে পুরু হলুদ রঙের গালচে পাতা ছিল। অলিমাসিমার বিছানার ওপরেও দিনের বেলায় মোটা হলুদ রেশমী ঢাকনি পাতা থাকত। ঘরময় কি যে একটা সুগন্ধ ভুরভুর করত, যে এসে দু দণ্ড এ-ঘরে দাঁড়িয়েছে, তারই গায়ে অনেকক্ষণ অবধি লেগে থাকত।

রাতে যেই আলো নিভিয়ে দিতেন, অমনি ছায়াময় ঘরখানি যেন আরো অপরূপ হয়ে উঠত। তার মাঝখানে শুয়ে শুয়ে অলিমাসিমা চোখের সামনে দেখতে পেতেন বর্ধমানের গলির ভেতর চারকাঠা মাপের একফালি জমি, আশেপাশের পোড়ো জমি থেকে আলাদা হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

ঘরখানি আর তখন নীরব থাকত না, অলিমাসিমার বুকের স্পন্দনকে ছাপিয়ে ঝাঁপতালের সুর বেজে উঠত। ঝাঁপতাল কাকে বলে জানেন না অলিমাসিমা; নিভৃতে যে বাজে, ভাবেন সেই বুঝি ঝাঁপতাল। মনের ভেতরকার যে সুর, সেই বুঝি ঝাঁপতাল।

॥ ৭ ॥

শনিবার আর আসতে চায় না। এর মধ্যে আনন্দ আরেকবার জামাইয়ের খোঁজ নিয়ে গেল। সঙ্গে করে জামাইয়ের বন্ধু ঘোষকেও নিয়ে এল। আধাবয়সী আমুদে ভদ্রলোক, রং জ্বলা, লোম-ওঠা, লাল মখমলের চেয়ারখানিতে বসে কত কি বলে গেলেন। দোকান থেকে গয়লা গিয়ে খাবার কিনে আনল, অলিমাসিমা চা করে দিলেন। মাঝখানে কেয়া এসে পড়ল, তাই শুনে জামাই আনন্দকে পাঠিয়ে তাকে ধরে আনাল। কেয়া হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকল। অলিমাসিমা তার দেমাক দেখে হার মানলেন, এত অহঙ্কার যে জেদ করে নিজের দাম বাড়াতেও কখনো চেষ্টা করবে না।

ওদের সঙ্গে বসে চা-জলখাবারও খেল কেয়া। পরে, ঘোষ বিদায় নেবার পর, নিচের খাবার ঘরে আনন্দের সঙ্গে কেয়ার সে কি ঝগড়া! কেয়ার বড়সাহেবের কাছে ইউনিয়ন নিয়ে কেয়ার মাতামাতির কথা শুনে আনন্দ রেগে চতুর্ভুজ।

অলিমাসিমার সামনেই দুজনে দুজনকে কি সব কাটা-কাটা জ্বালা-ধরানো কথা বলতে লাগল। তার চাইতে ছোটবেলাকার মারপিটও যেন ভালো ছিল।

অলকের নামে যা-তা বললে আনন্দ। তিনটে আপিশে এই সব করে নাম কাটিয়ে এখানে এসে জুটেছে। ওর সঙ্গে এত মাখামাখি কিসের। যত রাজ্যের বাজে ছেলে পাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের ইউনিয়নের, বড়সাহেবের নিজের মুখে শোনা। এতদিন পরে কেয়া নিজের চাকরির না অসুবিধা করে। আরও পাঁচটা মেয়েও তো ঐ আপিশে চাকরি করে, তারাও তো ইউনিয়নের মেম্বার, কই তারা তো কেয়ার মতো নাচানাচি করে না। কেয়া তো আর কচি খুকীটি নেই, ওর কত বয়স আনন্দের খুব জানা আছে। মোট কথা, শনিবার বর্ধমান যাওয়া কোনমতেই হয় না।

কেয়া যে কখনো রাগে না, সেও যেন আজ একটু গরম হয়ে উঠল। এতগুলো কথা আনন্দ না হয় না-ই বলত। বাস্তবিকই কেয়া বর্ধমান যায় না-যায়, আনন্দের তাতে কি? কেয়ার গলা একটুও উঠল না, স্বরটা কিন্তু কি রকম কাঠ-কাঠ শোনাতে লাগল। কথাগুলোও ভারি নির্মম। আনন্দের আত্মসম্মানে আঘাত-দেওয়া কথা।

অলিমাসিমার বুক টিপটিপ করে। যেরকম জেদী ছেলে আনন্দ, শেষটা না বড়সাহেবকে বলে, ঐ যে কেয়া বলেছিল ডিউটি ফেলে দেয়, তাই না করে। আর চুপ করে থাকতে পারেন না অলিমাসিমা।

ও আনন্দ, বর্ধমানে ও শুধু মিটিং-এর জন্যে যাচ্ছে না, আমারো একটা কাজ করে দিতে যাচ্ছে।

ওরা দুজনেই হঠাৎ থেমে গেল। আনন্দ আরো কিছুক্ষণ ছিল, তার মধ্যে নেপু নেমে এল।

ওকি, তুমি এখনো যাওনি, আনন্দ? কিছু দরকার আছে?

আনন্দ তেমনি হেসে বলে, দরকার তো সর্বদাই আছে, নেপুদি, কিন্তু তোমার কাছে কি কিছু পাওয়া যাবে? ছোটবেলায় তো আমাদের চা থেকে চিনিটুকু মেরে দিতে।

নেপু রাগে বাক্যহারা হয়, আনন্দ হেসে বিদায় নেয়। নেপু কেয়ার দিকে ফিরে বলে,

অত হাসির কি হল, কেয়া? যত সব অভদ্র কথা শুনতে খুব মজা লাগে, না? আর তুমিও কি বলে ওকে আস্কারা দাও, অলিমাসি? ওর মনের ভাব কি রকম, বলিনি তোমাকে এক শ বার? উনি আসতে বলেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে অত কি গল্প, এদিকে ঢুকতেও দেবে না বলে দিলাম, মাসি। ও লোক সুবিধের নয়।

অলিমাসিমা বলেন,

তোমার আপনার খুড়তুতো ভাই, নেপু, আমাদের মুখে কি অমন কোনো কথা শোভা পাবে?

নেপু বলে, বেশ, তাহলে আমিই বলে দেব। তবে শুনবে বলে তো মনে হয় না। বাবার একটা কোনো আক্কেল ছিল না, নইলে দেয় কখনো অমন ছেলেকে সম্পত্তি! একটা লক্ষ্মীছাড়া, বাউণ্ডুলে! ভদ্রঘরের ছেলেদের মতো বিয়ে-থা করলো না, যা-তা করে বেড়ায় নিশ্চয়ই, মাইনে তো পায় অনেক শুনেছি। দেখো তুমি, বাঁচবে বহুদিন, ওর কোনোদিন কিছু হবে না।

কেয়া হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়। নেপু একটু থেমে কষ্টে হেসে বলে,

ওঃ! আনন্দর নিন্দা করছি, অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি? তোমাদের কেয়াটিও কম যায় না। বড়লোক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যারা অমনি-অমনি মানুষ হয়, তাদের ধরনই আলাদা হয়, অলিমাসি, সারাজীবন খেটে খেলে, তুমি তার কি বুঝবে।

নেপু চলে গেলে অলিমাসিমা ভাবেন, সারাজীবন খেটে কি বা খেলাম? চল্লিশ বছরে সাত হাজার টাকা।

নিজের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আলো না জ্বাললে সন্ধ্যেবেলায় আবছায়াতে ঘরখানাকে কেমন যেন লাগে। মেহের আলির কথা মনে হয়। ঐ ডাকের সামনে উঁচু টুলে বসে থাকত। সাহেব যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে, মেহের আলি সাদা পোশাক পরে ওখান থেকে নড়বে না। সাহেবের সঙ্গে কোর্টে যেত আসত। এসেই সাহেবের জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে, আবার ঐখানে বসে থাকত। গলা তুলে ডাকতেও হত না, সায়েব একবার ওর নামটি উচ্চারণ করলেই হল, অমনি গিয়ে হাজিরা দেবে। কে জানে কি করে বুঝত।

খাবার ঘরের আর এ-ঘরের মাঝখানে এতখানি দেয়াল কাটা ছিল, সেই দিকে মেহের আলির চোখ থাকত। খাবার ঘরের দরজায় ঘি-রঙের লেসের পর্দা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে ওপারের বৈঠকখানা দেখা যেত, সে দিকে চেয়ে মেহের আলির দিন কাটত।

হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অলিমাসিমার মনে হয়, ঐ জায়গাটাতে উঁচু টুলে এখনো বুঝি মেহের আলি বসে আছে। সামনের দেয়ালের ফাঁকাটুকু নেপু কবে ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তবু সেই নীরেট দেয়ালের দিকে চেয়ে মেহের আলি বুঝি মুনিবের অপেক্ষায় বসে আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা ভাবেন, খেটে খেত মেহের আলি, শুখো মাইনে পেত চল্লিশ টাকা, বাড়িতে অনেকগুলি পোষ্য ছিল। নেপুর বাবা চোখ বুঁজবার পরদিনই নেপু তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছিল। মেহের আলিও তখন বুড়ো হয়ে গেছে, পা দুটো খুব ফুলতো মনে আছে। নেপু বলেছিল, কে জানে, হয়তো ছোঁয়াচে কিছু, ওসব ঝামেলা পুষতে নেই। দিয়েছিল এককথায় ছাড়িয়ে। মেহের আলি সেলাম করে চলে গেল, আর কোনো খবরও দিল না। সেরকম কিছু তখন মনেও হয়নি অলিমাসিমার।

খেটে খেত মেহের আলি, অলিমাসিমার মতো। সে চলে যাবার বহুকাল পরে দেশ থেকে তার বৌ কেঁদেকেটে চিঠি লিখেছিল মেহের আলি কেন চিঠি দেয় না, খরচ পাঠায় না, তাদের বড় কষ্ট। নেপু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল,

কোথায় মজা লুটছে কে জানে। এইসব খেটে-খাওয়া লোকদের জাতই আলাদা।

জামাইয়ের শরীর অনেক ভালো। শরীর ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাই যেন আবার তার খোলসের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। মাঝখানে একটু প্রগল্ভ হয়ে পড়েছিল, যাকে পেত তার সঙ্গে যেচে কথা বলতে চাইত। আনন্দ কিন্তু সে সুযোগ ছাড়েনি। জামাইকে ডাক্তার একটু বেড়াতে বলেছে। ব্লাড-প্রেসারের রুগীদের মোটরে বেড়ালে রোগ বাড়ে, এই বলে নেপু মহা আপত্তি

করেছিল। আনন্দ তার নিজের গাড়ি করে, নিজে চালিয়ে, গঙ্গার ধার থেকে রোজ একবার করে জামাইকে বেড়িয়ে আনতে লাগল।

নেপু ভেবে সারা, আনন্দ কোথায় কোনো অনিষ্ট করে না বসে। অলিমাসিমা ভাবেন আনন্দের আগ্রহের কারণটা কি শুধু জামাইয়ের প্রতি ভালোবাসা, না তার সঙ্গে নেপুকে রাগাবার ইচ্ছেও খানিকটা আছে।

রোজ ফিরে এসে জামাইকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে, এদিক থেকে একবার ঘুরে যায়, রোজ একবার কেয়াদের ইউনিয়নের খবর নেয়, কিন্তু আর ঝগড়া করে না।

এমনি করে শনিবার আসে।

দিন আর কাটতে চায় না। সকাল থেকে অলিমাসিমার উত্তেজনায় পেট ব্যথা করতে থাকে। কেয়া নিশ্চিন্ত মনে সব গোছগাছ করে নেয়।

ভুলে যাবে না তো, কেয়া? এই দেখ ঠিকানা লিখে দিয়েছি, কে জানে রাস্তার নাম বদলাল কিনা। বুঝলে, কেয়া, হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পেছনে লাগোয়া জমি, মাঝখানে একসারি মনসার ঝোপ ছিল, এখনো আছে হয়তো। আর এক পাশে একটা মস্ত হিমসাগর আমের গাছ।

কেয়া ঠিকানা-লেখা চিরকুটটা ভাঁজ করে ব্যাগে রাখে।

কেয়া, এই নক্সাটাও রাখো, যদি খুঁজে পেতে মুশকিল হয়, এই দেখ জমিটার নক্সা, আশেপাশের রাস্তাগুলোও নামসুদ্ধ দেওয়া আছে। তুমি একাই বেশ খুঁজে নিতে পারবে, ঐ অলকের সাহায্য নিতে হবে না।

কেয়া কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মনে হয় ভালো করে বুঝি শুনল না। অলিমাসিমা আবার বলেন,

ভুলো না, কেয়া, লক্ষ্মী মেয়ে—

কাগজ থেকে মুখ তুলে কেয়া জিজ্ঞেস করে,

তোমার অনেক দুঃখের ধন, না মাসি? তাই অমন করছ?

অলিমাসিমার গলার কাছটা টনটন করে; জোর করে বলেন,

না, না, তবে নিজের বলতে ঐ একফালি জমি ছাড়া আর তো কিছু নেই আমার। দেখে এসো নিশ্চয়ই, কেয়া, ভুলো না যেন।

রাঁধাবাড়া নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়েন অলিমাসিমা। কেয়া রওনা হয়। যাবার আগে, গোয়ালাকে দরজা খুলে দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বলে যায়।

একতলায় গভীর শান্তি বিরাজ করে। নারকোল গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন অলিমাসিমা, আসুক কেয়া, জমিটার কথা বলুক এসে। তা হলে মনে জোর পাব। বটফলের কাছে কথাটা পাড়তে পারব। নেপুকেও বলতে হবে।

অলিমাসিমার বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নেপুকে বলা খুব সহজ হবে না। নেপু তার হলদে চোখ দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে, দুটো কাঁচের মার্বেলের মতো হলুদ চোখে কোনো ভাবের লেশ থাকবে না। দু-তিনবার করে বলতে হবে অলিমাসিমাকে, নইলে কথাটা তার বোধগম্য হবে না।

রাগ করবে নেপু। এ বাড়ি থেকে অলিমাসিমা কত অনুগ্রহ পেয়েছেন, সব মনে করিয়ে দেবে। বলবে গরিব আত্মীয়স্বজনদের ধরনই আলাদা, যারা খেটে খায় তাদের জাত অন্যরকম।

অলিমাসিমা কোনো কিছুরই প্রতিবাদ করবেন না। জামাইয়ের কানে কথাটা তুলবে নেপু। অলিমাসিমার ভারি লজ্জা করতে থাকে। ছি ছি, জামাই কি মনে করবে!

তার চাইতে দুজনে যখন খেতে বসবে, তখন সামনাসামনি বলাই ভালো। কিন্তু জামাই অবাক্ হয়ে যখন জিজ্ঞেস করবে,

কেন, অলিমাসিমা, কিছু হয়েছে? আমি কিছু করতে পারি না?

তখন কি বলবেন অলিমাসিমা? নেপুর গঞ্জনার উত্তর তো খুব সহজ, চুপ করে থাকলেই হল। কিন্তু জামাইয়ের কথার যে কি উত্তর দেবেন, অলিমাসিমা ভেবে পান না। ক্যান্টিনে কাজ নেবার কারণ প্রাণ ধরে বলতে পারবেন না। টাকার জন্য এতকালের আশ্রয় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ কথা অলিমাসিমা উচ্চারণ করতে পারবেন না।

সারাদিন কেটে যায় অলিমাসিমার ভেবে ভেবে। বিকেলের দিকে আর থাকতে না পেরে, সকাল-সকাল রাতের রান্না সেরে, নেপুকে বলে, আধঘণ্টার জন্য বেরিয়ে পড়েন।

বটফলরা ভারি খুশি হয়। কোথায় যেন গির্জেতে কিসের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে, মেলা বসেছে, সেখান থেকে ফিরে, দেরী করে সব চা খাবার তোড়জোড় চলছিল।

বটফলের মা খুব রাগমাগ করছিলেন, কি সুন্দর সব খাবার-টাবার বেচছিল ওখানে, তা বৌমা কিছুতেই কিনল না। কেমন সব লুচি, আলুর দম, শোন-পাপড়ি।

ক্লান্ত ভাবে বটফল বলল,

কেন অবুঝের মতো কর, মা? ওসব খেলে তোমার অসুখ করবে। আমরাও তো কেউ খাইনি। ববি অতটুকু ছেলে, সে কিছু বলছে না, আর তুমি এরকম করছ! ছি!

বটফলের মা'র কান্না আসে।

তাই তো বলছি। ও ছোট ছেলে, সারা জীবন ধরে ও খেতে পাবে। কিন্তু আমি যে শিগ্গিরই মরে যাব, আমি ওসব আর কোথায় পাব?

অলিমাসিমা তাঁর ক্রুশ দিয়ে বোনা জালের ব্যাগ খুলে, বটফলের মাকে ছোট্ট এক শিশি জোয়ানের হজমি গুলি দেন।

একবেলা এক বড়ি, ওবেলা এক বড়ি খাবেন, দিদি, শরীর ভালো হয়ে যাবে।

বটফলের মা আহ্লাদে আটখানা, তখুনি শিশি নিয়ে ফসফস করে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

তবে সে না ক্যান্টিনের কথাটা পাড়া গেল। শুনে বটফল একটু গম্ভীর হয়ে গেল। লোক তো ওঁরা চাইছেনই, তবে এখন বটফলের কথা শুনলে হয়। তাছাড়া অলিমাসিমা পারবেন কি অমন ঝক্কির কাজ পোয়াতে, শুয়ে-বসে অভ্যস্ত তিনি।

শুয়ে বসে অভ্যস্ত। আজ পনেরো বছরের বেশী বড়বাড়ির সব কাজ অলিমাসিমা এক হাতে করে এসেছেন। অলিমাসিমার কোনো কষ্ট হবে না। মাস-কাবারে যার জন্য এক শ টাকা পাওয়া যাবে, এমন কোনো কাজই নেই যা অলিমাসিমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠবে না।

তবে সব কথা কি আর মুখে বলা চলে? অলিমাসিমা বললেন, জামাইয়ের শরীর ভালো না, ঝামেলার কাজের জন্য লোক ওঁদের আরো রাখতেই হবে।

তারপর বটফলের দাদার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন, তাছাড়া দাদা তো সবই জানেন, এখন আমার পেনসান নেবার সময় এসেছে, বাড়িটাও তুলতে হবে। বছর দুই ক্যান্টিনে কাজ করলেই সব টাকাটি উঠে যাবে।

সত্যি তো, বটফলের এত কথা মনে হয়নি। তা হলে অলিমাসিমাকে একবার নিয়ে যেতে হয় মিস্টার মণ্ডলের কাছে। একটা ভারি সুবিধে হয়েছে যে, অলিমাসিমার বয়স হয়েছে, নইলে যা সাংঘাতিক ভদ্রমহিলা ঐ মণ্ডল সায়েবের গিন্নী! কম বয়সের, কিম্বা ভালো দেখতে কোনো মেয়েকে ঘেঁষতেই দেবে না!

স্থির হল, জামাইকে এখন কিছু বলা নয়, মণ্ডলের সঙ্গে সোমবার দেখা করে, কথাটা পাকাপাকি করে, আসছে মাস থেকে কাজে লাগা। ততদিনে জামাইও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। কি আর এমন বয়স জামাইয়ের? বাড়ি ফেরার পথে অলিমাসিমা হিসেব করতে থাকেন। কতই বা বয়স জামাইয়ের? অলিমাসিমার সাতান্ন, নেপুর তা হলে পঞ্চান্ন; কবে যেন শুনেছিলেন, জামাই নেপুর চাইতে মাত্র তিন বছরের বড়, ওর তা হলে আটান্ন। আটান্নকে কিছু বুড়ো বলা চলে না। চাকর-বাকর নিয়ে ওদের বেশ চলে যাবে।

খিড়কির কড়া নাড়তেই গোয়ালা এসে খুলে দেয়। তাকে যেন একটু বিরক্ত-বিরক্ত মনে হয়।

কখন কেয়া-দিদি ফিরবেন, আর আমাকে রাত জেগে বসে থাকতে হবে?

রাত জেগে বসে থাকবি কেন, মঙ্গল? রান্নাঘরের দাওয়াটার ঐ কোনাটাতে খাটিয়া পেতে ঘুমিয়ে থাকিস। মাথার সামনেই দোর। কেয়াদিদির সাড়া পেলেই খুলে দিস। তোকে আট আনা পয়সা দেবে বলেছে।

পয়সার কথা শুনে খানিকটা নরম হয়ে আসে মঙ্গল। তবু বলে,

এত রাত করে আসা কেন, মাসিমা? পথে কত খারাপ লোক—

অলিমাসিমার আর মঙ্গলের সঙ্গে বকতে ইচ্ছে করে না। সংক্ষেপে বলেন,

শখ করে সে দেরী করছে না, মঙ্গল, ট্রেন পৌঁছবেই দেরী করে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন সবে আটটা বেজেছে। নিজের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়েন। খাটের ওপর চড়ে তাক থেকে কৌটোটা নামান। মাঝখানে গিঁট দেওয়া রেশমী মোজা তেমনি আছে।

খাটে বসে সত্তরটা নোট আরেকবার গুণে রাখেন। তার সঙ্গে একটা দশ টাকার নোটও রেখে দেন, এ মাসের হাতখরচটুকু।

রেশমের বোনা জিনিসে গিঁট ধরে না। কষে এঁটে আরেকটা ফাঁস পরিয়ে, মোজাটা তুলে রাখেন। ততক্ষণে সাড়ে আটটার কাছাকাছি হয়ে যায়।

আগে ঘড়িটা বাজত। শুধু বাজত না, বাজবার একমুহূর্ত আগে খট্ করে দুটো ছোট্ট দরজা মতন খুলে যেত। তার ভেতর থেকে চমৎকার সাজগোজ করা একটা সাহেব আর একটা মেম বেরিয়ে আসত, এসে ঐ বারান্দা-মতো জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে, আবার দুদিকের দুটি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ত।

নেপুর বাবা মারা যাবার পর থেকে কেন জানি ওটা

আর বাজে না। কিন্তু ঘড়িটা চলে। কে জানে ভেতরে কোথায় তারা দুজন বছরের পর বছর বসেই আছে।

॥ ৮ ॥

নেপুদের খাইয়ে, বাসন নিয়ে অলিমাসিমা নিচে নেমে আসেন। নেপুকে বুঝিয়ে নিচে শোবার ব্যবস্থা করেছেন। জামাই ভালো আছে, নেপুর ভয় গেছে। এখন যেন তারও অলিমাসিমার ওপরে থাকাটা পছন্দ হচ্ছে না। বলতেই, এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

অলিমাসিমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে, তালাটা লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

অলিমাসিমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, খাবার ঘরে পৌঁছে, বাসনগুলি ধুতে আরম্ভ করেন। এমন সময় ভেতর দিক্‌কার দরজা দিয়ে কেয়া এসে ঘরে ঢুকল।

অলিমাসিমা এমন চমকে গেলেন যে, হাত থেকে সবুজ ঘরবাড়িওয়ালা একটা প্লেট পড়ে গিয়ে খানখান হয়ে গেল। বিবর্ণ মুখে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। কেয়াও নিঃশব্দে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে, খিড়কি দরজা খুলে, বাইরের গলিতে ফেলে দিয়ে এসে বলল, আরেকটা বের করে নিও, মাসি, আপদ গেছে।—মিটিং হল না, মাসি।

অলিমাসিমা পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়লেন।

মিটিং হল না? যাওনি তা হলে বর্ধমানে?

কেয়া বললে,

না, না, গেছিলাম বইকি। সেখানে ওরা আশা করে থাকবে। মিটিংটা বন্ধ করে দেবার জন্যও তো যাওয়া দরকার ছিল। তবে শুধু অলক আর আমি গেলাম। বড়-সায়েব নোটিশ দিয়ে মিটিং বন্ধ করিয়েছেন।

অলিমাসিমার দিকে ফিরে একটু উত্তেজিত ভাবে বলে,

এ কার কাজ, জানো মাসি? আনন্দ ছাড়া আর কারো নয়। আসুক না কাল, ওকে আমি দেখে নেব।

কোনো কথাই অলিমাসিমার কানে যায় না। কিছু বলে না কেন, কেয়া? জমিটা কি ধ্বসে-টসে গেছে, কিম্বা ভূমিকম্প হয়ে পুঁতে গেছে? যত সব অসম্ভব কথা মনে হয় অলিমাসিমার। কেয়া কিছু বলে না, খালি আনন্দর ওপর রাগে ফুলতে থাকে। অলিমাসিমা আর পারেন না।

শেষটা কি সত্যি ভুলে গেলে, কেয়া?

কি ভুলে গেলাম, মাসি? ও, তোমার সেই জায়গাটা, না? তা, সেটা তো খুঁজেই পেলাম না। দু ঘণ্টা ধরে অলক আর আমি ঘুরে ঘুরে রাস্তাটাই পেলাম না। মেলা বাড়ি-ঘর, কারখানা, থানা এইসব হয়েছে ও-দিকটাতে। আবার সন্ধ্যেও হয়ে এল, রাস্তায় ভালো আলো নেই, ভালো করে খুঁজতেই পারলাম না, মাসি।

তারপর অলিমাসিমার রক্তশূন্য মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে,

কেন অত ভাবো, বল তো, মাসি? জমি তো আর চোরে পকেটে করে নিয়ে পালাবে না। ও থাকবেই। অলক আবার শিগ্‌গিরই যাবে, দিনের আলোয় দেখে আসবে বলেছে।

যাক, তাও ভালো। কেমন একটা যেন স্বস্তির ভাব আসে অলিমাসিমার। কি সব পাগলের মতো মনে হয়েছিল। পাহাড়ে কিম্বা নদীর ধারে ছাড়া আবার মাটি ধ্বসে যায় নাকি। তেমন ভূমিকম্পই বা কবে হল যে পুঁতে যাবে। আর পুঁতে গেলেও তো সেখানটা ঢিবি-মতন হয়ে থাকত, সহজেই চোখে পড়ত। চেনে না, তাই খুঁজে পায়নি। খোঁজেওনি নিশ্চয়ই তেমন করে।

কেয়া বললে নাকি কোথায় খেয়ে এসেছে। শুয়ে পড়ল গিয়ে। তার আগে বার বার অলিমাসিমাকে বুঝিয়ে বলল, জমির জন্য না ভাবতে, আলোয় আলোয় একদিন সেও না-হয় অলকের সঙ্গে যাবে, একটা রবিবারে, কি অন্য ছুটির দিনে। জমি কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

দুঃখ যে খানিকটা হয়নি অলিমাসিমার, তা নয়। তবে দুর্ভাবনার চাইতে দুঃখ শতগুণে ভালো। যারা চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছে, তাদের আর দশ-পনেরো দিনে কি বা এসে যায়। তবু মনের ভেতরটা একটু খচখচ করে।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ একটা সঙ্কল্প করে ফেলেন অলিমাসিমা। আরে তাইতো, এতক্ষণ মনে হয়নি কেন? কেয়া নয়, অলক নয়, এবার নিজেই যাবেন। একটা রবিবার, এ বাড়ির ভার কেয়াকে দিয়ে, ভোরবেলা চলে যাবেন, রাত্রে ফিরে আসবেন। নিজের চোখেই দেখে আসা ভালো। কারণ নক্সার কোনো অদলবদল করতে হলে, কাজ শুরু হবার আগেই করতে হয়, বটফলের দাদা বলেছেন।

কিন্তু খুঁজে পেল না কেন? নিশ্চয়ই সেরকম করে খোঁজেনি। সারাদিন হৈ-চৈ করে, সন্ধ্যা নাগাদ একবার একটু ঘুরে দেখেছে। ধরেছেও তো সন্ধ্যের গাড়ি, ন'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেছে। কেমন যেন মনমরা মনে হল কেয়াকে। তবে অলিমাসিমা কোনোদিনই কেয়াকে তেমন নজর করে দেখেননি, এ কথাও সত্যি।

হয়তো এত সাধের মিটিংটা শেষ পর্যন্ত হল না বলে মন খারাপ। কেয়ার জন্য দুঃখ হয় অলিমাসিমার। একটা

মিটিং হল না বলে যার মন খারাপ হয়ে যায়, তার মতো অভাজন কে বা আছে।

ছোট্ট কেয়াকে মনে পড়ে। একটা ছেঁড়া তালপাতার হাতপাখাকে বুকে জড়িয়ে, নেপুর মা'র খাটের পায়ের কাছে ঘুমোত। বেশ নোংরা মতো দেখতে পাখাটা, অলিমাসিমা সেটাকে একদিন টেনে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অমন জিনিস কেউ ঘরে রাখে? বুকে নিয়ে শোয়? অসুখ করবে না? নেপুর মাও তাই বললেন।

কাঁদেনি কেয়া। রাতে বলল পেটব্যথা করছে, না খেয়ে শুয়ে থাকল। আজকের মতো অমনি করে, না খেয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকল। নেপুর মা পরদিন অলিমাসিমাকে দিয়ে মোড়ের মাথা থেকে একটা সেলুলয়েডের পুতুল কিনে আনালেন। কেয়া সেটাকে নিয়ে খেলত বটে, কিন্তু বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুত না। অদ্ভুত মেয়ে, কেয়া। ভারি দেমাকী।

একটু একটু করে ঘুম আসে। কানে আস্তে আস্তে বাজনা বাজে।

পরদিন থেকে বাড়িটা আগাগোড়া ওলটপালট হয়। ডাক্তার কিছুদিন থেকেই বলছিল জামাইয়ের সিঁড়ি ভাঙা বন্ধ করে, একতলায় এসে বসবাস করার কথা। ঠিক এই সময় একতলার সামনের দিক্‌কার মাদ্রাজী ভাড়াটে দিল্লী বদলি হয়ে গেল, ঘরগুলিও খালি হল। একতলায় নেমে আসাতে আর কোনো বাধা রইল না। দোতলাটা ভাড়া দিলে অনেক বেশী পাওয়া যাবে, নেপুও ভারি খুশি।

বহুদিন পরে মাঝখানকার দরজা-জানলাগুলো খোলা হল। কেমন একটা পরিষ্কার হাওয়া বাড়িময় বইতে লাগল।

আনন্দ দোতলার জন্য কি একটা আপিশের ভাড়াটে ঠিক করে দেয়। নেপুর ততটা পছন্দ নয়; তবে আপিশ নিলে ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল হয় না, তারাই সারিয়ে নেবে, আপত্তির কোনোই কারণ থাকে না। তবু মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে।

অলিমাসিমার কিন্তু মনটা খুশি হয়, এই তো কেমন যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে। আর ওপর নিচ টানা-হ্যাঁচড়া করা নয়, সিঁড়ির মাঝখানের দরজাতে তালা দিতে হবে না, গোটা বাড়িটা নেপু চোখে চোখে রাখতে পারবে। তবে একটা ভালো লোক রাখতে হবে। আর জামাইয়ের কোর্টের বেয়ারাকেও এ বাড়িতে থাকতে বলতে হবে। শঙ্কর না হয় সব ঘর ধোয়ামোছা করে দিল, নেপুর কোনো-দিনই কোনো বাছবিচার ছিল না। নতুন লোকটা না হয় রাঁধাবাড়া ধোয়াপাকলা সারল। তবু জামাইয়ের দেখা-শোনার জন্য ঐ পুরোনো বেয়ারাটাই ভালো। ভারি অনুগত জামাইয়ের, আছেও প্রায় পনেরো বছর, ওর বাবাও নেপুর বাবার কাছে বহুদিন কাজ করেছে। খুব বিশ্বাসী চৌকোস লোকটা। জামাইয়ের অমনটিই দরকার।

ঘরদোর গুছোতে গুছোতে অলিমাসিমার চিন্তার আর শেষ থাকে না। আসছে মাসের পয়লা থেকে দোতলার ভাড়াটে এসে যাবে, আর অলিমাসিমাও ক্যান্টিনে বহাল হবেন। বটফলের বাড়ির সেই ঘরখানিরও ব্যবস্থা করেছেন। একটু ছোট, তবে অলিমাসিমার এখানকার ঘরের চাইতে ছোট হবে না। চৌকো বলে ওরকম মনে হয়। খটখটে শুকনো, বাইরে একহাত সান-বাঁধানো জমি, তার পরেই উঁচু রেলিং, তার পরেই রাস্তা; সামনে একটা পানের দোকান। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে, হট্টগোল চলে। বছর দুত্তিন বেশ চলে যাবে সেখানে। অত শুকনো যখন, সমস্ত পশ্চিমের রোদটা ঘরে ঢুকতে পায়, স্বাস্থ্যও নিশ্চয় ভালো। অন্ততঃ এখানকার চাইতে ভালো। এখানেও তো অলিমাসিমা দিব্যি বেয়াল্লিশ বছর কাটালেন। কি এমন মন্দ স্বাস্থ্য? ঐ যা এক নিচু হতে গেলেই হাঁটুর পেছনে খিল ধরে, পিঠটা টনটন করে ওঠে। তাও একটু হবে না?

তবে এক শ টাকা দেবে না, পঁচানব্বই দেবে। তাই বা মন্দ কি? বটফলের দাদা বলছিলেন, আসছে মাস থেকেই কাজ শুরু করে দেবেন; সব খরচ নাকি একসঙ্গে লাগে না। অলিমাসিরও এখনি সেখানে যাবার দরকার নেই। রবিবার-টবিবার বেশ গিয়ে দেখে আসতে পারবেন, কাজ কেমন এগুল।

যণ্ডা দেখতে মজুররা ওপরের সেই সব ভারি ভারি সাবেকি সিন্দুক আলমারি নিচে নামায়। নেপু সেগুলি কিছুতেই খালি করে দেবে না। সবসুদ্ধুই নামাতে হয়। তবে বাসনের আলমারি খালি করে না দেওয়া পর্যন্ত একচুল নড়ানো গেল না। ভাল ভাল রুপোর বাসন, গোছা গোছা খাগড়াই কাঁসা বের করতে হয়। বিরাট এক কাঁঠালকাঠের বাসনের সিন্দুকের তলা থেকে ছোট একটা তামার বাক্সে গোটা পাঁচেক মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলের মোহর বেরোয়। নেপুর আহ্লাদ আর ধরে না।

বাবার প্রথম রোজগার, অলিমাসি। মা তো ঠাকুর-পুজো করত না, ঠাকুমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা আমার ছোট-কাকিকে দিয়ে দিয়েছিল। তার বদলে এই বিলিতি বাক্সে

মহারানীর মুখ দেওয়া মোহর ক'টি রেখেছিল। বলত, দেখিস, ঐ পুরনো ঝাঁপিটার চাইতে এর পয় কত বেশী হবে। হলও তাই। ছোটকাকি পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হল, পরের বছর ম'ল। ওর ছেলে ঐ আনন্দটা কতক মামার বাড়ি খেয়ে, কতক আমাদের খেয়ে মানুষ হল। তার আবার কত বড়াই দেখ। নতুন মোটর কিনছে নাকি এই মাগ্‌গির বাজারে। ভাবে বোধ হয় জ্যাঠার সম্পত্তি রইল, আমার আর কি ভাবনা। রোজগারের পয়সাগুলো দিই উড়িয়ে।

নেপু ওপরে ওপরে এটা ওটা গুছোয় আর বলতে থাকে,

কি চালাক দেখলে তো, অলিমাসি? ওপরটা কেমন সাহেব কোম্পানির মাথায় হাত বুলিয়ে চমৎকার করে সারিয়ে নিচ্ছে। বাবার সময় যেমন ছিল, দরজা জানলা আগাগোড়া সব সাদা রঙের করিয়ে নিচ্ছে। কি ধূর্ত বুঝলে তো? আসলে নিজের খরচ বাঁচাচ্ছে। কিন্তু ওকে বলে দিও, অলিমাসি, আমি সহজে মরছি না। আরো কুড়িটি বছর বাঁচব।

কেয়াও ছিল সঙ্গে; একা পেরে ওঠেন না, ছুটির দিন অলিমাসিমা ডেকে এনেছেন। কেয়া বললে, আনন্দের এসবের ওপর কোনো টান নেই, নেপুদি, বলে নাকি হাতে পেলেই সের দরে বেচে দেবে। গোরস্থানে বাস করতে পারবে না, নাকি ওর ভারি ভূতের ভয়।

নেপু গম্ভীর মুখ করে বলে,

কেয়া, তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, রোজগারপাতি কর, স্বাধীনভাবে থাক, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু দোতলা ভাড়া হয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ির পাশের দরজাটা খোলা হবে, ওদিক দিয়ে তারা যাওয়া-আসা করবে। সিঁড়ির তলাটা আর জুড়ে থাকলে চলবে না।

কেয়া হেসে বলে, বাঁচালে, নেপুদি, আমিও কথাটা কি করে ভাঙি তাই ভাবছিলাম।

নেপু জিজ্ঞেস করে, কোন্ কথাটা ভাঙবে?

এই, এখান থেকে চলে যাবার কথা।

যাবে কোথায় শুনি? যাবার একটা চুলো আছে তোমার?

কেন আনন্দ বলছিল—

তোমার কি কোনো লজ্জাও নেই, কেয়া? আনন্দর সঙ্গে তোমার কি?

কেয়া কিছু বলে না, মৃদু হেসে বাক্স থেকে বাসনগুলি বের করতে থাকে।

অলিমাসিমা জানেন আনন্দের সঙ্গে কেয়ার কিছু নয়। কেয়ার ভাব ঐ অলক ছোকরার সঙ্গে। যাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা লক্ষ্মীছাড়ার একশেষ। কি সব চালাক-চালাক কথা অলকের। কি রকম ঘরের ছেলে কে জানে। কেয়া তো বলে বামুনের ছেলে, বনেদী ঘর, তবে অবস্থা পড়ে গেছে। কে জানে।

আজকাল আর বড় একটা আসে-টাসে না। কি দরকারই বা আসবার, রোজ তো কেয়ার সঙ্গে দেখা হয়। যেখানে সেখানে একসঙ্গে চা-টা খায় বোধ হয়। রাস্তা থেকে যে পান কিনে খাওয়ায়, এ তো অলিমাসিমার স্বচক্ষে দেখা। আনন্দ ঠিকই বলে, একটা অতি খেলো টাইপের ছেলে। কেয়া আনন্দর সঙ্গে কথা বলে না মনে হয়। রোজ আনন্দ আসে, অলিমাসিমার সঙ্গে কত গল্প করে যায়, কিন্তু কেয়া সেখানে থাকে না। আনন্দও তার নাম করে না।

খুব ইউনিয়ন নিয়ে মেতেছে কেয়া। বিপদে না পড়ে। ভালো করে মনে নেই অলিমাসিমার, কিন্তু নেপুর বাবা বেঁচে থাকতে, মিস্টার সিনহাদের আপিশের বাবুরাও ঐ রকম ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করেছিল। তারপর সেই থেকে কি সব গোলমাল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জেলে গেছিল কয়েকজন। বলেছেনও কেয়াকে। সে কারো কথা কানে তোলে না, ভাবে ওর মতো কেউ কিছু বোঝে না। অলিমাসিমা তো নয়ই; মুখ্যু অলিমাসিমা। অলিমাসিমার মনে হয় কেয়া আসলে অলিমাসিমাকে ঘেন্না করে, তাই কথা কানে তোলে না। ওর যত পরামর্শ ঐ অলকের সঙ্গে।

বলেন কথাটা আনন্দকে। আনন্দ খানিক চুপ করে থেকে বলল, কেয়া ওর স্বামীর নামে মামলা করে বিয়েটা ভেঙে নেয় না কেন?

অলিমাসিমা আকাশ থেকে পড়েন,

কি যে বল, আনন্দ, ভদ্রঘরের বৌ, তোমারও কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই?

আনন্দ অলিমাসিমার পাশে বসে পড়ে বলে,

কেন, দেবে না কেন? শুধু ঐখানে ওর একটু আত্মসম্মানের অভাব দেখি। বিয়ের পরই ওর যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চলে; সেখানে বিয়ে-থা করে সুখে ঘরকন্না করে; তিনটে ছেলে হয়েছে, তা জানো? কেয়া কেন ওকে ছেড়ে দেয় না, বলব? স্রেফ সাহসে কুলোয় না বলে, পাছে কেউ কিছু বলে, সেই ভয়ে। নিন্দের ভয়ে।

অলিমাসিমা কাষ্ঠহেসে বলেন,

নিন্দে করতে ছাড়ে না তো লোকে। তাদের দোষও দেওয়া যায় না। কারণ না থাকলে তো আর কেউ নিন্দে করে না।

আনন্দ বলে, করে না? কি যে বল। নিন্দের আবার একটা কারণ থাকা চাই নাকি? আমাকে চোর বলেছিল নেপুদি, মনে নেই তোমার? জ্যাঠাইমার তামার বাক্স-শুদ্ধু মোহর পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমাকে চোর বলেছিল। মোহর কখনো চোখে দেখিনি, অলিমাসি। জ্যাঠাইমার বাৎসরিক হচ্ছিল, নেপুদি বাক্সটা বের করে সবাইকে দেখাচ্ছিল, বলছিল খুব নাকি পয় ঐ বাক্সর। আমার কিন্তু পয় হয়নি। বিকেল থেকে বাক্স পায় না—

অলিমাসিমার কেমন যেন অসহ্য মনে হয়। বাধা দিয়ে বলেন, আমার খুব মনে আছে, আনন্দ, বাড়িসুদ্ধু লোকের সামনে অমন কেলেঙ্কারির কথা মনে থাকবে না? তুমি নতুন কলম এনেছিলে, বলেছিলে গড়ের মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছ। কেউ বিশ্বাস করেনি।

আনন্দ একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিও না, অলিমাসি, তুমি আমাকে মস্ত এক বক্তৃতা দিয়েছিলে। শুধু কেয়া বিশ্বাস করেছিল। সকলের সামনে বলেছিল, হ্যাঁ, ও নেবে বাক্স! ওর সাহসেই কুলোবে না! ওর তখন বিয়ের কথা হচ্ছিল, অলিমাসিমা, তারপরই জ্যাঠামশাই আমাকে হোস্টেলে পাঠালেন। আর এখানে থাকিনি।

খানিক চুপ করে আনন্দ বলে, যাক গে, ওসব পুরোনো কথায় আর কার কি এসে যায় বল। নিচে দেখে এলাম নেপুদির হাতে সেই বাক্স, বাসনের সিন্দুক থেকে নাকি বেরিয়েছে।

অলিমাসিমা বললেন, বাৎসরিকের দিন-ই হয়তো পুজোর বাসনের সঙ্গে তুলে ফেলেছিল। ও বাক্স আর খোলাই হয়নি। তোমার জ্যাঠামশায় তো আর পরের বছর ছিলেন না যে, বাৎসরিক করবেন।

আনন্দ উঠে পড়ে, একটু হেসে বলে, জ্যাঠামশাইও ঐ কথা মনে করে গেলেন, এই যা দুঃখ! জানো, অলিমাসি, নেপুদি ঘটনাটা একদম ভুলে গেছে। আমাকে এক্ষুনি মহাখুশি হয়ে বাক্সটা দেখাল!

কেয়ার কিন্তু মনে ছিল। জামাই তাকে বাক্স পাওয়ার কথা বলতেই তার চোখেমুখে আলো জ্বলে উঠেছিল। বাঃ, পাওয়া গেছে? আনন্দ তাহলে সত্যি নেয়নি, নেপুদি, তখন তুমি কি-না বলেছিলে!

নেপু অবাক হয়ে যায়। কি বাজে বকছ, কেয়া, আমি আবার কাকে কি বললাম। ওটা তো বাসনের বাক্সের মধ্যেই ছিল।

নেপুর সত্যি কিছু মনে নেই। অলিমাসিমা কাজ ফেলে নিচে গিয়ে নিজের ঘরে দোর দেন। মোজাটা বের করে নোটগুলি আরেকবার গুণে দেখেন। সাত হাজার দশ টাকা। তার সঙ্গে আরো দুটি এক-টাকার নোট রাখেন, খুচরো কিছু হাতে ছিল। কবে খরচ হয়ে যাবে। একবার যা মোজায় ভরবেন তা মনে মনে উৎসর্গ করা হয়ে গেল, আর অন্য কোনো প্রয়োজনে তাকে প্রাণ ধরে অলিমাসিমা বের করে দিতে পারবেন না।

অগোছালো বাড়ির কি একটা অশান্তির হাওয়া, অলিমাসিমার ছোট ঘরের বন্ধ দরজা ভেদ করে, ভেতরে প্রবেশ করে, অলিমাসিমাকে সারারাত জাগিয়ে রাখে। বহু নিশার স্বপ্ন বুঝি মুঠোর মধ্যে এল, তবু বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। বড় ভয় হয় যদি ফাঁকাটা সত্যি না ভরে। অন্ধকার রাত চোখের ওপর বোঝার মতো ভারি হয়ে ওঠে। কানের মধ্যে বাজনা বাজে না।

আবার সকাল আসে। অলিমাসিমা উঠে পড়েন, খাবার ঘরের দরজা-জানলা খুলে দেন, হিটারে চায়ের জল চাপান। টেবিলের ওপর চায়ের বাসন সাজান। গয়লা এসে ডাক দেয়, দুধ মেপে নেন, ডুলি খুলে পাঁউরুটি বের করেন। নেপু সিঁড়ির মাঝখানকার দরজার তালা খুলে দেয়। কুকুর তিনটে ছুটে নেমে আসে, অলিমাসিমার চারধারে নেচে-কুঁদে সারা হয়। তিনজনকে তিনটে লেড়ুয়া বিস্কুট দিতে হয়। শঙ্কর খিড়কি দিয়ে তাদের বেড়াতে নিয়ে যায়। রোজই এমনি হয়, তবু সকাল থেকে এ দিনটাকে কেমন অন্যরকম মনে হয়।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, খাবার ঘরের আলো জ্বালতে হয়।

কেয়া আসে।

মাসি, বড় ভাবনায় আছি, জানো? টাকা বড় খারাপ জিনিস, রাতের ঘুম নষ্ট করে দেয়, তা জানতে?

কেয়া বলে,

তাও যদি নিজের টাকা হত। আমার বালিশের তলায় সাত হাজার টাকা আছে, ভাবতে পার? আজ সকালে অলক নিয়ে ব্যাঙ্কে দিয়ে আসবে, তবে নিশ্চিন্দি।

পাশের চেয়ারে বসে হঠাৎ কেয়া বলে,

একটা নিয়ম ভাঙব, মাসি, এক পেয়ালা চা দেবে?

সারারাত ঘুমোয়নি কেয়া, চোখের কোলে কালি পড়েছে।

সাত হাজার টাকা পাওয়া এত সহজ! অলিমাসিমা বলেন,

কার টাকা, কেয়া? তোমাদের ইউনিয়নের? ব্যাঙ্কে রাখবে না?

কেয়া বলে, ব্যাঙ্কেই তো রাখার জন্য আনা। জায়গায় জায়গায় ছিল, আবার সরকারী সাহায্যটাও পাওয়া গেল, এখন সব এক করে তুলে রাখলেই নিশ্চিন্দি। কি যে হল কাল চারদিক দিয়ে, আর হয়েই উঠল না ঘরে আনাটা একেবারে বে-আইনী।

অলিমাসিমা ব্যাঙ্কের ব্যাপার বোঝেন না তবু বলেন, সত্যি ঘরে আনাটা ঠিক নয়, কেয়া, অতগুলো পরের টাকা। কালই তুলে দেওয়া উচিত ছিল।

কেয়াকে চিন্তিত মনে হয়,

উচিত তো ছিলই, মাসি। কিন্তু অলক—

কেয়াকে চুপ করতে দেখে, কেয়ার হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে অলিমাসিমা বলেন, অলক কি?

নাঃ, কিছু না। যাক গে আজ দশটায় ব্যাঙ্ক খুললেই জমা দিয়ে আসবে, কাগজপত্র কাল সব সইটই করে রাখা হয়েছে। শরীরটা ভালো লাগছে না, মাসি, রাতে বোধ হয় জ্বরও এসেছিল। চা-টা খাইয়ে বাঁচালে, মাসি।

অলিমাসিমার ভালো লাগে না। কেয়ার কখনো অসুখ করে না, এখন আবার না কোনো ফ্যাসাদ বাধায়। নেপু শুনলেই তো রেগে যাবে, বলবে, যেতে বল, যেতে বল কোথাও হাসপাতালে-টাসপাতালে, কে জানে কি ছোঁয়াচে রোগ ঢোকাবে শেষে। জ্বর গায়ে যাবে চলে কেয়া, বাড়ির অকল্যাণ হবে।

বাড়ি বলতেই ছোট আরেকটা বাড়ির কথা মনে আসে, যেখানে মনের পাখিরা ডানা গুটিয়ে বসতে পারে। কেয়াকে বলেন, জ্বর গায়ে আপিশ যাওয়া হবে নাকি, কেয়া?

কেয়া বলে, ভেবেছিলাম একবার ব্যাঙ্ক হয়ে, আপিশ হয়ে, ছুটি করিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু ভোরে একবার মাথা ঘুরে পড়েই গেলাম।

কপালে একটু কালসিটের দাগ। অলিমাসিমার বিরক্ত লাগে। যত সব অবুঝের মতো কথা। বলেন,

না, কিছু গিয়ে দরকার নেই। তোমাদের ঐ অলকটির হাতে চিঠি দাও, আর ব্যাঙ্কেও সে-ই যাক না। সে না সেক্রেটারি?

কেয়া বলে, একটা ঘরও তো দেখে নিতে হয়।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

আজ বরং শুয়েই থাকি মাসি, কাল যাব। শরীরটা সত্যি বড় খারাপ করেছে।

অলিমাসিমা জিজ্ঞেস করেন, শোবে কোথায়? সারা-দিন সিঁড়ি দিয়ে মিস্ত্রী-মজুররা ওঠানামা করে, আজ তো সিঁড়ির ওখানকার দেওয়াল চাঁচা হবে শুনলাম, ওখানে থাকা যাবে না, কেয়া।

কেয়া অলিমাসিমার মুখে দিকে চেয়ে থাকে। অলি-মাসিমা বলেন,

কোথায় ঘর ঠিক করবে ভেবেছ?

দেখি, দু'একটা মেয়েদের হোস্টেল আছে, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

একতলাটা গোছগাছ করে নিতে এক সপ্তাহ লাগবে। নেপুরা আজ মিসেস সিনহাদের বাড়ি যাবে, দিন সাতেক থাকবে। সকালে ওঁদের গাড়ি এল নিয়ে যেতে। আনন্দও এসেছিল, যদি কিছু দরকার হয়। তার গাড়িতেই স্বচ্ছন্দে ওরা যেতে পারত। কিন্তু নেপু কিছুতেই আনন্দের নতুন গাড়িতে চড়বে না মুখের ওপর পষ্টাপষ্টি বলে দিল। আনন্দ হেসে বলল,

কেন, চড়বে না কেন? আমার কিন্তু ছোটবেলায় তোমাদের মোটরে চড়বার ভারি শখ ছিল। চড়েও-ছিলাম দু'একদিন জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে। কিন্তু তুমি পারলে আমার নাক ছিঁড়ে নিতে।

নেপু কোনো উত্তর না দিয়ে মিস্টার সিনহার পুরনো গাড়িখানিতে চেপে বসল।

ওরা গেলে পর, আনন্দ একবার কেয়ার কথা জিজ্ঞেস করল। জ্বরের কথা শুনে, একবার ঘড়িটা দেখল, কিছু বলল না। নেপু কেয়াকে চলে যেতে বলেছে শুনে শুধু বললে,

চলি, অলিমাসি, দেখি ও-বেলা যদি আসতে পারি। একটা ডাক্তার ডাকলে পার।

দশটার সময় অলক এসে টাকা আর চিঠি নিয়ে গেল। অলিমাসিমা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু অলককে কিছুতেই ভালো লাগে না, ওকে দেখলেই মনটা খিঁচড়ে যায়। কতই না ভালো লাগার লোক অলিমাসিমার জীবনে! তার ওপর আজকাল আবার একে ভালো লাগে না, ওকে ভালো লাগে না! অলকের সঙ্গে অলিমাসিমার কি?

কেয়া একটু খুঁতখুঁত করে, আমারো সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল, মাসি, ওর একার ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপানো ঠিক হয়নি।

মিস্ত্রীরা আসে, দিনের কাজ শুরু হয়ে যায়, চারিদিকে মিহি চুনের গুঁড়ো ওড়ে, সব কিছুর ওপর একটা সূক্ষ্ম চুনের প্রলেপ পড়ে থাকে। অলিমাসিমা বারে বারে ঝাড়েন।

কেয়া জ্বর গায়েই তার ছড়ানো জিনিসপত্র বাক্সে তোলে, বিছানাটা জড়িয়ে রাখে। সিঁড়ির তলাটাও রং হবে, দেয়াল চাঁচা হবে, খালি করে না দিলেই নয়। মঙ্গল একবার এসে জিনিসগুলি এদিক্‌কার খালি ঘরের একধারে তুলে দিয়ে যায়। কেয়া সারাদিন চাদর জড়িয়ে, যে ঘরে নেপুর বাবা পড়াশুনো করতেন, সেখানে কৌচের ওপর পড়ে থাকে। অলিমাসিমা বারে বারে দেখে আসেন। কেমন একটা ঝড়ে-ওড়া ভাব সারা বাড়িটায়। অতীতকাল অনেকদিন এ বাড়িতে বাসা বেঁধে ছিল, সে হঠাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে যেন বিদায় নিচ্ছে।

কেয়া দুটো কথা বললে ভালো লাগত। বারে বারে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ান অলিমাসিমা। বিকেলে এক পেয়ালা চা খাইয়ে আসেন। কেয়া বলে,

জানো, মাসি, এ বাড়িতে আমি কত বছর থেকেছি? পাঁচবছর বয়সে এসেছিলাম, মা মরে যাবার পর। একটানা এগারো বছর ছিলাম, মাসি। বিয়ে হয়ে পাঁচবছর শ্বশুর-বাড়িতে থেকেছিলাম, তারপর পিসেমশাই নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আবার এখানে থেকে চারবছর কলেজে পড়েছি; দু বছর দিল্লীতে ট্রেনিং নিয়েছি; আবার এখানে এসে তিনবছর চাকরি করছি। একরকম বলতে গেলে জীবনটাই কাটালাম এখানে।

পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, পাশ ফিরে বলে, দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব। আর কখনো আসব না।

অলিমাসিমার কেন জানি শীত-শীত করে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এইখানে একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেয়া আরো বলে,

কত লোক থেকেছে এ বাড়িতে। আশ্চর্য না মাসি, জিনিসপত্রগুলো সব পড়ে রয়েছে, মানুষগুলো সব চলে গেছে। একবার বর্ষাকালে আনন্দ আর আমি স্কুল থেকে ফিরতে জুতো ভিজিয়েছিলাম বলে নেপুদি আমাদের একতলার এই স্নানের ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল, খেতে দেয়নি। আমরা একটা মরচে-ধরা পেরেক দিয়ে দরজায় কাটাকুটি খেলেছিলাম; দেখলাম তার দাগগুলো এখনো রয়েছে। আনন্দকেও কেউ ভালোবাসত না। দুষ্টুও ছিল না কম।

অলিমাসিমা হঠাৎ বলেন, কেন, সরকার মশাই তো তোমাদের দুজনকেই ভালোবাসতেন।

কেয়া খুশি হয়ে ওঠে।

ওঁর স্ত্রীও বাসতেন। শীতকালে আমাদের হাত-পা ফাটত বলে পুরোনো ঘি মালিশ করে দিতেন। আনন্দর আর আমার গা থেকে সারাদিন বোটকা গন্ধ বেরুত।

কে কবে কোথায় কেয়াকে এক কণা ভালোবাসা দিয়েছিল, কেয়া যত্ন করে তার হিসেব কষতে বসে যায়। অলিমাসিমার বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে, কি জানি জ্বরটর বাড়েনি তো; কথাগুলো যেন কেমন কেমন। বসে থাকতে পারেন না বেশীক্ষণ, ওদিকে একটা মানুষ নেই, বাড়িময় মিস্ত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি খেয়াল হয়, সাহস করে একটা বিক্রিওয়ালা ডেকে, খাবার ঘরের তক্তাপোশের ওপর থেকে পুরোনো খালি শিশি, বোতল, টিন রাশি রাশি বেচে ফেলেন। তক্তাপোশ সরিয়ে, তলা ঝাঁট দেওয়ান; বারকোস, কুলো তলা থেকে টেনে বের করে ওপরে রাখান। কোথাও ময়লা রেখে যাবেন না অলিমাসিমা।

অযথা খাটতে থাকেন অলিমাসিমা। আঠারো বছর ধরে এখানে থাকার হিসেব দিয়েছে কেয়া; অলিমাসিমা থেকেছেন একটানা বেয়াল্লিশ বছর। ভালোবাসার হিসেব কষেছে কেয়া; কি হবে ভালোবাসা দিয়ে? মানুষকে ভালোবাসা মানেই দুঃখ পাবার ব্যবস্থা করা। অলিমাসিমাকে দুঃখ দিতে পারে এমন কেউ নেই দুনিয়াতে।

সন্ধ্যাবেলা শূন্য খাবার ঘরে অলিমাসিমা একা কাঁদেন তাঁকে দুঃখ দেবার লোক নেই বলে। বর্ধমানের বাড়ি তো শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেবে, তবে দুঃখ দেবে কে? অলিমাসিমার চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়তে থাকে।

একটা শব্দ যেন কানে আসে, চোখ মুছে অলিমাসিমা কান পেতে থাকেন। কার পায়ের শব্দ না? অলিমাসিমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়। দোতলার দরজা-জানলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধ করিয়েছেন। নিচের তলারও এদিকের সব বন্ধ, শুধু সামনের দরজা এখনো খোলা। শিহরণ লাগে অলিমাসিমার সারা গায়ে, কানে যেন হাজার হাজার পায়ের শব্দ আসে বছরের পর বছর ধরে।

বুক টিপটিপ করে। ভাবেন গয়লাকে একবার ডাকি। নিঃশব্দে নেপুর বাবার পড়বার ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

কেয়া!

আনন্দ ডাকে, কেয়া!

পাথর হয়ে যান অলিমাসিমা। এমন করে আনন্দ কেয়াকে ডাকতে পারে? এমন করে কেউ কাকেও ডাকতে পারে অলিমাসিমা জানতেন না।

পথের আলো খোলা জানলা দিয়ে এসে কেয়ার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেয়া উঠে বসে, বিস্ফারিত নয়নে শুধু চেয়ে থাকে, কেয়ার কালো চুল শুধু ঝোড়ো বাতাসে উড়তে থাকে, কেয়ার মুখে কথা সরে না।

কথা? ভালোবাসার আবার কথা কি? বক্ষ থেকে বক্ষে ভালোবাসা নীরবে কথা কয়। কেয়াকে উঠে আসতে দেখলেন না অলিমাসিমা, আনন্দকে কাছে যেতেও দেখলেন না। দেখলেন শুধু দুজনায় গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এরই জন্য বুঝি সমস্ত বর্ষার সন্ধ্যাটি অপেক্ষা করে ছিল; এইবার আকাশের বুক চিরে জলের ধারা নামল।

নিঃশব্দে অলিমাসিমা ঘরে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ খোলা জানলা দিয়ে নারকোল গাছের গুঁড়ি বেয়ে জলের ধারা নামা দেখলেন। নিজের ফালি ঘরখানিতে গিয়ে আজ আর দরজায় খিল দিলেন না। দরজা খোলা রইল।

তাকের ওপর থেকে কৌটো নামিয়ে গোলাপী রেশমী মোজাটি বের করলেন। শীতল, কোমল; ভালোবাসার মতো আঁকড়ে ধরে না, কেবল খসে খসে যায়। নোটগুলি আরেকবার গুণে রাখলেন। সাত হাজার বারো টাকা।

আজ শিশি, বোতল, বাক্স বেচে কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে। সংসার-খরচের টাকার সঙ্গে রেখে দিলেন অলিমাসিমা। নেপু এলে দিয়ে দেবেন। কোথায় কি বাকি রয়ে গেল ভাবতে বসেন। নেপুদের কাছে কথাটা এখনো কিছুতেই পাড়া যায়নি। কাল রাতে খাবার সময় একটু চেষ্টা করেছিলেন। একতলায় থাকা, আরো দু-একটা লোক থাকলে ভালো, ওদিকে চাকরদের একটা ঘরও পাওয়া গেল। কোর্টের বেয়ারা এখানেই থাকুক না, সব সময় হাতের কাছে থাকবে, নিজের ঘরে রাঁধাবাড়া করে খাবে। জামাই খুশিই হল, নেপুও আপত্তির কোনো কারণ দেখেনি।

তার বেশী আর বলা হল না। বললেই তো নেপু রাগমাগ করবে, আগেকার দিনের কথা বলবে। নেপুর মুখে আগেকার দিনের কথা শুনতে ভালো লাগে না অলিমাসিমার। আগেকার দিনের সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ? দুদিন বাদেই দড়াদড়ি কেটে ভেসে পড়বেন অলিমাসিমা। আর এ বাড়িতে আসা হবে না।

আর কখনো যে এ বাড়িতে আসা হবে না, এ কথা অলিমাসিমা নিশ্চিত জানেন। জানলার নিচের তক্তাটার ওপর ব্যাঙের ছাতার রূপের মেলা আর দেখা হবে না। কেউ হয়তো কোনদিন টান মেরে শ্যাওলা-ঢাকা তক্তাটাকে দেবে ফেলে। অলিমাসিমাকে দেখতেও হবে না, দুঃখ পেতেও হবে না। বেয়াল্লিশ বছর ধরে দুঃখ পাবার পথগুলি সব বন্ধ করে ফেলেছেন অলিমাসিমা। বর্ধমানে গিয়ে শেষ বয়সটা নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটাবেন। কারো কিছু বলবার থাকবে না। টাকাগুলো সব ঝেড়েঝুড়ে শেষ করে দেবেন; আর টাকা গুণবেন না। নতুন সব বন্ধু করবেন; বটফলের অভাবও টের পাবেন না। এখানকার কোনো কিছু আর ঠাঁই পাবে না অলিমাসিমার জীবনে। আর এ বাড়িতে আসবেন না অলিমাসিমা।

বর্ধমানে নতুন করে সকাল হবে।

আর কেয়া? আনন্দ আর কেয়া?

নেপু রেগে অন্ধ হবে। কিন্তু জামাই হয়তো খুশি হবে। অলিমাসিমা গেলে শেষটা জামাইয়ের কোনোরকম অসুবিধে হবে না তো? বেয়ারাটাকে একটু বলে দিতে হবে।

আর আসবেন না অলিমাসিমা এ বাড়িতে, যেখানে বেয়াল্লিশ বছর বাস করে, অলিমাসিমা কারো হাতে দুঃখ পাবার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

তবে আনন্দ আর কেয়া মুখে যাই বলুক, ওরা আসবে। প্রথমটা আসবে না হয়তো, কিন্তু পরে নিশ্চয়ই আসবে। বেশীক্ষণ বসবে না হয়তো, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে জামাইকে ওরা দেখে যাবে নিশ্চয়ই। দুঃখ পাবার আশ্চর্য ক্ষমতা যে ওদের। এখনো হয়তো পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সারা জীবন হয়তো দুজন দুজনাকে ভালোবাসবে আর কাঁদাবে। কে জানে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবেন অলিমাসিমা,

উঃ, ভারি বেঁচে গেছি। বর্ধমানে একবার গিয়ে বসতে পারলেই হল। বিশ্রাম পেলেই এই হাতে পায়ে খিল-ধরা সেরে যাবে। কি একটা মালিশ করে দেয় বটফল; লণ্ঠনের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে গরম করে, হাতে পায়ে ঘষে দেয় বটফল। ভারি আরাম হয়।

বটফলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও, ওর কাছেও ঋণী থাকবেন না শেষ পর্যন্ত। অলিমাসিমা বটফলকেই ঐ বাড়ি লিখে দিয়ে যাবেন। অবিশ্যি এখুনি কিছু মরছেনও না অলিমাসিমা, দিদিমা সাতাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। আর তাই যদি কেউ বলে, মরতে ভয় নেই অলিমাসিমার। বাঁচতেই যে ভয় পেল না, তার আবার মরার ভয়! অলিমাসিমার হাসি পায়। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন অলিমাসিমা। এ বাড়িটা যেন দুনিয়ার আর সব বাড়ি থেকে আলাদা। যেই নেপুর মা বাবা চোখ বুঁজল, অমনি তারা এ বাড়ি থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেল। দুদিনের জন্য নেপুরা অন্য জায়গায় গেছে, অমনি যেন বাড়িটা ওর গা থেকে তাদের বেঁচে থাকার চিহ্নগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ-বাড়ির কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অলিমাসিমাও চলে গেলে তাঁর বেয়াল্লিশ বছরের এ বাড়িতে বাস করা অমনি করে মুছে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হত এতদিন থেকে থেকে বুঝি এখানকার দরজা-জানলার একটা হয়ে গেছেন। সে কথা ভুল। দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গেলে ফাঁকা রেখে যায়; অলিমাসিমা বেয়াল্লিশ বছর এ বাড়ির ওপরে ওপরে এমনি আলগোছে বাস করেছেন, বাড়ির গায়ে কোথাও একটুখানি আঁচড় কাটতে পারেননি।

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে, তার মধ্যে মনে হয় কে যেন খিড়কি দরজায় গুমগুম করে কীল মারে। চমকে ওঠেন অলিমাসিমা, আজ সন্ধ্যেবেলাটায় কোথাও একটুখানি শব্দ হলেই শিউরে ওঠেন অলিমাসিমা। কুকুরগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

১০

পুরনো ছাতাটা খুঁজে নিয়ে, খিড়কি দোরটা খুলতে হয়। ভাঙা আকাশ মাথায় করে অলক দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন একটা বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত মর্মাহত অলক, যে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। জামা-কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে; চুল বেয়ে, মুখ বেয়ে জলের স্রোত বইছে, এমন একটা জলে ধোয়া মর্মান্তিক নৈরাশ্যের প্রতিমূর্তি অলি-মাসিমা জন্মে দেখেননি।

কি যেন বলতে চেষ্টা করে অলক, কথাগুলি বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে উড়ে যায়, অলিমাসিমার কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাকে কর্কশভাবে ভেতরে আসতে বলে, খিড়কি দোর বন্ধ করেন। খাবার ঘরের বাইরে উঠোনের ধারে একটুখানি ছাদ দেওয়া, তার নিচে অলক দাঁড়িয়ে থাকে। খিড়কির পাঁচিলের ওপর দিয়ে পথের আলো তার সাদা মুখের ওপর পড়ে।

বলে, কেয়া?

কথা বলতে ঠোঁট কাঁপে, হাত কাঁপে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে জল আসে, অলিমাসিমা অলককে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে, দরজা বন্ধ করে দেন।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি চলে, অলক বলে,

কেয়াকে বলুন টাকাগুলো সব গেছে।

সে কি কথা! টাকাগুলো সব গেছে আবার কি? টাকা গেলে কেয়া করবে কি?

কঠিন স্বরে অলিমাসিমা বলেন, সে বাড়ি নেই, আমাকে বল। গেল কি করে?

অলকের ভাঙা ভাঙা কথা জোড়া দিয়ে নিতে হয়। ব্যাঙ্কে সোজা না গিয়ে, কি একটা জরুরী কাজে কোন্ বন্ধুর কাছে যেতে হয় নাকি, একটা চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়—

অলিমাসিমা ভাবলেশহীন মুখে অলকের দিকে চেয়ে থাকেন। হাতের পাতা দুটি উল্টে কি একটা হতাশার ইঙ্গিত করে অলক বলে,

বিশ্বাস করুন কেমন করে গেল জানি না। যখন খেয়াল হল, ব্যাগসুদ্ধ নেই। কেয়াকে জানাতে হবে।

অলিমাসিমার গলাটা চাপা খনখনে শোনায়।

কেয়া কি করবে? তার সাত হাজার টাকা আছে? পুলিশে খবর দিয়েছ?

কাউকে খবর দেয়নি অলক। জানাজানি হলে দুজনার চাকরি যাবে। আর শুধু চাকরি নয়, পুলিশের হাঙ্গামা লাগবে।

অলিমাসিমা ধৈর্য হারান, কি রকম আক্কেলশূন্য ছেলে তুমি। পড়ুক এবার হাতে হাতকড়া। ঠিক হবে। কিন্তু কেয়া?

অলক কম্পিত হস্তে মুখ ঢাকে। তাকে অবিশ্বাস করার কথা অলিমাসিমার একবারও মনে হয় না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে চেয়ে দেখেন অলিমাসিমা, কি একটা অদৃশ্য বাতাসে তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

ঘাড়ের কাছের চুলগুলি ছোট করে কাটা। হাতের কব্জির হাড় দেখা যায়, কি রকম অসহায় একটা ভাব মনে হয়।

রাগ ধরে অলিমাসিমার। অলকের জুতো ভরা জল, ঘর ভিজে যাচ্ছে, কাপড়-চোপড় থেকে নদী বইছে। রগের কাছে একটা শিরা ধুকধুক করছে।

কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

জুতো খোল। এসো আমার সঙ্গে। নিজের ঘরে নিয়ে যান বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটাকে। আলনা থেকে নিজের শুকনো থান দেন। কাশী-সিল্কের চাদরখানি দেন। নিজের গামছাখানি দেন।

কঠিন গলায় বললেন, কাপড় ছাড়। চুল-টুল মোছ। একটু ভদ্রলোকর মতো হও।

এ ঘরে এসে চায়ের জল চাপান। উঠুক একটু মিটারে।

অলক এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। চেয়ার দেখিয়ে বলেন, বোসো।

তারপর একটু চুপ করে থাকেন; অলক আর সইতে না পেরে, ভগ্নকণ্ঠে বলে,

বলুন কি বলবেন।

অলিমাসিমা হঠাৎ বলেন,

সেদিন বর্ধমানে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে জায়গা দেখে এসেছিলে?

অলক মাথা নাড়ে। ওরকম কোনো জায়গা খুঁজে পায়নি ওরা। ঠিকানা মিলিয়ে নক্সা মিলিয়ে ভালো করে দেখেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছিল তখন, ভালো করে দেখল কি করে?

না, অন্ধকারে যায়নি তো, দিনের বেলাতেই দেখে এসেছিল।

রাস্তাটাই খুঁজে পেলে না? নাম বদলেছে হয়তো, কাউকে জিজ্ঞেসও করলে না? মুখ তুলে অলক বলে,

রাস্তার নাম বদলায়নি, মাসিমা। কিন্তু জমি তো দেখলাম না।

অলিমাসিমার বুকের স্পন্দন কমে আসে। বিরক্ত হয়ে বলেন,

কি, চুপ করলে কেন? জমি নেই তো, কি আছে সেখানে?

একটা মোটরগাড়ির কারখানা আছে।

অলিমাসিমা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন,

পেছনে একটা দোতলা সাদা বাড়িও নেই বলতে চাও?

অলক অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে,

আছে, মাসিমা। সেখানে কারখানার মালিক থাকেন।

অলিমাসিমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। এ তো বোঝাই উচিত ছিল, দাদা যে সহজে ও-জমি ছেড়ে দেবে না, এ তো জানা কথা। বলেন,

একটা হিমসাগর আমের গাছ দেখলে?

না মাসিমা, কোনো আমগাছ নেই ওখানে। কোনো গাছ-ই নেই।

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে অলিমাসিমা বলেন, তোমরা ভুল জায়গা দেখে এসেছ, অলক, ঠিক করে চিনতে পারোনি। কারখানার মালিকের নাম কি?

অলক বলে, নিকুঞ্জ মাইতি। সব খোঁজ নিয়ে এসে-ছিলাম, মাসিমা।

অস্ফুট স্বরে অলিমাসিমা বলেন, তবে কেয়া যে বললে সময় পাওনি, দেরী হয়ে গেছিল। কেন বাজে বকছ, অলক, ভালো করে দেখনি মোটেই। মালিকের নাম হারাধন মুখোপাধ্যায়, মোটাসোটা ফর্সা দেখতে। ভুল বাড়ি দেখে এসেছ, অলক। বাড়িটা ঐ হারাধনের, কিন্তু জমিটা অন্য লোকের। ওতে একটা হিমসাগর আমের গাছ আছে।

অলক বলে,

না না, মাসিমা, কেয়া আপনাকে ইচ্ছে করে বলেনি, ভুল করা কি অতই সহজ? ও যে আমার চেনা পথ, চেনা বাড়ি। ও বাড়িতে আমি জন্মেছিলাম, মাসিমা, হারাধন মুখুজ্জে আমারই বাবার নাম। কুড়ি বছর হল তিনি মারা

গেছেন। মা বাড়ি বেচে দিয়ে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি জানি না ও-বাড়ি?

মাথার সব রক্ত হৃৎপিণ্ডে নামে। হৃৎপিণ্ডেও ভাঁটা পড়ে। কর্কশ কণ্ঠে বলেন, ক' ভাই তোমরা?

আমি ছাড়া কেউ নেই, মাসিমা। আমার বড় ভাই পাঁচবছর বয়সে মারা যায়, আমি তাকে চোখেও দেখিনি। শুধু মা আর আমি।

আমগাছ ছিল না কখনো ওখানে?

অলক তবুও বলে, আমগাছ নেই, মাসিমা, কিন্তু ঐ বাড়িই ঠিক। আমগাছ বাবাই হয়তো কেটে ফেলেছিলেন, কারখানাকে ভাড়া দেবার সময়। পরে ওরাই সবটা কিনে নিল।

কি মনে হওয়াতে অলক আবার বলে, কার বললেন পেছনের জমিটা? তাকে জিজ্ঞেস করবেন তো দলিল-পত্র আছে কিনা।

অলিমাসিমা চুপ করে থাকেন।

দলিলপত্র? দিদিমা বলে গেছেন; আবার দলিল-পত্র কি? দাঁড়িয়ে মাপজোক করিয়ে, মনসা পুঁতে দিয়েছিলেন, ঠাকুরমশাই নক্সা এঁকে দিয়েছিলেন, আবার দলিলপত্র কিসের?

ধীরে ধীরে অলিমাসিমার শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। অলক। দাদার ছোট ছেলে অলক। ভুরুর কাছটা যেন মার মতন। মার মুখটা ভালো করে অবিশ্যি মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় দাদার ঘাড়ের চুল ঐ রকম খোঁচা-খোঁচা হয়ে থাকতো, দাদার ঘাড়টা ঐ রকম সরু ছিল, দাদা তখন ভালো ছিল, ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেই ডাকত,—অলকানন্দা। পকেটে পেপারমিণ্ট লজেঞ্চুষ আনত, তাতে ইংরেজিতে কি সব লেখা থাকত। অলক।

অলক উঠে দাঁড়ায়। অলিমাসিমা বলেন, জল ফুটে গেছে, অলক, বোসো। বৃষ্টি পড়ছে এখনো। অলক বলে, কিন্তু—

অলিমাসিমা চা ঢেলে দেন। ডুলি থেকে টিনের মধ্যে রাখা কুচো নিমকি বের করে দেন।

কেয়া কখন ফিরবে, মাসিমা? কি যে হবে ভেবে পাইনে।

কেয়াকে তুমি কি ভালোবাস? বিয়ে করতে চাও?

অলোক স্তম্ভিত হয়, কেয়াকে বিয়ে? কি যে বলেন, মাসিমা, কেয়ার তো কবে বিয়ে হয়ে গেছে। খুব ভালো মেয়ে কেয়া। কিন্তু কি হবে এবার কে জানে। দুজনারই চাকরি যাবে।

অলিমাসিমা উঠে দাঁড়ান। উনি যে মাথায় একটা লম্বা, অলক অতো লক্ষ্য করেনি। কেমন যেন বেঁটে মনে হত।

দাঁড়াও, অলক।

পাশের ঘরে অলিমাসিমা, কৌটো নামিয়ে, মোজা বের করেন। গিঁট খুলে বারোটি টাকা বের করে কৌটোয় রেখে, মোজার মুখে গিঁট বেঁধে, এ ঘরে এসে অলকের হাতে দেন। এর মধ্যে সাত হাজার টাকা আছে, বুকে করে নিয়ে যাও, এক মুহূর্তের জন্য কাছ ছাড়া করবে না, কাল সকালে জমা দিয়ে দেবে, অলক, এর যেন অন্যথা না হয়।

অলকের চোখের পাতা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে, হাত কাঁপে, নিতে পারে না। জোর করে হাতের মধ্যে মোজাটাকে গুঁজে দেন, অলিমাসিমা। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে, দরজা খুলে তাকে একরকম ঠেলে বের করে দেন। কর্কশ কণ্ঠে বলেন, যাও, চলে যাও, আর এসো না এ বাড়িতে। আনন্দ কেয়াকে বিয়ে করবে। তুমি যাও।

কিছু বোঝে না যেন অলক, খিড়কি খুলে ছুটে চলে যায়। বাতাসে খিড়কি দরজা দুলতে থাকে। অলিমাসিমার হাত-দুখানি ব্যথা করে। অলককে একবার বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য অলিমাসিমার দুই হাত টনটন করে। অলকের গালের মাঝে লম্বা একটা টোল পড়ে, সেইখানে চুমো খেতে ইচ্ছে করে অলিমাসিমার। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে অলিমাসিমার। অস্বাভাবিক জোরে খিড়কি দরজা বন্ধ করে অলিমাসিমা ঘরে এসে বসেন।

মাথা ঝিমঝিম করে, কানের মাঝে বাজনা বাজে, কান ঝালাপালা হয়ে যায়, ঘরময় সুর ছড়িয়ে পড়ে, ছাদের কোনায় কোনায় ধাক্কা খেয়ে অলিমাসিমার কানে ফিরে ফিরে আসে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, বাড়ির ছাদের কোনা থেকে, নারকোল গাছের পাতা থেকে, টুপটাপ জল পড়ে। নালা দিয়ে কলকল করে জল ছোটে, শিরশির সরসর করে নারকোল গাছের পাতা নড়ে। মেঘ সরে যায়, চাঁদ বেরিয়ে পড়ে, উঠোনের কোনায় কোনায় জমানো জলের ওপর চিকচিক করে। ছোট ঘরের খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে আসে। ব্যাঙের ছাতারা দুলতে থাকে, কেমন একটা ভিজে ভিজে সোঁদা গন্ধে ঘর ভরে যায়।

হাত-পা-গুলোকে হাল্কা মনে হয়, আর খিল ধরবে না মনে হয়।

অলিমাসিমা ছুটি পেয়েছেন।

আবহমান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালবাসে।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

ফুরয় না তার যাওয়া এবং ফুরয় না তার আসা,
ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।
সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে,
সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না বাসী,
হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দফুলের হাসি।
তেমনি করেই সূর্য ওঠে, তেমনি করেই ছায়া
নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদীর হাওয়া।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
এখনো সেই ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়'

পরিমল গোস্বামী

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—এই প্রবাদ-বাক্যটির উৎপত্তি-ইতিহাস আমি জানি না, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি যে, এটি কোনো বিজ্ঞ লোকের কথা, নইলে আর এটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হবে কেন ?

সুখে থাকতে অযথা যারা বিপদ ডেকে আনে, তাদের প্রতি বিদ্রূপ-বর্ষণই এ প্রবাদ-বাক্যটির উদ্দেশ্য, যদিও বিদ্রূপ কতখানি সার্থক আমার কাছে তা স্পষ্ট নয়।

ভূত কি সত্যিই মানুষকে সুখে থাকতে দেয় না ? কোনো মানুষ সুখে আছে এটা কি ভূতের পক্ষে অসহ্য ? তাই কি সে সুখী লোককে কিলোতে থাকে ? তাই কি সে তাকে সুখের গণ্ডি থেকে বার ক'রে দুঃখের সীমানায় এনে ছেড়ে দেয় ? অথবা এ কথার মানে কি এই যে, সুখে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই দুঃখকে ডেকে আনা হল ?

অথবা এ ভূত সত্য ভূত নয়, মানসিক ভূত ? অর্থাৎ মানসিক সুখের মধ্যে মানসিক ভূতকে আদর ক'রে ডেকে আনা ?

কিন্তু এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন আলোচনার আগে ভূত সম্পর্কে কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নীতিগত প্রশ্ন বলছি এজন্য যে, ভূত আদৌ কাউকে কিলোয় কি না (অকারণ অথবা আত্মরক্ষার্থ)—এটি খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হওয়াই ভাল। মনে রাখতে হবে ভূতদের সমাজ নিতান্ত ছোট নয়, এবং গত কয়েক লক্ষ বছর ধ'রে ভূত এ পৃথিবীপৃষ্ঠে (ঊর্ধ্বে দশ মাইল সীমা পর্যন্ত) তাদের জীবন-যাত্রা চালিয়ে আসছে। (স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ভূত আছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।) আরও বড় কথা হচ্ছে ভূতের মৃত্যু নেই। কোনো ভূতকে কেউ গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেনি, কোনো ভূতের মৃতদেহ কেউ কোথায়ও পড়ে থাকতে দেখেনি। একবার কোনো রকমে ভূত হতে পারলে নিশ্চিন্ত। অতএব ভূতদের জনসংখ্যা যেমন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি ওদের মধ্যে স্বভাবতই সমাজ-চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বভাবতই, কারণ সব সমাজেরই বিবর্তন আছে। এমন অবস্থায় ভালভাবে না জেনে ভূতমাত্রকেই হিংস্র বা হিংসুটে বলা সম্ভবত ঠিক নয়।
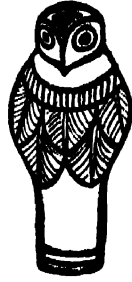
মানুষের সুখ দেখলেই যে-ভূতের ঈর্ষা হয়, কেউ সুখে আছে দেখলে যে-ভূত কিল মারতে আসে, সে-ভূত ভূত-সমাজে আদৌ আছে কিনা সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর সব দেশেই ভূত সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, এবং এ সব গল্প থেকে সে সব দেশের ভূতদের চরিত্র বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। দেখা যায় সভ্যদেশ মাত্রেই বহু সহৃদয় ভূত আছে এবং তারা মানুষকে সুখে থাকতে দেখলে কিল মারতে আসে না।

হ্যামলেট নাটকের ভূত হ্যামলেটকে বা অন্য কাউকে কিল মারেনি, কারণ সে ছিল হ্যামলেটের পিতৃভূত, এবং কোনো পিতৃভূতই পুত্রের পিঠে কখনো কিল মারে না। এই নাটকে হ্যামলেটের পিতার ভূতই বরং নিজের লোকের হাতে মার খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।—ব্যাপারটা ঘটেছিল এই : হোরাশিয়োর বহু অনুরোধেও যখন রাজভূত কোনো কথা না বলে চলে যেতে চাইল, তখন হোরাশিয়ো মারসেলাসকে বলল, ওকে থামাও। মারসেলাস বলল, ওকে (তা হলে) দণ্ডাঘাত করি ? হোরাশিয়ো বলল, কর, যদি না দাঁড়ায়।

Mar. Shall I strike it with my partisan ?

Hor. Do, if it will not stand.

Ber. 'Tis here !

Hor. 'Tis here ! [Exit *Ghost*]

Mar. 'Tis gone !

ভূত চলে যাওয়ার পর মারসেলাস দুঃখ ক'রে এমন কথাও বলেছিল যে—"এমন অভিজাত ভূতের উপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আমরা তার প্রতি বড়ই অন্যায় করেছি।"

এইজাতীয় সব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, ভূত ও হিংসা এ দুটি কথা সমার্থক নয়। মানুষের হাতে যে ভূত মার খেয়ে পালাতে পারে সে-ভূত কতখানি নিরীহ ভেবে দেখা উচিত। অনেক ভূতের মধ্যে আবার বাঙালীজনসুলভ হ্যাংলামিও আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লুল্লু গল্পে দেখা যায় এক ভূত খবরের কাগজের সম্পাদক হ'তে পারবে এই লোভে

নিজের দেহ থেকে তেল নিষ্কাশিত হতে দিয়েছিল। এ রকম মেরুদণ্ডহীন ভূত কখনো হিংস্র হতে পারে?

ভূত সম্বন্ধে আরো একটি দুষ্টবুদ্ধি-জাত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—

"ঠিক দুপ্পর বেলা ভূতে মারে ঢেলা
বলা কতই জানে খেলা।"

বলা নামক কোনো ভূত ঢিল মারে, যদি এর এই অর্থ হয়, তা হলেও এ কথা সত্যি নয়, কেননা ঘড়ি ধ'রে ঠিক দুপুরবেলা কোনো ভূত অদ্যাবধি কাউকে ঢিল ছোড়েনি। আর এর অর্থ যদি এই হয় যে, বলা নামক কোনো ব্যক্তি এ কাজ করে, তবে তো সব জলের মতো পরিষ্কার। বলা যে সেক্ষেত্রে কোনো ভূত নয়, বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সব প্রসঙ্গত।

আসল প্রশ্ন—'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ কি? এর মূলে অবশ্যই কোনো সত্য আছে, যদিও তাতে ভূতের চরিত্রে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে না। আমার বিশ্বাস সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় এই কারণে যে মানুষ নিজেই নিজের অনাবৃত পিঠটি ভূতের সামনে পেতে দিয়ে বলে, "ভাই, এবারে কিলোতে থাক।" এ লোভ ভূতের পক্ষে সংবরণ করা কঠিন, কেননা ভূতেরা হীনতাভাব বা inferiority complex-এ ভুগছে। ওদের সামনে পিঠ পেতে দিয়ে লোভ দেখাতে থাকলে তাই ওরা তা সামলাতে পারে না। পথে টাকা প'ড়ে থাকতে দেখলে যেমন যে-লোকটি চোর নয় সেও সাময়িক ভাবে চোর হয়, এও প্রায় তেমনি।

পিঠ পেতে যে কোনো হস্তধারীকে কিলের জন্য অনুরোধ জানালে কেউ কি আত্মসংবরণ করতে পারে? হাজার হলেও ভূতও তো এককালে মানুষ ছিল? ভূত এই কারণেই সুখী মানুষের পিঠে কিল মারে। সুখী মানুষ নিজেই এটা চায়। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে সে চায়।

কিন্তু কেন চায়? কারণ এইটে তার স্বভাব। এ না হ'লে সে পাগল হয়ে যেত। কিন্তু সুখে থাকতে মানুষ ভূতের কিল খেতে কেন ভালবাসে—এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

মানুষ যখন "সুখ চাই" প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই তার চেহারা কেমন, সে কোন্ আধারে থাকে, তাকে পেতে হ'লে মনের দিক দিয়ে কোনো প্রস্তুতি দরকার কিনা, এ সব বিষয় সে ভেবে দেখে না। যখন "আলো চাই" প্রার্থনা করে, তখনও সে আলোর স্বরূপ না জেনে প্রার্থনা করে। এবং সুখ যখন পায়, আলো যখন পায়, তখন তার আসল রূপটা কি বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারার কারণ এই যে, বিশুদ্ধ সুখ বা বিশুদ্ধ আলো নামক কোনো বস্তু এ-বিশ্বে কেউ ভোগ করতে পারে না। সুখের মধ্যে তাই কিছুকাল বাস করলেও বোঝা যায় না যে সুখের মধ্যেই বাস করা হয়েছে। যে-আলো সকল অন্ধকার দূর করে, সে-আলোই তো অন্ধকার রূপে দেখা দেয়। পাশে-পাশে দুঃখ না থাকলে কেউ সুখের স্বাদ পেত না, পাশে-পাশে অন্ধকার না থাকলে কেউ আলোর স্বাদ পেত না। হ্যালির ধূমকেতুর লেজের মতো। শোনা গিয়েছিল এই ল্যাজ পৃথিবী স্পর্শ করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে, অথচ যখন কথাটা শুনে লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই সবাই আমরা সেই ল্যাজের মধ্যে বাস করছিলাম।

অতএব সুখের বোধ জাগাতে হ'লে প্রত্যেকটি মানুষেরই মাঝে মাঝে একবার ক'রে ভূতের কিল খাওয়া দরকার হয়। বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন খাওয়া-পরা চাই, সুখে থাকতে হ'লে তেমনি প্রত্যেকটি লোকের অন্তত একটি ক'রে ব্যক্তিগত ভূত থাকা চাই। মানুষ যখন সুখের মধ্যে থেকে সুখের বোধ হারায়, তখনই তাকে গা থেকে জামা খুলে ব্যক্তিগত ভূতের সামনে কিল খাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

মানুষের ইতিহাস এর প্রমাণ। মানুষ কোনোদিনই সুখে থেকে সুখকে বুঝতে পারেনি। ইতিহাসের কথা থাক, আমরা নিজেদের জীবনে প্রতিবছর দেখতে পাই, আমরা গতবছর বেশি সুখে ছিলাম, এ-বছর ভীষণ দুঃখে আছি। পুরনো খবরের কাগজের পুজোর সময়কার সম্পাদকীয়তেও দেখা যাবে প্রত্যেক বছর পূর্ববছর থেকে কত খারাপ তা নিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আমি প্রমাণস্বরূপ ১৮৫৪ সালের সম্বাদ-ভাস্করের একটি খেদোক্তি উদ্ধৃতি করছি:

> কলিকাতা নগরে সকল বস্তুই মহার্ঘ। তবে দরিদ্র লোকদিগের জীবন রক্ষার উপায় কী শারদীয়া পূজা নিকট হইয়াছে দোকানি-পসারিরাও দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যম প্রকার মুগের মোন ২॥০, অড়হরের মোন ২।৵০, মাসকলাই মোন ১॥০...আতপ তণ্ডুল যাহা দুর্গা নৈবেদ্যে ব্যবহার হয় তাহার মোন ২॥০ টাকা, মধ্যম প্রকার ঘৃত সের এক টাকা।

আজ তণ্ডুলের মোন আড়াই টাকার স্থলে চল্লিশ টাকা, আজও সেই একই প্রশ্ন:

মহাশয়,—দোকান থেকে দুটো টাকা দিয়ে দু'সের আতপ চাউল নিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম কোন্ যুগে বাস করছি। ৪০ টাকা চাউলের মন। ন্যায্য মূল্যের দোকানেও আতপ চাউল নেই কাজেই আমার মত মধ্যবিত্ত লোক ৪০ টাকা মন দরে কি করে কিনে বিধবা মা বোনেদের খাওয়াবে।

এটি আজকের (১-৯-৫৮) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি চিঠির অংশ।

আমি বলতে চাই যে, সুখে যখন থাকি তখন সে-কথাটা আমরা বুঝতে পারি না। সুখে থাকার জন্য কত সামাজিক বিধিবিধান গড়া হয়েছে, শাস্ত্রকাররা হয়তো ভেবেছেন সমাজকে স্থায়ী সুখের গণ্ডিতে আটকানো গেল, কিন্তু এ-সুখ মানুষের সহ্য হয়নি। সে তার মধ্যে বার বার ভূত ডেকে এনে তার সামনে পিঠ পেতে দিয়েছে, কেননা সে সুখে ছিল কিনা, ভূতের কিল না-খাওয়া পর্যন্ত তা বুঝতে পারেনি।

সমাজ-জীবনের মতো ব্যক্তিচরিত্রও নানা নীতিশাস্ত্র ও মোহমুদ্গর জাতীয় বহু মুদ্গর বার বার ভেঙে ভূতের কিল খেতে বেরিয়ে পড়েছে নিষিদ্ধ গণ্ডিতে, এবং চরিত্র ঠিক আছে কিনা তার যাচাই করেছে এই ভাবেই। চরিত্রের পিঠে এই কারণেই ভূতের কিল মারতে হয়। ভূতের কি দোষ? ভূতেরা সাধারণত হিংস্র নয় আগেই বলেছি, এবং এ-কথাও বলেছি তারা সমাজ-সচেতন। তাই সমাজের বা ব্যক্তির উপকার হবে জানতে পারলে তারা আর স্থির থাকতে পারে না। এইতো সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম বেতার-কেন্দ্রের এক ইংরেজ মহিলা বছর কুড়ি আগে গারস্টিন প্রেসের বাড়িতে ভূতের কিল খেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এই মহিলার চাকরি ছাড়ার দরকার হয়েছিল বলেই ভূত এসেছিল, এবং ঐ মহিলারই অনুরোধে। সুখে ছিলেন তিনি অ্যানাউন্সারের চাকরিতে, কিন্তু যে-কারণে হোক তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি সুখে ছিলেন, তাই তিনি ভূতের সামনে পিঠে পাতলেন। ভূত প্রথম বার স্ত্রীলোক ব'লে একটু খাতির করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাকে ছাড়লেন না। দুবার ভূত দেখা দেওয়ার কারণ এটাই। খবরের কাগজ থেকে জানতে পারা গেছে তিনি দুবার ভূত দেখেছেন।

আমাদের দেশে বিবাহকে একটি স্বর্গনির্দিষ্ট বিধান ব'লে মানা হয়েছিল, স্থায়ী সুখ ও শান্তির আশায়। মেয়েরা কি সুখেই না ছিল এতদিন, এমন কি বিধবা হয়েও কি তৃপ্তি! জীবিত এবং স্বর্গীয় স্বামীরাও পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু বিধবাদের স্থায়ী শান্তির পিঠে কিল মারতে এলো ভূতেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যস্থতায় (বিধবাদের গায়ে হাত তুলতে ভূতেরা সাহস পায়নি)। আর অবাঞ্ছিত দাম্পত্যের পিঠে কিল মারতে এসেছে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের ভূত। সেদিন শুনলাম তিন হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা ঝুলছে কলকাতার আদালতে। শাস্ত্রকাররা ঠিক এরই অপেক্ষায় বাঁধন কঠিন করেছিলেন এককালে। তাঁরা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, সবই জানতেন। তাঁদের আশা পূর্ণ হয়েছে। এমনি চলতে চলতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুখ যখন অপরিমেয় হবে, তখন আবার মনে সন্দেহ জাগবে, "সুখে আছি তো?" ভূতেরা বলবে, "আমরা প্রস্তুত আছি, আসব কি?" বিচ্ছেদ-প্রাপ্তরা বলবে, "বোধ হয় আসা উচিত।" —ব'লে পিঠ পেতে দেবে।

অর্থাৎ আবার বাঁধন আসবে। আবার শাসন-সংহিতা-গুলোর নতুন সংস্করণ ছাপা হবে। তবে বোধহয় অনেক দেরি হবে এবারে।

প্রিয়তম
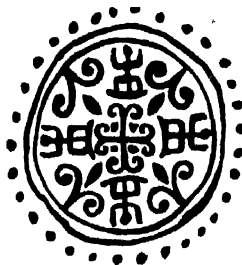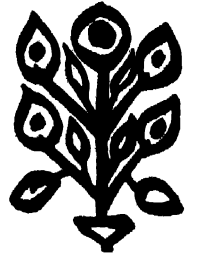
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নামটি যে চমৎকার তা মনে মনে নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার করে। সুধীর দোকানে বসে লক্ষ্য করেছে যারা সামনে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যায় তাদের কারো যদি সাইনবোর্ডখানা চোখে পড়ে সে একটু না একটু মুখ মুচকে হাসবেই। বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়, সুন্দরী হয়, কুমারী আর অল্পবয়সী হয়, তার মুখখানা লজ্জায় একেবারে টুকটুক করে। তারপর সেই রাঙা মুখখানা নিয়ে দোকানের একেবারে ভিতরে এসে ঢোকে। সঙ্গে আর কোন পুরুষ কি মেয়ে বন্ধু থাকলে ভালোই, না থাকলে একাও আসে। এসে হয়তো নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি-ব্যাগটায় হাত দেয়, কি কাঁচের যে ছোট্ট আলমারিটার মধ্যে কাঠের ওপর নকসা-কাটা গয়নার বাক্সগুলি রয়েছে সেখানে গিয়ে মুগ্ধচোখে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটির গায়ে গয়না নেই, বাক্সের মধ্যেও গয়না নেই। কিন্তু হবে হবে, দুজনেরই হবে, দুজনেই একদিন ভরে উঠবে।

মুগ্ধ হয়ে দেখবার মতো আরো অনেক জিনিস আছে ওই আলমারির তাকগুলিতে। আছে নানা আকারের, নানা ধরনের কৌটো, গোল আর চ্যাপ্টা। কোনটা মোষের শিং দিয়ে তৈরি, কোনটা হাতির দাঁতের। সুধীর মনে মনে ভাবে, কেবল মরা মানুষের দেহের কোন জিনিসই কোন কাজে লাগে না। তার সব গর্ব শুধু তাজা দেহ নিয়ে। মরে গেলে হয় ছাই, না হলে মাটি।

মনোহরণের আরো অনেক বস্তু আছে দোকানে। আছে বেতের চেয়ার, চামড়ায় মোড়া বাঁশের মোড়া। আছে কাঠের ক্যালেণ্ডার, টেবিলের ওপর বই সাজিয়ে রাখবার জন্যে নকসা-কাটা শেলফ। আছে নানা আকারের ফুলদানি, কৃষ্ণনগরের ছোট ছোট পুতুল। যুগলমূর্তি হর আর পার্বতীর। আসলে এই মর-পৃথিবীরই নর আর নারী। কারিগর কোন দৈবীভাব আনতে পারেনি এই দুই মূর্তিতে, চেষ্টাও করেনি। করলে, বিয়ের বাজারে চলত না। আজকাল বুড়ো শিবকে কোন্ পার্বতী পছন্দ করে? তাই শিবের চেহারাও করতে হয় কার্তিকের মতো, মদনের মতো; যাকে তিনি ভস্ম করেছিলেন। কায়ে-মনে তাকেই জয়ী করতে হয়, অমর করতে হয়, শিবের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে রাখতে হয়। চারটাকা-পাঁচটাকা দামের এই মাটির যুগলমূর্তিগুলি বেশ বিক্রি হয় আজকাল। কোনটি আলিঙ্গনবদ্ধ, কোনটি একেবারে চুম্বন-উন্মত। যার যেমন পছন্দ, সে তাই নেয়।

তারপর আছে দোলনা। বিয়ের দু-তিন বছর পরে যার দরকার হবে সেই ব্যবস্থা সুধীর দাসরা আগেই করে রেখেছে। এগুলিও বেশ বিক্রি হয়। দু-তিনটি ছেলে-পুলের হাত ধরে প্রৌঢ় দম্পতিও আসে, নতুন যে আসতে চাচ্ছে কি এসেছে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে। আবার একেবারে যারা প্রথম বাপ-মা হচ্ছে তারাও এসে দাঁড়ায়। খদ্দেরকে জিনিসপত্র বিক্রি করবার ফাঁকে ফাঁকে সুধীর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্বামী ফিসফিস করে কি এক একটা কথা বলে আর তরুণী গর্ভিণী স্ত্রীর মুখ লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে ওঠে। দেখতে ভারি ভালো লাগে

সুধীরের। খদ্দেরের দেওয়া রেজগিগুলি গুণে নিতে ভুল হয়ে যায়।

দেখতে পেলে সুধীরের দাদা অধীর কড়া ধমক লাগায়, 'কি ট্যালার মতো তাকাচ্ছিস। খুচরোগুলি ভালো করে গুণে নে।'

সুধীর লজ্জিত হয়ে ফের নিজের কাজে মন দেয়। টাকা-পয়সা বুঝে নেয়, কাগজ দিয়ে প্যাক করে, সুতো দিয়ে জড়ায়, মোটা হলে কাঁচি কি ছুরি দিয়ে কাটে, সরু হলে, তাড়াতাড়ি থাকলে দাঁতেই ছিঁড়ে নেয়। তাজা মানুষের অঙ্গের সব প্রত্যঙ্গই কাজে লাগে।

দোকানটা জ্যেঠতুতো ভাই অধীর দাসের। সুধীর রক্তের সম্পর্কে ভাই, কাজের সম্পর্কে কর্মচারী। মাল ডেলিভারি নেওয়া থেকে শুরু করে, জিনিসপত্র বিক্রি করা, খদ্দেরদের আপ্যায়ন করা, অবসরমতো তশীল তাগিদে বের হওয়া, আবার ভিতরে এসে দোকানপাট সাজানো-গুছানো ঝাড়পোঁছ করা, সন্ধ্যার সময় ধূপধুনো দেওয়া—সবই এক হাতে করতে হয় সুধীরকে। অবশ্য অধীরও বসে থাকেনা। সে ক্যাশে গিয়ে বসে। হিসাবের খাতাপত্র ঠিক রাখে। কোন্ জিনিস কোত্থেকে কিনলে সস্তায় পড়বে, কোন্ জিনিসের দাম কত বললে খদ্দেরও চটবেনা, পড়তাও ঠিক থাকবে সে ভাবনা অধীরের। মূলধন জোগাবার ভারও তার। চিন্তা-ভাবনার কাজ, মাথার কাজ সব অধীরের। আর সংসারে মাথার দামই তো সবচেয়ে বেশি।

সুধীরের কাজ হাত-পায়ের, চোখে-মুখের। যে চোখ মেয়েদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকায়, সেই চোখেই আবার খদ্দেরের জন্য অপলক হয়ে থাকে। সেই চোখ দিয়েই বুঝতে হয় কোন্ বয়সের কোন্ অবস্থার খদ্দেরের মনে কোন্ জিনিসটা ধরবে। আগে নয়নহরণ, তারপরে তো মনোহরণ। সুধীরের যে মুখ তরুণী মেয়েদের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে চুলবুল করতে থাকে সেই মুখই আবার এই দোকানের জিনিসগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। কাশীপুরের কারিগরের কাজকে কাশ্মীরী কাজ বলে চালায়, সাধারণ কাঠ থেকে মুখের কথায় চন্দনের গন্ধ বার করে। যা দোষ তাই গুণ করতে গিয়ে দোষগুলিও গুণ-বাচক বিশেষ্য, নিজের ত্রুটির সমর্থনে একদিন ক্লাসে এ কথা বলে ধমক খেয়েছিল সুধীর। যত ফাজিলই হোক, বাংলা আর সংস্কৃতে সে-ই সব চেয়ে সেরা নম্বর পেত।

কিন্তু সে বিদ্যা কোন কাজে আসেনি। মাথা খাটাবার কোন দরকারই এ দোকানে তার হয় না। তার কাজ হাত-পায়ের কাজ।

কিন্তু মাথার কাজও একফোঁটা আছে। কেউ জানুক আর না জানুক, কেউ বলুক আর না বলুক আছে। গয়নার কৌটোর ঢাকনির ওপরে পাতায় ঢাকা ফুলটির মতো সেই সূক্ষ্ম কাজটুকু আছে দোকানের এই নামটির মধ্যে। 'প্রিয়তম' নামটি সুধীরেরই রাখা।

শহরের এই বড় রাস্তার ওপরে ঘরখানি ভাড়া নিয়ে দোকানের কি নাম রাখা যায় অধীর দু-চারদিন তা নিয়ে বেশ ভেবেছিল। দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীরা মাথায় থাকুন, কিন্তু দোকানের মাথার সাইনবোর্ডে তাঁদের নাম আর দেওয়া যায় না। বড় পুরোন হয়ে গেছে ওসব নাম। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বরাজ স্বাধীনতা কথাগুলিরও যেন ধার কমে গেছে।

পছন্দমতো নাম আর মেলে না। সংসারে এত কথা এত শব্দ এত নাম, কিন্তু কোনটাই পছন্দ হয় না।

প্রকৃতিতে যত কোমলতা আছে—ফুল লতা পাতা, নদী, এমনকি ধানেরও কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে—বাংলাদেশের ধান আর নদীগুলির নামই বোধহয় সব চেয়ে বেশি মিষ্টি—অন্ন আর জল—যে নামগুলি মনে এসেছিল, সুধীর একটা একটা করে সবই তার দাদাকে শুনিয়েছে। কিন্তু অধীরের পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, 'দূর! দোকানটাকে তুই কি জলে ভাসিয়ে দিতে চাস, না মাঠে ঠেলে ফেলতে চাস? যা ফেলে এসেছি তা আর নয়। শহরে যখন এসেছি শহুরে হতে হবে। শহুরে নাম বল।'

নাগরিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জনপ্রিয়, লক্ষ্মীর প্রসাদও যারা সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকে সেই দু-একজন সিনেমা-স্টারের নাম করেছিল সুধীর।

অধীর সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলেছিল, 'তোর বউদি টের পেলে একেবারে খেয়ে ফেলবে।'

সুধীর বলেছিল, 'তাহলে বউদির নামটাই রাখ। সুচারু কথাটা তো ভালোই।'

অধীর ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'ফাজলামো হচ্ছে? মা বেঁচে আছেন না? দোকানের ওই নাম দিলে তিনি আমাকে কী চোখে দেখবেন? একেই তো দিনরাত খোটা শুনতে হয় আমি নাকি বউয়ের কথায় উঠি-বসি।'

তাহলে কী নাম দেওয়া যায়। আবার ভাবতে বসেছিল সুধীর। নাম-সমস্যা নিয়ে বেশ মাথা ঘামাতে হয়েছিল। প্রিয়, প্রিয়া, সুপ্রিয়, সুপ্রিয়া করতে করতে হঠাৎ নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'প্রিয়তম'। কথাটা ঠিক মুখের নয়, মন থেকেই বেরিয়েছে, যে মন মাথার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। নাকি কোথায় থাকে কে জানে!

সুধীর জোর দিয়ে বলেছিল, 'এই নামটাই রাখ দাদা। এই নামই সবচেয়ে ভালো হবে।'

অধীরের তবু খুঁৎখুঁতি যায় না। বলেছিল, 'মেয়েদের নাম দিলে ভালো হত না? ওর সঙ্গে একটা আকার যোগ করে—'

সুধীর বলেছিল, 'না। "প্রিয়তম"ই ভালো। আসলে আমাদের এই মনোহারী দোকানে কিনতে কাটতে মেয়েরাই তো বেশি আসবে। সঙ্গে পুরুষ ছেলে যদি কেউ থাকেও, পছন্দ করবে মেয়েরা, নেড়েচেড়ে দেখবে মেয়েরা, স্বামী কি সঙ্গীকে জিনিসগুলি কিনতে বাধ্য করবে মেয়েরা। তাই নামটা তাদের দিকে চোখ রেখেই রাখা ভালো, দাদা। প্রিয়তম-ই ভালো।'

নামটা শেষ পর্যন্ত অধীরের মনঃপূত হয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'কথাটা মন্দ বলিসনি। তোর বুদ্ধি আছে।'

হাসিটা অধীরের ঠোঁটে দুর্লভ। পয়সা যেমন বাক্স থেকে সে অতিকষ্টে বের করে, হাসিটাকে তার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করে রাখে। যেন হাতবাক্সের নয়, একেবারে আয়রন-চেস্টের সামগ্রী। তাই প্রাণের সিন্দুক খুলে নিজের মন থেকে যখন হাসে অধীর, তখন বড় ভালো দেখায়, বড় ভালো লাগে।

এই নামকরণের ইতিহাস সেখানেই শেষ। তারপর এই দোকান-প্রতিষ্ঠার দুবছরের মধ্যে কেউ আর জিজ্ঞাসা করেনি সে কথা। সাইনবোর্ডে নামটা দেখে অনেকেই মুচকি হেসেছে, খদ্দেরদের কেউ কেউ মুখ ফুটে বলেওছে, 'নামটা তো বেশ ভালো দিয়েছেন মশাই।' ব্যস, ওই পর্যন্ত। অধীর পাশে থেকেও কথাটা অযাচিত ভাবে বলেনি যে, নামটা সুধীরেরই দেওয়া। কেউ জিজ্ঞাসা না করলে সুধীরই বা কী করে কথাটা ফের তোলে।

কিন্তু গত দুবছরের মধ্যে সে সুযোগ আর আসেনি। কেউ আর তোলেনি প্রসঙ্গটা।

তৃতীয় বছরের শুরুতেই একজন করল। সুধীরের কি ভাগ্য সে পুরুষ নয়, মেয়ে। হাতে একখানা বই আর একখানা খাতা দেখে অনুমান করেছে সুধীর, মেয়েটি কলেজে পড়ে। তরুণী সুন্দরী মেয়ে। যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না তাদেরই একজন। কিন্তু সে মুখ যখন ফোটে তখন পদ্মফুলের মতোই ফোটে। তাকে দেখলে পণ্ডিতমশাইএর সেই উপমা 'ফুল্লনলিনী'র কথাই মনে পড়ত সুধীরের। সংস্কৃত পড়াটা কাজে লাগত। নভেল-নাটক কবিতার বই পড়া সার্থক মনে হত।

সেই ফুল্লনলিনীই একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল। আকাশ মেঘে ছাওয়া। দুপুরের ঠিক পরে। কিন্তু আকাশ দেখে বুঝবার জো ছিল না তখন কোন্ প্রহর। দোকানে ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটিও খদ্দের ছিল না। দুপুরে বাসায় খেতে গিয়েছিল অধীর। খাওয়ার পরে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে স্ত্রীর সেবায় সোহাগে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই সে সময় দোকানে আর কেউ ছিল না। না মালিক না খদ্দের। শুধু সুধীর আর সেই মেয়েটি। মালী আর একটি ফুল।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই অবশ্য সুধীরের কাউন্টারের কাছে এল না। কাঁচের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সেই নকসা-কাটা বাক্স কৌটো আর ব্যাগগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দেখল। আর ফাঁকে ফাঁকে সুধীরের চোখ এড়িয়ে তাকাতে লাগল বাইরের পথের দিকে। সুধীর বুঝেছে। মেয়েটি দোকানে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব বুঝেছে। এই দুপুরবেলায় কলেজ পালিয়ে মেয়েটি যে কোন জিনিস কিনতে আসেনি, দোকানের জিনিসগুলি যতই নয়নলোভন হোক, সেগুলির কোনটির আকর্ষণেই যে ও এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেনি, সুধীর এত বোকা নয় যে তা বুঝতে পারবে না। বয়স তো আর কম হয়নি তার। তিরিশ পেরিয়ে গেল। এই বয়স অবধি বিয়ে-থা না হলেও বরযাত্রী অনেকবার গেছে, প্রেমে না পড়লেও প্রেমের গল্প ঢের পড়েছে। সুধীর বুঝতে পারবে না কেন। তাছাড়া প্রায় ছ'মাস ধরে মেয়েটি আর ছেলেটি এই দোকানে একসঙ্গে আসছে। মাঝে মাঝে দু'একটা জিনিস কিনছে, মাঝে মাঝে শুধু নেড়েচেড়ে চলে যাচ্ছে। একবার মেয়েটি একটি কলমদানি কিনল। সুধীর কি বুঝতে পারল না কার জন্যে? ছেলেটি কিনল সুন্দর একটি সাদা কৌটো আর লালরঙের ব্যাগ। সুধীরের কি কিছু বুঝতে বাকি রইল? এমনি চলছে ছ'মাস ধরে। আরো কত আগে থেকে চলেছে কে জানে! সুধীর লক্ষ্য করেছে সবদিন ওরা একসঙ্গে আসে না। কেউ আগে আসে, কেউ পরে। সেদিন মেয়েটিই আগে এসে পড়েছিল।

মেয়েটি আর একবার তার ছোট হাতঘড়িটির দিকে তাকাল, আরো একবার পথের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে চলে এল সুধীরের কাউন্টারের কাছে। ওভাবে দশ মিনিটের বেশি যে দাঁড়িয়ে থাকা যায়না সেই বোধটুকু তাহলে এতক্ষণে জেগেছে।

মেয়েটি কাউন্টারের কাছে এসে আলাপ শুরু করে দিল, 'আচ্ছা, ওই হরপার্বতীর মূর্তি, ওগুলি কোত্থেকে আসে?'

সুধীর বলল, 'কৃষ্ণনগর।'

'মূর্তিগুলি বেশ সুন্দর।'

সুধীর মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

'দাম কত?'

সুধীর বলল, 'দাম তো একরকমের নয়। সাইজও একরকমের নয়। ছোট আছে, বড় আছে। কোন্‌টা আপনার পছন্দ, আপনি কোন্‌টার কথা জিজ্ঞাসা করছেন—'

ব'লে সুধীর দু'তিনটি মূর্তি এনে তার সামনে রাখল।

একটু অপ্রস্তুত হয়েছে মেয়েটি। তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ঠিক আজই কিনছি না।'

সুধীর যেন তা জানে না! হেসে বলল, 'নাই বা কিনলেন। দেখুন না।'

মেয়েটিও হাসল, 'যা দেখি তাই ভালো লাগে। যত দেখি ততই ভালো লাগে। পছন্দ আমার সবই। কিন্তু এদের ভিতর থেকে একটি বেছে নিয়ে কিনব। আমার এক বন্ধুর বিয়ে আসছে। তখন কিনব। তখন থাকবে তো?'

সুধীর বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবে।'

মেয়েটি মধুর অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'কই আর থাকে। আপনি শুধু মুখেই বলেন। সেদিন দুটি ফ্লাওয়ার-ভাস পছন্দ করে গেলাম, দুদিন পরে এসে দেখি আর নেই।'

সুধীর স্মিতমুখে বলল, 'আপনি একটু বলে যাবেন তাহলেই থাকবে। দু'মাস পরে এসেও পাবেন।'

মেয়েটি বলল, 'তা জানি। আপনাদের ব্যবহার এত ভালো। এমন ভদ্র ব্যবহার আর কারো কাছে আমরা পাইনি। এ পাড়ায় আরো তো কত দোকান আছে, রেস্তোঁরা আছে, কিন্তু এ দোকানের মতো কোনটাই নয়। আপনারা যখনই দোকানটা খুললেন আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এতদিনে সত্যিই একটা শৌখীন দোকান এ পাড়ায় হল। একসঙ্গে এত রকমের শখের জিনিস এ পাড়ায় আর কোথাও নেই। সবচেয়ে চমৎকার আর ওরিজিন্যাল হল দোকানের নামটি।' মেয়েটি ফিক ক'রে একটু হাসল, 'আচ্ছা, নামটা কে রেখেছে বলুন তো?'

সুধীর বলল, 'অনুমান করুন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনিই তো! আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। দেখুন আমার আন্দাজ কত ঠিক। এই নিয়ে আমি একজনের সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম। দুজনের মধ্যে যিনি দেখতে ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চমৎকার ব্যবহার করেন, চমৎকার কথা বলেন, নামটা নিশ্চয়ই তিনি দিয়েছেন। বাজিতে আমি আজ জিতে গেলাম।'

সুধীর কি বুঝতে পারেনা? কার সঙ্গে বাজি, কার সঙ্গে এই হার-জিতের মধুর লড়াই? বুঝতে পারেনা কোন্‌ যুদ্ধে জয়ও যা, পরাজয়ও তাই?

কিন্তু বুঝতে পারলেও বলতে নেই। শুধু যেটুকু কানে আসে সেইটুকুই শুনে যেতে হয়। যেটুকু চোখে পড়ে সেটুকু দেখে যাওয়াই ভালো। তার বেশি জানতে গেলে ঠকতে হয়। ঠেকে ঠেকে এ অভিজ্ঞতা সুধীরের যথেষ্ট হয়েছে।

তবু মেয়েটি যে তাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে তাকেই বেশি পছন্দ করেছে, দোকানের মালিকের চেয়ে সেলসম্যানই যে তার বেশি নজরে পড়েছে এইটুকু জানতে পেরেই সুধীর খুশি। আর দোকানের নামটা যে এখানে সুধীর ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না, তার সম্বন্ধে মেয়েটির এই ধারনাতেই তার মনে আর আনন্দ ধরে না।

তারপর একটু বাদেই ছেলেটি এসে পড়েছিল। শুধু মেয়েটিরই কানে পৌঁছায় গলার স্বরকে ততখানি নামিয়ে বলেছিল, 'Sorry.'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই তার দুঃখে দুঃখিত হয়নি। রাগ করে বলেছিল, 'এত দেরি করলে কেন? তোমার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে!'

ছেলেটি চোখের ইসারায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছিল। সুধীর যে উপস্থিত আছে এ খেয়াল কি মেয়েটির নেই?

বুঝতে পেরে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল মেয়েটি, লজ্জিত হয়েছিল।

ছেলেটি হঠাৎ সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট সুধীরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'নিন।'

সুধীর বলেছিল, 'না না, সে-কি!'

ছেলেটি বলেছিল, 'আহা, নিন না। তারপর কিরকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে আপনাদের?'

সুধীর বলেছিল, 'এই চলছে এক রকম।'

ছেলেটি বলেছিল, 'আরো ভালো চলবে। এই দু-তিন বছরের মধ্যেই বেশ জেঁকে উঠেছেন আপনারা। দেখেও ভালো লাগে। Wish you good luck'.

ছেলেটি বেশ লম্বা। আর বেশ স্মার্ট। সাহেবি পোশাকে ভালোই মানিয়েছে। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে। ঠিক যে কত বোঝা যায় না। তবে মেয়েটির চেয়ে বয়সে বেশ বড়। আর দেখে মনে হয় চালাক-চতুরও বেশি। কী করে ওদের আলাপ হল জানবার জো নেই। কতদিনের আলাপ কতদিনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাও শুধু অনুমান করেই নিতে হয়। ছেলেটি বোধহয় কোন অফিসে-টফিসে কাজ করে। এমন অফিস যেখান থেকে ইচ্ছা করলে ভর-দুপুরেও পালানো যায়, কিংবা এমন অফিস বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোই যেখানকার কাজ। হয়তো কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট, হয়তো কোন ওষুধের কারখানার এজেন্ট। এমন আরো কত আছে সুধীর তার কী-ই বা জানে, কী-ই বা খবর রাখে।

কিন্তু যাই হোক, ছেলেটিকে সুধীরের তেমন ভালো লাগেনি। এর মধ্যে হিংসার কিছু নেই। হিংসা সে কেন করতে যাবে, করে লাভটা কি। হিংসা নয়, তার মনে হয়েছে ছেলেটি যেন আরো কমবয়সী আর বেশি রূপবান হলে ভালো হত, মানাতো। কথায়বার্তায় আরো একটু ভদ্র, লাজনম্র আর বিনয়ী।

ওর এই সিগারেট অফার করবার ধরনটা সুধীরের ভালো লাগেনি। অবশ্য গোল্ডফ্লেক তার ভাগ্যে কমই জোটে। কিন্তু এত দামী সিগারেট খেয়েও সুধীরের সুখ নেই। ছেলেটির দেওয়ার ধরনটির মধ্যে কোথায় যেন অনুকম্পার ভাব মেশানো আছে। আছে যেন একটু ঘুষ দেওয়ার ধরন। জিনিসপত্র না কিনেও মেয়েটি যে দোকানে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, দামী স্বাদু সিগারেট কি সেই জন্যেই?

কিন্তু সুধীর কি এই সিগারেটটার অপেক্ষায় ছিল। সে কি ওর চেয়েও বেশি কিছু পায়নি?

তারপর এই ব্যবসা-বাণিজ্য আর জেঁকে বসার কথাগুলি। যে প্রেমে পড়েছে, যার সঙ্গে প্রণয়িনী উপস্থিত আছে তার মুখের ভাষা অত কাটখোট্টা হলে যেন ভালো লাগে না। সুধীর নিজে যদিও দোকানদার, সারাদিন বেচাকেনার কথাই বলে, তবু ছেলেটির মুখ থেকে ওই ধরনের কথাবার্তা শোনবার জন্য সে তৈরি ছিল না। ছেলেটি যেন এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল: তুমি ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু নও, তুমি শুধু দোকানদার।

বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে সুধীর আরো অনেক সময় ভেবেছে মেয়েটি যোগ্যতর আর কাউকে পছন্দ করলে পারত। কিন্তু কে জানে ছেলেটি হয়তো সত্যিই খুব গুণবান, বিদ্বান, চাকরি ক'রে অনেক টাকা রোজগার করে। তা যদি নাও হয় তাতেই বা ওদের প্রেমে পড়তে বাধা কি। এর চেয়ে বেমানান জোড় কি সুধীর দেখেনি? কত দেখেছে। এ তো ঘটকালি নয় যে, ঠিকুজী কুষ্ঠী মিলিয়ে দাঁড়িপাল্লায় সোনাদানার মতো রূপগুণের ওজন নিয়ে বাটখারার দুদিক সমান রেখে তবে মিল হবে। এ মিল আর এক রকমের। এতে তিলপ্রমাণ মিল থাকলেই যথেষ্ট।

বিয়ের মরশুমে দোকানে বেশ ভীড় হয়। বিক্রি হয় জিনিসপত্র। ফুলদানি, গয়নার বাক্স, কৌটো, যুগলমূর্তি সবই চলে। অধীর টেবিল-ঢাকনি, জানলার রঙ-বেরঙের পর্দাও স্টক করতে শুরু করেছে। বিয়ে আর অন্নপ্রাশনের মরশুম ছাড়াও সেগুলি বিক্রি হয় বেশ। মেয়েটি সবদিন যে তার বন্ধুকে নিয়ে আসে তা নয়, মাঝে মাঝে দু'একজন বান্ধবীকেও আনে। সবাই মিলে শখের জিনিসগুলি দেখে, নাড়েচাড়ে, দরদাম করে। আবার দু'একটা কেনেও। দলের মধ্যে মেয়েটিকে আরো বেশি সুন্দরী দেখা যায়। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে সুধীর তার সঙ্গে স্বস্তিতে আরো সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। অন্য পাঁচজনের কাছে যে জিনিস যে দামে বিক্রি করে তার চেয়ে মেয়েটির কাছ থেকে কিংবা তার সঙ্গে যারা আসে অনেক সময় তাদের কাছ থেকেও দু'আনা এক-আনা কম নেয়

সুধীর। তার এই দেওয়ার কথা মেয়েটি জানে না, জানবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যে জানবার সে জানে। অধীর মাঝে মাঝে টের পায়। আর টের পেলেই ধমক দেয়। বলে, 'অত যে কমে দিলি, পড়তা ঠিক থাকবে?'

সুধীর বলে, 'থাকবে দাদা। ওঁরা তো অনেক জিনিস নিয়ে থাকেন। একটু সস্তা করে দিলে আরো বেশি আসবেন, আরো বেশি নেবেন।'

অধীর বলে, 'থাক থাক, বুঝতে পেরেছি। তোকে নিয়ে হয়েছে মহা জ্বালা। মেয়েরা দোকানে এলে আমাকেই কাউণ্টারে বসতে হবে দেখছি। নইলে তুই সব বিলিয়ে দিয়ে আমাকে ফতুর করে দিবি।'

সব! বড়জোর দু'আনা এক-আনাই তো ছাড়ে সুধীর। ষোল-আনা সে দেবে কোত্থেকে আর নেবেই বা কে?
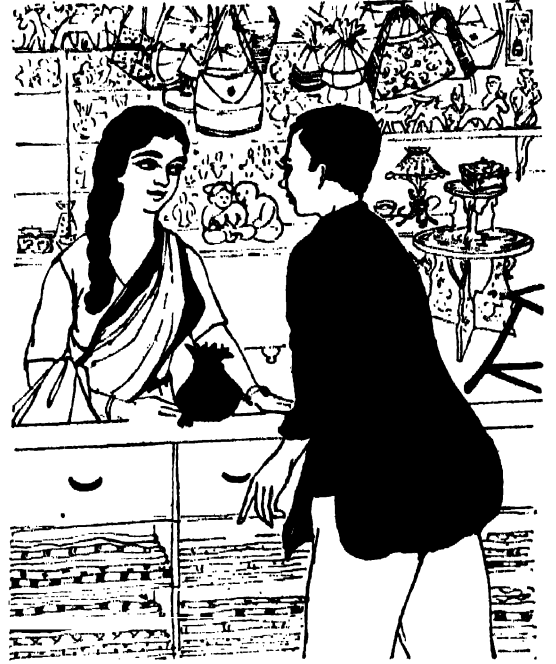
তারপর এই আষাঢ় মাসে আর একটা বিয়ের মরশুম এল। অনেক জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে দোকানে। রোজই কাস্টমারের ভীড় বাড়ছে। অধীর আর সুধীর দুজনেই খুব খুশি। সেদিন অধীর মাল কিনতে বেরিয়েছে, সুধীর এক হাতে বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সেই ভীড়ের মধ্যে মেয়েটিও আছে। খুব হাসিখুশি মুখ। শরীরটা আরো ভালো হয়েছে।

সুধীর বলল, 'ক'দিন তো আসেননি এদিকে! ভালো আছেন?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ। দেখুন এবার আমার সেই পছন্দ-করা জিনিসগুলি নেব। সব আছে তো?'

সুধীর বলল, 'সবই আছে। কী ব্যাপার? আপনার সেই বন্ধুর বিয়ে বুঝি?'

মেয়েটি হাসি-মুখখানা একটু নামিয়ে নিল। সুধীরের বুঝতে বাকি রইল না, কার বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঈর্ষার কাঁটা বুকে গিয়ে বিঁধল।

কিন্তু সুধীর একমুখ হাসির মধ্যে সেই যন্ত্রণার বিন্দুকে লুকিয়ে ফেলল। বলল, 'ভালোই তো, ভালোই তো। আমরা নিমন্ত্রণ পাব না?'

মেয়েটি বলল, 'পাবেন বইকি। আমার দাদার সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে দেব। জিনিসগুলিও তিনিই এসে নেবেন। আপনি যাবেন কিন্তু।'

সুধীর বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।'

ফ্লাওয়ার-ভাস, ভ্যানিটি-ব্যাগ, যুগলমূর্তি, আরও কয়েকটি জিনিস মেয়েটি পছন্দ করে গেল। না করলেও পারত। সুধীর কি জানেনা ওর কি কি পছন্দ? এত দিনেও কি জানতে বাকি আছে? সুধীর ভাবল এর মধ্যে একটা জিনিসের দাম সে নেবে না, সে নিজে দেবে।

কিন্তু পরদিন আর মেয়েটির দাদার দেখা নেই। তার পরদিনও না। বেছে বেছে জিনিসগুলি একদিকে লুকিয়ে রেখেছিল সুধীর; আর বুঝি পারে না। কই তার দাদা? নিজের দাদার ধমকে সুধীর অস্থির হতে লাগল, তারপর আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিল জিনিসগুলি। কি আর করবে! তার নিজের জিনিস তো নয়। হয়তো মেয়েটির দাদা অন্য কোন দোকানে গেছেন। হয়তো এই দোকান থেকেই তিনি তাঁর নিজের পছন্দমতো বিয়ের উপহারের জিনিসগুলি নিয়ে গেছেন। সুধীর কী করে চিনবে। মেয়েটির দাদাকে তো কোনদিন দেখেনি।

কিন্তু মাস ঘুরে গেল, কারোরই দেখা নেই। ছেলেটিও আসে না, মেয়েটিও আসে না। না একসঙ্গে, না আলাদা আলাদা। হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। অন্য কোন শহরে, কি এই শহরেরই অন্য কোন পাড়ায়।

তারপর মেয়েটির বান্ধবী এল একদিন একটা ফুলদানি কিনতে। দোকানে তেমন ভীড় নেই। সুধীর ফুলদানিটা

প্যাক করে তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

সে বলল, 'বলুন না।'

সুধীর সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'আপনার সেই বন্ধুর কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

সে বলল, 'কার কথা বলছেন?'

সুধীর বলল, 'সেই যে—এখানে যিনি প্রায়ই আসতেন। ডান গালে তিল আছে—'

সে বলল, 'বুঝেছি। শীলার কথা বলছেন তো? তার কথা আর বলবেন না। বড় দুঃখের ব্যাপার। বড় বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে।'

সুধীর বলল, 'কী হল!'

সে বলল, 'বিয়ের আগের দিন ধরা পড়ল, লোকটা একটি চীট। রায়পুরে ওর আর একজন স্ত্রী আছে। চাকরি-বাকরি সব মিথ্যে কথা। ভাগ্যে আগে থেকেই সব জানা গিয়েছিল। নইলে কি হত বলুন তো?'

জিনিস নিয়ে মেয়েটির বান্ধবী চলে গেল।

সুধীর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে এইজন্যেই মেয়েটি আর আসে না। বোধহয় কোনদিনই আসবে না। এ দোকান এখন নিশ্চয়ই তার কাছে সব চেয়ে অপ্রিয়। বিষের সমান। যেখানে সে প্রায় রোজ আসত, সেখানে সে আর কোনদিনই আসবে না।

ছেলেটি শুধু মেয়েটিকেই ঠকায়নি, প্রিয়তমেরও বড় লোকসান করে গেছে।

ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু না করিলেও নিবৃত্তি নাই—এখন বিস্তর ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তাহার ভাল মন্দ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহাই আমরা সমালোচনা করিতে অনিচ্ছু। ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখকেরা কেবল ঘটনা লেখেন। কিন্তু কেবল ঘটনায় অন্তরস্পর্শ করে না। যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে অন্তরের একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে না পারা যায় ততক্ষণ ঘটনা বৃথা।

কেবল ঘটনা-লেখক রামায়ণ লিখিতে গেলে হয় ত লিখিবেন :—"রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বিমাতার কৌশলে বনে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সীতা ছিলেন, একটা রাক্ষস আসিয়া সীতাকে হরণ করিল। তখন রাম চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর এবনে ওবনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমত সময় কতকগুলি বানর আসিয়া রামের সহায় হইল। তাহাদের সাহায্যে রাম সমুদ্র বাঁধিলেন, রাক্ষসকে মারিলেন, সীতাকে উদ্ধার করিলেন, অযোধ্যায় আসিলেন। তাহার পর একদিন সীতা সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা সন্দেহ হইল, অমনি রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাইলেন।" বাল্মীকি যদি এই ঘটনাগুলি এখনকার মত ক্ষুদ্র উপন্যাস আকারে লিখিয়া ছাপাইতেন তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণের দুর্দশা বটতলার গ্রন্থের মত হইত।

ঘটনা লেখক কেবল যড়যন্ত্রের মত। তাপমান যন্ত্র দাঁড়াইয়া বলিতেছে এই ৮৮ ডিগ্রি উত্তাপ, তাহার পর এই ৮৭ হইল, তাহার পর এই ৯০ হইল তাহার পর এই আবার ৮৮ হইল। ঘটনা লেখক ঠিক তাহাই বলেন, এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পর এই ঘটিল, তাহার পর আবার এই ঘটিল। কেন ঘটিল তাহা বলিব না, কেবল ঘটনা বলিব।

—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮৯
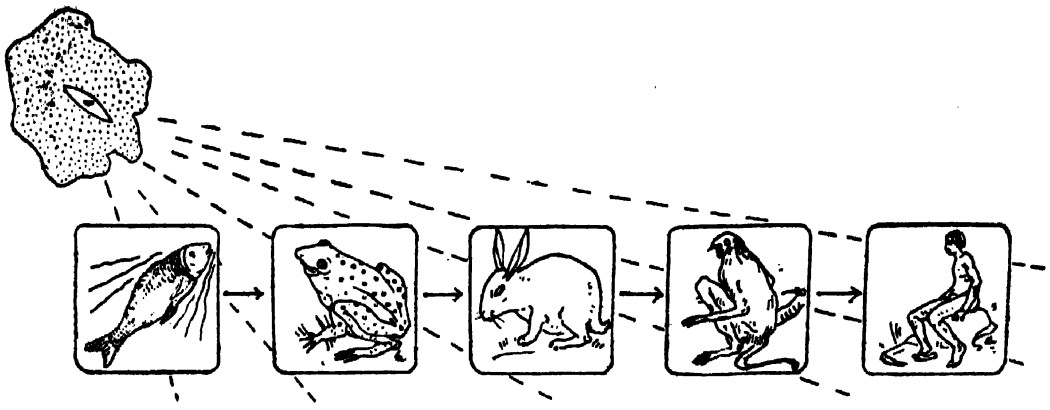
অ্যামিবা ও আমরা

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

অণুবীক্ষণের এস্‌প্লানেডে অ্যামিবার সঙ্গে প্রায় রোজই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এমনিতে না ঘাঁটালে, অ্যামিবা কোনদিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না, আপনার মনে গদাই-লস্কর চালে থপ্‌থপ্ করে চলে যায়। কিন্তু কি বলবো, এই সেদিন যেমনি ওর সঙ্গে একটু চোখাচোখি হচ্ছে-হবে বলে মনে হচ্ছে, অমনি অ্যামিবা হাত-পা গুটিয়ে এক জায়গায় কি রকম বম্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে বিনা ভাষায় এত কথা শুনিয়ে গেল যে, আমি তো কোন্ ছার, তা শুনলে তা-বড়-বড় সব তত্ত্বজ্ঞানীদের চোখও কপালে উঠে স্থির হয়ে থাকবে, আর নামবে না। বাব্বা, অ্যামিবারও পেটে পেটে এত! আমি যাই ডালে ডালে, তো ও যায় পাতায় পাতায়! এই সাজসজ্জা, লাজলজ্জার মাঝে অ্যামিবাকে কোনদিনও আমার অসামান্য কিছু বলে মনে হয়নি। কিন্তু যে কথা শুনিয়ে গেল, যে কথা বুঝিয়ে গেল, তারপর মনে হচ্ছে—সবেধন নীলমণি ওর ঐ একখানি কোষ সম্বল হোলে কি হয়, ওর ভিতরই রয়েছে জীবনের অপার অনন্ত এক ঐশ্বর্য-মহিমা। অ্যামিবা সেদিন যে-কথা চুপিচুপি বলে গেল তা ওরই কথায় বলতে গেলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—

এতদিন ধরে আমরা তোমাদের সব দেখেছি, সব বুঝেছি, কিন্তু মুখ খুলিনি, শুধু বুক পেতে সহ্য করেছি। কিন্তু মানুষের পাল্লায় পড়ে পৃথিবীর ব্যাপার-স্যাপার এমন দাঁড়াচ্ছে যে, এখন মুখ না খুলে আর থাকবার জো-টি নেই। সারা সৃষ্টিকে তোমরা অনাসৃষ্টি করে তুলেছ। কথায় কথায় তোমাদের এত লম্ফঝম্প; আসলে কিছুই নয়—শুধু লোক-দেখানো ওপর-চালাকি। এমন কাণ্ড তোমরা বাধিয়ে তুলেছ যে এতদিনের ক্রমবিকাশের যত সাফল্য সব যেন একনিশ্বেসে ভেস্তে দিয়ে গোল পাকিয়ে দেবে। এখন পৃথিবীতে শান্তি চাই—তোমাদের জন্যে, আমাদের জন্যে, বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণীদের জন্যে। আর অশান্তি নয়। আমরা এক-কোষী অ্যামিবা হ'লেও, আমরা ক্রমবিকাশের নজিরে তোমাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সে কথা যদি মানো, তাহলে দোহাই, আর অশান্তি বাড়িও না বলছি। তোমাদের মতো অমন জীব-জগতের ছোট-বড়-মেজ বহুৎ বাবাজীকেই আমরা জন্মাতে দেখেছি। আরে বাবা, সৃষ্টির আদিতে যখন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মালুম, বুঝলে, তোমাদের পণ্ডিতরা হিসাব করে বলে, সে নাকি শ দুই কোটি বছর আগে (চুপি চুপি বলে রাখি, তোমরা মানুষ এ-পৃথিবীতে দশলক্ষ বছর আগে ছিলে না), তখন থেকেই তো দেখে আসছি কি করলে কি হয়। তাই ভাল চাও তো, শুধু গলাবাজিতে 'মানবিক' 'মানবিক' কথাটা আউড়ো না। এখন থেকে সব-কিছুর প্রমাণ চাই তোমাদের বিনম্র আচরণে। কথায় চিঁড়ে আর ভিজবে না। যখন তোমরা মানুষে ক্রমপরিণতি লাভ করলে, তখন দেখে মনে হয়েছিল, আশা হয়েছিল—যাক্, এইবার বুদ্ধিসুদ্ধিওয়ালা একরকম তালেবর জীব তৈরী হলো, যারা নতুন করে দুনিয়াকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু ছাই, কার্যতঃ দেখা গেল, তোমরা তোমাদের নিজের পাতের দিকেই ঝোল টানতে এত ব্যস্ত যে, অন্য কার কি হলো তার পরোয়া করো না। স্বার্থ ভয়ানক জিনিস বুঝলে?

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, যত দিন যাচ্ছে দেখছি তোমাদেরও এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, তোমরা নাকি সব এক এক জন দেব-পুত্তুর বিশেষ। তাই এত মাতব্বরি। কিন্তু আর কারও চোখে ধুলো দিতে পার, আমাদের নয়। বললুম তো, তোমরা ছিলে আমাদেরই মতো সামান্য

জীব, অভিব্যক্তি তোমাদের জয়যাত্রার রাস্তা পরিষ্কার করে দিলো। কত ভোল পাল্টে তবে না এই হালফিলের মানুষের চেহারাটা পেলে। নিজের দেহের মধ্যে যে সেল-

লাইব্রেরী আছে—সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার আছো তো? সেখানে তোমাদের এই মাছ হওয়া, ব্যাঙ হওয়া, টিকটিকি হওয়া, খরগোস হওয়া, বাঁদরের মতো হওয়া, তারপর শেষে মানুষ হওয়া—এই সব-কিছু হওয়ার সব ইতিকথা সেলের মধ্যে লেখা আছে। তাই দেব-পুত্তুর হয়ে কোথায় পালাবে চাঁদ তোমরা!
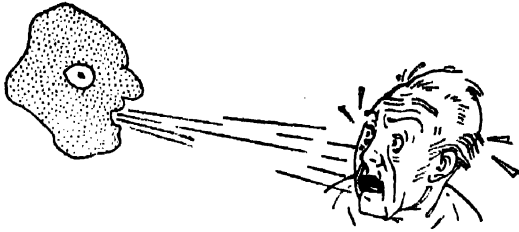
তোমাদের সেল-লাইব্রেরীতে অনেক সেল আছে। সেই হিসেবে তোমরা অনেক সেলের মালিক। তাই বোধ হয় তোমরা নিজেদের এত করিৎকর্মা বলে মনে কর; ভাব, সারা দুনিয়া থেকে তোমরা আলাদা। অনেক সেল আছে বলেই তোমরা উঁচুদরের? কে বললে? আর আমরা এক-সেলের মালিক বলেই নীচু দরের। এ কথা তোমাদের ভাবতে ভাল লাগে তো ভাব। কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা—সে কথাটা আমরা অত সহজে মানতে রাজী নই। আমরা বলবো তোমরা জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লক্ষ-কোটি সেলের প্রয়োজন বোধ কর, সেখানে আমরা সবেধন নীলমণি একখানি সেল দিয়েই বাজিমাত করে দিতে পারি। এখন আর পাঁচজন বলুক—কৃতিত্ব কার, তোমাদের না আমাদের? বাহুল্যে না অনাড়ম্বরে? আমি বলবো—ওই বাহুল্যই তোমাদের কাল—অনাড়ম্বর আমাদের ভূষণ।

তোমরা কথায় কথায় 'হেন করেঙ্গা' 'তেন করেঙ্গা' বল। আমরা মুখ ফুটে কিছু বলি না। কিন্তু কার্যতঃ করে দেখাই—অনেক সেল দিয়ে নয়—একটা সেল দিয়েই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তোমাদের চলতে ফিরতে, খেতে বসতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিত্য প্রয়োজন হয়। এক একটি অঙ্গ তৈরী করতে কয়েক কোটি করে কোষের প্রয়োজন হয়। আমাদের ব্যাপারটা আরও মজার কিন্তু। একের চেয়ে বেশী সেলও নেই, আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নেই—বাঁচতে জানলে ওই একখানি সেল দিয়েই সব ম্যানেজ করা যায়। এই যেমন চলার ব্যাপারটাই বলি। আমাদের আলাদা কোন পা নেই—সেলের পাশ থেকে একটুখানি বার হয়ে ঝুটো পা তৈরী হয়। আর তাই দিয়ে পুকুরে জলের মধ্যে আমরা টুক টুক করে চলে-ফিরে বেড়াই। তোমরা তার টেরটিও পাও না। তোমরা নকল দাঁত, নকল পা, মায় নকল চাঁদ তৈরী করতে ওস্তাদ; কিন্তু এমন ঝুটো পা'র হদিস তোমাদের কোনও শাস্ত্রের ত্রিসীমানায় জানা আছে? আমরা এই ঝুটো পা'র সাহায্যে হানড্রেড মিটার, টু-হানড্রেড মিটার দৌড়ই না বটে—সেকেণ্ডে এক মিলিমিটারও পার হতে পারি না—টুক টুক করে ওই মিলিমিটারের তলায় আমরা আমাদের মতো করেই মিলিটারী। দুড়দাড় করে রকেটের সাহায্যে তোমরা উড়ে যেতে পার—কিন্তু এমন স্লো-রেসে আমরাই চিরকাল ফার্স্ট।

তোমরা পোলাও কালিয়া সব খেতে ভালোবাস এবং পরে পেটের রোগেই বেশী ভোগ। কিন্তু আমাদের মধ্যে পেটের রোগ নেই বললেই হয়। আহারে আমরা সাত্ত্বিক না হলেও একেবারে নিরামিষ-ভোজী নই। আমাদের চেয়ে ছোট চেহারার ব্যাক্টিরিয়া দিয়ে আমরা আমাদের ভূরিভোজ সাঙ্গ করি—পাঁঠা কাটি না। চিবিয়ে চিবিয়ে মোটেই আমরা খেতে বসে দুনিয়াকে ভুলে থাকি না। আমাদের খাওয়ার সময় কাঁটা-চামচে-ছুরির কুট্‌কাট্‌ আওয়াজও হয় না। বলতে পার একরকম গিলেই আমরা খেয়ে থাকি। একটা আস্ত ব্যাক্টিরিয়া খপ্‌ করে ঘাড়ে ধরে নিই ঝুটো পায়ের সাহায্যে। দুদিক থেকে দুটো ঝুটো পা বার করে যখন ব্যাক্টিরিয়াকে খেতে বসি—সে দৃশ্য দেখলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বা বলবে, আমরা হাত তুলে 'গৌর-নিতাই' 'গৌর-নিতাই' করছি উদর-পূর্তির জন্যে। তারপর ব্যাক্টিরিয়াকে সেলের মধ্যে এনে একটুখানি জায়গার মধ্যে হজমের উনুন জ্বালিয়ে দিই।
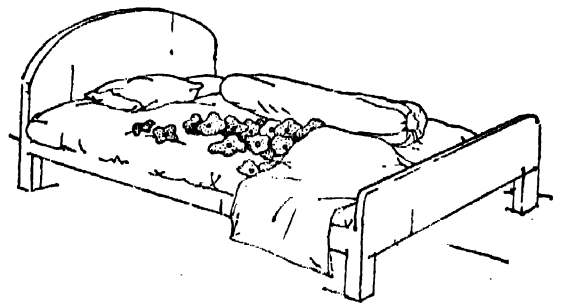
যেটুকু গ্রহণ করবার সেটুকু সেলের মধ্যে গ্রহণ করি, আর যেটুকু ফেলে দেবার সেটুকু বর্জন করি। সেল থেকে ছিবড়ে থুক্‌ করে বাইরে ফেলে দিই। যে-কোন ব্যাক্টিরিয়া

দেখলেই আমাদের নাল পড়ে না—খাওয়ার জন্যে আমাদের পছন্দসই ব্যাক্‌টিরিয়া চাই।

তোমরা ঢক্‌ ঢক্‌ করে জল খাও; আমরা জল খাই কিন্তু এমন আওয়াজ করে পাড়াপড়শীকে জানিয়ে নয়। অনায়াসে সেলের ভিতর দিয়ে জল এসে বুক জল করে দিয়ে যায়। তাছাড়া সেলের মধ্যে জল সঞ্চয় করবার ব্যবস্থা আমাদের আছে—ক্ষুদে জালার মতো কনট্রাক্‌টাইল ভ্যাকুয়োল। জলের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে কনট্রাক্‌টাইল ভ্যাকুয়োল বন্ধ করতে বা খুলতে হয়। যখন এইসব ভ্যাকুয়োল ফুটফাট ফাটে তখন তোমরা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে—অম্বুলে রোগী তুমি ভুটভাট পেটে? রামচন্দ্র! তা কেন হতে যাবে? এ যে জলের ব্যবস্থা ঠিক রাখার উপায়।

তেমন বেপাকে পড়লে কোন্‌ শর্মা না 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে চম্পট দেয়। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ বিপদে আমরা নির্ভয়। বিপদের সামনে আপনাকে মেলে ধরবার আমরা এক অননুকরণীয় কৌশল বার করেছি। যেমনি বহিঃশত্রু বা অন্য কোন দুর্যোগ আমাদের দিকে ঘনিয়ে আসে, অমনি আমরা আমাদের প্রত্যেকের চারপাশে আত্মরক্ষার জন্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়ে সেখানেই বসে থাকি। 'ব্যোম ভোলা' বলি, কিন্তু দুর্গানাম জপ করি না। আমাদের আত্মরক্ষার এ প্রাচীর তোমাদের ম্যাজিনো-সিগ্‌ফ্রিড লাইনের চেয়ে বেশী দুর্লঙ্ঘনীয়। সেই আত্মরক্ষার শিবিরের অবস্থাকে তোমাদের পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন আমাদের এনসিস্টমেন্টের অবস্থা। এ অবস্থায় আমরা বহুদিন ধরে পর্যন্ত ঘুপটি মেরে বসে থাকতে পারি এবং এমনি করে বসে থেকেই আমরা মৃত্যুকে উপহাস করি। তারপর আবার যেদিন সুদিন ঘনিয়ে আসে, তখুনি আমরা সিস্টের প্রাচীর ভেঙে বাইরে চলে আসি এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা শুরু করি। মরবো না গো, মরবো না—অত সহজে আমরা মরবো না। এই আমাদের ব্রত।

তোমরা হয়তো ভাবতে পার, এই বদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে আমাদের জীবন হাঁপিয়ে ওঠে। আরে বাবা, মোটেই তা নয়। আমরা ওই আবরণের মাঝে নিজেদের অজস্র ভাগে ভেঙে অজস্র ক্ষুদে ক্ষুদে অ্যামিবাতে রূপান্তরিত হয়ে বসি। ঠিক রক্তবীজের ঝাড় যেন। সুসময় হলেই এক থেকে বহু হয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো। সিস্ট হলো যেন আমাদের আঁতুড়ঘর। এর মধ্যেই রয়েছে বংশবৃদ্ধির উপায়।
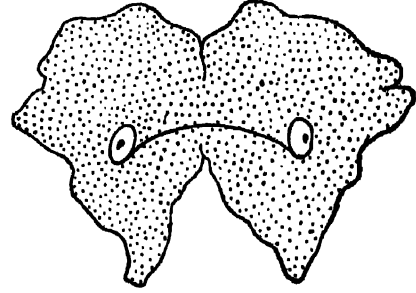
তোমাদের বউরা যখন কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ কথা কয়, সে-সব দেখলে শুনলে আমাদের বড় হাসি পায়। কথায় কথায় তোমরা প্রেম, ভালবাসা, আরও কত হিজিবিজি কানা-কানি চাওয়া-চায়ি করো দেখি। বুঝতে কি পারো, না পেরেও বোঝ না যে এই নির্দয় পৃথিবীতে প্রত্যেকে নিজের কাছেই পরম-প্রিয়। পরকে আপন করা তো নিজেকে ভালবাসার নামান্তর মাত্র। তোমাদের বিয়ে-সাদি নিয়ে দেখি এত ধুম-ধাড়াক্কা। আমরা সোজাসুজি তাই দোসর খোঁজার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরেছি। পরের জন্যে মন কাড়াকাড়িতেও আমরা ব্যস্ত নই, আমরা আমাদের নিজেদের সেলকে ভেঙে বংশবৃদ্ধির খাতিরে দু'খানা করে দিতে পারি। ওই মন্তর পড়ে সাতপাক ঘুরিয়ে উলু দেওয়ার পর্বের শেষ তো বংশবৃদ্ধিতে, তাই ওতে কিছু নেই। পথের দিকে আনমনা হয়ে চেয়ে বসে থেকে জুড়কি বাঁধবার স্বপ্ন দেখি না, কোন মনচোরের প্রতীক্ষাও করি না। যদি বলো এ আমাদের আ ত্ম প্রী তি—তা হ লে তার জবাবে বলবো—এতেই আত্ম-তৃপ্তি, এবং এই দিয়েই আত্ম-বিস্তৃতি।

আসল কথা কি জান, আমাদের এই এক কোষের মধ্যেই এক অবিনাশী শক্তি আছে, যাতে আমরা মরেও মরি না; যাতে আমরা এক এক জন একলা হলেও, আসলে প্রত্যেকে একাই একশো। আমাদের ভিতর দিয়ে, সময়ের

সহযোগিতার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীর মহান্ প্রাণ শত ভঙ্গিমায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা হয়েছি অভিব্যক্তির দূত। তাই বলছি, তোমরা এখন আর দানবপনা কোরো না, লক্ষ্মীটি! সৃষ্টির সমস্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের ওপর। অত অবুঝ হয়ে অ্যাটম ছোঁড়াছুঁড়িতে অসাবধান হয়ো না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্রমচক্র আছে অ্যাটমের মধ্যে, দেখো, তা না তোমাদের গলাটা কেটে ফেলে।

এত বলছি বটে, কিন্তু আমরা তোমাদের কোন অভিসম্পাত দিতে বসিনি এবং স্বপ্নেও কখনো ভাবিনে যে, তোমরা রাত্রে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লে তার পরের দিন সকালে দেখা যাবে যে, তোমরা আর সে 'তোমরা' নেই, কয়েক লক্ষ আমাদের মতো অ্যামিবায় রূপান্তরিত হয়ে বিছানায় ঘোরাঘুরি করছো। তোমরা যা আছ বাবা তাই থাক। শুধু এই সৃষ্টিকে আর রসাতলে পাঠিও না। এই আমাদের মিনতি। এখনও ক্রমবিকাশের পথে তোমাদের সম্ভাবনা অফুরন্ত, আত্মবিস্মৃতির পরিধি অপার, সাফল্য অনাগত। কথা রাখ, এই জীবনের ভোজবাজীতে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভুলো না। আমাদের ঋণ শোধ করার কথা স্বপ্নেও ভেবো না, অ্যামিবা চিরকাল 'অ্যামিবা' থেকে যাবে। কিন্তু মানুষ যেন কখনো না 'পুনঃ অ্যামিবো ভব' হয়ে যায়—তাহলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না। কথা দিচ্ছি, তোমরা লক্ষ্মীছেলে হলে, আমাদের মাসতুতো ভাই ওই এনটামিবাদের চুপি চুপি বলে দেব—তারা যেন আর তোমাদের পেটের মধ্যে মিথ্যা কামড়ানোর দক্ষযজ্ঞ না করে। এই হলো অ্যামিবার শেষ উক্তি।

ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় সার্টিফিকিট সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা একটা ফেসন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, সার্টিফিকিট দেখিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ লেখক সার্টিফিকিট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই সার্টিফিকিটদাতা দয়া করিয়া, বা অনুরোধে পড়িয়া, অথবা জ্বালাতন হইয়া সার্টিফিকিট দিয়াছেন। মনে এই সন্দেহ হইলে আর সে রচয়িতা বা রচনার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা থাকে না। অতএব তখন সার্টিফিকিট উপকার না করিয়া অপকার করে।

—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৯

শোক

সন্তোষকুমার ঘোষ
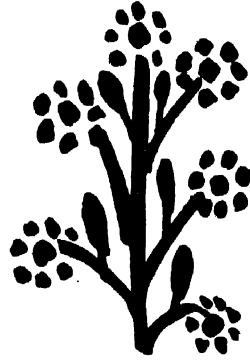
ওরা সবাই হঠাৎ একসঙ্গে এভাবে নেমে গেল কেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে। বুকের ভিতরটা কেমন করছে।

এ ঘরে তাদের তুমুল আড্ডা বসেছিল ; ও-ঘরে গানের আসর। হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়াল। চৌকাটে দাঁড়িয়ে কী বলল ; চাপা গলা, শুনতে পাইনি। ফিসফিস করে ওরা কী বলাবলি করল। তার পর নিঃশব্দে, ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর আমি, নতুন আচারের লোভে ভাঁড়ারে ঢুকে কাঁচের বয়মটা ছুঁয়ে কাঁপতে থাকলাম। কিছু বুঝলাম না, কিছু শুনলাম না, ওরা আমাকে কেন কিছু বলে গেল না, কেন একলা এত বড় বাসাটায় আমাকে ফেলে গেল। আমি যে ভাবব, আমি যে ভয় পাব।

এই বে-মেরামতী বাড়িটার জং-ধরা কব্জাগুলো খিটখিটে, জানালা-কবাট সব ভীতু, হাওয়ার সাড়া পেলেই খুলে যায়, সরে দাঁড়ায়, ঠকঠক করে কাঁপে। এখন যদি হাওয়া হানা দেয় আমি কী করব। অসহায় পেয়ে সব ধুলো ত আমারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা কি করতে পারব? হয়ত মরেই যাব। ঝড়ের ঝাপটে নয়, ভয়ে। ডাক্তার বলেছে, আমার কলজে বড় ধুকপুকে, স্নায়ু ঝিমোনো। বলেছে কথায় কথায় ভয় পেতে নেই।

তার চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে যেতে চেষ্টা করি না কেন। হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লা দুটো ঠেসে দিই, ছিটকিনি হাতে যদি না পড়ে তবে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে ত দাঁড়াতে পারব!

তা-ও যদি না পারি, তবে অন্তত বসবার ঘরের ওই বুক-কেস্‌টার আড়ালে লুকোব। ওটা মজবুত আছে, সহজে নড়ে না। তারপর, খানিক দাপাদাপি করে হামলাদার হাওয়া যখন পালিয়ে যাবে, তখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে ওই অন্ধকার কোণ থেকেই বেরিয়ে আসব। হেলান চেয়ারটা তখনও হয়ত ধুলোয় ছেয়ে থাকবে, তা থাকুক। চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুঁজব। হাঁপাব। জিভটাকে চোয়ালের ভিতরের দেয়ালে বুলিয়ে বুলিয়ে কিংবা ঠোঁট চেটে চেটেই পিপাসা মেটাব। পিপাসা যাবে, আমার ভয় যাবে। ভয় যখন যাবে, আমি তখন ভাবব।

আর কিছু ত পারি না, চলতে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না, পড়তে না, খেতে না, বলতে না, কিন্তু ভাবতে এখনও পারি। সুখের কথা, দুঃখের কথা। পুরনো সুখের কথা ভেবে ভেবে দুঃখ পাই, দুঃখের কথা ভেবে সুখ। একটা জায়গায় পৌঁছে দুটোই এক হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না। যেন যুগ্ম স্বরধ্বনি।

কতদিন ভেবেছি, দুঃখ পাবার ক্ষমতাটুকুও যেদিন থাকবেনা, তার আগেই যেন আমার মরণ ঘটে। অথবা ঘটবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না, কারণ ওই ক্ষমতাটুকু খোয়ানোরই আরেক নাম মৃত্যু।

মৃত্যু আসলে আলাদা কোন ঘটনাই নয়। সলতে ফুরিয়ে আলো এক সময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি নেবে? যে মুহূর্তে জ্বলেছিল, সেই মুহূর্ত থেকেই তো নিবেও আসছিল। সলতেটা যখন জ্বলছিল, তখনই পুড়ছিল, একটু একটু করে নিবছিলও। আমরা যেমন এক একটি মুহূর্তের মধ্যে একটু-একটু করে বাঁচি, সেই সঙ্গে তেমনই একটু-একটু করে মরিও। আস্তে আস্তে করে ফুরোনর পালাও এক দিন ফুরোয়। সেই শূন্যতাকেই আমরা বলি শব। সব-শেষকে, সব বিয়োগের যোগফলকে ঢেকে দিই সাদা চাদরে ; সমারোহে সমাধি দিই।

মৃত্যুর কথা থাক। দুঃখের কথা বলছিলুম, তাই বলি।

অনেক দিন ভেবেছি, শিশু মাটিতে পড়েই কাঁদে কেন। তার দুঃখ কী। কেউ জানে না, বড় হয়ে সে কথা কারুর মনে পড়ে না। বিজ্ঞানীরা নানা রকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এটা তো ঠিক, সৃষ্টির আদিতে যেমন অন্ধকার, অনুভূতির আদিতে তেমন দুঃখ। বোধ হয় অন্তেও।

আজ আমার এই চেয়ারে শুয়ে শুয়ে, যখন ঝড় থেমে গেছে, আমার মনের ভয় কেটেছে, তখন আদি, মধ্য, অন্ত্য সব পর্বের কথাই ভাবা যেত। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে—ওরা গেল কোথায়।

*

ওরা লুকোতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না ত।

জানতে আমার কিছু কি বাকি রইল।

বড় বউমা ফিরে এসেছিল সবার আগে। ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আস্তে কবাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, আমি একেবারে সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

"মা!" অস্বস্তিতে, ভয়ে ও যেন চেঁচিয়ে ওঠল।—"আপনি এখনও ঘুমোননি?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললুম, "এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউমা?"

কিছুদিন থেকেই কথা জড়িয়ে যায়, নিজের গলা নিজেকেই যেন ভেংচি কাটে, তবু যথাসাধ্য স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলুম।—"কোথায় গিয়েছিলে, বউমা। সুনীল, অনিল, এরাই বা সব কোথায় গেল।"

"সিতেশ কাকার বাড়ি।"

"সেখানে? হঠাৎ? এত রাত্রে?"

বউমা এবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি চাইল। চোখ নামিয়েও নিল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলুম, ইতস্তত করছে। আস্তে আস্তে বলল, "কাকার অসুখ।"

"কী অসুখ বউমা?"

"এমন কিছু নয়। মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন।"

বুঝলুম, মিছে কথা বলছে। মিছে কথার মুশকিলই ওই, কেমন যেন টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি টের পাই। অনেক বয়স হল ত, এখন আমি থুনথুনে বুড়ি। অনেক কথা সারা জীবন ধরে শুনেছি, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে চট করে ধরে ফেলি। বলার ভঙ্গি, স্বরের তারতম্য থেকেই টের পাই।

আমার কথায় কোথা থেকে এত জোর এল জানি না, বলে উঠলুম, "বউমা, আমিও যাব।"

ও অবাক হয়ে চাইল। আমার পা দুটি তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ও বলল, "মা আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, আপনি যাবেন অতদূর?"

জেদ করে বললুল, "যাবই।"

"বেশ, আপনার ছেলে আসুক, তাকে বলবেন।"

ওর গলা রূঢ় শোনাল। রাগ করেছে।

আমি সেই থেকে ঘুমোইনি, অপেক্ষা করেছি, ওরা কখন ফেরে, অনিল আর সুনীল। মাঝে মাঝে চোখ জড়িয়ে এল, তবু জেগে রইলুম। ওরা ফিরল একেবারে শেষ রাত্রে।

বউমাই দরজা খুলে দিয়ে থাকবে। আমি নিজেকে টেনে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলুম। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে।

"এখানেই একটু আগুন জ্বাল। এক টুকরো লোহাও ছুঁইয়ে দাও...কাপড়ও ত ভিজে...মাকে এখনই কিছু ব'লনা, কষ্ট পাবেন।"

বউমাকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, "মা কিন্তু আমার ফিরে আসা অবধি জেগে ছিলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখানে যেতেও চেয়েছিলেন।"

সবই ত জানতুম।

কী ভাবে, কখন বিছানায় ফিরে এসেছি, জানি না। চোখের পাতা অল্প অল্প করে বুজছিল, তবু, কী আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়লুম। কম বয়সে, শখ করে মাঝে মাঝে নাইতে নেমে জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকতুম। যতক্ষণ পারা যায়। এই ঘুমও তেমনই। ভোরে ভাঙল না, রোদ উঠলেও না, ধড়মড় করে যখন উঠে বসলুম, তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।

বউমাকে বললুম, "এতখানি বেলা হয়েছে আমাকে ডেকে দাওনি?"

"আপনি যে ঘুমোচ্ছিলেন।"

"খোকা কোথায়? ডেকে দাও।"

অনিল এসে পায়ের কাছে বসল। ওর দুটি চোখই লাল। ও-ও কি কেঁদেছে? এ-বয়সের ছেলেরা কি কাঁদে। ওদের ত শুধু হাসাহাসি করতেই দেখি। বোধ হয় কাঁদেনি—লাল চোখ দুটিতে শ্মশানে রাত-জাগার চিহ্ন।

বললুম, "খোকা লুকোসনে। আমি সব বুঝেছি। কী হয়েছিল বল ত। সিতেশ ঠাকুরপো কী রোগে—"

"রোগ তেমন কিছু নয় ত। ক'দিন থেকেই বলছিলেন, দুর্বল লাগছে। আমাদের এখানেও আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

মৃদু গলায় বললুম, "হাঁ। ওঁকে অন্তত চার দিন দেখিনি।"

"হঠাৎ মাথা ঘুরে কলতলায় পড়ে গেলেন। ধরাধরি করে ওরা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এল কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।"

"সব শেষ?" আমার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা গেল হয়ত, খোকা এগিয়ে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

"রোগটা আসলে কিছু না। এ-বয়সে, মা, বয়সটাই রোগ। শরীর-মনের জোর ত থাকে না, সামান্য কিছু হলেই লোকে ভেঙে পড়ে। অসুখটা উপলক্ষ। তা ছাড়া সিতেশ কাকার সময়ও হয়েছিল—একাত্তর বছরে পড়েছিলেন।"

একাত্তর? চমকে উঠলুম। আস্তে আস্তে বললুম, "এই আশ্বিনে আমারও সত্তর বছর পূর্ণ হবে, খোকা।"

খোকা কিছু বলল না। পিঠে হাত বুলিয়েই দিতে থাকল।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললুম, "খোকা, আমাকে একবার নিয়ে যাবি?"

"তুমি? তুমি কী করে যাবে। গিয়েই বা কী হবে।"

"নইলে, নইলে আমি যে শান্তি পাব না।"

খোকা বলল, "ছি, মা, ছি। অতটা ব্যাকুল হতে নেই।"

এতক্ষণ সব আবেগ চাপা ছিল, এবার হাহাকার করে বলে উঠলুম, "তোরা জানিস না। সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার কত দিনের চেনা।"

মাথা নীচু করে খোকা বলল, "জানি মা, সব জানি।"

সব জানে? ও-কথা কেন বলল খোকা। কী জানে, কতটুকুই বা জানা ওদের সম্ভব। কিছু না। হয়ত মন-গড়া কয়েকটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। একটু আগেও বলেছে—ছি, মা, ছি। ছি বলতে গেল কেন। অন্যায় আমি কী করেছি।

অনেক কথাই মনে পড়ছে।

কবে থেকে চিনতুম সিতেশ ঠাকুরপোকে। বছরের হিসেব ত নেই—সেই তের বছর বয়স থেকেই, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন নাকে নোলক পরতুম। শুধু আমি না, আমার বয়সী সবাই পরত।

সেই সেকালে মনটা একটু তরল, একটু বায়বীয় পদার্থ ছিল, অদ্ভুত সব কিছুতে বিশ্বাস করত। তখন জানতুম, অনেক কালো বেড়াল একসঙ্গে কড়ায় তেলে চুবিয়ে জ্বাল দিয়ে বিধাতা অমাবস্যার অন্ধকার তৈরি করেন। পুতুলকে তখন প্রাণহীন মনে করতে শিখিনি, তা সে খেলার পুতুলই হ'ক, কি পুজোর পুতুল হ'ক।

বিয়ের পরে শিবপুজো আর করিনি। স্বামীকে পেলুম। শুনলুম, তিনিই আমার শিব। খেলার পুতুলেরা পরে কোলে এল।

আর এলেন সিতেশ ঠাকুরপো। আমার স্বামীর বন্ধু—কিন্তু বয়সে অনেক ছোট। প্রায় আমার সমবয়সী। বলতে ভুলেছি, আমার স্বামী বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বাঙলার বাইরে ছোট একটা শহরে চাকরি করতেন—বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর তাঁকে দেখিইনি।

কিন্তু সিতেশ ঠাকুরপো আসতেন। স্কুল থেকে জলপানি পেয়ে পাস দিলেন, কলেজে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, খেলতুম, শাশুড়ির কাছে ধমক খেয়েও ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা অবধি ছুটোছুটি ছাড়িনি। শাড়িটা যদি খসে যায়-যায় হয়েছে, লজ্জা পাইনি, আঁচলটা কষে কোমরে বেঁধেছি। কখনও শাড়িটার পাড় পায়ে জড়িয়ে গেলে হোঁচট খেয়েছি।

শুধু খেলাই না। সিতেশ ঠাকুরপোর পড়ার বইও লুকিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলুম। ওর সঙ্গে কত যে ঝগড়া হত, তর্ক হত। বই পড়তুম, কিছু বুঝতুম, কিছুটা বুঝতুম না। মানে জেনে নিয়ে ফের পড়তুম। শেষে একদিন ওর কলেজের ক্লাসের বইও পড়তে আরম্ভ করে ওকে প্রায় ধরে ফেললুম।

এরই ফাঁকে ফাঁকে স্বামী যখন আসতেন, অবাক হতেন। "তুমি এত সব শিখলে কোথায়?"

"সিতু ঠাকুরপোর কাছে।" নিঃসঙ্কোচে বলতুম।

স্বামী বললেন, "ও।"

একটিমাত্র অক্ষর, তবু মনে হত একটু যেন আহত স্বর, একটু-বা গম্ভীর। তখন সঙ্কোচ হত।

কখনও কখনও উনি দেখেছেন, মাথায় খোলা চুল, ঘোমটা নেই, সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছি। উনি দেখতেন, থমকে দাঁড়াতেন, মনে হত কী বুঝি বলবেন, বলতেন না, নিজের ঘরে ঢুকতেন।

একদিন দেখি, বাক্স গোছাচ্ছেন। ওঁকে সেদিন কাজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। বললুম, "আবার কবে আসবে।"

বললেন, "আর আসব না।"

"কেন?"

"তুমি খুশি হও না বলে।"

বলে উঠলুম, "মিছে কথা। খুব খুশি হই।"

বিরস গলায় উনি বললেন, "তার চিহ্ন ত দেখিনে।"

ছেলেমানুষ ছিলুম ত, রোখ চাপলে তখন চুপ করে

যেতে পারতুম না। "কে এলে আমি খুশি হই, তোমার মনে হয়?"

উনি শান্ত স্বরে বললেন, "নামটা নেহাতই কি আমার মুখে শুনতে হবে? সে কি তুমি নিজেও জান না?"

চলে যাবার আগে উনি কাছে এগিয়ে এলেন, আমার চিবুক তুলে ধরে বললেন, "তুমি জান না, বুঝতে পার না, আমি কত দুঃখ পাই।"

দুঃখ। এই কথাটার নতুন অর্থ তখন সবে জানতে শিখেছি। আগেও দুঃখ ছিল—গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাওয়া যেদিন বারণ হয়েছিল, সেদিন দুঃখ পেয়েছি, পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছি। এই সেদিনও ত দুঃখ হত মনের মত শাড়ি পরতে না পেলে। সে-ও দুঃখ—কিন্তু অর্থের পোশাক বদলে আজ ফিরে এসেছে। সকালের রোদ আর দুপুরের জ্বালা যেমন এক হয়েও আলাদা।

সেদিন উনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আগে কাঁদতুম পায়ে কাঁটা ফুটলে। এখনও কাঁটা ফুটলে কাঁদি, কিন্তু সে-কাঁটা পায়ে ফোটে না, শরীরের কোথাও না।

সুখেরও স্বাদ বদলে গিয়েছিল, যাচ্ছিল। নরম বালিশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই সেরা সুখ, অল্প বয়সে তাই জানতুম। কিংবা বৃষ্টিতে উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করে শিল কুড়নো। কিন্তু দীর্ঘ রাত জুড়ে বিছানায় জেগে থেকে ছটফট করা, অথবা কোন একজনের কথা অহর্নিশি ভাবাও যে এক ধরনের সুখ, সেটা অনুভূতির পর্দায় সবে একটু একটু দোলা দিতে শুরু করেছে। সেই সুখ প্রিয়জন কেউ এলে থেকে থেকে বুকে কাঁপে। তার আসন আধেক বুঁজে আসা চোখের পাতায়।

আমার স্বামী কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের দুঃখের সঙ্গে সহজেই সন্ধি করে নিতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে কলকাতাতেই একটা কাজ নিয়ে ফিরে এলেন। কোলে খোকা এল। সিতেশ ঠাকুরপো একটা কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন, বিয়ে করেননি, রোজ বিকেলে আসতেন। কিন্তু ওঁকে কোনদিন আর অনুযোগ করতে শুনিনি।

কেননা, আমাদের সম্পর্কটা তিনি তখন ধরতে পেরেছিলেন। দুটি সমবয়সীর সখ্য; রুচির মিল। হয়ত তারই উপরে আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ। তার বেশি কিছু না।

উনি বুঝতেন। আমরা যখন গল্প করছি, এসে বসতেন। ইচ্ছে হলে আমাদের কথায় যোগ দিতেন। আবার উঠেও যেতেন।

কিন্তু ছেলেরা বোঝেনি। অনিল না, সুনীলও না। আজ যে-গলায় অনিল বলেছে 'ছি, মা, ছি', সেই তিরস্কারের ভঙ্গিটি কত দিন ওদের চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। ওরা যখন কিশোর তখন থেকেই।

হয়ত পাড়ার লোক কিছু বলত। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। অনিল এক এক দিন হিংস্র গলায় বলেছে, "সিতেশ কাকা রোজ-রোজ কেন আসে মা, কেন আসে?"

"বা-রে, কাকা হন যে তোমার, আসবেন না?"

"কাকা না আরও কিছু। আমি সব বুঝি, সব জানি।"

মনে পাপ নেই, তবু আমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। উনি আড়ালে কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে ঠাস-ঠাস করে ছেলেকে কয়েকটা চড় মেরেছিলেন। আমি ত মা, ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছি, অনিল আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল, তবু আমার কাছে এল না, ওকে ছুঁতে দিল না।

সবই আজ মনে পড়ছে।

সিতেশ ঠাকুরপো ঘরের একজনের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁকে ওরা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি।

ওঁর মৃত্যুর পর সিতেশ ঠাকুরপো একদিন বলেছিলেন, "আমি আর আসব না।"

"কেন?"

"ছেলেরা হয়ত পছন্দ করছে না।"

দৃঢ় স্বরে বলেছি, "বাড়ি ছেলেদের একার নয়। তোমাকে আসতেই হবে, ঠাকুরপো।"

উনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে ধীর গলায় বললেন, "আচ্ছা।"

রোজই আসতেন। থান কাপড় প'রে, পুজো সেরে ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আলোচনার বিষয়ও বদলে গিয়েছে। আগে বেশির ভাগ কথাই হত শিল্পকলা বা সাহিত্য নিয়ে, এখন জানিনা কী করে বা কোথা থেকে ধর্মের প্রসঙ্গও এসে পড়তে লাগল। যা নিয়ে কখনও ভাবিনি, সেই মরজীবনের পর-জীবন নিয়েও কত দিন কত কথা হত। আত্মার কথা আলোচনা করেছি আমরা, ভক্তির কথা, মুক্তির কথা।

বয়স অলক্ষ্য মাস্টারও। আমাদের রুচিও বদলে দেয়। আমরা বেড়াতেও যেতুম দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে। মন্দিরে গিয়ে কথকতা শুনতুম।

ছেলেরা হাসত। বউমা বিচিত্র দৃষ্টিতে চাইত।

ওরা ত হাসবেই। ঠাট্টা করবেই। ওরা তরুণ যে। যৌবনটা অহঙ্কারের কাল। দেহবলে বলীয়ান। সেই বলটা মদের মতো। চেতনা, বুদ্ধি, সব আচ্ছন্ন করে রাখে। পৃথিবী যেন একা তারই, আর কারও না। শিশুর না, প্রৌঢ়ের না, জরাগ্রস্তের না। আপনবয়সী ছাড়া আর সকলকেই কৃপা বা করুণা করে। কী ধৃষ্টতা, এখন ত বুঝেছি। গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যৌবন যাদের আসেনি বা গিয়েছে, তারাই ত দলে ভারী। শুধু দলে নয়, নানা বিষয়ে। শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী শিল্প-কীর্তির, জ্ঞানান্বেষণের কতটুকুতে যৌবনের দাবী। প্রৌঢ় আর প্রাজ্ঞরাই চিন্তার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। শুধু মাত্র জৈব-সৃষ্টির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তো যৌবনের অনন্য নৈপুণ্য দেখিনে।

এ-সব কথা সিতেশবাবু আমাকে বলতেন, বোঝাতেন। ওরা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনত, হাসত। এমন দিন আসবে, আসছে, যখন ওরা বলবে, ওদের ছেলেরা হাসবে।

বয়স বেড়েছে, সিতেশবাবু লাঠি ধরেছেন, আমি চশমা। ঝুঁকে পড়ে বই পড়ি, আর ভাবি। ভাবনার জালে অজানা কত কী এসে রোজ ধরা দেয়।

তার কোনটা পাখি, কোনটা প্রজাপতি। তাদের সন্তর্পণে তুলে ধরি, পরখ করি। তারা আমার জানার সীমানাটা একটু একটু করে বাড়িয়ে দেয়।

খানিক আগে সুখ-দুঃখের কথা বলেছি। টের পাচ্ছিলুম, আমার সুখ-দুঃখের স্বাদ আবার ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে; ফিরে যাচ্ছে আবার সেই শৈশবে বা কৈশোরে, যখন আচার খেতে ভাল লাগত। এখন এই বয়সে আবার লুকিয়ে টক কুল খেতে শিখেছি। সেই আমার সুখ। এ-সুখ বুকে কাঁপে না, জিভ দিয়ে লালা হয়ে ঝরে। সেই কৈশোরে যেমন ঝরত। পুরনোই নতুন হয়ে ফিরে এসেছে। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আদি বিন্দুতে এসে ঠেকেছি।

কিংবা ঠেকিনি, ঠেকব। আমার মৃত্যুর মুহূর্তে জন্মক্ষণটিকে ফিরে পাব।

পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে ষাটে পড়ল, ষাট গড়িয়ে গড়িয়ে ঢলে পড়েছে সত্তরে। সিতেশবাবু প্রতিদিনই এসেছেন। আগে লাঠি ভর করে, শেষের দিকে লাঠিতেও হত না, একটি রিক্সার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবু রোজ আসা চাই।

এসে বসতেন বাইরের ঘরে। লাঠিটা এক কোণে রেখে ঘাম মুছতেন। আমিও এসে বসতুম। তখন আর

কথা হত না, বেশি না। উনি একটু হাসতেন, আমিও। দুটি হাসি মাঝপথে মিলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকত। এমন কত দিন হয়েছে। এক ঘণ্টার উপরে আমরা একই ঘরে বসে থেকেছি, কিন্তু একটিও কথা হয়নি, আমাদের শুধু দেখা হয়েছে।

সেই দিনান্তের দেখাটুকুও এক দিন শেষ হল। ওঁর হার্টের অসুখ হল, উপরে উঠতে পারেন না। আমি বাতে বিছানা নিয়েছি, নীচে নামি না।

তখনও আসতেন। দোতলায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সময়ে বাইরের রকে লাঠির ঠুকঠুক কখন শোনা যাবে, তার অপেক্ষা করতুম। সেই ঠুকঠুক আর কিছু না, শুধু জানান, উনি আছেন, এখনও আছেন। শুধু জেনে নিতে আসা, আমি আছি কি না।

দেহে ত সাড়া নেই, সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠত, আছি, আমিও আছি। সেই সাড়া কোন ধ্বনিকে ভর করে ওঁর কাছে যেত না, কিন্তু পৌঁছত ঠিক। উনি বুঝতেন। রকে বসেই খানিক জিরিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করে ফিরে যেতেন।

সেই আসা-যাওয়াটুকুও শেষ হয়ে গেল।

আমি ভয় পেয়েছি, আকুল হয়েছি। আমি কাঁদছি।

সময় পূর্ণ হলে যারা যায়, সংসার থেকে অপ্রয়োজনীয়

বলে খারিজের খাতায় যাদের নাম ওঠে, তাদের মৃত্যুতে কি কেউ কাঁদে ?

কাঁদে। বুড়োর শোকে বুড়িরাই কাঁদে।

সে কান্না শুধু বিচ্ছেদের নয়। প্রতিটি সমবয়সীর মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদেরও যাবার দিন এল বলে।

আমিও যাব। তাই কাঁদছি। আমি মরলে কেউ ত কাঁদবে না, তাই নিজের মরণের কান্না নিজেই কেঁদে রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ ঠাকুরপোর শোকে। তা ত নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।

সূর্যাস্তের পথ

উমা দেবী

নিভন্ত দিনের শেষে পড়ন্ত বেলায়
এ দ্বিধা-বিভক্ত সত্তা রোদন-মর্মরে
মুহুর্মুহু তরঙ্গিত হায়—
আজো কেন তোমাকেই চায় ?
জানি আমি তোমাকেই চায় অনুক্ষণ
একটি মেয়েলি মন।

কেন এই অন্তর্গ্লানি—কেন এই রঙিন উত্তাপ ?
কেন বা লোভায় এক দুর্লজ্যের পাপ ?
কেন এই তিক্ততার ঘৃণ্য অভিশাপ
বিস্বাদ করেছে আজ সমস্ত জীবন ?
—একটি মেয়েলি মন।

আমি কি করিনি তপ পার হ'য়ে চলে যেতে এই নম্রতাকে
কঠিনের দুঃসহ বিপাকে ?
আমি কি ফেলিনি ছুঁড়ে আরামের রঙিন রেশম
পরিশ্রমে হইনি নির্মম ?
কেন তবে শতপাকে বাঁধে এক অসহ্য দুরাশা
—লোকে যাকে বলে ভালবাসা ?

আমাকে মূর্ছিত করে চন্দন-তরুর কোনো বিষাক্ত সৌরভ—
আমার স্বাধীন সত্তা হারাল হারাল বুঝি সমস্ত গৌরব !
জীবন-পুষ্পের দৃঢ় বৃন্ত আজ শিথিল কোমল
হৃদয়ের অগ্নি ঝরে হ'য়ে অশ্রুজল
—এ সমস্ত দুর্ভাগ্যের একক কারণ
—একটি মেয়েলি মন।

হৃদয় ! পালাও তুমি সূর্যাস্তের অন্ধকার পথে
সমস্ত রঙিন মেঘ—রঙিন আশার মেঘ
রঙিন বাসনা আর কুয়াশার সমস্ত আবেগ
পিষ্ট ক'রে বল্গাহীন নিশীথের অয়শ্চক্ররথে।
এ বন্ধন ছিঁড়ে যাবো কঠিন দু-হাতে
ছড়াবো তারার মণি অন্ধকার রাতে,
অন্ধকারে মিশে যাবে উৎপাটিত হৃৎপিণ্ডের আরক্ত মণিকা,
কয়েকটি কবিতার সজল কণিকা !

চোর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমি যেদিন পেঁপে চারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়িতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।

স্কুলে যাবার সময় রাস্তার নর্দমার পাশে সবুজ কচি, আমার আঙুলের সমান, কি তার চেয়েও ছোট লিকলিকে একটা পেঁপে চারা চোখে পড়েছিল। কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের মাঝখানে চারাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার তখনি লোভ হচ্ছিল ওটা তুলে নিই। কিন্তু ক্লাসে গাছটা রাখবার সুবিধা হবে না, এ ও পাঁচটি ছেলে হয়তো ওটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখতে দেখতে হাতের চাপে নরম চারাটাকে চট্‌কে ফেলবে—তা ছাড়া জামার পকেটে লুকিয়ে রাখলেও বেলা চারটে পর্যন্ত জল-মাটি ছাড়া ওইটুকু গাছ শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাবে চিন্তা করে তখন সোজা স্কুলে চলে গেছি। স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে আবার সোজা সেই নর্দমার পাশে কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের কাছে চলে এসেছি। তারপর হাত বাড়িয়ে টুক্ করে পেঁপে গাছটা তুলে নিয়েছি। বর্ষাকাল। জলে ভিজে ভিজে মাটি এমনি নরম হয়েছিল। আমার খুব ভাল লাগল অত তাড়াহুড়ো করে গাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার পরও যখন দেখলাম দশ নম্বর সুঁচের মতন সরু লম্বা আর দুধের মতন সাদারঙের মূলটা আর মূলের চারপাশের চুলের মতন সরু ছোঁচালো শিকড়গুলোর একটাও ছিঁড়ে বা ভেঙে যায়নি। যেন মূল ও শিকড় সমেত চারাটা আমার হাতে উঠে আসতে তৈরী হয়েছিল।

হ্যাঁ, তখন বিকেল। আমাদের রান্নাঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জাল নিয়ে চারহাত পাঁচহাত একটুকরো জমি দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি পড়ে আছে। দিনরাত ছায়ায় ঢাকা থাকে বলে সেখানে কোনো গাছ হয় না। এত বড় একটা যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ ডালাপালা ছড়িয়ে জমিটা অন্ধকার করে রেখেছে, সেখানে আর অন্য কিছুর চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায় না। শীতের গোড়ার দিকে মা ফি-বছর ধনেশাক লাগাতে গেছে কিন্তু হয়নি। বাবা এই সেদিনও ডাঁটার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। বীজ ফুঁড়ে অগুণতি কুঁড়ি বেরিয়েছিল। কুঁড়িগুলো যখন দু পাতার ছোট ছোট গাছ হয়ে বড় হচ্ছিল তখন আস্তে আস্তে সব ফ্যাকাশে রং ধরে শুকিয়ে খড়কের মতন হয়ে-হয়ে মরে গেছে। দুটো-একটা ডুমুরের ডাল কেটে দিয়েও বাবা সুবিধা করতে পারেনি। মুশকিল এই যে সবটা গাছ কাটা যায়নি। কাটতে গেলে আমাদের পিছনটা একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়বে এই ভয়ে বাবা ডুমুর গাছটা রেখেছিল।

তা হোক, আমার পেঁপে গাছ বাড়বে না, ছায়ায় থেকে-থেকে ফ্যাকাশে রং ধরে একদিন খড়কের মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি যত্ন করে চারাটা পুঁতলাম। পুঁতে বেশ করে খানিকটা বাড়তি মাটি উঁচু করে গুঁড়ির চারপাশে তুলে দিলাম। চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মগে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারাটাকে প্রায় স্নান করিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি যখন শূন্য মগ হাতে করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখিনু কুমারদের বাড়ির সেই যে ছোকরা চাকর—নামটা অবশ্য তখনি মনে পড়ে গেল —মদন। মিট্‌মিট্ করে হাসছে। বগলে একটা ছোট পুঁটলি। পরনে ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট। গায়ের গেঞ্জিটা আরো বেশি ছেঁড়া। পিঠের দিকটা কেমন আছে চোখে পড়ছে না, দেখলাম বুকের দিকটা ফুটো হয়ে-হয়ে জামাটার আর কিছু নেই।

'হাসছিস কেন?' আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

'গাছ দেখছি।' আমাকে গম্ভীর দেখে মদনও গম্ভীর হয়ে গেল। 'বটের চারা?'

'তোর মাথা।' রাগ করে বললাম, 'বাড়ির ভিতর কেউ বটগাছ লাগায় নাকি আহাম্মক। পেঁপে চারা। বটের পাতা এমন হয়?'

কথা না বলে মদন চোখ তুলে মাথার ওপর যজ্ঞডুমুরের ছড়ানো ডালপাতার দিকে চেয়ে রইল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম মদনটা খুব শুকিয়ে গেছে। হাত-পা কাঠির মতন হয়েছে দেখতে। কানের পাশে গলায় ময়লা জমে ছাতা পড়েছে। ওর মাথায় কেমন চমৎকার টেড়ি দেখেছি—তার কিছু ছিল না, যেন অর্ধেক চুল উঠে গেছে, ছোট হয়ে গেছে মাথাটা। এইটুকুন ছোট-ছোট চুল—তা-ও কতকাল যেন তেল-জলের মুখ দেখেনি।

একটা ঢোঁক গিললাম।

'কোথায় ছিলি এতকাল। সুকুমারদের বাড়িতে তো দেখিনি?'

'ব্যামো হয়েছিল। দেশে গিছলাম।' মদন আমাদের উঠোনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'মা-ঠাকরুন আছেন ঘরে?'

আমার চোখে চোখ রেখে যখন ও প্রশ্ন করল তখন হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এল।

'সুকুমারদের বাড়িতে আর তুই চাকরি করিসনে?'

মুখ বেজার করে মদন ঘাড় নাড়ল।

'মা কোথায়?'

চুপ করে ওর রোগা হাত পা ও ছেঁড়া জামাটা আর-একবার দেখতে দেখতে পরে বললাম, 'মার শরীর খারাপ। সবে আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে। শুয়ে আছে।'

'ভাই হয়েছে বুঝি?'

মুখ বেজার করে আমি মাথা নাড়লাম।

'বোন। রংটা যদিও আমার চেয়ে ফরসা হয়েছে।'

মদন চুপ করে থেকে আমার পেঁপে চারাটা ছাখে।

একটা কথা মনে হল। কিন্তু চেপে গেলাম।

'কেন মাকে,—আমার মাকে কি দরকার?'

মদনের চোখের দিকে তাকাই।

মদন অল্প হাসল।

'দরকার আছে।'

'আয় আমার সঙ্গে।'

কলতলায় গিয়ে হাত ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলি। মুখটা ধুয়ে ফেললাম। হাতের পুঁটলি চৌবাচ্চার সিমেন্টের ওপর নামিয়ে রেখে মদন হাত ধোয় পা ধোয় তারপর আঁজলা করে ঢকঢক করে অনেকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়। রোগা পেটটা ফুলে ওঠে। মাথায় আমরা দুজন সমান। আমার বয়স বেশি কি মদনের বয়স—চিন্তা করছিলাম। হয়তো দুজন এক বয়সের ছিলাম।

'আয় ইদিকে আয়।'

ঘরের পৈঠায় উঠে মাকে ডাকলাম।

মদন আমার পেছনে দাঁড়ায়।

বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে মা সম্ভবত শুয়ে ছিল। আমার ডাক শুনে উঠে বসল। রোগা ফ্যাকাসে মুখখানা দরজার কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কেন, কি হয়েছে।'

'মদন—সুকুমারদের বাড়ির মদন। এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মা হঠাৎ চুপ করে রইল। মদনকে ভাল করে দেখল।

'কি হয়েছিল তোর?' একটু পর মা প্রশ্ন করে।

'ব্যামো—কালাজ্বর।' মদন এক পা এগিয়ে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'এখন আর জ্বর হয়?'

মদন মাথা নাড়ল।

আবার কি ভাবল মা। তারপর:

'ও বাড়ি গিয়েছিলি?'

মদন এবারও কথা না কয়ে ঘাড় কাত করল। মানে সুকুমারদের বাড়ির কথা হচ্ছে। আমি চুপ থাকি।

'গিন্নীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে।' মদন মার দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকায়। 'আমাকে আর রাখবে না,—গিন্নীমা বলল, অন্য লোক রাখা হয়ে গেছে।'

'সে কি রে!' অবাক হবার সুরে মা বলল, 'তুই ওদের পুরনো লোক, এতকাল কাজ করলি!' একটু থেমে মা পরে আস্তে আস্তে, যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'তা অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হবেই—অসুখ করল দেশে গেল, এর মধ্যে অন্য লোক রাখা হয়ে গেল! না হয় রাখল, কিন্তু—' আবার কি ভেবে মা মদনের মুখ ছাখে।

'আর কারো বাড়ি গিয়েছিলি? কেউ কথা দিলে?'

মদন মাথা নাড়ল। আর তৎক্ষণাৎ আমি বলে বসলাম, 'সুকুমারদের বাড়িতে "না" করে দিতে ও সোজা এখানে চলে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি চুপ কর, তুমি থাম!' মা আমাকে ধমক দিতে আমি চুপ করলাম। চুপ করে মদনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও কাঁদতে আরম্ভ করেছে। কান্নার শব্দ নেই। চোখে জল আসছে আর হাতের পিঠ দিয়ে ক্রমাগত তা মুছতে চেষ্টা করছে।

'তা কর্তা আসুক—', মা বলল, 'একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' বাচ্চা বোনটা কেঁদে উঠতে মা ঘুরে বসল।

চোখ মোছা শেষ করে মদন আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর মুখ দেখি। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ওর ঠোঁটের ধারে উঁকি দেয়। সম্ভবত আমার ঠোঁটের কিনারেও এমন একটা রেখা জেগেছিল। বস্তুত আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতবড় বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে চাকরি করবে। তেতলা বাড়ি, মোটরগাড়ি, রেডিও, আরও তিনটে চাকর-চাকরানী, হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া— আমাদের ছোট উঠোন, টালির ঘর, কেরাসিনের আলো, টিমটিমে ঠাণ্ডা সংসার।

সন্ধ্যার দিকে বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে বাবা ঘরে ফিরল।

আমি আমার ছোট্ট ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসার উদ্যোগ করছি। মদন বাইরে পৈঠার অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। দুটো পয়সা দিয়েছিল মা ওকে। সেই সকালের ট্রেনে দুটো পান্তা খেয়ে দেশ থেকে ট্রেনে চেপেছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর সবে ব্যারাম থেকে উঠে এসেছে। পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে খেয়ে মদন অন্ধকারে বসে ঝিমোচ্ছিল, মাঝে মাঝে চড়-চাপড় দিয়ে গা থেকে মশা তাড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি কান পেতে ছিলাম বাবা কি বলে শুনতে। হাত মুখ ধুয়ে বাবা বিশ্রাম করতে বসে। মা উঠে চা তৈরী করে দেয়। বস্তুত এই খারাপ শরীর নিয়েই মাকে রান্না ও ঘরের আরও পাঁচটা কাজ করতে হচ্ছিল। চা খেতে-খেতে বাবা সব শুনল। শুনে হাসল।

'কেন, তিনটে লোক আছে, ড্রাইভার আছে, বাগানের কাজ করতে বাইরের একটা লোক রাখা হয়েছে—না হয় আর-একটা—কত বয়স, আমাদের মিণ্টুর চেয়ে বড় হবে না—কি নাম যেন ছেলেটার? মদন। পুরনো লোক ওদের—এভাবে ওকে মুখের ওপর "না" করে দিলে?' একটু থেমে বাবা শেষ করল, 'বড়লোক কি আর গরীবের দুঃখ বোঝে! এখন বেচারা যায় কোথায়।'

মা যেন ও-ঘর থেকে আরও কি বলল।

বাবা চিন্তা করছে। বুঝতে পারলাম বাবা চিন্তা করে দেখছিল সবটা বিষয়।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চৌকাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মদন বাবার পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। বলতে কি মদনের জন্য আমার বুকের ভিতর ভয়-ভয় করছিল। যদি বাবা 'না' বলে বসে, যদি বাবা বলে যে—

'কত মাইনে দিত ওরা বললি?'

'দশ টাকা।'

'আর দুবেলা ভাত দুবেলা জলখাবার?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মদন ঘাড় কাত করল। বাবা আবার চিন্তা করছে। মা ছোট বোনটাকে দুধ খাওয়ায়। মার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা প্রশ্ন করে,

'তুমি কি ওষুধটা খেয়েছিলে?'

মা মাথা নাড়ে।

'ওষুধটা ভাল। ওইটুকুন শিশি। ছ'টাকা দাম। তা ভাল জিনিস। খাও। নিয়মিত খেতে থাকলে শরীরে বল পাবে।' ব'লে বাবা আবার মদনকে ছাখে। তারপর:

'আমি গরিব। কেরানী মানুষ। অত মাইনে দিতে পারব না। অথচ একটা লোকও চাই। মিণ্টুর মার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। তা বাপু—'

মা মদনের মুখ লক্ষ্য করছে। আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মদন ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছে।

বাবা বলল, 'দুবেলা ভাত খাবে—আর সকালে বিকালে ওই একটু চা রুটি—আমাদের যা হয়—আর আর—' হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাবা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

অর্থাৎ বাবা ইতস্তত: করছিল। একটা বাড়তি লোকের খোরাক জুগিয়ে অতিরিক্ত দুটাকা একটাকা ঘর থেকে বার করে দিতেও বাবার কষ্ট হবে আমার জানতে বাকি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বাবা মার জন্য একটা ওযুধ কিনে এনেছে। আমার স্কুলের দু মাসের মাইনে জমে গেছে। বাবা এসবই চিন্তা করছিল, মুখ দেখে বুঝলাম।

মা মদনের দিকে তাকাল।

'দশ টাকা মাইনে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাপু, —তিন টাকার বেশি পাবে না।'

অবাক হয়ে দেখলাম মদন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছে।

বাবা খুশি হল।

'তা ছাড়া কাজকর্ম আমার সংসারে আর তেমন কি—অতিথি অভ্যাগত নেই, বাইরের লোক নেই। তিনজন তো আমরা মানুষ।'

মদন আবার ঘাড় কাত করেছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখে পড়ল ওর মুখে হাসি ফুটেছে। মানে, তাতেই সে রাজী। মদন আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমার এত ভাল লাগছিল!

বড় বড় চারটে ডুমুরের ডাল কেটে ফেলল মদন। আকাশটা ফরসা হয়ে গেল। আমার পেঁপে চারাটা ফট্‌ফটে রোদের মুখ দেখে হাসতে লাগল।

'এইবেলা গাছটার জোর বাড় হবে', মদন বলল, 'ওই ডুমুরের ডাল দিয়ে আমি বেড়া তৈরী করে দেব—ছাগল গরু এসে মুখ লাগাতে পারবে না।'

'আরো দু চার রকমের চারাগাছ এনে পুঁতব', আমি বললাম, 'জমিতে এখন রোদ লাগছে, এখন গাছ বাড়বে।'

'তার জন্যে চিন্তা কি—আমি যখন এসে গেছি আর চিন্তা নেই, আমি হরেক রকমের চারা এনে লাগিয়ে দেব।' খুশি হয়ে মদনকে চুমো খাবার মতন আমার মনের অবস্থা। সকালে মাকে বাটনা বেটে দিয়ে জল তুলে দিয়ে, ঘর বারান্দা ঝাঁট দিয়ে একটু অবসর হতে ও ছুটে এসেছিল রান্নাঘরের পিছনে। পেঁপে চারাটা ছায়ায় ঢাকা আছে দেখে তখনি ও কাটারি হাতে করে ডুমুর গাছে উঠেছে। রোগা শরীর। পা দুটো ঠক্‌ঠক করে কাঁপছিল। ভয় পেয়ে আমি নিচে দাঁড়িয়ে বলছিলাম, 'সাবধান, দেখবি পড়ে-টড়ে না যাস!' গাছের ডালে কাটারির কোপ বসাতে বসাতে মদন বলছিল, 'আমরা চাষীর ছেলে, হট্ করে কি গাছ থেকে পড়ে যাই—' আমি আর কিছু বলিনি।

এতবড় চারটে ডাল কাটা হয়েছে দেখে বাবা চোখ কপালে তুলল। 'এটা করলি কি মদন, বাড়ির আব্রু নষ্ট করে ফেললি!'

মা পিছনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বাবা যখন ডুমুর গাছের অবস্থা দেখে খুব একটা হায় আফসোস করতে আরম্ভ করল তখন মা মুখ থেকে আঁচল সরাল: 'আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তোমার ছেলের বৌ আসতে এখনো ঢের দেরি। অত আব্রু রাখার দরকার কি—তা ছাড়া—'

যেন একটু অবাক হয়ে বাবা মার মুখ দেখছিল।

মা বলল, 'তা ছাড়া আমাদের পিছনটা তো ফাঁকা। পোড়ো মাঠ। মানুষের মুখ দেখা যায় না। আব্রুর দরকার পড়ে না।'

অর্থাৎ মা যে মদনের কাজটা সমর্থন করল আমি বুঝে গেলাম। কেন করবে না। আমি বাগান করতে চাইছি আর মদন এ বাড়ির কাজে লাগতে না লাগতে আমাকে সাহায্য করছে মা কি সেটা ভাল চোখে না দেখে পারে!

তা ছাড়া এমনিও মদন মার খুব বাধ্য হয়ে পড়ল। মা শুধু চোখের ইঙ্গিত করতে মদন এটা এনে দেয় ওটা বাড়িয়ে দেয়। কয়লার গুঁড়ো জমে ছিল। মাটি এনে মদন নিজে থেকে এত এত গুল তৈরী করে ফেলল। মাকে বলতে হল না। রোদে শুকিয়ে সব গুল নিজেই তুলে রান্নাঘরের কোণায় এনে জড়ো করে রাখল। মা বলল, 'গরিবের ছেলে গরিবের সংসারেই তোকে মানিয়েছে বাবা।'

'ও বাড়ি আমি আর ইয়ে করতেও যাব না।' মদন একটা খারাপ কথা বলতে যাচ্ছিল, মা ধমক দিতে ও চুপ করল। তারপর মা কি ভেবে হাসল: 'কেন, ওরা কি তোকে খেতে-টেতে দিত না?'

'ছাই দিত!' যেন কথাটা বলতে মদনের মুখ চুলবুল করছিল। 'সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ঘন দুধ—এই এতবড় টুকরো মাছের—সব ওরা খেয়েছে। কর্তা খেয়েছে গিন্নী খেয়েছে খোকা খেয়েছে—আমাদের ঝি-চাকরের জন্যে মোটা চালের ভাত আর ডাল আর পুঁই-চচ্চড়ি—মাসের মধ্যে এক-আধদিন কুচো চিংড়ি পেতাম চচ্চড়িতে—আর ডালের কি চেহারা—গঙ্গাজল!' এমনভাবে হাত নেড়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মদন সুকুমারদের বাড়ির খাওয়ার বর্ণনা করছিল যে আমি ও মা একসঙ্গে জোরে হেসে ফেললাম। বাবা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখতে পাইনি।

বাবা ধমক লাগায়।

'হয়েছে হয়েছে—একজনেরটা খেয়ে এসে নিন্দে করতে নেই—বলে, যার নুন খাব তার গুণ গাব—নিন্দে করা পাপ।' আমাদের হাসি নিভে গেল। মদন চুপ করে রইল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে আমার পেঁপে গাছের তদারক করতে লেগে গেলাম। রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি বাবার গলা শুনছিলাম। 'তা অত গুল দেওয়াবার কি দরকারটা ছিল—একটা কচি বাচ্চা পেটের দায়ে নয় এখানে চাকরি করছে—তাই বলে তুমি সব কাজ ওকে দিয়ে সারছ।' বুঝলাম মাকে বলা হচ্ছে। মা বলছিল, 'আমি কিচ্ছু বলিনি—বরং আমি না করেছি—নিজে থেকে ও মাটি এনে বসে বসে এসব দিয়েছে।'

তারপরও বাবা গুমগুম করে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি। না, একটা বাচ্চা ছেলে রাতদিন খাটুক বাবা যেমন পছন্দ করে না, মা-ও তা চায় না। আমি নিজের চোখে দেখতাম। কি, ঘন দুধ, বড় মাছ আমরা কেউ খেতে পেতাম না। মাসের আটাশ দিন ডাল তরকারী শাক চচ্চড়ি হত। কিন্তু তা হলেও যদি মা কোনোদিন পটলটা বেগুনটা ভাজত, কি বড়াটড়া করত, আমাকে বাবাকে তো বটেই, মদনকেও দুটো একটা না দিয়ে মা শান্তি পেত না, ভাত খেতে পারত না।

চোখের ওপর তো দেখলাম মদন আমাদের বাড়িতে কাজে লাগতে না লাগতে মা আমার একটা ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট সুন্দর করে সেলাই (ভাল বা ছেঁড়া বলতে আমারও অতিরিক্ত প্যান্ট ঐ একটাই ছিল) করে ওকে পরতে দিয়েছে। বাবা সামনের মাসে মাইনে পেলে মদনকে একটা গেঞ্জি কিনে দেবে মা এখন থেকেই বলে রাখছে। যদি মা অল্প ক'দিনের মধ্যে ওকে এতটা আদর যত্ন করতে আরম্ভ না করত তো মদনই কি মার এমন বাধ্য হয়ে পড়ত ? মার মুখে শোনা, আমি স্কুলে চলে গেলে মদন সারাটা দুপুর মার কাছে বসে থাকে, কাগজ জ্বেলে আমার ছোট বোনের দুধ-বার্লি গরম করে দেয়, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে ছুটে গিয়ে উঠোনের দড়ি থেকে জামা-কাপড়-গুলো তুলে ঘরে এনে রাখে—'মিণ্টু আমার ছেলে, তুইও আমার ছেলে।' আমি ক'দিন মাকে বলতে শুনেছি। শুনে ফ্যাকাসে ড্যাবড্যাবে চোখে মদন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত।

পাঁচ দিনের মাথায় পেঁপে চারাটার আরো দুটো কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা ডাঁট, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট ছ'টা পাতা হয়েছে। 'এখন আর চারা না, রীতিমতো একটা গাছ বলা চলে', ভাবতাম আমি আর অবাক খুশী চোখে বাদলা হাওয়ায় ছোট ছাতার মতন পাতাগুলোর কাঁপন দেখতাম। মদন ডুমুরের ডাল কেটে সুন্দর একটা বেড়া তৈরী করে দিয়েছে।

'আমি আরো কিছু চারা এনে পুঁতব', মদন বলত, 'আতা, করমচা, বাতাবিনেবু, পেয়ারার চারা।'

'কোথা থেকে আনবি ?' আমি বলতাম, 'পারবি জোগাড় করতে ? বৌবাজারে এসব চারা পাওয়া যায় রথের মেলায়। এখন তো রথ শেষ হয়ে গেছে।'

'আরে ধেৎ, রথের মেলা—কিনে আনব নাকি—এমনি সব নিয়ে আসব।'

'কোথা থেকে শুনি ?' উৎসাহে খোলা বই ফেলে রেখে আমি মদনের বিছানায় গিয়ে বসতাম। আমার পড়ার ঘরেই দুজনের শোবার জায়গা। পাশাপাশি বিছানা। বাবা মা খেয়ে ও-ঘরের দরজায় খিল এঁটে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। বেশ একটু রাত জেগে আমি পড়তাম। মদন আমার পড়া শুনতে শুনতে কোনদিন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনদিন একটা দুটো কথা সুরু করে পরে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাবা মা শুনতে না পায় এমনভাবে নিচু গলায় দুজন কথা বলতাম।

'তুই কি পেয়ারা করমচার চারা দেখে এসেছিস কোথাও ?'

'আমি কি এ-পাড়ায় নতুন', মদন প্রশ্ন শুনে চাপা গলায় হাসত, 'কার বাড়িতে কোন্ গাছ আছে আমি সব জানি।'

'শুনি না কোথা থেকে করমচার চারা জোগাড় করবি ?' আমি তখন মদনের বালিশে মাথা রেখে তার পাশে শুয়ে পড়েছি।

মদন আমার পেটের ওপর হাত রাখে, তারপর আমার কাছে মুখ এনে কথাটা বলে। শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলি, 'এমনি তো দেবে না ওরা, চুরি করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো—চুরি করব। সুকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর ফুলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারা যাবে না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।'

উত্তেজনায় মদন তখন উঠে বসেছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'চুরি করে ওসব আনলে মা রাগ করবে।'

'মাকে বলতে গেছি নাকি চুরি করে এনেছি কি দেখিয়ে এনেছি ?' মদন আমার পেটে চিমটি কাটল। 'রাত থাকতে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়ব, কেমন ?'

আমি ঘাড় নাড়ি। কি ভেবে একটু পরে বলি, 'সুকুমারের ওপর তোর খুব রাগ, কেমন ? ওর মা তোকে আর ও-বাড়ি রাখল না বলে ?'

'বয়ে গেছে ও-বাড়ির কাজ করতে।' ভেংচি কেটে মদন আমার কথার উত্তর দেয়। একটু চুপ থেকে পরে: 'রাগ থাকবে না ? রোজ ইস্কুলে যাবার সময় সুকুমার পায়ের জুতোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত, বুরুশ করে দে। লাটসাহেবের ছেলের জুতো বুরুশ করতে করতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত—আর আজ কিনা বলে এখানে তোর সুবিধে হবে না, অন্য বাড়িতে কাজ পাস কিনা ছাখ্ গে।'

'সুকুমারও বলেছে এ-কথা ?'

'তবে !'

যেন মদনের চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো নিভিয়ে শুয়ে শুয়ে সেদিন সুকুমারের চেহারাটা মনে করছিলাম। ব্যারিস্টারের ছেলে। ভাল জামা-জুতো পরে স্কুলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি—সুকুমার আমার সঙ্গে ভাল ক'রে মিশবে দূরে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না হাবুলের সঙ্গে না সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অংশু

অনুপম নীহার। ওরা বড়লোক, আমরা গরিব। আমরা খালি পায়ে স্কুলে আসি, আমাদের জামা প্যাণ্ট ময়লা ছেঁড়া—

ভাল হবে খুব ভাল হবে। মদনের প্রস্তাবটা মাথায় ঘুরছিল। ওদের বাগানের সব ফলের গাছ ফুলের গাছ যদি ছিঁড়ে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দেয়া যায় বেশ হয়।

অন্ধকারে একসময় মদন আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনে।

'ঘুমিয়ে পড়লি ?'

'না।'

'সুকুমারের বাবা রোজ বাড়িতে মদ খায়।'

'ধেৎ!' আমি অল্প হাসলাম।

'হ্যাঁ রে—ওদের টাকা পয়সা থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি সব বিক্রি হয়ে যাবে।' মদন থমথমে গলায় বলল, 'ওরা যদি আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন না ?'

অন্ধকারে মাথা নেড়ে আমি উত্তর করলাম, 'তা হয় বটে।'

দুদিন আমরা চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুদিনই ব্যর্থ হলাম। শেষ রাত্তিরের অন্ধকারে টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা সুকুমারদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি অমনি মোটা লাঠি বাগিয়ে বাগানের মালী আমাদের তাড়া করেছে। আর সুকুমারদের কুকুরটা! বাঘের মতন লাফিয়ে মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনরকমে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

'কত বড় এক একটা পেয়ারা, দেখলি তো!' বাড়ি ফিরে মদন আফসোসের গলায় বলত, 'একবার যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারতাম, পাঁচ-সাতটা পেয়ারা আনা যেত।'

'থাক গে—শেষে ধরা-টরা পড়ে—' আমি মদনকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু মদন চুপ থেকে যেন ও-বাড়ির বাগানের ডাঁশা পেয়ারাগুলোর কথা ভাবত। নর্দমার পাশে একটা মাধবী-লতার চারা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পেঁপে গাছের গুঁড়ি থেকে আধ হাত দূরে সরিয়ে চারাটা পুঁতলাম। মদনকে বললাম, 'তুই দু মগ জল এনে ঢেলে দে। আমি একটা বাঁশের কঞ্চি কোথাও পাই কিনা দেখি। লতাটা তরতর করে বেয়ে উঠবে।'

বাঁশের কঞ্চি নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম মদন তেমনি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কি ভাবছে। ওদিকে মা মদনকে ডাকছে কয়লা ভেঙে দিতে। মদন নড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক-পা এক-পা করে মা রান্নাঘরের পিছনে চলে আসে। 'বেলা হয়েছে, উনন ধরাতে হবে—তোরা কি কেবল বাগানের পিছনে লেগে থাকবি।' কিন্তু মার কথা শুনে মদন মুখ তুলল না। 'তোর কি হয়েছে, ভূতে পেয়েছে ?' মা হাসে।

হুট্‌ করে আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম মদন অসন্তুষ্ট হল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল একবার।

শুনে মা হাসছিল: 'ছিঃ, পরের জিনিসের ওপর লোভ করতে নেই। এমন একটা খুব ভাল জিনিস না পেয়ারা।'

তারপরও মদন মুখ নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। উঠোনে বাবার খড়মের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে মার কয়লা ভাঙতে গেছে।

না, পেয়ারা না, ভাবছিল সে ভূষণের কথা। সুকুমারদের বাগানের মালী। 'ওর সেবার জ্বর হয়েছিল, আমি নিজের হাতে কয়লা ভেঙে উনন সাজিয়ে ওর উনন ধরিয়ে দিলাম, সাগু জ্বাল দিয়ে দিলাম। আর আজ শালা আমায় লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে আসে!'

আমি হাসি: 'তুই তো আর এখন ওদের চাকর নস— ও-বাড়ির কেউ না তুই—কাজেই।'

'বটে!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে মদন ভেংচি কাটে। 'ওই শালা—ভূষণের মাথাটা আমি ইঁট মেরে ভেঙে দেব।'

'না না ওসব করতে যাবিনে—খামকা একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি।' আমি মদনকে বুঝিয়ে বললাম, 'জানতে পারলে বাবা রাগ করবে। বাবা গণ্ডগোল পছন্দ করে না। সাদাসিধে মানুষ, নিরিবিলি থাকতে চায়।' বলে আমি স্কুলে চলে গেলাম। কিন্তু মদন আমার কথা শুনল কি? যেন ও-বাড়ির ওপর তার আক্রোশের আর শেষ ছিল না। হ্যাঁ, তখন বিকেল, বেশ জোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে,—রাস্তায় জল জমেছে। আমরা স্কুল থেকে ফিরছি। আমি হাবুল সনাতন পিছনে হাঁটছি। আগে আগে চলেছে সুকুমার আর তার বন্ধুরা। হঠাৎ দেখলাম—বিপরীত দিক থেকে আমাদের মদন সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। সম্ভবত মা মুদি-দোকানে কিছু কিনতে পাঠিয়েছে ওকে। মদন নিশ্চয় সুকুমারদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে হাবুলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তবে দোকানের দিকে যাবে। চিন্তা করলাম। কিন্তু চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। ইচ্ছা করেই মদন এটা করল সবাই বুঝল। পা দিয়ে রাস্তার জল ছিটিয়ে সুকুমারের সাদা ধবধবে সাটিনের শার্ট প্যাণ্ট নোংরা করে দিয়ে মদন ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু যাবে কোথায়। সুকুমারকে দেখেশুনে

বাড়ি নিয়ে যেতে একটু দূরে দূরে যে ভূষণ মালীও হাঁটছিল মদন নিশ্চয় দেখতে পায়নি। ছুটে গিয়ে ভূষণ মদনকে ধরে ফেলল। সুকুমার আর তার বন্ধুরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মদনকে হিড় হিড় করে ভূষণ সুকুমারদের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি আর আমার বন্ধুরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখলাম।

কথাটা মা শুনল। আফিস থেকে ফিরে বাবা শুনল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর রাত। রাত আটটা পর্যন্ত বাবা আমাদের বাড়ির সামনে বড় কাঁটাল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল।

বাবা একসময় ঘরে ফিরতে মা বলল, 'তুমি কি একবার যাবে, ও বাড়ি? নিশ্চয় ছেলেটাকে বেঁধেটেঁধে রেখেছে। এখন পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।'

'রাখুক বেঁধে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল, 'যেমন কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করুক। কেন হারামজাদা কাদা ছিটোতে গেল।'

'আহা, ছেলেমানুষ, না হয় একটা অপরাধ করেছে,—আর কী তেমন অপরাধ। হয়তো ছুটে যাচ্ছিল বলে—'

আমি মার কথায় সায় দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

'বড়মানুষের বাড়ি গিয়ে আমার চাকরের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার—আমারও সম্মানে বাধে। ওদের কাছে ওরা বড়—কিন্তু আমিও শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। আমিও—' বুঝলাম মদনকে এতটা রাত অবধি আটকে রাখা হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে বাবা খুব উত্তেজিত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

মা আর কথা বলল না। কাজকর্ম একলা হাতেই সব সারতে লাগল। বাবা বারান্দার অন্ধকারে বসে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল। আর আমি হ্যারিকেনের সামনে বই খুলে মদনের বিছানা, দেওয়ালের হুকে ঝোলানো তার তালিমারা ময়লা হাফ-প্যাণ্ট ও শার্টটা দেখেছিলাম। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।

সত্যিই মদন সে রাত্রে আর এল না।

সকালে চা খেতে খেতে বাবা ও মা ঠিক করল আমাকে একবার ও-বাড়ি পাঠানো হবে মদনের খোঁজ নিতে।

মা বলল, 'ময়লা প্যাণ্ট ছেড়ে ধোয়া প্যাণ্টটা পরে নে।'

বাবা বলল, 'অন্য কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে লাভ নেই—কেবল সতীশবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবি মদন কাল বাড়ি ফেরেনি কেন। শুধু জেনে আসবি। আর কিছু বলতে হবে না।'

'জিজ্ঞেস করলে বলবি বাবা পাঠিয়েছে।'

'না না না।' মার কথায় বাবা আবার প্রতিবাদ করে উঠল। 'বলবি মা পাঠিয়েছে। আমি কেন! আমি এ-ব্যাপারে নেই। হয়তো ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে কি গেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা—মানে পুরুষমানুষ খোঁজখবর নিচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে, জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মেয়েমানুষের মধ্যেই থাক এটা—বুঝলে না? সেজন্যেই তো আমি মিণ্টুকে সুকুমারের মার কাছে পাঠাচ্ছি।'

অল্প হেসে মা বলল, 'আচ্ছা।'

মানে, বাবা রাগ দুঃখ দুশ্চিন্তা অভিমান—মনে মনে যা-ই পোষণ করুক না কেন, বাইরে সব বিষয়ে নিরিবিলি মুক্ত থাকতে চায়। মদনের ব্যাপারে আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, বুঝে মা আর উচ্চবাচ্য করল না।

কেবল আমি যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মা—চিরুনি দিয়ে আমার মাথার চুলটা ঠিক করে দিল। বলল, 'সুকুমারের সঙ্গে কথা-টথা বলে কাজ নেই—কি বলতে কি বলে দিলে তুই আবার ঝগড়া-টগড়া বাধিয়ে আসবি।'

আমি বললাম, 'না, বলব না।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হল না। সুকুমারদের গেট্-এর সামনে শিউলী গাছের তলায় আমি থমকে দাঁড়াই। মদনকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু মদন খুব ব্যস্ত। বালতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল বয়ে আনছে। সুকুমারদের গাড়ি ধোয়ানো হচ্ছে। ভূষণ গাড়ি ধোয়াচ্ছে। ড্রাইভার হারাণ দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। বেশ বড় বালতি। গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে বালতিটা নামিয়ে রেখে মদন হাঁপায়। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও ফিক্ করে হাসে।

'আমি এ বাড়ির কাজে লেগে গেছি।'

'কবে থেকে?' বেশ আস্তে বললাম।

'ওই কাল বিকেল থেকেই।' হলদে দাঁত ক'টা বার করে মদন তেমনি হাসতে থাকে, 'আমায় কিছু বলল না গিন্নীমা—বরং ভূষণাকে গালমন্দ করেছে। ছেলেমানুষ ছুটতে গিয়ে জল ছিটিয়েছে—তা বলে—'

আমি ফিরে আসছিলাম!

মদন বলল, 'শোন্। তোর মাকে বলবি, আর আমি

তোদের বাড়ির কাজ করব না। এখানে লেগে গেছি। গিন্নীমা কাল রাতে বলল ওরা গরিব মানুষ। নিজেদেরই চলে না, তো ও-বাড়িতে তুই থাকবি কি।'

আমি ফিরে এলাম।

মা শুনল। বাবা শুনল।

শুনে তারা একটা কথাও বলল না।

আমি মুখ ভার করে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পেঁপে গাছে আরও দুটো নতুন পাতা মেলেছে। মদনের হাতের তৈরী ডুমুরের ডালের বেড়াটা দেখছিলাম। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, মদন গেছে—আমার পেঁপে চারাটাও আর থাকবে না।

তিন দিন পর শেষ রাত্রে আবার জোর বর্ষা নামল। সে কী বৃষ্টি! যেন জল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। কতক্ষণ আর ঘরে আটক থাকা যায়। সেই অন্ধকার থাকতে জেগে বিছানায় বসে ছিলাম। হ্যাঁ, তখন বেলা আটটা সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে কি আমি হুট্ করে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের পিছনে চলে গেলাম। আমার বাগানের অবস্থা কি হয়েছে দেখতে ভীষণ মন কেমন করছিল। কেননা উঠোনে জল জমেছে। রান্নাঘরের পিছনটা ঢালু। সেখানে কত জল দাঁড়াল, পেঁপেগাছ মাধবী-চারা ডুবে গেল কিনা এবং যদি তা-ই হয়, জলটা সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আমি বৃষ্টি মাথায় করে ডুমুরতলায় ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাগানের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পেঁপে চারাটা নেই। মাধবী-লতাটা জলে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ডুমুরের ডালের বেড়াটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে। আমার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। বারান্দা থেকে মা ডাকছিল, বাবা ডাকছিল: 'ভিজিস্‌নে, জ্বর হবে, চলে আয়, চলে আয়।'

'আমার পেঁপে গাছটা নেই।' চিৎকার করে উঠলাম।

'জলে ভাসিয়ে নিল কি?' মা বলল, 'উঠোনের সব জল তো নদীর স্রোত হয়ে ঘরের পিছনে ছুটছিল—'

'বেড়া ভেঙে গেছে। যেন কে ভেঙে দিয়ে গেল।' বলতে বলতে আমি বাগান ছেড়ে ঘরের পৈঠায় উঠে এলাম।

'তাই বলো, বেড়াও ভাঙা, পেঁপে চারাও নেই।' বাবা গম্ভীর হয়ে মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে, আমার দিকে না মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই হারামজাদা গরুটা নিয়ে গেছে। শেষ রাত্তিরে একটা খচখচ শব্দ শুনলাম না রান্নাঘরের পিছনে?'

'আমি শুনিনি শব্দ।' মা আমার দিকে মুখ ফিরাল, 'হবে হয়তো, যদি জলে ভাসিয়ে নিত এদিক ওদিক কোথাও থাকত তো, এতবড় গাছটা তো অদৃশ্য হয়ে যেত না। ঐ গরুর কর্ম।'

'একেবারে গোড়াসুদ্ধ খেয়ে গেছে। যেন উপড়ে তুলে সবটা গাছ মুখে নিয়ে সরে পড়েছে।' আমি কান্নার সুরে বললাম, 'একটা শেকড় পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মা চুপ করে রইল। বাবা আবার মুখে হুঁকো তুলল।

'কত যত্ন করে গাছের সবটা ঘিরে মদন ডুমুরের ডাল পুঁতে বেড়া করে দিয়েছিল—' যেন নিজের মনে বললাম আমি। শুনে মা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বাবা নির্বিকার। আমার ওই বাগানের সঙ্গে যে মদনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে মা তা স্বীকার করল। মার নিশ্বাস ফেলার শব্দে তা বুঝলাম। কিন্তু বাবা যেন কথাটাকে তেমন আমল দিচ্ছিল না।

'যা যা এখন পড়তে যা—সামনে পরীক্ষা।'

বাবার ধমক খেয়ে গাছের শোক বুকে পুষে এক-পা এক-পা করে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

হ্যাঁ, তারপর ছ'মাস গেছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ। শীতের দুপুর। হঠাৎ আবার কি করে যে সুকুমারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল বলা শক্ত। আমার মনে হয় 'ডিটেকটিভ' গল্পের বইটা। আমার এক মামাতো ভাই বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসে বইটা আমাকে দিয়ে গেছে। কি করে কি করে যেন সুকুমার জানতে পেরেছিল। একদিন হুট্ করে গল্পের বই নিতে আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। একটু অবাক হলেও তৎক্ষণাৎ তাকে বইটা পড়তে দিলাম। তারপর আর কি। ও আমাদের বাড়িতে এল যখন আমাকেও ভদ্রতা রাখতে ওদের বাড়ি যেতে হল। এবং এটা সবাই স্বীকার করবে, দীর্ঘকাল ঝগড়াঝাঁটি চলার পর যখন ঐ বয়সের দুটি ছেলের মধ্যে ভাব হয় তখন তা দেখতে দেখতে বড় বেশি গাঢ় নিবিড় হয়ে ওঠে।

যেন সুকুমার আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, আমি তাকে না দেখে শান্তি পাই না। ওর বাড়ির ঘরে বসে দুজন গল্প করি, ওদের প্রকাণ্ড ছাদে উঠে বেড়াই,—কখনো আমরা বাগানে নেমে যাই।

হ্যাঁ, বাগানের মতো বাগান বটে!

একধারে ফুলের গাছ, একধারে ফলের গাছ।

পাঁচিলের এ মাথা থেকে আরম্ভ করে ও-মাথা পর্যন্ত

বাগানের আর শেষ নেই। কোন্‌টা কলমের চারা কোন্‌টা বীজের গাছ সুকুমার আমাকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায়।

তারপর দুজন একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ কাণ্ড লম্বা ডাঁট সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটা সুন্দর পেঁপে গাছ! ফলতে আরম্ভ করেছে। 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল!' সুকুমার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সুকুমার আমার হাত ধরে বলল, 'চল এখন ওপাশটা ঘুরে দেখা যাক।'

বাগান দেখা শেষ করে গল্প করতে করতে দুজন যখন সুকুমারদের বাঁধানো উঠোন পার হয়ে ওর বাড়ির ঘরের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম মদন চৌবাচ্চার ধারে বসে মাথা গুঁজে চায়ের কাপ প্লেট ধুচ্ছে। ও আমায় দেখতে পায়নি। যদি মুখ তুলে তাকাত আমি নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে কথাটা মাকে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে রইল, মাকে আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চুপ করে রইলাম।

কেবল চাকরি না, আমাদের রান্নাঘরের পিছনের ছায়ায় ঢাকা স্যাঁতসেঁতে জমির চেয়ে ও-বাড়ির রোদালো বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি এতটুকু রাগ করতে পারলাম না। কি, তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘছত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশি টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে সুকুমারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে—যেন গাছটাকে দেখে দেখে আর আশ মিটত না।

একদিন দুপুরবেলা গাছটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় ঢুকল। মাঝখানে গল্প থামিয়ে আমি সুকুমারকে বললাম, 'চলি রে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে ও আমাকে দেখছিল। কিন্তু ওর দিকে আর না তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম। তখনও বুকের ভয়টা ডেলা পাকিয়ে আমার গলার কাছে ঠেকে ছিল। মদন পেঁপে চারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে—কেবল মদনকে না, আমাকেও—না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।

বাড়ি ফিরে মার পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইলাম।

'কি হ'ল।' মা প্রশ্ন করছিল।

আমার চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

'কাঁদছিস কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা শুধোয়। আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়ি গয়না পরা প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—আর কখন তিনি শাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম—থাকতে আরম্ভ করেছি?

আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।
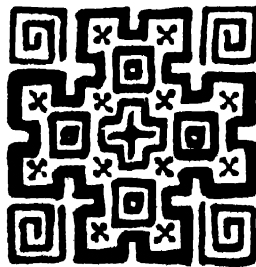
শতাব্দীর অভিজ্ঞ
জুয়েলার্স
টি.সি.আড্ডি
এণ্ড সন্স
২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

রবার্ট সাহেবের গৃহত্যাগ

শংকর

আপনাদের কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গে যদি কোথাও দেখা হয়ে যায়, দয়া ক'রে আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন। আর যদি কিছু মনে না করেন, (ব্যাপারটা বলে রাখা ভালো) আপনার ওখানে পৌছিয়েই টেলিগ্রামের খরচটা আমি দিয়ে দেবো।

কৃষ্ণপ্রাণের কোনো ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে, সেটা ছাপিয়ে দিতাম। তবে তাঁর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে রাখি। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুল। গায়ে লম্বা গেরুয়া-রঙের আলখাল্লা। খালি পা, হাতে একতারা। খড়্গের মতো নাক, আর টানা-টানা চোখ—একেবারে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তফাতের মধ্যে শুধু ঐ কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। আর কটা চোখ দুটো। বয়স? তা হলো বৈকি, এতোদিনে বছর পঁয়ত্রিশ। তবে সংসার-ত্যাগীদের বয়স তো, সব সময় বোঝা যায় না।

বুঝেছি, আমার বর্ণনা থেকে আপনার মানসচক্ষে কৃষ্ণপ্রাণের ছবিটা ঠিক ভেসে উঠছে না। কিন্তু সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। কৃষ্ণপ্রাণকে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও আপনি তাঁকে বুঝতে পারবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাছের পোস্টাপিস থেকে আমার নামে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। আপনার টেলিগ্রামটা পেলেই আমি ট্যাক্সি নিয়ে একবার স্যালভেশন হোমে যাবো। সেখানে মিনিট তিনেক লাগবে, তারপর সোজা ইস্টিশন। তবে আমাদের যাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রাণকে যে ক'রে হোক আটকে রাখবেন।

আর একান্তই যদি তা সম্ভব না হয়, ওঁকে বলবেন (তবে দয়া ক'রে একটু আড়ালে ডেকে বলবেন, মীরা যেন শুনতে না পায়)—মিসেস বনার আপনাকে অনেক দিন থেকে খুঁজছেন। আপনাকে বেশীক্ষণ আটকিয়ে রাখবেন না, শুধু একটি, মাত্র একটি প্রশ্ন করবেন। তারপর…

দেখুন, লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই কোনো কিছু অনুরোধ করে বসা যে ভদ্রতাবিরোধী তা আমি জানি। কিন্তু কি করবো বলুন, মিসেস বনারের জন্যে এই সামান্য উপকার-টুকু যদি না করতে পারি। শুধু আমি কেন, মিসেস বনার সম্বন্ধে ভারতীয় হিসেবে আপনারও দায়িত্ব আছে।

ওঁর সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা না থাকে তবে বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত ভারত সংস্কৃতি সোসাইটির বিশেষ সংখ্যায় আমার লেখাটি পড়ে দেখবেন। কারুর অনুরোধে নয়, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখেছিলাম—ভারতবর্ষের ধর্মজীবনে বিদেশিনীদের দান সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও রচিত হয়নি। যদি তা কোনোদিন রচিত হয়, তবে মিসেস বনারের নাম নিশ্চয়ই সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সিস্টার নিবেদিতা, মাদার, মিস্ ম্যাক্‌ল্যাউড-এর সঙ্গে উচ্চারিত হবে মিসেস বনারের নাম। ভারতের প্রাচীন ধর্মসাধনার প্রতি এমন জলন্ত ও ঐকান্তিক বিশ্বাস আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি, শুনিনি, এমন কি পড়িওনি।